Written strictly in accordance with the Approved Syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal as a Text-Book for Class X for Higher Secondary and Multipurpose Schools of West Bengal.
[*Vide Circular No. HS/1/58, dated 7th March 1958*]

ভূগোল

(উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্করণ)

দ্বিতীয় ভাগ

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

"ভূগোল শিক্ষা", "ভূগোল (৯ম ও ১০ম শ্রেণীর) "National Reader" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
এবং কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অবসর-প্রাপ্ত

অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন সিংহ, এম. এ.

ও

'ভূগোল ও বিজ্ঞান, ২য় শ্রেণীর', "ভূগোল ও বিজ্ঞান, ১ম ভাগ", "সহজ ভূগোল-শিক্ষা",
'ভূগোল, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং ভবানীপুর মিত্র-
ইনস্টিটিউশনের ভূগোল-শিক্ষক ও বিজ্ঞানের প্রধান-শিক্ষক

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

১৯৬০

প্রকাশক: শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মূল্য—৭'২৫ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর: শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

SYLLABUS FOR GEOGRAPHY

Higher Secondary Course

Board of Secondary Education, W. B.

CLASS—X

Part I—Physical Bases of Geography

A. (a) *Lithosphere* : Major types of Land form—Mountains, Plateaus and Plains (Mountains - their types in relation to mode of formation—Different types of Plateaus and Plains) : Earthquakes and Volcanoes—their causes and distribution : Weathering—mechanical and chemical : Denudation by different agents—water (surface and underground), sea, wind and ice : Works of rivers.

(b) *Hydrosphere* : Temperature and salinity : Movements of the ocean—currents and tides (omitting the theory of tides).

PART II—GEOGRAPHY OF THE WORLD

(*Regional, Economic and Human*)

B. Outline ot the geography of India.

N.B. The entire approach to the teaching of Geography will be regional.

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ

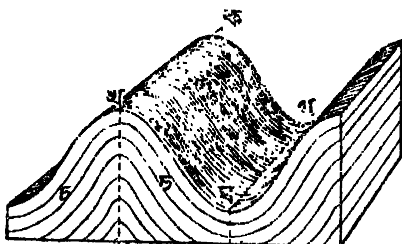
দ্বিতীয় খণ্ড

বারিমণ্ডল

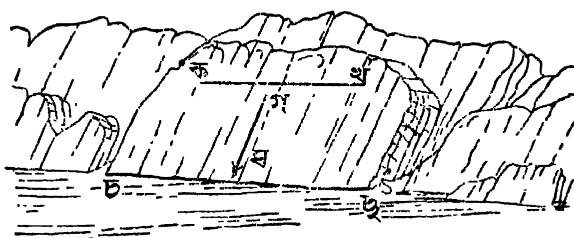
দ্বিতীয় খণ্ড

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

চিত্র ও নক্‌শা এবং উহাদের ব্যাখ্যা

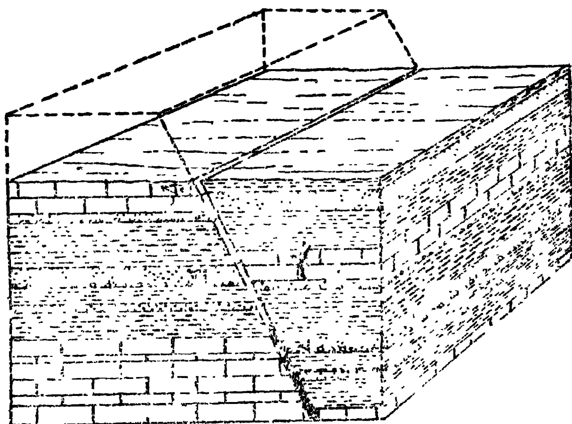


উলম্বভাবে সাধারণ ভাঁজ (Simple upright folds) —কখ—ভাঁজের উচ্চ অংশ বা উচ্চভঙ্গ (Anticline); কখ-রেখা উচ্চভঙ্গের অক্ষ; গঘ—ভাঁজের অধঃভঙ্গ বা ভাঁজের নিম্ন অংশ (Syncline) গঘ-রেখা—অধঃভঙ্গের অক্ষ; চ—ভাঁজের অঙ্গ; পৃঃ—১৪৪

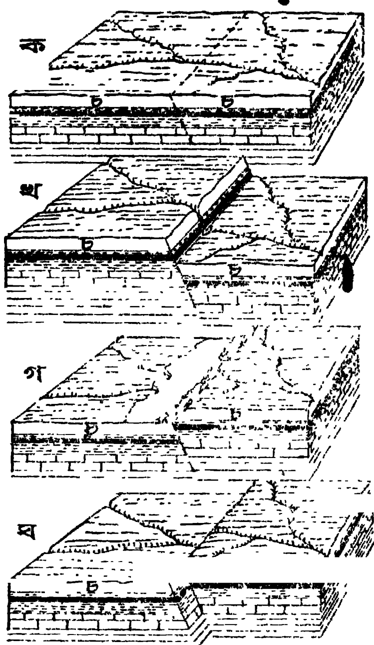


নতভাবে অবস্থিত স্তরের ডিপ ও স্ট্রাইক,—আনুভূমিক সরলরেখার (চছ) সমান্তরাল কখ-সরলরেখা স্ট্রাইক এবং উহার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত গঘ-সরলরেখা উলম্ব সরলরেখার সহিত যে কোণ সৃষ্টি করে, তাহাই ডিপ; পৃঃ—১৫৪

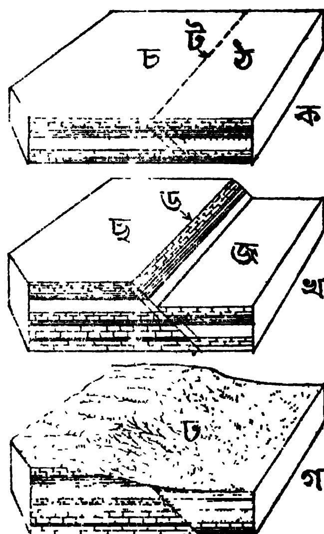
উঃ সং—৯ (ক)



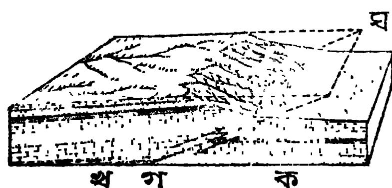
নত অবস্থায় চ্যুতিতল—শিলাস্তর কাটিয়া এক অংশ নতভাবে নামিয়া গিয়াছে,—ফাটলের বামপার্শ্বের তলকে পাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বের স্থানচ্যুত তলকে ঝুলান তল বলে ; ফাটলের কাল রঙ করা অংশটি খনিজ দ্রব্যপূর্ণ ভেন; ভগ্নরেখা দ্বারা বেষ্টিত অংশটি (যে অংশটি ফাটলের ফলে উঠিয়া গিয়াছিল) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অপসারিত হইয়াছে; ফাটলের উভয় পার্শ্বের শিলাস্তরগুলির অবস্থান লক্ষ্য কর ; পৃ—১৫৪



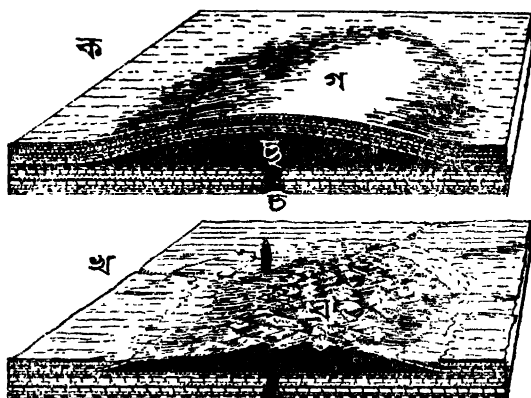
বিভিন্ন প্রকারের চ্যুতি—ক—শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি; ভগ্নরেখা ফাটল নির্দেশক। খ—ফাটলের এক পার্শ্বের শিলাস্তর নামিয়া গিয়াছে এবং অপর শিলাস্তরের পার্শ্বদেশ উচ্চ,—ইহাই স্লিপ বা ফল্ট-স্কার্প; লক্ষ্য কর, নদী ঐস্থানে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে; এইরূপ চ্যুতিকে স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal fault) বলে। গ—একপার্শ্বের শিলাস্তর ফাটিয়া উঠিয়া গিয়াছে; ঐ স্থানে নদী হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে; এইরূপ চ্যুতিকে বিপরীত চ্যুতি (Reverse fault) বলে। ঘ—এখানে শিলাস্তরের এক অংশ এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়াছে; এইরূপ চ্যুতিকে স্ট্রাইক-ফল্ট (Strike fault) বলে; পৃ:—১৫৪



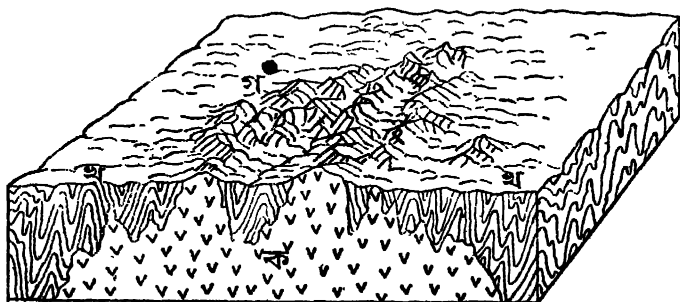
বহির্মুখী প্রবল চাপের ফলে পাললিক শিলাস্তরে চ্যুতির (Tensional fablt) সৃষ্টি; ক—শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি; খ—চ্যুতির সৃষ্টি; ড—ফল্ট-স্কার্প, গ—ফল্ট-স্কার্পের ক্ষয়সাধন এবং উহার ফলে ব্যবচ্ছিন্ন ফল্ট-স্কার্প ভূমিতে পরিণতি; পৃঃ—১৫৪



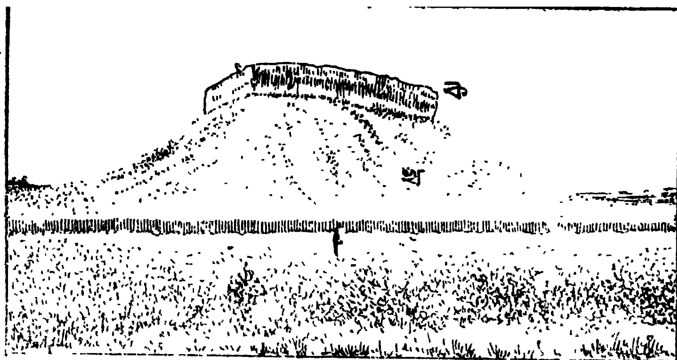
থার্স্ট-ফল্ট (Thrust or Compressional fault)—গঘ ফাটল, খ-শিলাস্তর অংশ ফাটলতল বহিয়া ক-শিলাস্তরের উপরে উঠিয়া গিয়াছে, ইহাই ঘাত-চ্যুতি বা থার্স্ট-ফল্ট; লক্ষ্য কর, ভগ্নরেখা-অঙ্কিত অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; পৃঃ—১৫৫



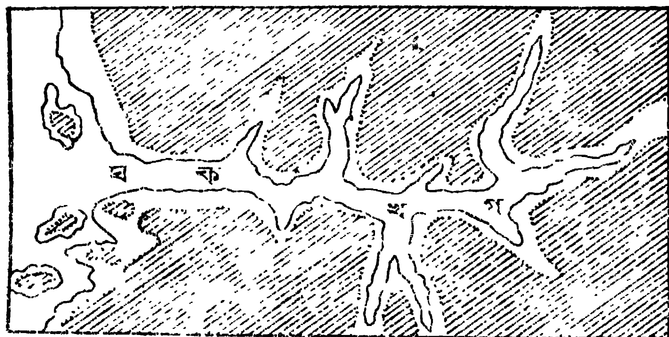
ক—ল্যাকোলিথ (Laccolith)—ছ-অংশের পৃষ্ঠদেশ উত্তল এবং উহা আগ্নেয়শিলায় গঠিত; উহার চাপে ঐ অংশের উপরস্থ ভূ-পৃষ্ঠও উত্তল; চছ ডাইক; লক্ষ্য কর, ল্যাকোলিথের তলদেশে পাললিক শিলা রহিয়াছে; খ—কালক্রমে পাললিক শিলায় গঠিত ল্যাকোলিথের ছাদ-অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আগ্নেয়শিলায়-গঠিত বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠে পরিণত হইয়াছে; পৃঃ—১৫৫



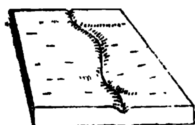
ব্যাথোলিথ (Batholith)—ভূ-পৃষ্ঠের গ-অংশের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যাথোলিথের আগ্নেয়শিলা দেখা যাইতেছে এবং ঐ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর; খ-অংশের পূর্বতন শিলা রহিয়াছে; ক-অংশই ব্যাথোলিথ; ইহার তলদেশ নাই, অর্থাৎ উহার নিম্নে অন্য প্রকৃতির শিলাস্তর দেখা যায় না; পৃঃ—১৫৫

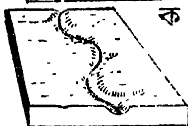


মেসা বা বাট (Mesa or butte)—পাহাড়ের শীর্ষদেশ ক-অংশ কঠিন শিলায় গঠিত, খ-অংশ অপেক্ষাকৃত কোমল শিলায় গঠিত ; পৃঃ—১৫৯



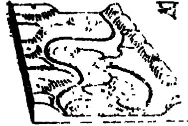
ফিয়র্ড—উচ্চভূমি ফিয়র্ডের পার্শ্বে অবস্থিত ; ক- খ- ও গ-অপেক্ষা ঘ-অংশের জলের গভীরতা কম ; পৃঃ—১৬৯





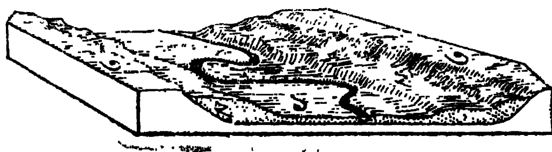






ঙ

নদী-উপত্যকার ক্রমবিকাশ—ক—V-অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট নবীন নদী-উপত্যকা; খ—নদীর বক্রগতি ধারণ; গ—উপত্যকা প্রশস্ত হইয়াছে; ঘ—উপত্যকা আরও অধিক প্রশস্ত হইয়াছে এবং নদীর গতিপথ ও বিশেষ বক্র; ঙ—উপত্যকায় বন্যা-গঠিত সমভূমির সৃষ্টি হইয়াছে এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদও রহিয়াছে; পৃ—১৮৬



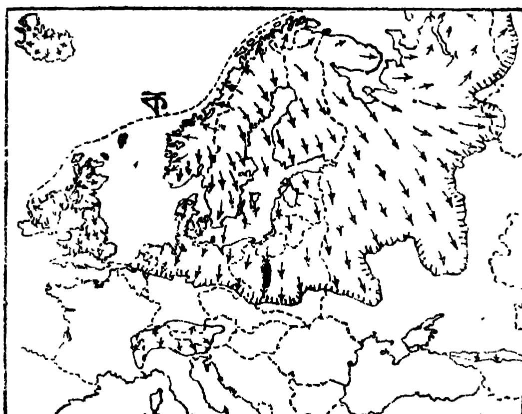
১—নদী-উপত্যকা, ২—নদী-টেরাস বা বন্যাগঠিত সমভূমির সোপান, ৩—উপত্যকার পার্শ্বের উচ্চভূমি; পৃঃ—১৮৭



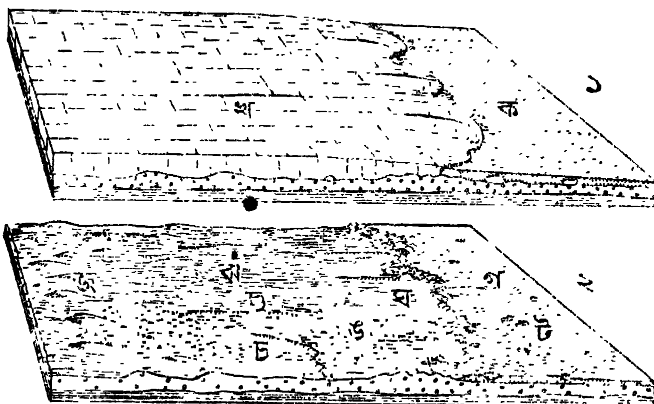
ক—মহাদেশীয় হিমবাহের কার্যের ফল—রোচে মুতেঁন্তে (Roche mountonne'e), দূর হইতে ঐগুলি দেখায় যেন কতকগুলি মেষ একত্রে শুইয়া আছে ; পৃঃ—২০২, ২০৫, ২২২



উত্তর-আমেরিকার মহাদেশীয় হিমবাহ,—খ ও গ হিমবাহের উৎপত্তি স্থান, ঐস্থান দুইটি হইতে হিমবাহ বিস্তারিত হইয়াছিল ; পৃঃ—২০২



ইউরোপের মহাদেশীয় হিমবাহ—ক-ভগ্নরেখা পর্যন্ত পশ্চিমে হিমবাহ বিস্তারিত হইয়াছিল, তীরচিহ্ন হিমবাহের গতিপথ নির্দেশক ; পৃঃ—২০২

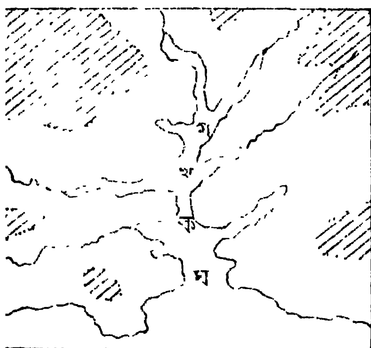


মহাদেশীয় হিমবাহ ও তাহার কার্য—অবক্ষেপণ—.

(১) ক—আউট-ওয়াশ প্লেন, খ—মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা আবৃত ভূ-পৃষ্ঠ ; পৃঃ—২০৮ ; (২) হিমবাহ গলিলে ঐ ভূ-পৃষ্ঠ-অংশের রূপ, গ—আউট-ওয়াশ সমভূমি ; ঘ—প্রান্তদেশীয় মোরেণ ; ঙ—হ্রদ ; চ—এস্কার ; ছ—বরফের ফাটলে সঞ্চিত শিলাস্তূপ ; জ—ড্রামালিন ; ঝ—টিল-সমভূমি ; পৃঃ—২০০-২১১



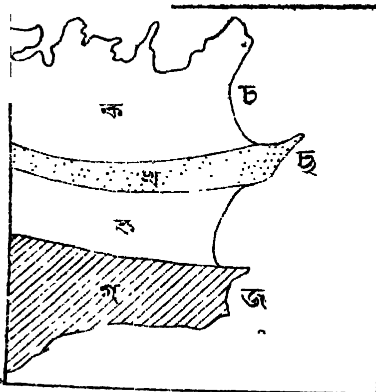
মহাদেশীয় হিমবাহের কার্য,—ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ,—পার্বত্যভূমির রূপের পরিবর্তন—(১) হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়সাধনের ফলে বন্ধুর পার্বত্যভূমি কতকটা মসৃণ হইয়াছে ; (২) হিমবাহ-বাহিত মোরেণের সঞ্চিত হওয়ায় বন্ধুর পার্বত্যভূমি কতকটা মসৃণ হইয়াছে ; (৩) শিলাময় সমভূমিতে মোরেণ সঞ্চিত হওয়ায় উহা বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; (২) ও (৩) চিত্রে হ্রদ লক্ষ্য কর ; পৃঃ—২০০-২০৫



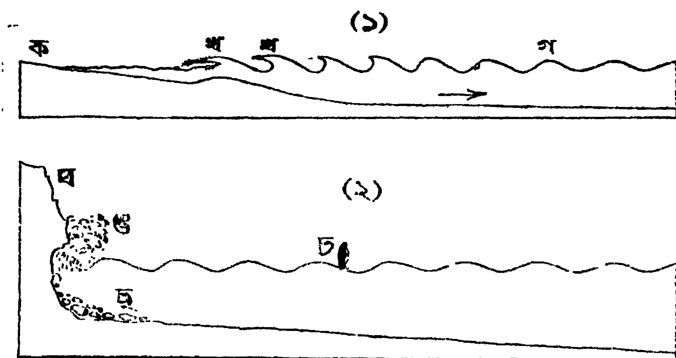
রিয়া—ক-, খ- ও গ- অপেক্ষা ঘ-অংশের জলের গভীরতা অধিক ; লক্ষ্য কর, উচ্চভূমি রিয়া হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ; পৃঃ—১৬৯, ২১৪, ২১৫



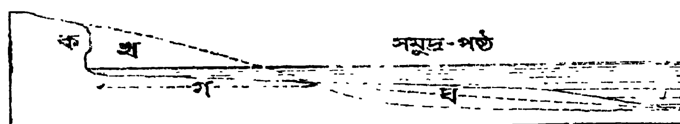
বালিয়াড়ীযুক্ত তটরেখা—ক—বালুকা-চর, খ—নদীপ্রবাহ, গ—লেগুন, ঘ—হ্রদ, এইরূপ অগভীর হ্রদকে জার্মানি দেশে হাফ্ (haff) বলে ; পৃঃ—২১৫



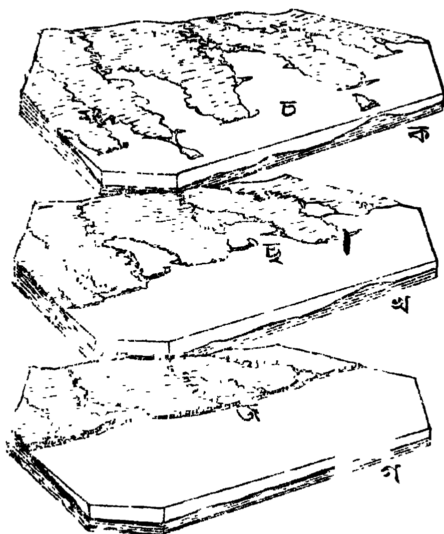
কোমল ও কঠিন শিলায় গঠিত তটভূমির বিভিন্নভাবে ক্ষয়সাধন,—ক—কোমল শিলায় গঠিত ভূমির চ-তটভূমি ; ছ ও জ কঠিন শিলায় গঠিত তটভূমি ; পৃঃ—২১৬



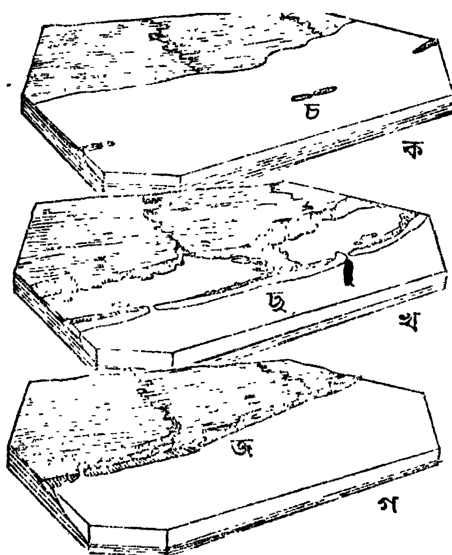
(১) অগভীর সমুদ্রের পার্শ্বের তটভূমি ও তরঙ্গের কার্য—ক—বেলাভূমি, খ—ব্রেকার, গ—তরঙ্গ ; (২) গভীর সমুদ্রের পার্শ্বের উচ্চ তটভূমি ও তরঙ্গের কার্য—চ—তরঙ্গ, ঘ—উচ্চ তটভূমির প্রান্ত, ছ—তরঙ্গের আঘাতের ফলে ক্ষয়জাত পদার্থ-সঞ্চয়ন, ঙ—তরঙ্গের আঘাত ; পৃঃ—২১৬, ২১৭



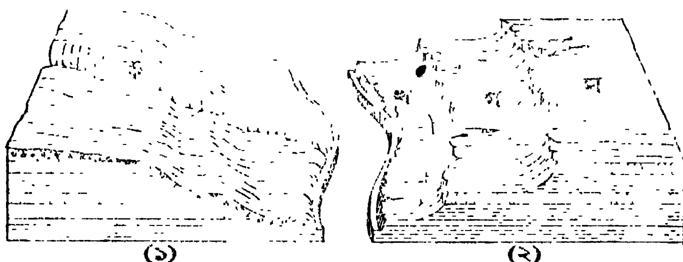
তরঙ্গের কার্য—ক—তটভূমি, খ—তটভূমির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, গ—তরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট সোপান (Wave-cut Terrace), ঘ—তরঙ্গ-সৃষ্ট সোপান (Wave-built Terrace) ; পৃঃ—২১৬, ২১৭



খণ্ডিত তটরেখার ক্রমবিকাশ—ক—প্রাথমিক অবস্থা—ক্রমশঃ চ-উপসাগরের মুখে স্পিটের (spit) সৃষ্টি ; খ—দ্বিতীয় অবস্থা—উপদ্বীপের অগ্রভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, উপসাগরের মুখে স্পিট্ ও ছ-হুকগুলি বর্ধিত হইয়াছে ও উপসাগরে পললরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাই উপসাগরে আয়তন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; গ—বার্ধক্য অবস্থা,—তটরেখা অখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, উপসাগরের মুখে ছোট ছোট লেগুনের সৃষ্টি হইয়াছে ; পৃঃ—২১৭, ২১৮

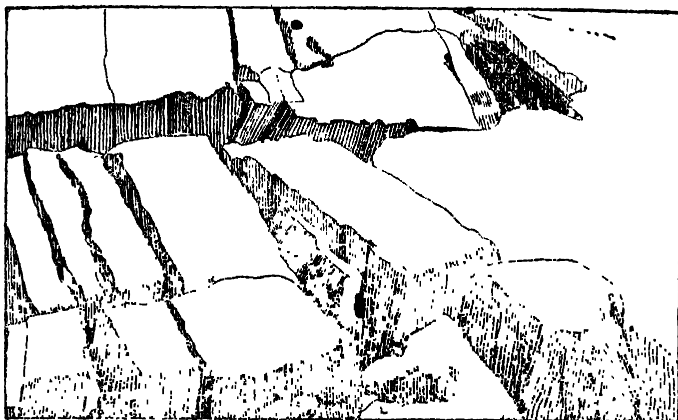


নিম্ন তটভূমির নদী-মোহনার সম্মুখে অগভীর সমুদ্রে বার বা চর ও লেগুনের উৎপত্তি এবং পরিশেষে তরঙ্গের আঘাতে বারের পশ্চাৎগমন ও লেগুনগুলির আয়তন বিশেষভাবে হ্রাস-প্রাপ্তি—ক—উপকূলের কিছুদূরে অগভীর সমুদ্রে চ-মগ্ন চরের সৃষ্টি ; খ— ছ-চর-গুলির দীর্ঘ আয়তন ও লেগুনের উৎপত্তি ; গ—লেগুনগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ বার বা চরগুলি পশ্চাৎগমন ও পললের দ্বারা লেগুনগুলি মজিয়া গিয়াছে ; পৃঃ—২১৮

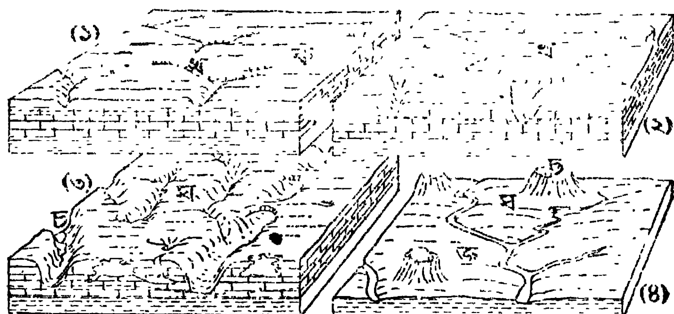


(১) (২)

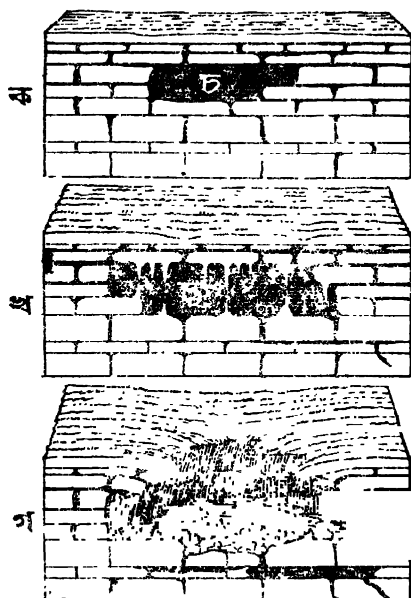
ক্ষয়সাধন ও নগ্নীভবন—আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধনের তুলনা—(১) আর্দ্র অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল,—কঠিন শিলাস্তরের উপর ক্ষয়জাত পদার্থের (রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে) আবরণ রহিয়াছে ; (২) শুষ্ক অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল—ক্ষয়জাতপদার্থ (যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে) অপসারিত হইয়াছে—কঠিন শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠ কতকগুলি সোপানের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; পৃঃ—২৩২



তুষারের (frost action) কার্যের ফলে গ্র্যানিট-শিলা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে ; পৃঃ—২৩৫



চূণাপাথরে গঠিত ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন—(১) প্রাথমিক অবস্থা—ক—ভূ-পৃষ্ঠ, খ—নদীপ্রবাহ বা জলধারা ; (২) ক্ষয়কার্যের যৌবন অবস্থা—ভূ-ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি, ভূ-পৃষ্ঠের জলধারা ফাটলের মধ্য দিয়া ভূ-নিম্নে প্রবেশ করিতেছে ; (৩) ক্ষয়কার্যের পরিণত অবস্থা—ভূ-গর্ভে গহ্বরের সৃষ্টি এবং ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ জলধারা ভূ-নিম্নে প্রবেশ করিতেছে ; (৪) ক্ষয়কার্যের বার্ধক্য অবস্থা—জলে দ্রবীভূত হইয়া অধিকাংশ চূণাপাথর অপসারিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে দুই-একটি পাহাড় (যে অংশ বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই) রহিয়াছে এবং নদী প্রবাহপথ সৃষ্টি করিয়াছে ; পৃঃ—২৩৯



চূর্ণাপাথরে·গঠিত ভূ-ত্বকের অংশবিশেষে জলের রাসায়নিক ক্রিয়া—ক—ভূ-নিম্নস্থ চূর্ণাপাথর জলে দ্রবীভূত হইয়া অপসারিত হইলে গহ্বরের সৃষ্টি, চ-গহ্বর ; খ—অধিক ক্ষয়কার্যের ফলে ছ-গহ্বর বিস্তার লাভ করিয়াছে ; ঐরূপ গহ্বরে স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালগমাইট গঠিত হইতে পারে ; গ—উক্ত গহ্বরের ছাদ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং উহা গর্তে (sink) পরিণত হইয়াছে ; পৃঃ—২৩৯

ভূগোল

দ্বিতীয় ভাগ

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

প্রথম খণ্ড

অশ্মমণ্ডল (Lithosphere)

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন

পর্বতের শ্রেণী-বিভাগ ও গঠন : ভূ-পৃষ্ঠের সকল অংশ সমতল নহে। স্থানে স্থানে প্রস্তরময় উচ্চভূমিও আছে। অতিশয় উচ্চ এবং বহুদূর-বিস্তৃত প্রস্তরময় ভূমিকে **পর্বত** এবং প্রস্তরময় ভূমি অল্প-উচ্চ ও অল্প-দূর বিস্তৃত হইলে, তাহাকে **পাহাড়** বলে।

কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে পাহাড়-পর্বত বা উচ্চভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই শক্তিগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) যে সকল শক্তি পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে উৎপত্তি হয় এবং (২) যেগুলি পৃথিবীর বাহিরে সৃষ্টি হয়।

ভূ-নিম্নস্থ পদার্থগুলির পরস্পর রাসায়নিক বিক্রিয়া, শিলাস্তরের সঙ্কোচন-প্রসারণ, উত্তপ্ত গলিত শিলার স্থান-পরিবর্তন (Vulcanism), রেডিও-একটিভ্-প্রক্রিয়া (radio-activity) প্রভৃতি কার্যের ফলে আভ্যন্তরীণ শক্তির (Tectonic Force) উদ্ভব হইতে পারে। তখন প্রবল ভূ-আলোড়ন হয়। আর, ঘন ঘন ভূ-আলোড়ন হইলে শিলাস্তরের বিস্তীর্ণ অংশ কুঞ্চিত (crustal warping) বা ভাঁজে ভাঁজে গ্রথিত (Crustal Bending or Folding) হইয়া পড়ে কিংবা শিলাস্তর ফাটিয়া যায় ও উহার এক অংশ স্থান-পরিবর্তন (Crustal Fracture and Fault) করে। এই কার্যগুলি (Diastrophism) ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘ-সময়ব্যাপী হইতে পারে। কখন থামে, আবার কখন ঐ ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইভাবে অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত গঠিত হইয়াছে।

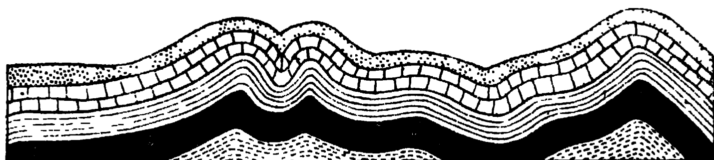
বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, হিমবাহ, তুষার, জীব প্রভৃতির কার্যের ফলে প্রতিনিয়ত ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তন অবশ্য অতি ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। ইহার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উন্নত-অংশ ক্রমশঃ অবনত এবং অবনত-অংশ ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। এই সকল কার্যের উদ্দেশ্য, ভূ-পৃষ্ঠের সকল অংশকে এক সমতলে পরিণত করা (Forces of Gradiation)। পৃথিবীর বাহিরে এই সকল শক্তিব উৎপত্তিস্থল। প্রধানতঃ সৌর শক্তি এই সকল শক্তির মূল হইলেও পৃথিবীর অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে তুষার, জল ও বায়ু প্রবাহিত এবং পর্বতগাত্রের শিথিল শিলা স্থানচ্যুত হয়।

লক্ষ্য কর, প্রথম শ্রেণীর শক্তির কার্য, দ্বিতীয় শ্রেণীরকার্যের বিপরীত। প্রথম শ্রেণীর শক্তির কার্যের ফলে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হইতেছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যের ফলে পাহাড়-পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভূমিতে কিংবা মালভূমির শিলাগুলি বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুর ভূমি বা স্তূপ-পর্বতে পরিণত হইতেছে। উভয় শ্রেণীর শক্তির কার্য একত্রে কার্যকরী হইতেছে। এইজন্য ভূ পৃষ্ঠের রূপের এত বৈচিত্র্য।

গঠনের তারতম্য অনুযায়ী পর্বতগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; যেমন—

১। **ভঙ্গিল-পর্বত** (Fold Mountains)—ভূ-ত্বক নানারূপ শিলাস্তরের দ্বারা গঠিত। ভূ-নিম্নস্থ গলিত শিলার ধীরে ধীরে স্থান-পরিবর্তন বা ভূ-পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা কোন অংশে অধিক ক্ষয়জাত পদার্থগুলি সঞ্চিত হওয়া কিংবা পৃথিবীর সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য শিলাস্তরে বহির্মুখী বা অন্তর্মুখী (Tensional or Compressional Forces) প্রবল পার্শ্বচাপ পড়ে। শিলাস্তরগুলির পার্শ্বদেশে ধীরে ধীরে প্রবল চাপ পড়িলে শিলাস্তরগুলি বাঁকিয়া (Bending) ও নানারূপ সমান্তরাল ভাঁজের (Fold) সৃষ্টি হয়। ভাঁজের এক অংশ উচ্চ (Anticline) এবং এক অংশ নিম্ন (Syncline) হয়। আবার, পরে অনেকবার প্রবল চাপ পড়িলে ভাঁজগুলি ঠাসাঠাসি হইয়া খুব উচ্চ হইয়া উঠে

এবং কখন কখন শিলাস্তর ফাটিয়া (Fracture) স্থান-পরিবর্তন করিয়া চ্যুতির (Fault) সৃষ্টি করে। শিলাস্তর ফাটিয়া ফাটল-তলের উপর দিয়া সরিয়া যাইলে তাহাকে চ্যুতি বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিলাস্তর অকস্মাৎ স্থান-পরিবর্তন করে; আর এই স্থান-পরিবর্তন মাত্র ইঞ্চির সামান্য ভগ্নাংশ হইতে ২।১ ফুট পর্যন্ত। এইরূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর-বিস্তৃত এবং উচ্চ যে-পর্বতমালা গঠিত হয়, তাহাকে



পার্শ্বচাপের ফলে বিভিন্ন শিলায় গঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলিতে
নানা রকমের ভাঁজের সৃষ্টি দেখান হইয়াছে

ভঙ্গিল-পর্বতমালা বলে। দুইটি ভাঁজের মধ্যবর্তী নিম্ন-অংশকে পার্বত্য-উপত্যকা বলে। প্রাচীনকালে-সৃষ্ট ভঙ্গিল-পর্বতগুলির অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি নবীন ভঙ্গিল-পর্বত। ইহারা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া সুউচ্চ। এই পর্বতগুলি প্রধানতঃ পাললিক শিলায় গঠিত। উহাদের মধ্যে কখন কখন সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তাহাতে প্রমাণ হয়, এই শিলাগুলি সমুদ্রগর্ভে সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই সকল ভঙ্গিল-পর্বতমালার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ অভ্যন্তরভাগে (core) আগ্নেয়শিলা বা রূপান্তরিত-শিলা দেখা যায়। জুরা পর্বতের ভাঁজগুলি সমান্তরাল ও সরলপ্রকৃতির। আল্পস ও হিমালয়ের ভাঁজগুলি জটিলপ্রকৃতির। ইহাদের অধিকাংশ ভাঁজ খুব নিকটে নিকটে আসিয়াছে, কোনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার, একটির উপর অন্যটি উঠিয়া গিয়াছে (thrust fault)। আর, প্রবল চাপের ফলে পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হইয়াছে।

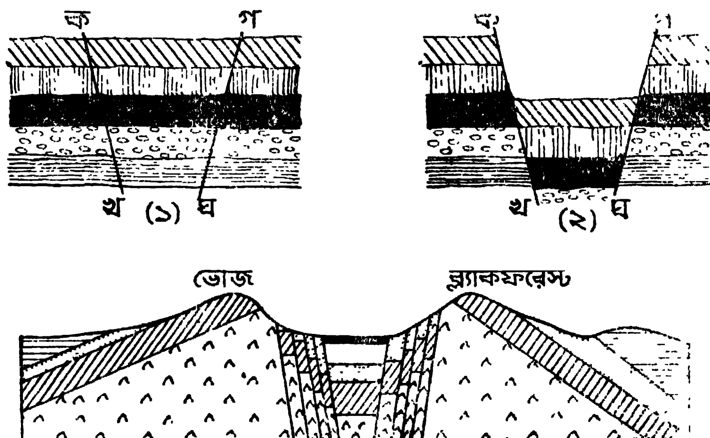
ভেগ্‌নারের মতবাদ (Wegner's theory of Continental

Drift)—হিমালয়, রকি প্রভৃতি সু-উচ্চ ও সু-দীর্ঘ ভঙ্গিল-পর্বতমালার সৃষ্টি সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানী হেবেগ্নারের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই মতবাদ বিজ্ঞানী-সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

মহাদেশগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু গ্র্যানিট-শিলাস্তরের দ্বারা গঠিত। এই গ্র্যানিট-শিলাস্তর ভূ-নিম্নে অবস্থিত গলিত ব্যাসল্ট-শিলাস্তরের উপর ভাসিয়া আছে। ব্যাসল্ট অপেক্ষাকৃত গুরু শিলা। গ্র্যানিট-শিলাস্তরের ৩ ভাগ উপরে এবং ১৭ ভাগ ব্যাসল্ট-স্তরে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। হেবেগ্নারের মতে সুদূর অতীতে ভূ-পৃষ্ঠে একটিমাত্র বিশাল অখণ্ড-স্থলভাগ ছিল। পরে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঐ স্থলভাগ স্থানে স্থানে ফাটিয়া পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়। এইভাবে মহাদেশগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। আজও মহাদেশগুলি অতি ধীরে ধীরে সরিতেছে। সুকঠিন শিলার দ্বারা গঠিত বিশাল ভূ-খণ্ডগুলি অগ্রসর হইবার সময় উহাদের সম্মুখভাগে অবস্থিত শিলাময় স্থানে অত্যধিক পার্শ্বচাপ পড়ে; ফলে ঐ অংশ উচ্চ হইয়া উঠে এবং উচ্চ অংশের পশ্চাতে অবস্থিত অংশ নিম্ন হয়। দাক্ষিণাত্য ও মধ্য-এশিয়ার মালভূমি সুকঠিন প্রাচীন শিলায় গঠিত। এই মালভূমি দুইটি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানের এক অংশ উচ্চ হইয়া হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হয় এবং উহার পশ্চাৎ-অংশ নিম্ন হইয়া সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমুদ্রের উৎপত্তি হয়। পরে এই সমুদ্রগর্ভে পললরাশি সঞ্চিত হইয়া উত্তর-ভারতের বিশাল সমভূমি গঠিত হইয়াছে। অনুরূপ কারণে উত্তর-আফ্রিকা ও ইউরোপ সরিয়া যাওয়ার ফলে আল্পসের এবং ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে।

২। **স্তূপ-পর্বত** (Block Mountain or Host)—প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে কখন কখন কঠিন শিলাস্তর খাড়াখাড়িভাবে ফাটিয়া (vertical fracture) চ্যুতির সৃষ্টি করে (চিত্রে **ক খ** এবং **গ ঘ**); আবার, কখন কখন ঐরূপ দুইটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী-অংশ, পার্শ্ববর্তী স্থান অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠে (Fault-Scarp) কিংবা ঐরূপ দুইটি চ্যুতির মধ্যবর্তী-অংশের কোন পরিবর্তন হয় না;

কিন্তু, উভয় চ্যুতির বহিঃপার্শ্বের ভূ-খণ্ড বসিয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রে ঐরূপ মধ্যবর্তী স্থান পর্বতে পরিণত হয়। ইহাকে স্তূপ-পর্বত বলে। সাতপুরা, ব্লাক-ফরেস্ট, ভোজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পর্বত।



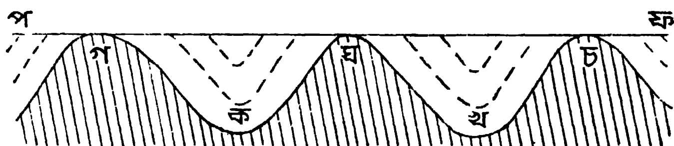
১নং ও ২নং চিত্রে গ্রস্ত-উপত্যকার উৎপত্তি দেখান হইয়াছে ; তৃতীয় চিত্রে ভোজ ও ব্ল্যাক-ফরেস্টের মধ্যবর্তী গ্রস্ত-উপত্যকা

সমান্তরাল দুইটি চ্যুতির মধ্যবর্তী-অংশ কখন কখন অনেক নীচে বসিয়া যায়। ঐরূপ নিম্নস্থানকে **গ্রস্ত-উপত্যকা** (Rift Valley or Graben) বলে। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবর্তী-স্থানে গ্রস্ত-উপত্যকা অবস্থিত। এই উপত্যকায় নর্মদা নদী প্রবাহিত। পূর্ব-আফ্রিকার গ্রস্ত-উপত্যকা বিখ্যাত।

সুদীর্ঘ ফাটলের এক পার্শ্বের শিলাস্তর অপেক্ষা অপর পার্শ্বের শিলাস্তর উল্লম্ব-ভাবে অধিক উচ্চে উঠিলে এই শিলাস্তরের প্রান্তদেশ উচ্চস্থানের (Escarpment) বা পাহাড়ের, এমন কি পর্বতের আকার ধারণ করিতে পারে। ইহা অবশ্য অল্প সময়ে সাধিত হয় না—বহুযুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে কার্য চলে, কখন থামে, আবার, কখন ঐ ক্রিয়া চলিতে থাকে। তাই, এইরূপভাবে পর্বত সৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রয়োজন হয়। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সম্ভবতঃ এইভাবে সৃষ্টি

হইয়াছে (Fault-escarpment)। আবার, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সুউচ্চ প্রান্তদেশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বহুশৃঙ্গযুক্ত পর্বতে (Sierra) পরিণত হইতে পারে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিয়ারা নেভেডা (Sierra Nevada) এই শ্রেণীর পর্বত।

৩। **ক্ষয়জাত-পর্বত** (Residual Mountain)—পার্বত্যভূমি বা মালভূমির কোমল শিলা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলাগুলি অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আর, অবশিষ্ট কঠিন শিলাস্তূপ পর্বতের আকারে থাকে। উহাকে **ক্ষয়জাত বা নগ্নীভূত** পর্বত



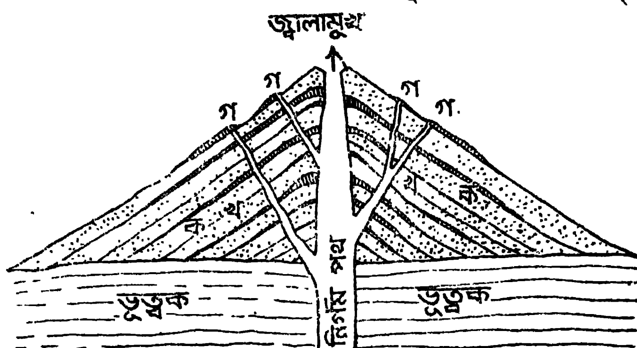
ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি—প, ফ পুরাতন মালভূমির পৃষ্ঠদেশ ; গ, ঘ, চ অক্ষুণ্ণ অংশ পাহাড়ে এবং ক, খ ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। ভগ্নরেখাগুলি ক্ষয়কার্যের ক্রমবিকাশ

বলে, যথা—আরাবল্লী পর্বত। যে-মালভূমি এইরূপভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পাহাড় ও উপত্যকায় পরিণত হয়, তাহাকে ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি (Dissected Plateau) বলে ; যথা—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশবিশেষ।

৪। **সঞ্চয়জাত-পর্বত**—অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূ-গর্ভ হইতে উত্তপ্ত গলিত পদার্থ বাহিরে আসিয়া শীতল হয় এবং ক্রমশঃ জমিয়া মোচার মাথার মত আকৃতি-বিশিষ্ট পর্বত গঠিত হয়। ইহাকে সঞ্চয়জাত পর্বত বলে ; যথা—বিস্যুভিয়াস আগ্নেয়গিরি। ইহাদের কথা পরে বলা হইবে।

আগ্নেয়গিরি (Volcanoes) ঃ ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলেও ভূ-ত্বকের নিম্ন-অংশ অত্যন্ত উত্তপ্ত, কিন্তু উপরের শিলাস্তরের প্রবল চাপের ফলে ঐ অতি-উত্তপ্ত অংশ কঠিন অবস্থায় আছে। কোন প্রাকৃতিক কারণবশতঃ উপরের চাপ কমিলে উত্তপ্ত কঠিন-শিলা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহা হইতে বিবিধ গ্যাসীয়

পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ঐরূপ উত্তপ্ত গ্যাসের প্রবল চাপে ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশে নির্গমপথের (Vent or Conduit) সৃষ্টি হয়। ঐ পথ দিয়া উত্তপ্ত গ্যাস, বাষ্প প্রভৃতি নির্গত হয়। আর, উহাদের প্রচণ্ড চাপে ঐ নির্গমপথটি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, পরে, উহার মুখ হইতে উত্তপ্ত গলিত শিলা, ভস্ম, প্রস্তরখণ্ড, বাষ্প, গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ বাহির হয়। যে-মুখ হইতে এই সকল উত্তপ্ত ও গলিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে **জ্বালামুখ** (Crater) বলে। উহার গঠন বাটির মত। প্রধান জ্বালামুখ ভিন্ন গৌণমুখও থাকিতে পারে। নির্গমপথটি গঠন কতকটা চিমনির মত এবং উহা ভূ-নিম্নস্থ গলিত লাভাপূর্ণ একটি



ভ্যলকানোর দ্বারা সৃষ্ট মোচাকৃতি সঞ্চয়জাত পর্বতের (আগ্নেয়গিরি) বিভিন্ন অংশ—গ—গৌণ-জ্বালামুখ, ক প্রধান-জ্বালামুখ হইতে নির্গত পদার্থ, খ—গৌণ-জ্বালামুখ হইতে নির্গত পদার্থ

গহ্বরের (Magma Chamber) সহিত সংযুক্ত থাকে। আবার, এই গলিত শিলা বা লাভা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মোচার আকারবিশিষ্ট বা অন্য আকারের পর্বতের সৃষ্টি হইতে পারে। ঐরূপ পর্বতকে সঞ্চয়জাত পর্বত বা আগ্নেয়গিরি বলে। আর, নির্গমপথটির নাম **ভ্যলকানো** (Valcano)। আবার, সকল ভ্যলকানো পর্বত সৃষ্টি করে না কিংবা প্রত্যেকটি হইতে উল্লিখিত সকল পদার্থ নির্গত হয় না।

ভ্যলকানোর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রগর্ভে নূতন নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হয় এবং কখন কখন লাভার দ্বারা নগর, গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি চাপা পড়িয়া যায়।

বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলিয়াম্‌ ও পম্পিয়াই নামক দুইটি নগর ভস্ম ও লাভার দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া যায়।

যে-ভ্যলকানো হইতে অবিরত বা মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাকে সক্রিয় বা **জীবন্ত (Active) ভ্যলকানো** বলে। যেগুলি বর্তমানে শান্ত, কিন্তু যে-কোন সময় অগ্ন্যুৎপাত হইতে পারে, তাহাদিগকে **সুপ্ত (Dormant) ভ্যলকানো** এবং যেগুলি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে **মৃত (Extinct) ভ্যলকানো** বলে।

যে-সকল শিলায় সিলিকার (Silica) পরিমাণ অধিক, তাহাদিগকে এ্যাসিড শিলা বলে, যথা—গ্র্যানিট্‌। এই জাতীয় শিলা তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় অত্যন্ত সান্দ্র (Viscous) হইয়া যায় এবং শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয়। উত্তপ্ত তরল শিলায় বিবিধ গ্যাস ও বাষ্প মিশ্রিত থাকে। শিলার সান্দ্র অবস্থায় গ্যাস ও বাষ্প সহজে নির্গত হইতে পারে না বলিয়া বিস্ফোরণ ঘটায়। তাই, যে সকল ভ্যলকানো হইতে এ্যাসিড-শিলার লাভা নির্গত হয়, তাহাদিগকে বিস্ফোরক ভ্যলকানো বলে। এ্যাসিড লাভা শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয় বলিয়া জ্বালামুখের নিকট সঞ্চিত হয়। এইজন্য এই জাতীয় সঞ্চয়জাত পর্বত বা আগ্নেয়গিরির পার্শ্ব-দেশের ঢাল অধিক ও ইহাদের গঠন মোচা-আকৃতিবিশিষ্ট।

যে সকল শিলায় সিলিকার পরিমাণ কম, তাহাদিগকে বেসিক বা ক্ষারক (Basic) শিলা বলে। এই জাতীয় শিলা ধীরে ধীরে শীতল হয় এবং তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় সান্দ্র অবস্থায় পরিণত হয় না। এইজন্য জ্বালামুখ হইতে এই জাতীয় লাভা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে না। তাই, যে সকল ভ্যলকানো হইতে বেসিক-লাভা নির্গত হয়, তাহাদিগকে শান্ত-প্রকৃতির ভ্যলকানো বলে। এই সকল ভ্যলকানোর গাত্রের ঢাল কম বা গাত্রদেশ ক্রমনিম্ন। আবার, পর্বত সৃষ্টি না হইতেও পারে।

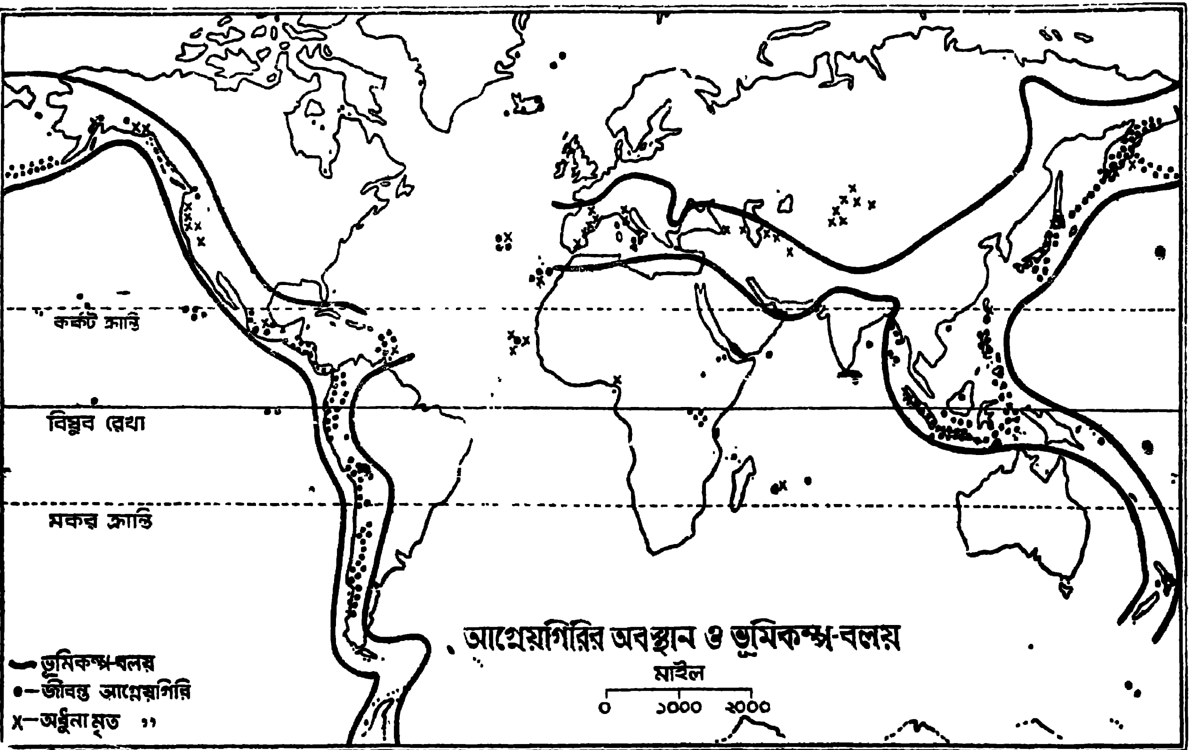
প্রাচীনকালে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সকল ফাটল-পথে প্রচুর পরিমাণে তরল লাভা নির্গত হওয়ায় বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হয়। আবার, কোন কোন অঞ্চলে অসংখ্য জ্বালামুখের সৃষ্টি হইয়া প্রচুর

পরিমাণে লাভা নির্গত হয়। এইরূপ লাভার দ্বারা ঐ সকল অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে, হয়ত, একই স্থান পুনঃ পুনঃ লাভার দ্বারা প্লাবিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশবিশেষ, দক্ষিণ-ব্রাজিল, ইথোপিয়া, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া-মালভূমি প্রভৃতি লাভার দ্বারা গঠিত।

আগ্নেয়গিরি-বলয় (Regions of Volcanic Activity)—ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশেই আগ্নেয়গিরিগুলি অবস্থিত। গভীর মহাসাগরের উপকূলে উচ্চ পার্বত্যভূমি ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশে অবস্থিত বলিয়া এই অংশেই অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে। একটি আগ্নেয়গিরি-বলয় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে হর্ণ অন্তরীপ হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূল হইয়া এশিয়ার কামস্কাটকায় আসিয়াছে ; পরে জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও নিউজিল্যাণ্ড হইয়া আন্টার্কাটিকা মহাদেশে পৌছাইয়াছে। একটি শাখা জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে প্রসারিত। তাই, এই বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরিয়া আছে। এইজন্য ইহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়গিরি-বলয় ('The Pacific Ring of Fire') বলে। আর একটি বলয়, আইসল্যাণ্ড হইতে সুরু করিয়া উত্তর-স্কটল্যাণ্ড, আজোর্স ও কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জ হইয়া গিনি উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার একটি শাখা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আর একটি শাখা ভূমধ্যসাগরের সিসিলি ও ইটালী হইয়া ককেশাস পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত।

ভূমিকম্প : কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-ত্বক সময় সময় অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রধানতঃ ভূ-গর্ভে উৎপত্তি (Tectonic Forces) হয়। ভূ-গর্ভে যে-স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, ঐ স্থানকে ভূমিকম্পের **কেন্দ্র** (Focus, Centre) এবং কেন্দ্রের ঠিক উপরে ভূ-পৃষ্ঠের বিন্দুকে উহার **উপকেন্দ্র** (Epi-centre) বলে।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ ভূমিকম্প হয়,—(১) কোন প্রাকৃতিক কারণে চাপ অধিক হইলে ভূ-ত্বকে ভাঁজ পড়ে বা ভূ-ত্বক ফাটিয়া যায় কিংবা



আগ্নেয়গিরির অবস্থান ও ভূমিকম্প-বলয়

স্তর-চ্যুতি ঘটে। (২) নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ সময় সময় ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরের ভারের সামঞ্জস্য থাকে না; তখন সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য স্তরগুলি স্থান-পরিবর্তন করে। (১) ও (২) কারণ বশতঃ প্রবল ভূমিকম্প হয়। (৩) পর্বতগাত্র হইতে ধস নামিলে ভূমি কাঁপিয়া উঠে। (৪) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের সময় ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। আবার, ভূ-গর্ভের গলিত লাভা কোন ফাটল পথে নির্গত হইবার সময় ভূমিকম্প হইতে পারে। (৫) কখন কখন ভূ-ত্বকের গভীর ফাটলের মধ্যে সমুদ্র জল প্রবেশ করে এবং উহা উত্তপ্ত অংশে পৌঁছাইলে জল স্টীমে পরিণত হয়; আর, স্টীমের প্রবল চাপে ভূমিকম্প হইতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে কোন স্থান উন্নত, আবার কোন স্থান অবনত হয়; ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হইতে পারে। কখন কখন ভূ-ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং উহার মধ্য দিয়া জল, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি বাহির হইতে পারে। আর, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয় ও দেশের অশেষ অনিষ্ট হয়। বর্তমান কালের বিহার ও আসামের ভূমিকম্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকম্প-বলয় (Seismic Belts)—যেখানে পার্বত্যভূমির পার্শ্বে গভীর সমুদ্র বা যেখানে নবীন ভঙ্গিল-পর্বত অবস্থিত, সেখানেই ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অধিক। পৃথিবীতে দুইটি ভূমিকম্প-বলয় আছে,—একটি বলয় ভূমধ্যসাগর হইয়া আল্পস্, ককেশাস, হিমালয় প্রভৃতি হইয়া পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অপরটি দক্ষিণ- ও উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূল হইয়া এলিউশিয়ান, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া প্রসারিত। তাই, দ্বিতীয় বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

ভু-পৃষ্ঠের গঠনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ ফাটল (Fracture)—বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাস্তরে ছোট-বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ ফাটলে দুই পার্শ্বের শিলা অতি নিকটে থাকে। এইরূপ ফাটলকে শিলার সংযোগস্থল (Joints) বলে। ফাটলের বিস্তার কিছু বেশী হইলে, তাহাকে ফিসার (Fissure) বলে। ফাটল-পথে শিলাস্তরের মধ্যে জল ও

বায়ু প্রবেশ করে। ইহাদের দ্বারা শিলার খনিজদ্রব্যের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। ফলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার, ভূ-নিম্নে ফাটল-পথে জল প্রবাহিত হইতে পারে। আর, কখন কখন ভূ-নিম্নস্থ বিস্তৃত দীর্ঘ ফাটলের (fissure) মধ্যে বিবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়; কারণ, খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইয়া এই অংশে সঞ্চিত হইতে পারে। কোন অঞ্চলের শিলাস্তরের ফাটলগুলির বিভিন্ন অবস্থান ও প্রকৃতি হইতে সেই অঞ্চলের শিলাস্তরের ইতিহাস জানা যায়। খনিজদ্রব্য উত্তোলন, সুড়ঙ্গ-নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ফাটলগুলির অবস্থান জানা প্রয়োজন হয়। শিলার প্রকৃতি, স্থানীয় জলবায়ু এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবের উপর ফাটলের প্রকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি নির্ভর করে।

চ্যুতি (Fault)—ফাটলের কোন পার্শ্বের শিলাস্তর স্থান-পরিবর্তন করিলে ফাটলকে চ্যুতি বলে। যে-তলের উপর দিয়া শিলাস্তর সরিয়া যায়, তাহাকে **চ্যুতি-তল** (fault surface) বলে। চ্যুতি-তল ও দিগন্তরেখার (Horizon) মধ্যস্থ কোণকে **Strike of the fault** বলে। কোন কোন শিলাস্তর নতভাবে অবস্থান করে। এই নত কোণকে ডিপ্ (Dip) বলে। আর ডিপ্ দিগন্তরেখার সহিত যে-কোণ রচনা করে তাহাই স্ট্রাইক (Strike)। সুতরাং ডিপ্ উল্লম্ব-তলের সহিত কোণ এবং স্ট্রাইক অনুভূমিক-তলের সহিত কোণ সৃষ্টি করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই দুইটির বিশেষ প্রয়োজন আছে—ইহাদের দ্বারা বিভিন্ন শিলাস্তর, শিলাস্তরের ভাঁজ প্রভৃতির অবস্থান জানা যায়। চ্যুতি-তল নত অবস্থায় থাকিলে যে-তল উপরে থাকে, তাহাকে ঝুলান-প্রাচীর (hanging wall) এবং নীচের তলকে পাদ-প্রাচীর (foot wall) বলে।

চ্যুতি-তলের উপর শিলাস্তর বিভিন্নভাবে সরিয়া যায়। চ্যুতি-তলের এক পার্শ্বের শিলাস্তর অপর পার্শ্বের শিলাস্তর অপেক্ষা নিম্নে নামিলে ক্লিফের (cliff) সৃষ্টি করে। ইহাকে ফল্ট-স্কার্প (Fault-scarp)ও বলে। শোণ নদের উপত্যকায় কাইমুর পাহাড় fault-scarp বা fault-escarpment। এইরূপভাবে শিলাস্তরের স্থান-পরিবর্তনকে স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal fault) বলে। আবার, এক পার্শ্বের শিলাস্তর উপরে উঠিয়া যায় (Reverse fault)। অধিকাংশ স্থলে শিলাস্তর এক

পার্শ্বে তীর্যকভাবে কিংবা অনুভূমিকভাবে (obliquely or horizontally) সরিয়া যায় ; ইহাকে Strike-fault বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিলাস্তর উঠিয়া কিংবা নামিয়া বা পার্শ্বে সরিয়া যায়। একটি স্তর অপর স্তরের উপর উঠিয়া যাইলে, তাহাকে Thrust fault বলে।

ভূ-ত্বকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কুঞ্চন (Broad Warps)—ইহাও এক প্রকার শিলাস্তরের ভাঁজ। বহু বৎসর ব্যাপী বিস্তীর্ণ শিলাস্তরে প্রবল পার্শ্বচাপ ধীরে ধীরে পড়িলে ভূ-ত্বকের বিস্তীর্ণ অংশ মৃদুভাবে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে—বিস্তৃত অঞ্চল সামান্যভাবে উন্নত বা অবনত হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ সামান্য ভাবে উত্তল বা অবতল ভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে মহাসাগর বা সাগর-তল উচ্চ হইয়া পৃথিবীর বহু অংশে স্থলভাগ গঠিত হইয়াছে ; আবার স্থলভাগ বসিয়া গিয়া সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। এই কারণে মহাদেশের মধ্যভাগেও সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম ও চূণাপাথর দেখা যায়।

উত্তপ্ত গলিত শিলা বা লাভার কাজ (Vulcanism)—আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। দীর্ঘ ফাটল-পথে লাভা নির্গত হইয়া মালভূমি ইত্যাদি গঠিত হইবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে লাভা ভূ-পৃষ্ঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, কখন কখন লাভা ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উঠে না ; বরং ভূ-ত্বকের বিবিধ ফাটলে অবস্থান করে ; কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠে দেখা যায়। অতি উত্তপ্ত ও গলিত আগ্নেয়শিলা ফাটলের মধ্য দিয়া কিছুদূর উঠিয়া ভূ-ত্বকের মধ্যস্থ পাললিক-শিলার কোন বিস্তীর্ণ অনুভূমিক ফাটলের (Sill) মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে পাললিক-শিলার পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ ঐ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ চাপের প্রভাবে কুঞ্চিত বা স্থানচ্যুত হইয়া যায় (laccolith and batholith)। আর, তাপ ও চাপের প্রভাবে এই অংশের কতক শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় এবং এই ক্ষেত্রে বিবিধ গ্যাস ও জলের সংযোগে নানারূপ শিলার মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে পারে। এই সকল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কখন কখন নানা রকমের খনিজ পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নে ভূ-ত্বকের বৃহৎ উলম্ব-ফাটলের মধ্যে লাভা সঞ্চিত হইতে পারে। ইহাকে ডাইক (Dike) বলে। কালক্রমে

ডাইকের পার্শ্বের কোমল শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ডাইক উচ্চ প্রাচীরের মত দেখায়। আবার, বৃহৎ ডাইকগুলি পাহাড়-পর্বতের আকারও ধারণ করে।

মালভূমি (Plateau) ঃ—বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি, অথচ ইহার পৃষ্ঠদেশ মোটামুটিভাবে সমতল হইলে, তাহাকে সাধারণতঃ মালভূমি বলা হয়। মালভূমির কোন একটি প্রান্তদেশ, পার্শ্ববর্তী নিম্ন-সমভূমি হইতে সাধারণতঃ সুউচ্চ (escarpment) থাকে। মালভূমিব স্থানে স্থানে গভীর নদী-উপত্যকা থাকিতে পারে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দুইটি নদী-উপত্যকার মধ্যস্থ ভূভাগগুলি প্রধানতঃ এক সমতলে দেখা যায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে মালভূমির উচ্চতা ৫০০ ফুটের অধিক। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বতের পাদদেশে যে বিশাল সমভূমি রহিয়াছে, তাহার উচ্চতা ৫০০০ ফুটের অধিক হইলেও ইহাকে মালভূমি বলা হয না ; কারণ, এই উচ্চ-সমভূমি ক্রমনিম হইয়া মধ্যভাগের নিম্ন-সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং প্রান্তদেশে এস্‌কার্পমেণ্ট নাই।

মালভূমির প্রকারভেদ—ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী পৃথিবীর প্রধান মালভূমিগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—

(১) পর্বতবেষ্টিত মালভূমি (Intermountain plateau)—এই সকল মালভূমি, পার্শ্ববর্তী পর্বতগুলি গঠিত হইবার সময়, উন্নত (uplifted) হইয়াছে। তিব্বতের মালভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার উচ্চতা ১০,০০০ ফুট হইতে ১৫,০০০ ফুট পর্যন্ত। মঙ্গোলিয়ার ও তারিম-বেসিনের মালভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও ইহাদের উচ্চতা অনেক কম।

(২) পর্বতের পাদদেশের মালভূমি (Piedmont plateau)—কোন কোন পর্বতের পাদদেশে মালভূমি দেখা যায় : দক্ষিণ-আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে প্যাটাগোনিয়ার মালভূমি অবস্থিত। ইহাকে মালভূমি বলিবার হেতু, এই মালভূমি পূর্বদিকে ক্রমনিম্ন হইলেও আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে ৩০০′ হইতে ৫০০′ উচ্চ এস্‌কার্পমেণ্ট সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩) মহাদেশীয় মালভূমি (Continental plateaus or tablelands)—এই সকল মালভূমির পার্শ্বদেশে সাধারণতঃ উচ্চ পর্বতমালা দেখা যায় না ; আর,

মালভূমিগুলি সমুদ্র-উপকূল বা নিম্ন-সমভূমি হইতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার অধিকাংশ, আরব, পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া, দাক্ষিণাত্য, স্পেন প্রভৃতির মালভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকৃতির মালভূমি হইতে কোন কোন নদী নামিবার সময় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে।

আবার, শিলার প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী মালভূমিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যথা—

(১) যে সকল মালভূমির শিলাস্তরগুলি প্রধানতঃ অনুভূমিকভাবে অবস্থিত ; যথা—মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর মালভূমি। ইহার অধিকাংশ পাললিক শিলায় গঠিত এবং শিলাস্তরগুলি অনুভূমিকভাবে অবস্থিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার মালভূমি প্রাচীনকালে-সৃষ্ট কঠিন পাললিক-শিলায় গঠিত।

(২) ব্যাসল্ট-লাভার দ্বারা গঠিত মালভূমি, যথা—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশ, উত্তর-আমেরিকার কলম্বিয়ার মালভূমি। সুদীর্ঘ ফাটল-পথে লাভা নির্গত হইয়া এই সকল মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করিয়াছে।

(৩) কোন কোন অঞ্চলে কেলাসিত প্রাচীন-শিলায় গঠিত নিম্নভূমি উন্নত (uplifted) হইয়া মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; যথা—পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব-ব্রাজিল, মধ্য-আফ্রিকা ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশবিশেষ।

জলবায়ুর প্রভাবে মালভূমির প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন— কেবলমাত্র শিলার প্রকৃতির উপর মালভূমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠন নির্ভর করে না, বরং জলবায়ুর উপর মালভূমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠন বিশেষভাবে নির্ভর করে।

শুষ্ক অঞ্চলের মালভূমি—পৃথিবীর বহু অংশের মালভূমির জলবায়ু শুষ্ক। ইহার কারণ—(ক) ক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানে শুষ্ক আয়নবায়ু (স্থলভাগ হইতে আগত বায়ুপ্রবাহ) প্রবাহিত হয়। এইজন্য এই অঞ্চলের মালভূমির জলবায়ু শুষ্ক। ভূ-আলোড়নের প্রভাবে নিম্নভূমি উন্নত হইয়া এই মালভূমিগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। (খ) পর্বতবেষ্টিত মালভূমিগুলিতে আর্দ্র সমুদ্র-বায়ু প্রবাহিত হয় না বলিয়া ইহাদের জলবায়ু শুষ্ক। (গ) কোন কোন মালভূমির কোন এক প্রান্তদেশ সুউচ্চ

এবং ঐ অংশ হইতে ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমনিম্ন হইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ঐ সুউচ্চ-অংশ প্রবাহিত আর্দ্র-সমুদ্রবায়ুর প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত হইলে, ঐ অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ইহার পশ্চাৎভাগ প্রবাহিত বায়ুর অনুবাত পার্শ্ব। তাই, এই অংশ বৃষ্টিচ্ছায়া-অঞ্চলে পরিণত হয়; ফলে এইরূপ মালভূমির অধিকাংশ অংশের জলবায়ু শুষ্ক হয়। (ঘ) অধিক-উচ্চ মালভূমির উপরস্থ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে; এইজন্য এইরূপ মালভূমিতে বৃষ্টিপাত কম হয়।

আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলের উচ্চমালভূমি সুকঠিন-শিলায় গঠিত না হইলে ইহার ভূ-পৃষ্ঠের শিলা বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মালভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকৃতির শিলায় গঠিত হইলে, কঠিন-শিলায় গঠিত-অংশ সামান্যভাবে এবং কোমল-শিলায় গঠিত-অংশ অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে ইহা পাহাড়িয়া বা বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে পরিণত হয়। জলপ্রবাহ, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতির কার্যের ফলে এইরূপভাবে মালভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল বন্ধুর পার্বত্যভূমি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীনকালে কোন এক সময়ে মালভূমি ছিল।

শুষ্ক মালভূমি-অঞ্চলের উপত্যকা—শুষ্ক মালভূমির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া এই অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যাও কম। তাই, প্রশস্ত নদী-উপত্যকাও খুব কম দেখা যায়। সময় সময় যে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, তাহার জল প্রবাহিত হইয়া স্থানে স্থানে সংকীর্ণ ও অগভীর নদী-উপত্যকার সৃষ্টি করে। আবার, আর্দ্র অঞ্চল হইতে কোন নদী নির্গত হইয়া শুষ্ক মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে গভীর ও সংকীর্ণ নদী-উপত্যকা গঠন করে। এইরূপ উপত্যকাকে **ক্যানিয়ন** (canyon) বলে। এইরূপ উপত্যকার পার্শ্বদেশ সুউচ্চ হয় এবং ইহার গঠন কতকটা ইংরাজী U-অক্ষরের মত। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর গ্রাণ্ড-ক্যানিয়ন প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর মধ্য-অংশ, তিব্বতের সাংপু বা ব্রহ্মপুত্র নদ, কাশ্মীরের সিন্ধু নদী গভীর গিরিখাত বা ক্যানিয়নের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এইরূপ গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী নাব্য নহে; আবার ইহারা যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করে; কারণ

গিরিখাতগুলি সুগভীর ও ইহাদের পার্শ্বদেশ সুউচ্চ বলিয়া সহজে অতিক্রম করা যায় না ; আর ইহাদের উপর সেতু নির্মাণ করা ব্যয়বহুল।

শুষ্ক অঞ্চলের মালভূমির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য—এই অঞ্চলের ভূমি সাধারণতঃ সমতল ; তবে স্থানে স্থানে ক্লিফ্ (Cliff) বা এস্কার্পমেণ্ট (Escarpment) রহিয়াছে। এই অঞ্চলের ক্লিফ্ বা এস্কার্পমেণ্টের খাড়া প্রান্তভাগ কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর, স্থানে স্থানে পাহাড় দেখা যায়,—ভূ-আলোড়নের প্রভাবে চ্যুতির সৃষ্টি হইয়া এক অংশ উন্নত হয় ; ফলে উন্নত-অংশ পাহাড়ে পরিণত হয়। আবার, কঠিন-শিলায়-গঠিত কোন অংশ চারিদিকে কোমল-শিলায় বেষ্টিত থাকিলে, কোমল অংশ ক্ষয় হইয়া যায় ও কঠিন অংশ ক্ষয়জাত পাহাড়-পর্বতের আকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশ প্রধানতঃ কঠিন শিলায় (mesa, butte) এবং উহার নিম্নস্তর কোমল শিলায় গঠিত হইতে পারে। এই অঞ্চলের বহু নদ-নদী অন্তর্বাহিনী। তাই, এই নদ-নদীগুলি যে জলাভূমিতে পতিত হয়, তাহাদের জল সাধারণতঃ লবণাক্ত। এইজন্য অঞ্চলের অধিকাংশ হ্রদের জল লবণাক্ত। স্থানে স্থানে দুই-একটি স্বাদুজলের হ্রদও আছে। তিব্বতের মানসসরোবরের জল স্বাদু।

আর্দ্র অঞ্চলের মালভূমি (Plateau Features Developed in Humid climate)—শুষ্ক অঞ্চলের মালভূমি অপেক্ষা আর্দ্র অঞ্চলের মালভূমি নানা কারণে বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন এই অঞ্চলের মালভূমির বিশেষত্ব আর থাকে না। ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল, নদীর গর্ভদেশের ঢাল, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, শিলার প্রকৃতি ও মালভূমির বয়সের উপর ক্ষয়কার্য নির্ভর করে। মালভূমির কঠিন শিলা অপেক্ষা কোমল শিলা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর, বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের অধিক-ঢালযুক্ত মালভূমির পৃষ্ঠদেশের শিলা বা উচ্চ-অংশের শিলা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলের মালভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পাহাড় ও উপত্যকায় পরিণত হয়। কারণ, স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা রহিয়াছে। এইরূপ মালভূমিকে ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি (Dissected Plateau) বলে। দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিম-প্রান্ত, ব্রাজিল-মালভূমির

পূর্ব-প্রান্ত ও পূর্ব-অস্ট্রেলিয়ার উচ্চভূমির পূর্ব-প্রান্ত সমুদ্রের উপকূলের নিকট অবস্থিত এবং ইহাদের প্রান্তদেশের ঢাল অধিক। আর, এই অঞ্চলগুলি বৃষ্টি-বহুল। তাই, এই স্থানগুলির অংশবিশেষ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পার্বত্য-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর, স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাদিগকে পর্বত নামে অভিহিত করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ভূ-পৃষ্ঠ পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমনিম্ন বলিয়া এই অঞ্চলের নদ-নদীগুলি পূর্ববাহিনী ও ইহাদের প্রবাহপথ সুদীর্ঘ। এইজন্য নদীগুলির ক্ষয়কার্য অধিক নহে। আবার, আফ্রিকার কঙ্গো নদীর বৃষ্টিবহুল অববাহিকার নদনদীগুলির প্রবাহপথের অংশবিশেষ সমভূমিপ্রায় ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত। গতিপথের বিভিন্ন অংশে কঠিন-শিলার অবস্থান হেতু ঐরূপ স্থানে সাময়িকভাবে ইহাদের ক্ষয়কার্য কম; আর কঠিন ও কোমল শিলার সংযোগ স্থলে জলপ্রপাতের বা ধাপে ধাপে কয়েকটি জলপ্রপাতের কিংবা নদীর খরস্রোতা অংশের (Rapids) সৃষ্টি হইয়াছে।

আর্দ্র অঞ্চলের নদী-উপত্যকার পার্শ্বদেশ সাধারণতঃ সুউচ্চ নহে; কারণ, উপত্যকার পার্শ্বদেশের গাত্র বাহিয়া জলধারা নিম্নে অবতরণ করে; ফলে এই অংশ বিভিন্নভাবে খণ্ডিত হয়। বহু ছোট-বড় শাখানদী প্রবাহিত হইয়া প্রধান নদীর সহিত মিলিত হয় এবং ইহারা, আবার, ছোট-বড় নদী-উপত্যকা সৃষ্টি করে; ঐগুলি যেন প্রধান উপত্যকার শাখা-উপত্যকা। আর, পার্শ্ববর্তী দুইটি নদী-উপত্যকার মধ্যবর্তী মালভূমির অংশের ভূ-পৃষ্ঠ প্রধানতঃ সমভূমিপ্রায়। স্থানে স্থানে সামান্যভাবে উন্নত-অবনত হইলেও বা স্থানে স্থানে দুইটি-একটি গভীর খাত থাকিলেও মালভূমির এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠ সমভূমির মত দেখায়।

আর্দ্র অঞ্চলের মালভূমির স্থানে স্থানে সুউচ্চ ভূমি থাকে, তাহার গাত্রদেশের ঢাল অধিক হইলে ঐ উচ্চ-অংশের ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা স্থানচ্যুত হইয়া নিম্ন-অংশে প্রচুর শিলাখণ্ড (piles of talus †) সঞ্চিত হয়। আবার, উচ্চ অংশে বা নিম্ন-অংশে

† পর্বত-গাত্র বা উচ্চ-ভূমির ঢালু-অংশের শিলাখণ্ড বা মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নদেশে সঞ্চিত হয়। এইরূপ ভাবে স্থানচ্যুত শিলাখণ্ডকে বা মৃত্তিকাকে Talus বলে।

প্রচুর ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা (deep accumulation of regolith * blanket) সঞ্চিত থাকে। আর, সুউচ্চ অংশের শিলাময় পৃষ্ঠদেশ মৃত্তিকাশূন্য হইয়া যায় ; কারণ মৃত্তিকাও অপসারিত হয়। এইজন্য, উচ্চভূমির ঢাল কমিয়া যায়। স্থানে স্থানে যে উচ্চ ভূ-খণ্ড (Blocks) থাকে, তাহাদের শীর্ষদেশের গঠন চূড়ার মত (Rounded blocks) হয় না।

দক্ষিণ-চীনের মালভূমি, পশ্চিম-ইউরোপের অর্ডেন-মালভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন (Dissected) হইয়াছে এবং অংশবিশেষ এত অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ইহা পার্বত্যভূমি বা পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা আবৃত বিশাল মালভূমি—গ্রীনল্যাণ্ড ও আণ্টার্কাটিকা, এই দুইটি বিশাল মালভূমিময় স্থলভাগ। অতি-শৈত্যযুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহারা সমগ্রভাবে কঠিন-বরফে ঢাকা। এইরূপ বিস্তীর্ণ ও গভীর কঠিন-বরফের (Ice) অতি-বিশাল স্তূপকে মহাদেশীয় হিমবাহ (Ice Sheet or Continental Glacier) বলে।

গ্রীনল্যাণ্ডের মালভূমি পর্বতবেষ্টিত। আণ্টার্কাটিকার স্থানে স্থানে পর্বত, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি থাকিলেও ইহাও বিশাল মালভূমি। এই দুইটি বিশাল স্থলভাগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে গভীর বরফ-স্তূপে ঢাকা। এই সকল বিশাল অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশের বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র বিরাট তুষার-মালভূমির মত দেখায়। আর এই তুষারক্ষেত্রের পৃষ্ঠদেশ সমতল। এই অঞ্চলে নদনদী থাকিতে পারে না। তাই, এই ভূ-পৃষ্ঠ কেবলমাত্র তুষারের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হিমযুগে উত্তর-আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তরাংশ এইরূপ মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা আবৃত ছিল ; তাহার বহু নিদর্শন এই সকল অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে আজও বর্তমান। পরে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

পাহাড়িয়া-অঞ্চল (Hilly Lands) : পাহাড়ের সংজ্ঞা বলা সহজ নহে ;

---

* নিম্নস্থ অপরিবর্তিত (Bed rock) শিলার উপর ক্ষয়প্রাপ্ত বা আংশিকভাবে ভৌত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিবর্তিত শিলার (decomposed rocks) যে আবরণ থাকে, তাহাকে Regolith বা mantle rocks বলে।

কারণ, স্থানবিশেষে শিলাময় উচ্চভূমিকে পাহাড় বা পর্বত বলা হয়—কোন এক বিশেষ উচ্চ ও বিস্তীর্ণ ভূমিকে পাহাড়, আবার কোন এক অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ বা কম বিস্তীর্ণ ভূমিকে পর্বতও বলা হয়। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া ভূগোল রচনা করা হয়। সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়িয়া অঞ্চল ও পার্বত্যভূমির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বা কর্মতৎপরতা এক প্রকার নহে; প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই সকল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের গঠনের বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা নিরূপিত করা যায়। তবে পাহাড়িয়া অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের গঠনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভূ-বিদ্যার সংজ্ঞার সহিত ভূগোল-বিদ্যার সংজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে একরূপ নহে। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আলিঘনি-কাম্বারল্যাণ্ডের পাহাড়িয়া অঞ্চল। ইহাকে ভূ-বিদ্যায় মালভূমি বলে; আর স্থানীয় অধিবাসীরা পর্বত বলে, কারণ ইহার কোন কোন অংশ বন্ধুর ও ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চ। ভূগোল-বিদ্যায় ইহাকে পাহাড়িয়া অঞ্চল বলে।

সমভূমি কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। পাহাড়িয়া অঞ্চল কৃষিকার্যের তত উপযোগী নহে; তবে পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের বহু অংশে কৃষিকার্য করা চলে। ইহা পশুচারণের উপযুক্ত স্থান। উন্নত-অবনত সমভূমিপ্রায় ভূ-পৃষ্ঠ (rough plain) অপেক্ষা পাহাড়িয়া-অঞ্চলের ভূমি বন্ধুর; তবে পার্বত্য-ভূমির মত বন্ধুর নহে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে স্থানে স্থানে প্রশস্ত নদী-উপত্যকা; আবার স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় কিংবা বন্ধুর ভূমি বা অধিক ঢালযুক্ত ভূমি দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন অংশই প্রধানতঃ ২০০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে; আর উচ্চ-অংশ বিস্তীর্ণ নহে কিংবা উচ্চ অংশের পরিমাণও অধিক নহে। অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল সাধারণতঃ কম। ছোট ছোট পাহাড়, প্রশস্ত নদী-উপত্যকা, উন্নত-অবনত সমভূমিপ্রায় স্থান, বেসিন, সমান্তরাল নদী-উপত্যকা ও অপ্রশস্ত পাহাড়-শ্রেণী প্রভৃতি পাহাড়িয়া অঞ্চলে দেখা যায়। প্রাচীন উচ্চভূমি অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হয়। তাই, ইহা পার্বত্যভূমি বা মালভূমি নহে।

শিলার প্রকৃতি, স্থানীয় জলবায়ু, উৎপত্তির প্রকারভেদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন বিভিন্ন। এইজন্য প্রত্যেক পাহাড়িয়া অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই, একই অঞ্চলের প্রত্যেক পাহাড়িয়া স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের গঠন একরূপ না হইতে পারে। উচ্চ-মালভূমির প্রান্তদেশে, উচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে বা সমভূমির মধ্যভাগে বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলি রহিয়াছে।

আর্দ্র-অঞ্চলের আনুভূমিকভাবে অবস্থিত পাললিক-শিলায় গঠিত উচ্চভূমি নদীপ্রবাহের দ্বারা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত গোলাকার শীর্ষদেশবিশিষ্ট অসংখ্য পাহাড় ও নদী-উপত্যকায় পরিণত হয়। আলিঘনি-কাম্বার-লণ্ডের পাহাড়িয়া অঞ্চল এইভাবে সৃষ্ট। দক্ষিণ-আফ্রিকার ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের পাদদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চল, দক্ষিণ-জার্মাণির অংশ-বিশেষ, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ওজার্ক পাহাড়িয়া অঞ্চল, ভারতের দাক্ষিণাত্যের পাহাড়িয়া অঞ্চল, এই শ্রেণী পাহাড়িয়া অঞ্চলের অন্তর্গত।

স্বল্প-বৃষ্টিপাত-অঞ্চলের মৃত্তিকাযুক্ত উচ্চভূমি বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অতি-বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হয়। এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট মাটির টিলা, খাত প্রভৃতি দেখা যায়। ইহাকে **ব্যাডল্যাণ্ড** (Bad lands) বলে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের চম্বল নদীর উপত্যকায় এইরূপ ব্যাডল্যাণ্ড রহিয়াছে। আবার, কেলাসিত রূপান্তরিত-শিলায় গঠিত উত্তর-চীনের শুষ্ক অঞ্চল ব্যাডল্যাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ইহা বৃক্ষাদিশূন্য স্থান।

পাললিক-শিলার স্তর ভাঁজে ভাঁজে গ্রথিত হইয়া যে অঞ্চল গঠিত হইয়াছে, সেরূপ অঞ্চল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সমান্তরাল পাহাড়-শ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ সমান্তরাল নদী-উপত্যকাসহ পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হয়। ইউরোপের জুরা পর্বত, উত্তর-আমেরিকার আপালাচিয়ান পর্বতমালার পাহাড়-উপত্যকা অঞ্চল (ridge- and-valley region), আসামের ব্রহ্মদেশের সীমান্তের পাহাড়-অঞ্চল এইভাবে গঠিত।

ভাঁজ ও চ্যুতিযুক্ত বিভিন্ন প্রকৃতির শিলায় গঠিত উচ্চভূমির বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন শিলা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক জটিল প্রকৃতির পাহাড়িয়া

অঞ্চলে পরিণত হয়। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের আপালাচিয়ান পর্বতের দক্ষিণভাগের কেল্সাসিত-শিলায় গঠিত অংশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বভাগের উচ্চভূমি ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি। ইহাকে মালভূমি-পাহাড়িয়া অঞ্চল বলা যাইতে পারে। ইহা প্রাচীন গ্র্যানিট্, প্রাচীনকালে-সৃষ্ট পাললিক-শিলা, লাভা প্রভৃতি শিলার দ্বারা গঠিত। বহু শৈলশিরা ও মালভূমি, স্থানে স্থানে গভীর নদী-উপত্যকা বা খাত ও বিচ্ছিন্ন পাহাড় লইয়া ইহা গঠিত। তাই, ইহা অত্যন্ত বন্ধুর ভূমি। ক্যালিফোর্ণিয়ার কোস্ট-রেঞ্জ কয়েক প্রকার শ্রেণীর পাললিক-শিলা (উহারা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), আগ্নেয়-শিলা, রূপান্তরিত-শিলায় গঠিত। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির শিলাস্তরগুলিতে ঘন ঘন ভাঁজ পড়িয়াছে বলিয়া উহারা সমান্তরাল শৈলশিরা ও তন্মধ্যস্থ উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহাতে বহু চ্যুতি বর্তমান।

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-এশিয়ার বহু অংশের পাহাড়িয়া অঞ্চলের গঠন ও প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা নাই। সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের শিলার প্রকৃতি, পাহাড়ের গঠন-ভঙ্গি বহু প্রকারের। দক্ষিণ-চীনের পাহাড়িয়া অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা দেখা যায়। ইহার বহু অংশ চ্যুতি ও ভাঁজযুক্ত।

শিলাময় বন্ধুর উচ্চভূমি মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এক বিশিষ্ট-প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ গঠিত হয়। ইহার প্রায় সকল অংশ কঠিন বরফে ঢাকিয়া যায়। এই বরফস্তূপ স্থানবিশেষে বেশ উচ্চ থাকে। আর, এই বিশাল বরফ-স্তূপের পৃষ্ঠদেশ মোটামুটিভাবে সমতল। ইহার প্রবল চাপে ও ঘর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুর অংশ মসৃণ হয় এবং পাহাড়ের চূড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শিথিল শিলাখণ্ড বা মৃত্তিকা কিংবা সঞ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ডগুলি (regolith) অপসারিত হইয়া যায় ও ভূ-পৃষ্ঠ নগ্ন হয়। তখন এই অঞ্চলে প্রশস্ত উপত্যকা, গোলাকৃতি শীর্ষদেশবিশিষ্ট পাহাড়, স্বল্প মৃত্তিকাময় ভূমি ও ভূ-পৃষ্ঠে ছোট-বড় শিলাখণ্ডগুলি ছড়ান অবস্থায় দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠের আমূল পরিবর্তন ঘটে—জলনিকাশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে নদীগুলি স্থানে স্থানে খরস্রোতা হইয়াছে, আর স্থানে স্থানে রহিয়াছে ছোট-

বড় জলপ্রপাত। আর, হ্রদ ও জলাভূমি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে; কারণ মোরেন সঞ্চিত হওয়ায় বা ভূ-পৃষ্ঠের কোমল অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় জল সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপ ভূ-ভাগ কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। ইহা প্রধানতঃ অরণ্যময় অঞ্চল। তবে, স্থানে স্থানে তৃণভূমিও রহিয়াছে। তাই, এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের কাঠ-সংগ্রহ করা ও পশুপালন করা প্রধান উপজীবিকা।

কানাডার প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত কানাডা-শিল্ডের বন্ধুর অংশ, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইংল্যাণ্ড স্টেট্সের পাহাড়িয়া অঞ্চল, স্কট্ল্যাণ্ডের উচ্চভূমি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের অংশবিশেষ মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল।

পার্বত্যভূমিঃ পর্বত যে-কোন প্রকার শিলায় ও যে-কোন ভাবে গঠিত হউক না কেন, সকল পার্বত্যভূমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠনের সামঞ্জস্য দেখা যায়; অবশ্য প্রত্যেক পর্বতের সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে নিজস্ব বিশেষ রূপও আছে। তাই, মালভূমি বা পাহাড়িয়া অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজে পরিলক্ষিত হয়। পার্বত্যভূমির পর্বত-শৃঙ্গ সুউচ্চ, হয়ত উহারা বরফে ঢাকা। ইহাদের গাত্রদেশের ঢাল অধিক। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে গভীর নদী-উপত্যকা বা গিরিখাত, পর্বতশ্রেণীর বহু ছোট-বড় শৈলশিরা প্রভৃতি রহিয়াছে। আর, বিভিন্ন উচ্চতায় জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্রকৃতির।

পার্বত্য অঞ্চলের নদী-উপত্যকা—পার্বত্য-অঞ্চলে নদীর প্রাথমিক গতি। এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল (Gradient) অধিক বলিয়া নদী খরস্রোতা। তাই, ইহার ক্ষয়কার্য সমধিক। ইহার ফলে গভীর নদী-উপত্যকার সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ উপত্যকাকে খাত (Gorge) বলা হয়। এইরূপ সংকীর্ণ উপত্যকার সৃষ্টির হেতু—ক্ষয়কার্যের নবীন অবস্থা (Young Gorge) বা কঠিন-শিলাময় স্থান। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের এইরূপ খাতের পার্শ্বদেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইহা প্রশস্ত হয়, ফলে ইংরাজি V-অক্ষরের আকার ধারণ করে। এইরূপ গঠন হইলে উহাকে নদী-উপত্যকা বলে। নদীর গর্ভদেশ বিভিন্ন প্রকৃতির শিলার অবস্থানের জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে নদী

অত্যন্ত খরস্রোতা (Rapids) হয় বা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। আবার, কোন কোন অংশে নদী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উপত্যকায় প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার পর উপত্যকা-মুখ সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সংকীর্ণ উপত্যকার মুখে উচ্চ বাঁধ বাঁধিলে পশ্চাতের প্রশস্ত উপত্যকায় জল সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে জলশক্তির সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আর, এই সঞ্চিত জলরাশির দ্বারা নিম্নভূমিতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন হইতে পারে। নদীর গতিপথে, হয়ত, কঠিন শিলাস্তরের দ্বারা জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নদীর গর্ভদেশের অংশবিশেষের ভূমির ঢাল (Gradient) অত্যন্ত কম হইতে পারে, আর এই অংশের উপত্যকার তলদেশ প্রশস্ত হইলে নদীর স্রোতোবেগ কমিয়া যায় এবং ইহা বক্রগতি ধারণ (Meander) করে। এই অংশে পাললিক ভূমিও গঠিত হইতে পারে।

নদীর পার্বত্য অংশে যান্ত্রিক উপায়ে (Mechanical weathering) ক্ষয়সাধনই অধিক,—উপত্যকার সুউচ্চ গাত্র হইতে শিথিল শিলাখণ্ডগুলি স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নে পড়ে এবং ঐস্থানে সঞ্চিত হয় কিংবা নদীর স্রোত দ্বারা বাহিত হয়; আর স্রোতবাহিত শিলাখণ্ডগুলির পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘর্ষণে ঐগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কর্দম, বালুকা, নুড়ি, প্রভৃতিতে পরিণত হয়; আবার, স্রোতবাহিত-শিলাগুলির আঘাতে ও ঘর্ষণে নদীর তলদেশ ও পার্শ্বদেশের শিলা শিথিল ও ক্ষয় হয়।

জল-বিভাজিকা (Water Partings or Divides)—পার্শ্ববর্তী দুইটি উপত্যকার মধ্যবর্তী উচ্চভূমি বা শৈলশিরায় পতিত বৃষ্টির জল বা ইহার উপরস্থ তুষার বিভক্ত হইয়া ঐ দুইটি উপত্যকার গাত্র বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করে; ফলে বহু ছোট ছোট জলধারা বা ছোট-বড় হিমবাহের সৃষ্টি হয়। জলপ্রবাহ ও তুষার উপত্যকার গাত্রদেশ ক্ষয় করিয়া বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি করে। এইরূপ উচ্চভূমিকে **জল-বিভাজিকা** বলে। মহাদেশের বড় বড় নদ-নদীর অববাহিকাগুলি পরস্পর উচ্চভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মহাদেশের সুদীর্ঘ পর্বতমালার এক পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া নদীগুলি ভূমির ঢাল অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত

এবং উহার অপর পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। তাই একদিকের নদীর অববাহিকাকে উচ্চভূমি অন্য দিকের নদীর অববাহিকা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করিয়া দেয়। এইরূপ উচ্চভূমিকে **মহাদেশীয় জল-বিভাজিকা** বলে। ইউরোপের আল্পীয় শ্রেণী; এশিয়ার ককেশাস, হিন্দুকুশ, ট্রান্স-হিমালয়, তিয়েনসান, আলতাই প্রভৃতি পর্বতমালা; আমেরিকা মহাদেশের রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা মহাদেশীয় জল-বিভাজিকা।

উচ্চ পর্বতমালার পাদদেশের পাহাড় (Mountain Foothills and Spurs)—পৃথিবীর প্রধান পর্বতমালার পাদদেশে ছোট-বড় পাহাড়, বিচ্ছিন্ন শৈলশিরা বা প্রধান পর্বতের শাখা-শৈলশিরা (spurs) প্রভৃতি দেখা যায়। ভারতের শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড়। ইহা হিমালয়ের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রধান পর্বতমালার পাদদেশের পাহাড়গুলি বিভিন্নভাবে গঠিত। শিলার প্রকৃতি, জলবায়ু এবং গঠনের প্রকৃতির উপর এই সকল পাদপাহাড়ের ভূ-পৃষ্ঠ নির্ভর করে। পর্বতের পাদদেশের সঞ্চিত পললরাশি বিশেষভাবে জমাট না বাঁধিয়া (unconsolidated sediments) ভূ-আলোড়নের ফলে উচ্চ হইলে, এইরূপ উচ্চভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয় হইয়া পাহাড়ে পরিণত হইতে পারে। পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতের দক্ষিণাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যাডল্যাণ্ডে (Bad land) পরিণত হইয়াছে। আবার, নেপালের শিবালিক বেশ উচ্চ ও আরণ্যময়। আমেরিকার রকি পর্বতের পাদদেশে এক শ্রেণীর সমান্তরাল পাদ-পাহাড় আছে, তাহাকে হগ্‌ব্যাক্ রিজ্ (hogback ridge) বলে। প্রধান পর্বতের সম্মুখে অবস্থিত পাদ-পাহাড়ের পার্শ্বদেশ উচ্চ এবং অপর পার্শ্ব ক্রমনিম্ন হইয়া সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

স্পার (Spur)—পর্বতমালার প্রধান শৈলশিরার ছোট ছোট শাখা-শৈলশিরা থাকিতে পারে। এইগুলি প্রধান শৈল-শিরার সহিত কতকটা লম্বভাবে বা অন্য কোন কোণ সৃষ্টি করিয়া অবস্থিত। ইহাদিগকে **স্পার** (Spur) বলে। পার্শ্ববর্তী দুইটি স্পারের মধ্যে নাতিদীর্ঘ উপত্যকা থাকে। এইরূপ উপত্যকাগুলিকে প্রধান উপত্যকার শাখা-উপত্যকা বলা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত বড় বড় নদীর

উপত্যকার উভয় পার্শ্বে এইরূপ স্পার থাকিতে পারে। নদী-উপত্যকার উভয় পার্শ্বের উচ্চভূমি হইতে নির্গত স্পারগুলি কখন কখন এইরূপভাবে অবস্থান করে যে, নদী-উপত্যকা বিশেষ বক্র হইয়া যায়। আর, বিপরীত দিকে অবস্থিত স্পারগুলি দৃষ্টি রোধ করে, কারণ এক পার্শ্বের একটি যতদূর প্রসারিত, বিপরীত পার্শ্বের অপরটি বিপরীত দিকে তাহা অপেক্ষা বেশীদূর প্রসারিত থাকে। তাই, নদীর এই অংশে নৌ-চলাচল বিপজ্জনক। এইরূপ ভাবে অবস্থিত স্পারগুলিকে Interlocking Spurs বলে।

পর্বত-শৃঙ্গ—পর্বতমালার গিরিশৃঙ্গ বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। প্রাকৃতিক নানা কারণে গিরিশৃঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোনটি চ্যুতির ফলে, কোনটি উচ্চভূমির উপর আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হইবার ফলে সৃষ্টি হইতে পারে। তবে উচ্চভূমির ভূ-পৃষ্ঠের শিলার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর অধিকাংশ গিরিশৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আর, ইহার উচ্চতম অংশই কঠিন শিলায় গঠিত।

গিরিপথ (Mountain Passes)—উচ্চ পার্বত্যভূমির প্রধান পর্বতমালা পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করে। এই উচ্চ-অংশের স্থানবিশেষ সংকীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশও থাকিতে পারে। এই নিম্ন অংশের উভয় প্রান্তদ্বয় উপত্যকার সহিত সংযুক্ত হইলে এই নিম্ন-অংশের মধ্য দিয়া পর্বতমালা অতিক্রম করা যায়। এইরূপ নিম্ন-অংশকে গিরিপথ বলে। হিমালয় পর্বতমালার গিরিপথগুলি সাধারণতঃ সুউচ্চ। শীতকালে হিমালয়ের গিরিপথগুলি তুষারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন গিরিপথগুলি অতিক্রম করা যায় না।

তুষারের কার্য—পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

পার্বত্যভূমির উপকূলভাগ (The Shore Features of Mountain Regions)—পার্বত্যভূমির উপকূলভাগ সর্বত্র একরূপ দেখা যায় না। ইহার কারণ, বিভিন্ন অংশে উপকূলের উৎপত্তি-ইতিহাস বিভিন্ন।

ভূ-আলোড়নের ফলে যে-অংশের উপকূলভাগ অদূর অতীতে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উঠিয়াছে, তাহাদের উপকূলভাগ সাধারণতঃ অখণ্ডিত—এখানে ছোট-বড় উপসাগর ইত্যাদি বিশেষ দেখা যায় না। আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের ৪০° উ. সমাক্ষ-

রেখার দক্ষিণ হইতে চিলির ৪০° দ. সমাক্ষরেখা পর্যন্ত অংশে এইরূপ উপকূলভাগ আছে। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিশেষ নাই। এই অংশের পার্শ্বে সমুদ্র গভীর ও মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ। আবার, ভূ-খণ্ড সমুদ্রগর্ভে বসিয়া যাইয়া যে উপকূল-ভাগ গঠিত হয়, তাহার তটরেখা খণ্ডিত। কারণ, উপত্যকা, বন্ধুর-ভূমি প্রভৃতি বসিয়া যাইলে উপতাকার নিম্ন-অংশ গভীর উপসাগরে পরিণত হয়। পূর্বতন দুইটি উপত্যকার মধ্যস্থ শৈলশিরা পার্বত্য উপদ্বীপ, পার্বত্য দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি করে। এইরূপ খণ্ডিত উপকূলকে **রিয়া** (Ria) তটরেখা বলা হয়। ইহার ফলে স্থানে স্থানে ছোট-বড় উপসাগর বা সাগরশাখা প্রভৃতি এখানে দেখা যায়। আর, এইগুলি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে পরিণত হইতে পারে। উপসাগরের বা ক্ষুদ্র সাগর-শাখার পার্শ্বে নদী-বাহিত পলল রাশি সঞ্চিত হইয়া সমভূমির উৎপত্তি হইতে পারে। ঐরূপ স্থানে বন্দর গড়িয়া উঠে। ইহার পশ্চাৎ-ভূমির সহিত পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত এবং পশ্চাৎভূমি উন্নত হইলে, ইহা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

পৃথিবীর বহু অংশে রিয়া-তটরেখা দেখা যায়। পশ্চিম-ইউরোপের স্পেনের উত্তর-উপকূল, গ্রীসের উপকূলের অংশ-বিশেষ, ইজিয়ান ও আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল ; এশিয়ার জাপানের ও দক্ষিণ-চীনের উপকূল রিয়া-প্রকৃতির।

পার্বত্য-উপকূলে হিমবাহের কার্যের ফলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির উপকূলের সৃষ্টি হয়। এইরূপ উপকূল বিশেষভাবে খণ্ডিত,—দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট অথচ সংকীর্ণ এবং অধিক ঢালযুক্ত পার্বত্য উপদ্বীপ, সংকীর্ণ অথচ গভীর উপসাগর, এই দুইটি পরপর অবস্থিত ; আর শিলাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে। উপসাগর ও উপদ্বীপ-গুলি আঁকা-বাঁকা। এইরূপ উপসাগর বা সাগরশাখাকে **ফিয়র্ড** (Fiord) বলে। হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট U-আকার বিশিষ্ট উপত্যকা মগ্ন হইয়া ফিয়র্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম।

কেবলমাত্র শীতপ্রধান দেশে বা মধ্য-অক্ষাংশযুক্ত অঞ্চলের মেরুর দিকে (Higher Middle Latitude) ফিয়র্ডযুক্ত তটরেখা থাকিতে পারে। প্রধানতঃ এই অঞ্চলের পশ্চিম-উপকূলে উচ্চ পার্বত্যভূমি থাকিলে এইরূপ তটরেখা দেখা যায় ; কারণ, আর্দ্র পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে প্রচুর তুষার-

পাত হয় বলিয়া বহু হিমবাহ সৃষ্টি হইতে পারে। নরওয়ের পশ্চিম-উপকূল, দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ-চিলির উপকূল, উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের পুগেট-সাউণ্ড হইতে আলাস্কা পর্যন্ত, নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ-দ্বীপের পশ্চিম-উপকূল ফিয়র্ডে পূর্ণ। ইহা ছাড়া, গ্রীণল্যাণ্ড, লাব্রডর, স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম-উপকূল কতকটা এইরূপ প্রকৃতির। ইহাদের পার্বত্যভূমি অধিক উচ্চ নহে বলিয়া ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য তত মনোরম নহে।

সমভূমি (Plains) **ঃ** সমভূমিতে মানুষের কর্মতৎপরতা অধিক—ইহা কৃষিকার্যের উপযোগী, এখানে গমনাগমন সহজসাধ্য ; সমভূমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের বাসভূমি। এইরূপ ভূ-পৃষ্ঠযুক্ত ভূমিতে মানব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে।

যে-ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চ নহে এবং ইহার কোন অংশ তাহার পার্শ্ববর্তী অংশ অপেক্ষা ৫০০' ফুটের অধিক উচ্চ নহে (Local relief of less than about 500 ft.), তাহাকে সমভূমি বলে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে অধিক উচ্চ সমভূমি এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন সমভূমিও রহিয়াছে।

মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বতের পাদদেশ উচ্চ-সমভূমি বা বৃহৎ সমভূমি (High or Great Plain) প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার ফুট উচ্চ। কাস্পিয়ান সাগরের (হ্রদ) পার্শ্ববর্তী কতক অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন। সমভূমির ভূ-পৃষ্ঠ নানারূপ হইতে পারে,— কোন কোনটি সমগ্রভাবে সমতল, কোন কোনটি সামান্য ভাবে উন্নত-অবনত (rolling plain), আবার কোন কোনটি বিশেষভাবে উন্নত-অবনত (rough plain) ; তবে ইহার কোন অংশই প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী অংশ অপেক্ষা ৫০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। সমভূমির আর একটি বৈশিষ্ট্য—কোন একটি সমভূমির বিস্তীর্ণ অংশের উৎপত্তি-ইতিহাস অভিন্ন ও শিলাগুলিও একই প্রকৃতির ; আবার, একই সমভূমির বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি-ইতিহাস বিভিন্ন ও শিলার প্রকৃতি বিভিন্ন হইতে পারে।

পৃথিবীর সমভূমিগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায় ; যথা—(ক) জলবায়ু হিসাবে, যেমন—উষ্ণমণ্ডলের শুষ্ক-অঞ্চলের সমভূমি, উষ্ণমণ্ডলের আর্দ্র-অঞ্চলের সমভূমি, মধ্য-অক্ষাংশযুক্ত অঞ্চলের সমভূমি (Middle Latitude)

ইত্যাদি ; (খ) সমুদ্র হইতে দূরত্ব অনুযায়ী, যেমন—উপকূলের সমভূমি, মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমভূমি ইত্যাদি ; (গ) শিলার প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী, যেমন—আনুভূমিকভাবে অবস্থিত পাললিক-শিলায় গঠিত সমভূমি, প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত সমভূমিপ্রায় (peneplain) ভূ-ভাগ, হিমবাহ-বাহিত-শিলার দ্বারা গঠিত সমভূমি ইত্যাদি ; (ঘ) বন্ধুরতার মান অনুযায়ী, যেমন—বিস্তীর্ণ অংশের বন্ধুরতাহীন সমভূমি (flat plains), ইহার স্থানীয় উন্নতি-অবনতির মান ৫০ ফুটের অধিক নহে ; সামান্যভাবে বন্ধুর সমভূমি (undulating plains), ইহার স্থানীয় উন্নতি-অবনতির মান ৫০-১৫০ ফুট ; বন্ধুর ও ব্যবচ্ছিন্ন সমভূমি (rough dissected plains), ইহার স্থানীয় উন্নতি-অবনতির মান ১৫০-৫০০ ফুট।

ভূ-পৃষ্ঠের উন্নতি-অবনতির মানের উপর মানুষের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠ যতই সমতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে, ততই কৃষিকার্যের ও জলসেচ-ব্যবস্থার উপযোগী হইবে ; আর, ভূমিক্ষয় ততই কম হইবে। তাই, ভূগোল-বিদ্যায় ভূমির উন্নত-অবনতের মান আলোচিত হয়। আবার, এক প্রকার উন্নতি-অবনতি-বিশিষ্ট সমভূমি বিভিন্ন জলবায়ু-অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে বা বিভিন্ন প্রকৃতির শিলায় গঠিত হইতে পারে কিংবা একই প্রকৃতি-বিশিষ্ট শিলা বিভিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারে। এইজন্য সমভূমিগুলির উৎপত্তি-ইতিহাস অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ-ই ব্যবহারিক-ক্ষেত্রের উপযোগী ; যথা—(১) জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে বা (২) জলপ্রবাহের অবক্ষেপনের ফলে সমভূমির উৎপত্তি ; (৩) হিমবাহের কার্যের ফলে সমভূমির উৎপত্তি ; (৪) বায়ুপ্রবাহের কার্যের ফলে সমভূমির উৎপত্তি। আবার, প্রত্যেক শ্রেণীর সমভূমিকে বিচার করিবার প্রয়োজন—(ক) ভূমির উন্নতি-অবনতির মান ; (খ) উপত্যকার আকার ; (গ) ভূমির পৃষ্ঠের গঠন, যেমন,—টিলা বা অনুচ্চ অংশের অবস্থান, পার্শ্ববর্তী নদী দুইটির মধ্যস্থ ভূখণ্ডের উচ্চতা, ইত্যাদি ; (ঘ) জলনিকাশের প্রকৃতি, যেমন—নদনদী, জলাশয়, বিল ইত্যাদির অবস্থান ও ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ইত্যাদি। অবশ্য, প্রত্যেক সমভূমির উল্লিখিত সবগুলি

বর্তমান না থাকিতে পারে। তবে, ভূ-আলোড়ন বা আভ্যন্তরীণ শক্তি, বিবিধ ক্ষয়কার্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই সমভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। ভূ-বিদ্যা অনুযায়ী সকল সমভূমি এক সময়ে গঠিত হয় নাই,—কোনটি প্রাচীন, কোনটি মধ্যবয়স্ক, কোনটি নবীন; আবার, ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমি সামান্যভাবে উন্নত হইয়া প্রাচীন ভূ-খণ্ড নবযৌবন লাভ করিতে পারে।

সমভূমির শ্রেণী বিভাগ—পৃথিবীর প্রধান সমভূমিগুলিকে যে নানাভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বিভিন্ন যুগে* প্রাকৃতিক কারণে একই সমভূমির, বিবিধ পরিবর্তন ঘটিতে পারে—হয়ত, কোন এক যুগে উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হইয়াছিল; তারপর, উহা, হয়ত, সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, আবার, পলি-সঞ্চরণের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ হইয়া সমভূমির রূপ পাইয়াছিল বা ভূ-আলোড়নে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল; এইরূপ বিভিন্ন যুগে একই সমভূমির বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হইতে পারে। এইরূপ জটিলতার সীমা নাই। বর্তমান যুগে আমরা সমভূমিগুলির যে রূপ দেখিতেছি, তাহাদিগকে সেভাবে শ্রেণী-বিভাগ করিলে এই সকল জটিলতার কতকাংশ দূরীভূত হয়। তাই, ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে, যে সমভূমিগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়; আবার যেগুলি ক্ষয়জাত পদার্থগুলির আক্ষেপণের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে আর একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক্ষয়কার্যের ফলে সমভূমির সৃষ্টিঃ জলপ্রবাহের ক্ষয়কার্যের দ্বারা সমভূমির উৎপত্তি—সরল বা জটিল প্রকৃতির শিলার দ্বারা গঠিত বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ, ভূমির উপরস্থ জলের (surface water) দ্বারা যান্ত্রিক

* ভূগোল-বিদ্যায় 'যুগ' কথাটি ইতিহাসের যুগ নহে। ভূ-বিদ্যায় যুগ যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, ভূগোল-বিদ্যায়ও সেই অর্থ বুঝায়। পৃথিবীর বয়স ১৫০ কোটি বৎসর ধরিলে, ইহার $\frac{১}{৩}$ অংশের কথা আমরা বিশেষ জানি না। এই ৫০ কোটি বৎসরকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায়। তাই, নবীন যুগ বলিলে তাহা ১০ কোটি বৎসরও হইতে পারে। 'সদ্য' বা 'অধুনা', এই কথার অর্থ ৪০।৫০ হাজার বৎসর হইতে পারে।

বা রাসায়নিক উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যে সকল সমভূমি গঠিত হয়, তাহাদের বিষয় এইবার আমরা আলোচনা করিব।

সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট সমভূমিগুলির মধ্যে সাগরগর্ভ হইতে সদ্য-উত্থিত উপকূল-সমভূমির বিষয় সর্বপ্রথম এবং তাহার পর পূর্বতন-যুগে-সৃষ্ট ও জটিল প্রকৃতির শিলায় গঠিত বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ, জলপ্রবাহের কার্যের ফলে, যে সকল সমভূমি গঠিত হইয়াছে, তাহাদের কথা বলা হইবে।

সাগরগর্ভ হইতে সদ্য-উত্থিত উপকূল-সমভূমি—পৃথিবীর বহু অংশের উপকূল-সমভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া কিয়দংশ সমুদ্রগর্ভে বিস্তৃত। সমভূমির এই নিমজ্জিত অংশের নাম মহীসোপান। সমুদ্রের এই অংশ অগভীর (৬০০ ফুটের অধিক গভীর নহে)। প্রকৃতপক্ষে মহীসোপান মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ। প্রাকৃতিক কারণে মহীসোপান উন্নত হইয়া উপকূলের সমভূমিকে প্রশস্ত করে; আবার, উপকূলের সমভূমি বসিয়া মহীসোপানকে বিস্তৃত করে। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়জাত পদার্থ নুড়ি, বালুকা, কাদা প্রভৃতি গৌণ বা মুখ্য কারণে মহীসোপানে পললরূপে সঞ্চিত হয়। সমুদ্রস্রোত, তরঙ্গ, জোয়ার-ভাটা এই পললরাশিকে গুরুত্ব অনুযায়ী মহীসোপানের উপর ছড়াইয়া দেয়। তাই, নুড়ি, বালুকা, কাদা বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত। যেটি যে-অংশে সঞ্চিত হয়, তাহা সেই অংশে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে মহীসোপানের পৃষ্ঠদেশ সমতলে পরিণত হয়। ভূ-আলোড়নের (Tectonic Forces) জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইলে এইরূপ পললসহ মহীসোপান উপকূলের সমভূমিতে পরিণত হয়। আর, নুড়ি, বালুকা, কাদা প্রভৃতির স্তর লইয়া এই সমভূমি গঠিত। বিভিন্ন পললের স্তরগুলি একটি পর আর একটি আনুভূমিকভাবে সাজান থাকে এবং স্তরের উপাদানগুলি জমাটভাবে (Compacted) থাকে না। এইরূপ সমভূমি সমুদ্রের দিকে সামান্যভাবে নত অবস্থায় থাকে। আর, ইহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই।

বহুদিন এই শ্রেণীর সমভূমি সমতল-অবস্থায় থাকিতে পারে না,—নদ-নদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ ইহার উপর প্রবাহিত হয়; ফলে ইহাদের প্রভাবে সমভূমির ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন হয়। এখানে নদ-নদীর স্রোতোবেগ মন্থর, ভূমির জলনিকাশ-

ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। ফলে ইহার নিম্নতম অংশগুলিতে প্রধানতঃ সমুদ্রতটের নিকট ছোট-বড় জলাভূমির সৃষ্টি হয়।

আবার, কোন উপত্যকা বা সমভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উপকূলের নিকট নিম্ন-সমভূমিতে পরিণত হইলে, ইহারও অনুরূপ প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যায়। কখন কখন সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অধিকতর নিম্ন হইলে সমুদ্র-জল তথায় প্রবেশ করিয়া উপত্যকার নিম্নঅংশ উপসাগরে পরিণত হইতে পারে।

পৃথিবীর বহু অংশে এইরূপ প্রকৃতির উপকূলস্থ নিম্ন-সমভূমি রহিয়াছে। এশিয়া ও ইউরোপের সুমেরু মহাসাগরেব উপকূলে এইরূপ সমভূমি অবস্থিত। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের দক্ষিণাংশে ও মেক্সিকো-উপসাগরের উপকূলে স্থানে স্থানে এইরূপ প্রকৃতির নিম্ন-সমভূমি আছে।

উপকূলস্থ অন্যান্য প্রকৃতির সমভূমি—উপকূলস্থ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-সমভূমিগুলি জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত। সমভূমি নানা প্রকৃতির শিলায় গঠিত হইলে, কোন শিলা অধিক, আবার, কোন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে ইহার ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র অংশ সম্পূর্ণভাবে সমতল থাকে না,—উন্নত-অবনত ভূমি বা উপত্যকা ও দুইটি পার্শ্ববর্তী উপত্যকার মধ্যস্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি কিংবা মধ্যে মধ্যে টিলা বা অনুচ্চ পাহাড় প্রভৃতি এখানে কালক্রমে সৃষ্টি হয়।

উপকূলের পার্শ্বে ও উপকূল হইতে কিছু দূর পর্যন্ত এক বিশিষ্ট প্রকৃতির পাললিক-শিলায়-গঠিত সমভূমি দেখা যায় (Belated Coastal Planes),—উপকূলের সহিত কতকটা সমান্তরালভাবে পর পর অবস্থিত অনুচ্চ-ভূমি এবং তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নিম্নভূমি। এইরূপ অনুচ্চভূমি অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ-আকার-বিশিষ্ট এবং অনুচ্চভূমিগুলি সমুদ্রের দিকে ক্রমনিম্ন হইয়া নিম্নভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে ও ইহার পশ্চাৎভাগের প্রান্তদেশ, অপর পার্শ্বের নিম্নভূমি হইতে খাড়াভাবে উঠিয়াছে। ইহাদিগকে **এস্‌কার্পমেণ্ট** (Escarpment) বলে। কোন কোন স্থানে এস্‌কার্পমেন্টের অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে ছোট ছোট পাহাড়ে (Ridges) পরিণত হইয়াছে। পাহাড়গুলিকে **কিউস্টা** (Cuesta) বলে। এই অঞ্চলের প্রবাহিত নদনদীগুলি অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাগুলিকে অধিক ক্ষয়

করে এবং কঠিন শিলাগুলি তত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কঠিন শিলায় গঠিত ভূ-পৃষ্ঠের অংশই পাহাড়ে পরিণত হয়। বিভিন্ন যুগে পর পর সমুদ্রগর্ভ উন্নত হইয়া একটির পর আর একটি সমভূমিতে পরিণত হইলে, এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি গঠিত হয়। নবীনতম সমভূমি সমুদ্র-উপকূলে এবং প্রাচীনতমটি সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা ও টেক্সাস রাজ্যের উপকূলের সমভূমি সমুদ্র-গর্ভ উন্নত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে গ্র্যানিট-শিলায় গঠিত যে ছোট ছোট পাহাড় (Cuesta) রহিয়াছে, উহারা এককালে উপকূলের নিকটস্থ ছোট ছোট পাহাড়িয়া দ্বীপ ছিল। মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূল এই প্রকৃতির সমভূমি।

জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীন-পাললিক-শিলায়-গঠিত সমভূমি—(Stream-eroded Plains in Older Sedimentary Rocks)—মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত পাললিক-শিলায়-গঠিত সমভূমি জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পূর্বে-বর্ণিত উপকূলের সমভূমির (Belated Plain) মত কতকটা রূপ পায়। উপকূলস্থ সমভূমির শিলাস্তর অপেক্ষা এই অঞ্চলের শিলাস্তর জমাট ও শক্ত; কারণ বহু দিন পূর্বে এই স্থানের শিলা গঠিত হইয়াছে বলিয়া জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলার কণাগুলি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আবার, ভূ-আলোড়নের (Diastrophism) ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে পারে, ভূ-পৃষ্ঠ অবতল বা উত্তল কিংবা একপার্শ্ব ক্রমনত হইতে পারে।

বহু বৎসরব্যাপী জলপ্রবাহের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে প্রাচীনকালে-সৃষ্ট-সমভূমির ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন হয়। ইহার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে কোটি কোটি মণ শিলা অপসারিত হইয়া যায়, বিভিন্ন অংশের শিলার কঠিনত্বের মান অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আবার, মৃদু প্রকৃতির ভূ-আলোড়নের জন্য ভূমির ঢালের পরিবর্তন বা শিরাস্তর বিভিন্নভাবে নত হইতে পারে। তখন জলনিকাশ-ব্যবস্থা অন্যভাবে গঠিত হয়,—নদনদীর গতি শুধু পরিবর্তিত হয় না, ইহাদের মিলন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যায়, পূর্বতন-জলাশয় লুপ্ত এবং নূতন নূতন জলাশয়ের উদ্ভব

হইতে পারে। সমভূমির আর পূর্বরূপ থাকে না। কঠিন-শিলাময়-অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে বা ছোট-বড় টিলা কিংবা ছোট ছোট পাহাড়ে এবং কোমল-শিলাময়-অংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। শিলাস্তরের চ্যুতিপূর্ণ অংশ দুর্বল বলিয়া ঐ অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার, পাহাড়িয়া বা পার্বত্য অঞ্চল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হইতে পারে। আর, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন স্থানীয় জলবায়ুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

উল্লিখিত বিষয়-আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়কার্যের পরিবর্তন-চক্র (cycle of erosion) চলিতেছে,—শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, এই তিন প্রকার অবস্থাই পর পর দেখা যায়; আবার, নবজীবন লাভ করিয়া অর্থাৎ ভূ-আলোড়নের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত নিম্নভূমি (বার্ধক্য অবস্থা) বন্ধুর উচ্চভূমিতে (শৈশব অবস্থা) পরিণত হইতে পারে। তারপর, আবার পরিবর্তন-চক্র চলে। অতি-প্রাচীনকালে কোন এক যুগে (Huronian age) ভূ-আলোড়নের ফলে সুউচ্চ আরাবল্লী পর্বত গঠিত হয়, তাহার পর এই পর্বতমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিপ্রায় (peneplane) ভূমিতে পরিণত হয়, পুনরায় আর এক যুগে (Cambrian age) উন্নত হইয়া পর্বতে পরিণত হয়, তাহার পর আর এক যুগে হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (সে-যুগে ভারতের অংশবিশেষে মহাদেশীয় হিমবাহ বর্তমান ছিল)। অতি-প্রাচীন ও সুউচ্চ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী বর্তমানযুগে কতকগুলি শৈলাশিরার সমষ্টিমাত্র। এই সকল শৈলাশিরা-অংশগুলি গ্র্যানিট্ (আবু পাহাড়), কোয়ারট্জাইট, শিস্ট প্রভৃতি আগ্নেয় ও রূপান্তরিত (Delhi-Dharwar age) অতি-শক্ত শিলায় গঠিত। ইহা পৃথিবীর অন্যতম অতি-প্রাচীন পর্বতমালা।

সমভূমির বিস্তৃত-অংশ সমতল কিংবা সামান্যভাবে উঁচু-নীচু বা তরঙ্গায়িত-সমভূমি (Rolling or undulating plain) হইতে পারে। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলায় এই প্রকৃতির সমভূমি রহিয়াছে।

সমভূমির বিস্তৃত-অংশ সমতলভাবে গঠিত হইবার হেতু—কেবলমাত্র জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ সমভূমির বিস্তৃত-অংশ সমতলভাবে পরিণত হইবার হেতু—(১) নবীন-সমভূমিগুলিতে জলপ্রবাহের

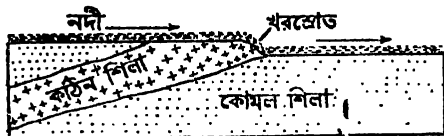
কার্য অতি-অল্প সময়-ব্যাপী হইয়াছে বলিয়া ইহার ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, (২) অতি-প্রাচীন ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কারণ এই ক্ষেত্রে ক্ষয়কার্য সমাপ্ত হইয়াছে কিংবা ইহার মধ্যস্থ যে সকল কঠিন-শিলাময় অনুচ্চ-অংশগুলি ছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া অপসারিত হইয়াছে। এইরূপ সমভূমি গঠিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রয়োজন।

তরঙ্গায়িত-সমভূমি গঠিত হইবার হেতু—সাধারণতঃ সমভূমি যতই প্রাচীন হইতে থাকে অর্থাৎ ক্ষয়কার্যের পরিবর্তন-চক্র অধিক অগ্রসর হইলে ইহার ভূ-পৃষ্ঠের অংশগুলির কোন স্থান অধিক, কোন স্থান অল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিংবা সমভূমির বিভিন্ন অংশের স্থানীয় উন্নতি-অবনতি (Local relief) বেশী হইলে এইরূপ সমভূমি তরঙ্গায়িত-সমভূমিতে পরিণত হয়। মহাদেশের মধ্যস্থ কোন কোন ভূ-ভাগ অনুচ্চ পাহাড় লইয়া গঠিত হইলে, তাহাকেও কখন কখন তরঙ্গায়িত সমভূমি বলা হয়; কারণ ইহার কোন অংশের স্থানীয় উন্নতি-অবনতি ৫০০ ফুটের অধিক নহে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সমভূমি পাহাড়িয়া অঞ্চল।

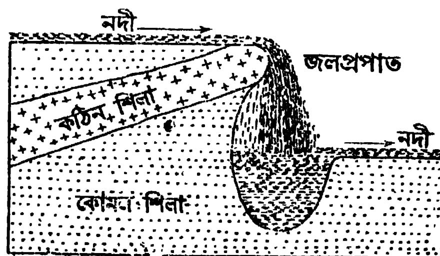
জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত নবীন সমভূমির বিশেষত্ব—এইরূপ সমভূমির অধিকাংশ ভূ-পৃষ্ঠ সমতল, আর স্থানে স্থানে রহিয়াছে সংকীর্ণ নদী-উপত্যকা। উপত্যকার পার্শ্বদেশ খাড়াভাবে গঠিত। এইরূপ সংকীর্ণ-উপত্যকায় বন্যা হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া এই অংশে লোকবসতি কম। পার্শ্ববর্তী দুইটি নদীর মধ্যস্থ অংশ বা দোয়াবের ভূমি সমতল। দোয়াব-অঞ্চল কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া এই অংশে জনপদ গড়িয়া উঠে। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশের সমভূমি এই প্রকৃতির। আর, নদী যতই প্রাচীন হইতে থাকে, উপত্যকা প্রশস্ত হইয়া যায় এবং উপত্যকার প্রশস্ত তলদেশে নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রবাহিত হয় (meander)। সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতের ন্যায় নদীর বয়স অনুযায়ী নবীন বা প্রাচীন নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ প্রশস্ত নদী-উপত্যকা লোকবসতির উপযোগী। এইরূপ উপত্যকার পার্শ্ববতী ভূ-ভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। তাই, ঐরূপ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি হইতে বৃষ্টির জল বা ছোট-বড় জলধারা উপত্যকার গাত্র বহিয়া নদীতে পড়ে; ফলে ঐ অংশে ছোট-বড় খাতের সৃষ্টি

হয়। তাই, এই অঞ্চলের নদী-উপত্যকার পার্শ্বদেশের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর (river-breaks)। বর্ধমান বিভাগের কতকাংশের নদীকূল এইরূপ প্রকৃতির।

• মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের চম্বল নদীর উপত্যকার পার্শ্বে এইরূপ বন্ধুর ভূ-ভাগ (Bad land) দেখা যায়। আবার, নদীর গতিপথে কোমল শিলা ও কঠিন শিলা, এই দুই প্রকৃতির শিলা থাকিলে, উহারা বিভিন্নভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়; ফলে কঠিন ও কোমল শিলার মিলনস্থলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইতে পারে কিংবা ঐরূপ অংশে নদী খরস্রোতা হইতে পারে। তবে, নদী যতই প্রাচীন হইতে থাকে, কঠিন শিলাময় অংশও ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া নদীর গর্ভদেশের ঢাল (Gradient) কমিয়া যায় এবং খরস্রোতা অংশ বা জলপ্রপাত ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ নদীর গতি হয় মন্থর। কখন কখন নদী-উপত্যকার পার্শ্বদেশে শিলাময় সোপানের মত অংশ দেখা যায়। উহাকে **শিলাময় টেরাস** (Rock terrace) বলে। উপত্যকার পার্শ্ব-দেশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হওয়ায় শিলাময় টেরাসের উৎপত্তি হয়। তবে, সমভূমি ও উহার মধ্যে প্রবাহিত নদী একভাবে প্রাচীনত্ব লাভ করে না,—সমভূমি প্রাচীনত্ব লাভ করিবার পূর্বে নদী প্রাচীনত্ব (erosional maturity) লাভ করে।



নদী খরস্রোতা হইবার হেতু



কঠিন ও কোমল শিলা দ্বারা গঠিত নদীর গর্ভদেশে জলপ্রপাতের সৃষ্টি

উল্লিখিত ক্ষয়কার্যের ফলে সমভূমিতে যে বিশিষ্টপ্রকৃতির সমভূমির সৃষ্টি হয়,

তাহা এবং সমভূমিপ্রায়-ভূমি (peneplains), এই উভয় প্রকৃতির সমভূমিতে নদী-উপত্যকা এত বিস্তার লাভ করে যে, পার্শ্ববর্তী দুইটি উপত্যকার মধ্যবর্তী অনুচ্চভূমি নামমাত্র বর্তমান থাকে; কাজেই ঐ অনুচ্চভূমির অবস্থান সহজে বুঝা যায় না।

নিম্ন বা উচ্চ সমভূমিপ্রায়-ভূমির (High or Low Peneplains) **উৎপত্তি**—বর্তমান যুগে যে সব সমভূমিপ্রায়-ভূমি বা পেনিপ্লেন দেখা যায়, পূর্বে উহারা পার্বত্যভূমি কিংবা অনুভূমিকভাবে অবস্থিত পাললিক-শিলায় গঠিত উচ্চ সমভূমি ছিল। আর, পেনিপ্লেনগুলি খুব নিম্ন বা সমতল নহে।

পার্বত্যভূমি বিবিধ প্রকৃতির শিলায় গঠিত। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইহার শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের রূপের পর পর ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে, অবশেষে অতি-কঠিন শিলাময় অংশ ভিন্ন অন্য অংশ পেনিপ্লেনে বা তরঙ্গায়িত সমভূমিতে (undulating plains) পরিণত হয়; কেবলমাত্র অতি কঠিন শিলাময় অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট স্তূপ-পাহাড়ে (Block Hills or Monadnocks) পরিণত হয়। আবার, কখন কখন ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন-চক্রে এইরূপ আংশিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্লেন, ভূ-আলোডনের জন্য পুনরায় উন্নত হইতে পারে। তখন নদীর গর্ভদেশের ঢাল অধিক হইয়া যায়, মৃদুগতিসম্পন্ন নদী খরস্রোতা নদীতে পরিণত হয় এবং ক্ষয়কার্যের মাত্রা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে পেনিপ্লেন উন্নত-অবনত ভূমি বা তরঙ্গায়িত সমভূমির রূপ পায়। পূর্বতন.পেনিপ্লেনের কঠিন শিলায় গঠিত অংশগুলি সমতল-শীর্ষবিশিষ্ট পাহাড়ে পরিণত হয়।

উত্তর-আমেরিকার কানাডা-শিল্ড প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন। মহাদেশীয় হিমবাহের কার্যের ফলে ইহার উৎপত্তি। ইহার পর উহা নদনদীর দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের অধিকাংশ ভূ-পৃষ্ঠ মহাদেশীয় হিমবাহ-সৃষ্ট পেনিপ্লেন। ভারতের বহু অংশে পেনিপ্লেন রহিয়াছে, রাজস্থানে আরাবল্লী পর্বতের পূর্বে মালব, ছত্রিশগড়-সমভূমি (মধ্যপ্রদেশ), ছোট নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানে স্থানে পেনিপ্লেন দেখা যায়। বীরভূম জেলার

দুবরাজপুর-অঞ্চল প্রাচীন শিলায় গঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্লেন। এখানে স্থানে স্থানে স্তূপ-পাহাড় বর্তমান।

মহাদেশের মধ্যভাগের সমভূমি—উপকূলের সমভূমি-প্রসঙ্গে সমান্তরাল শৈলশিরাশ্রেণী ও তন্মধ্যে নিম্নভূমিসহ যে সমভূমির (Cuesta form Plains) কথা আলোচনা করা হইয়াছে, কতকটা এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি সমুদ্র-উপকূল হইতে দূরবর্তী অঞ্চলেও দেখা যায়। জলপ্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে সমান্তরালভাবে বহু শৈলশিলা (cuesta ridges) বা এস্‌কাপমেণ্ট ও তাহাদের মধ্যবর্তী অংশে নিম্নভূমি গঠিত হইতে পারে। এই অঞ্চলের বহু এস্‌কার্পমেণ্ট বিশেষ উচ্চ হইতে পারে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে চক্‌শিলায় গঠিত ডাউন ও তন্মধ্যস্থ নিম্নভূমি রহিয়াছে। আবার, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বেসিনের সমভূমির রূপ কতকটা এইরূপ। নায়েগ্রা-জলপ্রপাত চূনাপাথরে গঠিত এস্‌কার্পমেণ্টে অবস্থিত।

কোন কোন স্থানে শৈলশিরা ও উহাদের মধ্যস্থ নিম্নভূমি একই কেন্দ্রস্থ বিভিন্ন বৃত্তাকারে (Concentric Ridges) অবস্থান করে। সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিভিন্ন-প্রকৃতির পাললিক-শিলায় গঠিত কোন ভূ-ভাগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমির সৃষ্টি হয়,—হয়ত কোন যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ট সামান্যভাবে কুঞ্চিত (warping) হইয়াছিল; আর বিভিন্নভাবে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের প্যারিস-বেসিন এই প্রকৃতির সমভূমি। এখানে পাঁচ-ছয়টি আংশিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত নিম্ন শৈলশিরাশ্রেণী সমভূমির উপর পর পর গোলাকারে অবস্থিত। লণ্ডন-বেসিন এই প্রকৃতির হইলেও ইহা অধিকতর বিস্তৃত।

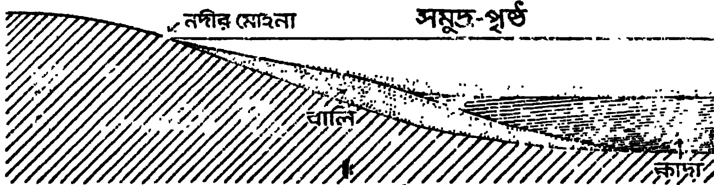
কার্স্ট-সমভূমি (Karst Plains)—ভূ-পৃষ্ঠের উপর জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলাফল আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া, ভূ-নিম্নস্থ জল বিবিধ খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া নিম্নস্তরের ক্ষয়সাধন করিতে পারে। বৃষ্টির জল শিলাস্তরের ফাটল দিয়া ভূ-নিম্নে প্রবেশ করে এবং তথায় বিশুদ্ধ চূনাপাথরের স্তর থাকিলে, উহা জলে দ্রবীভূত হয়। ফলে ভূ-নিম্নে গুহার ও গহ্বরের সৃষ্টি

হয়। এই সকল গহ্বরের জন্য ভূমি বসিয়া যাইতে পারে। আর, এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর হয়। আবার, এইরূপ অঞ্চলে স্থানে স্থানে কখন কখন নদীর জল ফাটলপথে প্রবেশ করিয়া ভূ-নিম্নস্থ শিলার ফাটলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। আবার, কোন অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের অংশ-বিশেষ বিশুদ্ধ চুণাপাথরে গঠিত হইলে, এই সব অংশ জলে সহজে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইজন্য স্থানে স্থানে, ছোট-বড় গর্ত (sinks), ছোট-বড় নিম্নঅংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলে দেখা যায়। কোন বড় নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত হইলে, তাহার উপত্যকা থাকিতে পারে; তবে ছোট ছোট নদী-উপত্যকা দেখা যায় না। আর স্থানে, স্থানে ছোট-বড় উচ্চভূমি বা পাহাড় সামঞ্জস্যহীনভাবে রহিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার আড্রিয়াটিক উপকূলের নিকটস্থ ভূ-ভাগ কার্স্ট-অঞ্চল।

নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত সমভূমি (Plains of Stream Aggradation): বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ছোট-বড় জল-প্রবাহের দ্বারা এই ক্ষয়জাত পদার্থগুলি বাহিত হয় এবং জলপ্রবাহের স্রোতোবেগ যতই মন্দীভূত হইয়া আসে, ততই ঐ পদার্থগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। জলস্রোত-বাহিত এইরূপ ক্ষয়জাত পদার্থগুলিকে পলল (Alluvium) বলে। আর, সঞ্চিত হইবার কার্যের নাম অবক্ষেপণ। পললরাশির অবক্ষেপণের ফলে যে সমভূমি গঠিত হয়, তাহাকে পাললিক-সমভূমি (Alluvial Plane) বলে। উৎপত্তি-ভেদে পাললিক সমভূমিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) ব-দ্বীপ, (২) বন্যাগঠিত সমভূমি, (৩) পর্বতের পাদদেশের সমভূমি এবং (৪) প্রাচীন পাললিক-সমভূমি।

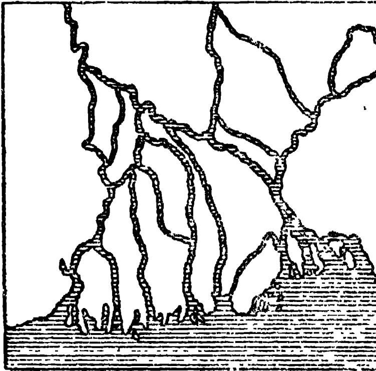
ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমভূমি (Delta Plains)—নদী-মোহনায় স্রোতোবেগ থাকে না বলিয়া নদী-বাহিত পললরাশি ভারের তারতম্যানুসারে প্রধানতঃ মোহনার নিকট স্থির জলের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়; ক্রমসঞ্চয়ের ফলে কালক্রমে সমুদ্র বা হ্রদের এই অংশে নূতন নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়। এইরূপভাবে জলের তলদেশে প্রচুর পললরাশির সঞ্চয়ের ফলে, যে নূতন ভূমির সৃষ্টি হয়, তাহাকে ব-দ্বীপ বলে। ব-দ্বীপে সাধারণতঃ প্রধান নদীর বহু শাখা-প্রশাখা নদী প্রবাহিত

হয়। নীল-নদের ব-দ্বীপের গঠন গ্রীক্ ভাষার অক্ষর ডেল্টা (Δ) ন্যায় বলিয়া, উহার নাম ডেল্টা। বাংলা ভাষায় এইরূপ আকৃতি মাত্রাহীন ব-এর ন্যায়;



নদীর মোহনায় পলল সঞ্চিত হইতেছে

এইজন্য বাংলা ভাষায় ইহাকে ব-দ্বীপ বলা হয়। পৃথিবীর বহু নদীর মোহনায় এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট নূতন ভূ-খণ্ড দেখা যায়; তাই, এই প্রকৃতির ভূ-খণ্ডকে ব-দ্বীপ বলে। আবার, সকল নদীর ব-দ্বীপে শাখানদী থাকে না। উত্তর-চীনের হোয়াং নদীর (হোয়াং হো, চীন ভাষায় নদীকে হো বলে) ব-দ্বীপে কোন শাখা-নদী নাই।



গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ

প্রত্যেক নদী ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিতে পারে না,—নদী উচ্চ স্থান হইতে সমুদ্রে পড়িলে বা নদীর মোহনায় সমুদ্রস্রোত বা প্রবল জোয়ার-ভাটা থাকিলে অথবা নদীর জলে পলল কম থাকিলে কিংবা মোহনার নিকটস্থ সমুদ্র গভীর হইলে নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ গঠিত হয় না। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ নাই; কারণ, এই নদী মালভূমি হইতে প্রবলবেগে অবতরণ করিয়া গভীর সমুদ্রে পড়িতেছে।

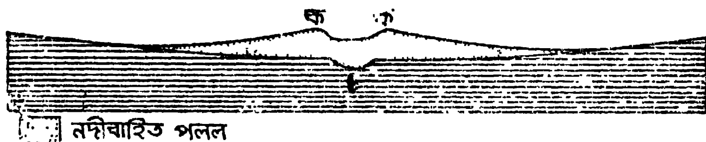
ব-দ্বীপ-অঞ্চলের সমভূমির প্রকৃতি—নদীর মোহনায় যে পললরাশি

সঞ্চিত হয়, তাহা প্রধানতঃ বিবিধ শিলার সূক্ষ্ম কণায় গঠিত। ইহা শুধু পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষয়জাত শিলার কণায় গঠিত নহে; কারণ নদীর গতিপথের যে অংশে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হয় তথায় পলল সঞ্চিত হয়; আবার হয়ত, নদী-প্রবাহ উহার ক্ষয় সাধন করে। তাই, নদীর প্রবাহ-পথের বিভিন্ন অংশে পুনঃপুনঃ ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ, এই উভয় প্রকার কার্যই চলে। তাই, নদী-প্রবাহ নদী-অববাহিকার বিভিন্ন অংশ হইতে পলল সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নদীমোহনায় পললগুলি সঞ্চয় করে। এইজন্য ব-দ্বীপ সূক্ষ্ম শিলকণায় অর্থাৎ বালুকা ও কাদায় গঠিত হয়।

ব-দ্বীপের ভূ-পৃষ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমতল। ইহা সাধারণতঃ সাগরতট অভিমুখে সামান্যভাবে ঢালু। আর, সাগরতটই সর্বাপেক্ষা নিম্নতম ভূমি। উপকূল-অংশ অতি ধীরে ধীরে গঠিত হয় বলিয়া ইহা অত্যন্ত নিম্নভূমি। এখানে রহিয়াছে জলাভূমি; নবগঠিত ও অতি-নিম্ন দ্বীপ (ঐগুলি জোয়ারের জলে প্লাবিত হয়); মধ্যে মধ্যে ছোট-বড় শাখা-নদী (দক্ষিণ-বঙ্গে ছোট ছোট শাখানদীকে খাল বলে)। আর, তটভূমির পার্শ্বের সমুদ্র অগভীর, কিন্তু বড় বড় শাখানদীর মধ্য দিয়া জোয়ার-ভাটা ভালভাবে চলে বলিয়া উহাদের মোহনার নিকট সমুদ্র অপেক্ষাকৃত গভীর। আবার, যে সকল শাখানদী দিয়া মূল নদীর মিঠা জল (Fresh water) প্রবাহিত হয় না, সেই শাখানদীর জল লবণাক্ত হইয়া যায় এবং ইহারা ক্রমশঃ মজিয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ সুন্দরবনের নদীগুলি উল্লেখ করা যায়।

বিশেষ কোন ঋতুতে পৃথিবীর অধিকাংশ নদীর বন্যা হয়। বন্যার সময় নদীর জলের পরিমাণ ও স্রোতোবেগ অধিক। তাই, তখন নদীর ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ, এই দুইটি কার্যই অধিক। ব-দ্বীপ নিম্নভূমি বলিয়া নদীর বন্যার জলে ইহা প্লাবিত হয় এবং বন্যার জল অপসারিতহইলে ভূমির উপর কাদা ও বালুকা সঞ্চিত হইতে পারে। সাধারণতঃ প্রধান নদী বা শাখানদীর কূলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পলল সঞ্চিত হইয়া এই অংশ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা ক্রমশঃ উন্নত (natural levee) হয়; আর, পার্শ্ববর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন বলিয়া ঐ স্থানের জল নিকাশ হয় না; ফলে ঐরূপ স্থানে জলাভূমি বা বিলের সৃষ্টি হয়। এইজন্য ব-দ্বীপে বহু জলাভূমি ও বিল দেখা যায়। আর এই অংশ উর্বর পলিমাটি হইতে বঞ্চিত হয়।

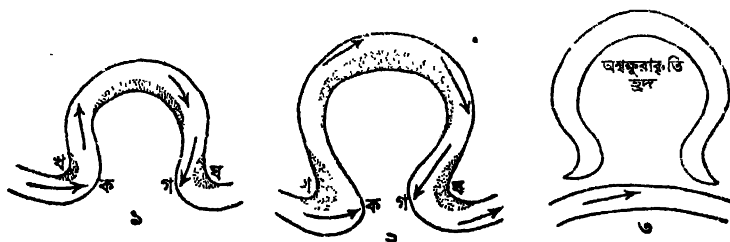
নদীর কূল অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি (natural levee) বলিয়া তথায় গ্রাম বা নগর গড়িয়া উঠে। বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীতীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া গ্রামগুলি নদীতীরে অবস্থিত। কখন কখন নদীর তীরে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া পার্শ্ববর্তী-নিম্ন-অঞ্চলকে বন্যা হইতে রক্ষা করা হয়। বন্যার জলের চাপে বাঁধ ভাঙ্গিলে ঐ অঞ্চলের



পলল সঞ্চিত হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা নদীর কূল উন্নত হইয়াছে

বিশেষ ক্ষতি হয়। এইক্ষেত্রে দামোদর নদের বাঁধ উল্লেখ করা যায়। নদীর কূলের 'লেভীর' বিস্তার ও উচ্চতা মোহনার দিকে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে এবং মোহনার নিকট লেভী গঠিত হয় না। ইহার বিস্তার ২।৩ মাইল হইতে ২।১ গজ এবং উচ্চতা ২০-২৫ ফুট হইতে ২।১ ইঞ্চি হইতে পারে। লেভীর অপর পার্শ্ব ক্রমনিম্ন হইয়া নিম্নভূমির সহিত মিশিয়া যায়। আবার, নদীর কূল উচ্চ থাকায় উপনদীগুলি বাধ্য হইয়া ইহার সহিত অনেক দূর পর্যন্ত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া পরে মূল নদীর সহিত মিলিত হয়। দামোদর নদের নিম্ন-অংশ এই ভাবে প্রবাহিত।

সমভূমির উপর নদী-প্রবাহ মন্দীভূত। যে অংশে নদীর স্রোতোবেগ গতি-



নদীর বক্রগতি ধারণ এবং উহার বক্র-অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদে পরিণত হইয়াছে

মন্থর, সেখানে বালুকা ও কাদা সঞ্চিত হয়। যে-কূলে স্রোতোবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক সেই কূল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আর বিপরীত কূলে স্রোতোবেগ মন্দীভূত বলিয়া

পলি সঞ্চিত হইয়া চরের সৃষ্টি হয়। এইভাবে নদী বক্রগতি ধারণ করে (Meander)। নদীর এইরূপ প্রবাহপথে কখন কখন ঐরূপ বাঁকের মধ্যবর্তী অংশ অপ্রশস্ত হইয়া যায়; আর, এই অপ্রশস্ত ভূ-খণ্ডের উভয় পার্শ্বদেশ নদীর স্রোতোবেগে ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে এবং অবশেষে ঐ অপরিসর ভূমি ভেদ করিয়া নদী সোজাপথে প্রবাহিত হয়; ফলে বিচ্ছিন্ন পূর্বতন নদী-খাতটি অশ্বা-ক্ষুরাকৃতি হ্রদে (Ox-bow Lake or Cut-Off) পরিণত হয়। আবার, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদগুলি ক্রমশঃ পলি সঞ্চিত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য হ্রদগুলি লুপ্ত হইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন। এইজন্য ব-দ্বীপে বহু ছোট-বড় নবীন বা প্রবীণ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এইরূপ হ্রদ ও জলাভূমি রহিয়াছে।

প্রধান নদী ও শাখানদীর মোহনায় পললরাশি সঞ্চিত হওয়ায় ব-দ্বীপ সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয় অর্থাৎ ব-দ্বীপ সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হয়। ইহার ফলে নদীর গর্ভদেশের ঢাল কমিয়া যায়। তাই, নদীর স্রোতোবেগ আরও মন্দীভূত হইয়া যায়। এইজন্য নদী-বাহিত পললরাশি নদীগর্ভে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় নদীর তলদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হয়। তখন নদীর জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করে, ফলে পললরাশি প্লাবিত অঞ্চলে ছড়াইয়া যায়। আবার, এইরূপক্ষেত্রে কখন কখন নূতন ধারাপথ সৃষ্টি করিয়া নদী প্রবাহিত হয়। দামোদর নদের নিম্ন-অংশে পলল-সঞ্চয়নের জন্য বর্ধমানের কিছু দক্ষিণ হইতে নূতন নূতন ধারাপথ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার বন্যার জল রূপনারায়ণ নদে পড়িতেছে। ব-দ্বীপ-অংশে প্রধান নদী এইভাবে বহু শাখানদীতে বিভক্ত হইয়া যায় ও উহারা বিভিন্ন ধারাপথে সমুদ্রে পতিত হয়। তাই, উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নদী-মোহনা থাকে।

ব-দ্বীপ পাললিক সমভূমি বলিয়া ইহার মৃত্তিকা উর্বরা। ইহা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। এইজন্য পৃথিবীর বহু ছোট-বড় ব-দ্বীপ ঘনবসতিপূর্ণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ, চীনের হোয়াং নদীর ব-দ্বীপ, মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বন্যাগঠিত সমভূমি (Flood plains)—পার্বত্য অঞ্চলে নদী খরস্রোতা। প্রবল স্রোতোবেগে এই অংশের নদীর তলদেশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে নদী গিরিখাত সৃষ্টি করে ও নদীর তলদেশের ঢাল ক্রমশঃ কমিয়া যায়। আর, জলধারা গিরিখাতের গাত্র বাহিয়া নদীতে পড়ে বলিয়া ঐ অংশের শিলা ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কার্যের জন্য গিরিখাত ক্রমশঃ ইংরাজি V-অক্ষরের মত উপত্যকা সৃষ্টি করে। উহাকে নদী-উপত্যকা বলে। এই উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ বক্র আকারের। তাই, এইরূপ উপত্যকায় প্রবাহিত নদীর গতিপথও বক্র আকারের। বক্রগতি নদীর স্রোতোবেগ এক পার্শ্বে অধিক এবং বিপরীত পার্শ্বে কম থাকে, কারণ বাঁকগুলি পর্যায়ক্রমে নদীর অধিকাংশ জলকে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চালিত করে। এইজন্য নদীর স্রোতোবেগ যে কূলে অধিক, সেই কূল অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বিপরীত পার্শ্বে স্রোতোবেগ মন্দীভূত বলিয়া তথায় পলল সঞ্চিত হয়। এক কূল খাড়া এবং অপর কূল ঢালু হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নদীর উভয় কূল বা উপত্যকার পার্শ্বদেশের শাখা-শৈলশিরাগুলি (Spars) ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ নদী-উপত্যকা প্রশস্ত হয় এবং উপত্যকার উভয় পার্শ্বদেশ পরস্পর মোটামুটিভাবে সমান্তরাল থাকে। আর, সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার তলদেশে পললরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে পাললিক সমভূমি গঠিত হয়। উপত্যকা যতই প্রাচীন হইতে থাকে উপত্যকার পার্শ্বদেশ ততই দূরে দূরে সরিয়া যায় এবং উভয় পার্শ্বদেশ আর সমান্তরাল থাকে না। এইরূপ সমভূমিকে বন্যাগঠিত সমভূমি বলে। তাই, ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ, এই উভয় প্রকারের কার্যের ফলে এইরূপ সমভূমির সৃষ্টি হয়।

বন্যাগঠিত সমভূমিতে নদী সোজাপথে প্রবাহিত হয় না। নদী বক্রগতি ধারণ করে। ইহার জন্য এখানে কালক্রমে ছোট-বড় অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। তাই, এইরূপ সমভূমিতে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। নদীর গতিপথের এই অংশে নদীর গর্ভদেশের ঢালও কমিয়া যায়; ফলে ইহা নদীর গতিপথের মধ্য-অংশ। ইহার পরবর্তী অংশই নদীর ব-দ্বীপ। ময়ূরাক্ষী নদী

সিউড়ীর পর বন্যাগঠিত সমভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। তাই ইহার পরবর্তী অংশ ময়ূরাক্ষীর মধ্যবর্তী। এই অংশে শাখানদী, বিল, জলাভূমি প্রভৃতি রহিয়াছে। পরবর্তী অংশ ইহার ব-দ্বীপ। এইভাবে বর্ধমান শহরের পরবর্তী অংশেই দামোদর নদের ব-দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। দুর্গাপুর হইতে ইহার বন্যাগঠিত সমভূমি সুরু হইয়াছে।

ভূ-আলোড়ন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণবশতঃ নদীর স্রোতোবেগ বৃদ্ধি পাইলে, নদী পুরাতন বন্যাগঠিত সমভূমি ক্ষয় করিয়া নূতন নদী-উপত্যকা সৃষ্টি করে। এই নবগঠিত উপত্যকা কালক্রমে বন্যাগঠিত সমভূমিতে পরিণত হয় এবং উহার উভয় পার্শ্বস্থ পূর্বতন বন্যাগঠিত সমভূমি অপেক্ষা কিছু নিম্নে অবস্থান করে। পূর্বতন বন্যাগঠিত সমভূমিকে, **বন্যাগঠিত সমভূমির সোপান** (Floodplain Terraces) বলে।

পর্বতের পাদদেশে পাললিক সমভূমি (Piedmont Alluvial Plains and Fans)—উচ্চ পার্বত্যভূমি হইতে নিম্নভূমিতে নদী দ্রুত অবতরণ করিলে স্রোতোবাহিত ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালি, কাদা নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়; কারণ নদীর গর্ভদেশের ঢাল হঠাৎ খুব কমিয়া যায় বলিয়া স্রোতোবেগ দ্রুত মন্দীভূত হয়। ক্রম-সঞ্চয়নের ফলে নদী ক্রমশঃ মজিয়া যায় এবং নদী কূলের পার্শ্ববর্তী ভূমি প্লাবিত করে। এইজন্য ভূমির উপর পললরাশি সঞ্চিত হয়; আর, নদী নূতন ধারাপথে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইভাবে, নদী বহুবার ধারাপথ পরিবর্তন করে। আবার, কখন কখন নদী বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। হয়ত শাখাগুলি মিলিত হইয়া একই ধারায় প্রবাহিত হয়। এইভাবে ভারতের তিস্তা, কুশী প্রভৃতি নদীর প্রবাহপথ বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে পার্বত্যভূমির পাদদেশে নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা এক পাললিক সমভূমি গড়িয়া উঠে। 'এই প্রকৃতির সমভূমিকে পর্বতের পাদদেশের পাললিক সমভূমি বলে। আবার, একই অঞ্চলে ছোট-বড় অনেকগুলি নদী পার্বত্যভূমি হইতে দ্রুত অবতরণ করিতে পারে। ইহারা প্রত্যেকেই পর্বতের পাদদেশে উল্লিখিতভাবে পাললিক সমভূমি গঠন করিতে পারে।

এইরূপ ক্ষেত্রে ছোট-বড় এইভাবে গঠিত পাললিক সমভূমিগুলি পরস্পর মিলিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সে, পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশের হিমালয়ের পাদদেশেও এইরূপ সমভূমি আছে। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স-অঞ্চলে নদীগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে—যখন ধারাপথের পরিবর্তন হয়, তখন কখন কখন নূতন নূতন শাখানদীর উৎপত্তি হয় ইত্যাদি।

সমভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্বে নদী অত্যন্ত খরস্রোতা থাকে বলিয়া ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড, বালি, কাঁকর প্রভৃতিও স্রোতের দ্বারা বাহিত হয়। এইজন্য পর্বতের পাদদেশের পাললিক সমভূমি মৃত্তিকা, নুড়ি, কাঁকর ও বালুকাপূর্ণ। তাই, এইরূপ প্রকৃতির মৃত্তিকায় জল সহজে বসিয়া যায় এবং উহা কৃষিকার্যের উপযোগী নয়। উত্তরপ্রদেশে ইহাকে 'ভাবার' (Bhabar) বলে। পার্বত্যভূমি হইতে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমিতে ছোট ছোট নদী অবতরণ করিলে, কখন কখন ঐ সকল নদী এই অঞ্চলে লুপ্ত হইয়া যায় এবং উহার জল ভূ-নিম্নে চুয়াইয়া চুয়াইয়া বহিয়া চলে; তারপর ঐরূপ প্রকৃতির সমভূমি অতিক্রম করিলে, আবার নদী আকার প্রাপ্ত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি রহিয়াছে।

শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে অধিক উচ্চভূমি হইতে নিম্নসমভূমিতে নদী দ্রুত অবতরণ করিলে ঐ স্থানে পললরাশি ভূমির উপর ছড়াইয়া পড়ে এবং এক বিশিষ্ট আকারের পাললিক সমভূমির সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলের ভূমি অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া মৃত্তিকায় নদীর জল শোষিত হইয়া যায়। তাই, সমভূমির উপর নদী অবতরণ করিবার পর ধারাপথ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য নদীবাহিত শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালুকা ও কাদা ভারের গুরুত্ব অনুযায়ী পর পর সঞ্চিত হয়। আর, এই পাললিক ভূমির আকৃতি কতকটা ত্রিভুজের মত,—যে স্থানে নদী সমভূমিতে অবতরণ করে, সেখানেই ত্রিভুজের শীর্ষদেশ; যতদূর পর্যন্ত পললরাশি বিস্তার লাভ করে তাহাই, ত্রিভুজের ভূমি বলা যায়; তবে, এই রেখা বৃত্তের মত। তাই, ইহার আকার হাত-পাখার আকৃতিবিশিষ্ট (Fan)। পর্বতের পাদদেশ হইতে এই ভূমি ক্রমনিম্ন। শুষ্ক অঞ্চলে এইরূপ ভূমির নিম্নে

জল পাওয়া যায় বলিয়া জল-সেচ করিয়া এখানে কৃষিকার্য হইতে পারে। তুরানের তাসখন্দ নগর এইরূপ পাললিক সমভূমিতে অবস্থিত।

ডাঙ্গা বা মাটির তৈয়ারী উচ্চ রাস্তা বা বাঁধের গা দিয়া বৃষ্টি জল গড়াইয়া নীচে পড়িলে পাখার আকারের মত পলি বাঁধের নীচে জমে; তাহা তোমরা লক্ষ্য করিতে পার।

এক বিশিষ্ট প্রকৃতির ব-দ্বীপ (Delta-Fans)—কখন কখন উচ্চ-পার্বত্যভূমি হইতে অগভীর সমুদ্রে নদী দ্রুত অবতরণ করে। উপকূল পার্শ্বে উচ্চ পার্বত্যভূমি থাকিলে এইরূপ দেখা যায়। নদীর জলে প্রচুর পলি থাকিলে, ইহা ব-দ্বীপ গঠন করে। ফলে পার্বত্যভূমির পাদদেশে নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়। তখন নদী নবগঠিত নিম্নভূমির উপর হাতাপাখার আকারবিশিষ্ট সমভূমি (Fan) গঠিত করে; কারণ নদীর স্রোতোবেগ দ্রুত মন্দীভূত হইয়া যায়। ব-দ্বীপ-ও ফ্যান, এই দুই প্রকৃতির ভূমি-গঠন একসঙ্গে চলে। এইরূপ প্রকৃতির ভূ-ভাগকে ব-দ্বীপ-ফ্যান (Delta-Fan) বলে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো নদীর ব-দ্বীপ, নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ-দ্বীপের ক্যাণ্টারবারী সমভূমি, স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার নিম্নভূমি, এইরূপে গঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপের অংশবিশেষ এইভাবে গঠিত হইয়াছে।

বেসিন-সমভূমি (Basin Plains)—অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি বেষ্টিত সরার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ভূ-ভাগকে বেসিন বলে। জলপ্রবাহের দ্বারা পার্শ্বস্থ উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পরে বেসিনের নিম্নঅংশে ক্ষয়জাত পদার্থ অর্থাৎ পলি সঞ্চিত হয়। এইভাবে এই অংশে পাললিক সমভূমি গড়িয়া উঠে। ইহাকে বেসিন-সমভূমি বলে। এই অঞ্চল হইতে জলনিকাশ হইতে পারে না বলিয়া ইহার নিম্নতম অংশে সাধারণতঃ অগভীর জলাশয় বা জলাভূমি দেখা যায়। আর, শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের এইরূপ জলাশয়ের জল সাধারণতঃ ক্ষারক (alkali flats)।

প্রাচীন পাললিক সমভূমি (Plains of Older Alluvium)—বহু পূর্বে পললরাশির দ্বারা এই সকল সমভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। নূতন পাললিক সমভূমি (যথা—ব-দ্বীপ বা বন্যাগঠিত সমভূমি) হইতে ইহার ভূ-প্রকৃতি ও

মৃত্তিকার প্রকৃতির অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। (ক) বিশেষতঃ আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলের এইরূপ সমভূমির মৃত্তিকার জৈব পদার্থ (humus) জলে দ্রবীভূত হইয়া অপসারিত হইয়া যায়। এইজন্য এই অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি সামান্য। (খ) বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই প্রকৃতির সমভূমির স্থানে স্থানে মৃত্তিকা কতকটা জমাট বাঁধিয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন পাললিক সমভূমির স্থানে স্থানে কাঁকর গঠিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী-মহকুমার স্থানবিশেষে এইভাবে গঠিত ঘুঁটিং দেখা যায়। (গ) ব-দ্বীপের নদীর কূল অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি। স্থানে স্থানে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, শাখানদী প্রভৃতি এইরূপ সমভূমিতে দেখা যায় না। আর, নদী পূর্বতন ধারাপথ ত্যাগ করিয়া হয়ত নূতন ধারাপথে প্রবাহিত। প্রাচীন পাললিক সমভূমির নদীগুলি পূর্বতন সমভূমির মধ্যে নূতন নদী-উপত্যকা সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হয়। ঐ উপত্যকায় নদী বক্রগতি ধারণ করিয়া আর একটি নূতন বন্যাগঠিত-পাললিক-সমভূমি গঠন করে। আর, প্রাচীন পাললিক সমভূমির ক্ষয়সাধন হইতে থাকে। তাই, এখানে অবক্ষেপণ অপেক্ষা ক্ষয়সাধন-কার্যই অধিক। এইজন্য ইহার ভূ-পৃষ্ঠের রূপের অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হয়। নবগঠিত সমভূমি অপেক্ষা প্রাচীন সমভূমি কিছু উচ্চে অবস্থিত। ঐ উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে জলধারা নামিবার জন্য উচ্চভূমির প্রান্তভাগে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয় এবং ঐ অংশ বন্ধুর হইয়া যায় (Gullied bluffs)।

প্রাচীন পাললিক সমভূমি যে, পলল দ্বারা গঠিত, তাহা নানাভাবে পরীক্ষা করা যায়। ইহার ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর বা সামান্যভাবে উন্নত-অবনত হইতে পারে। যেভাবে গঠিত হউক না কেন, ইহার ভূমির নিম্নস্থ অংশ কাদা ও বালির বিবিধ স্তরের দ্বারা গঠিত। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের সমভূমি প্রাচীন পাললিক সমভূমি। এখানে স্থানে স্থানে হাজার ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া পলল সঞ্চিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী দুইটি নদীর মধ্যস্থ অংশ বা দোয়াব (Doabs) প্রাচীন পাললিক সমভূমি। দোয়াবের ভূ-পৃষ্ঠ সমতল, এইজন্য এখানে খালপথে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচন করা সুবিধা। তাই, দোয়াবগুলি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। গঙ্গা ও যমুনা

এখানে নদীগুলি সংকীর্ণ নিম্নভূমি বা খাদার (Khadar) সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত। ঐ নিম্নভূমি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির সংযোগস্থলে বা দোয়াবের প্রান্তদেশের ভূমি স্থানে স্থানে বন্ধুর (Gullied bluffs)। যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে চম্বল নদীর খাদারের পার্শ্ববর্তী ভূমি বিশেষ-ভাবে বন্ধুর (Chos-country)। ইহাই চম্বলের ব্যাড্‌ল্যাণ্ড। বর্ধমান-বিভাগের কতকাংশের ভূমি (রাঢ়-অঞ্চল) প্রাচীন পাললিক সমভূমি। এখানেও নদীর উচ্চ কূলের পার্শ্বদেশের ভূমি ছোট ছোট নালায় পূর্ণ ও উঁচুনীচু (Gullied bluffs)। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের রকি-পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত উচ্চ-সমভূমি (High Plains) প্রাচীন পাললিক সমভূমি।

শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের সমভূমি (Plains in Dry Climates) **: মরু-ভূমি-অঞ্চলের সমভূমি**—ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণের ফলে মরুভূমির সমভূমি গঠিত হইলেও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলের সমভূমি হইতে এই অঞ্চলের সমভূমির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ,—(ক) আর্দ্র অঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় ; (খ) শুষ্ক অঞ্চলের ভূমির উপর উদ্ভিজ্জ থাকে না বলিয়া ইহার প্রায় সকল অংশের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কারণ উদ্ভিজ্জ ভূমির ক্ষয় নিবারণ করে ; (গ) মরুভূমি অঞ্চলে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না বটে, কিন্তু সময় সময় অতিবর্ষণ হইতে পারে, তখন অস্থায়ী জলধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া যায় কিন্তু জল শীঘ্র শুকাইয়া যায় ; (ঘ) মরুভূমির অস্থায়ী জলধারার ক্ষয়কার্য এক বিশিষ্ট প্রকৃতির ; (ঙ) ইহার জলপ্রবাহগুলি সাধারণতঃ অন্তর্বাহিনী ; এবং (চ) বায়ুর কার্যের দ্বারা ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের বিশিষ্ট প্রকৃতির রূপ পায়। মরুভূমি-অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ প্রধানতঃ বায়ুর কার্যেরই ফলে পরিবর্তিত হয়।

ক্ষয়সাধনের ফলে মরুভূমির ভূ-পৃষ্ঠের রূপ—মরুভূমির জলবায়ু শুষ্ক ও বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত কম। এইজন্য এখানে যান্ত্রিক বা রাসায়নিক উপায়ে শিলার ক্ষয়সাধন কম। তবে, এখানে রাসায়নিক উপায়ে ক্ষয়সাধন অপেক্ষা যান্ত্রিক উপায়ে ক্ষয়-সাধন অপেক্ষাকৃত বেশী। মরুভূমির ভূ-পৃষ্ঠ উদ্ভিজ্জশূন্য বলিয়া শিলার উপর

কোন আবরণ নাই। তাই, ইহার ভূ-পৃষ্ঠকে নগ্ন বলা যায়। এইজন্য এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের শিলার প্রত্যেক ফাটল বা দুইটি শিলার সংযোগস্থলের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং শিলার পৃষ্ঠদেশের উপর বায়ু ও তাপের ক্রিয়া ঘটিতে পারে। এইজন্য ক্ষয়সাধনের ক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিলেও ভূ-পৃষ্ঠের সকল অংশে দিবারাত্রি এই ক্রিয়া অবিরামভাবে সংঘটিত হয়। তাই, সমষ্টিগত ক্ষয়কার্যের ফল অধিক। আর, ক্ষয়জাত শিলাকণাকে বায়ুপ্রবাহ অপসারিত করে। তাই, ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়প্রাপ্ত-অবস্থা সর্বদাই নবীন—মনে হয়, কিছু সময় পূর্বেই যেন শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে;—শিলাস্তরের ফাটল, সংযোগস্থল, পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তর প্রভৃতি এখানে সর্বদাই বর্তমান।

মরুভূমি-অঞ্চলের অস্থায়ী বা সবিরাম জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়সাধনের ফলাফল ঃ উপত্যকার ও সমভূমির উৎপত্তি—আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলে বৃষ্টির জল এবং নদী-বেসিনের ভূ-নিম্নস্থ জল, যথা—ঝরণা ও চুয়ান জল লইয়া নদীর সৃষ্টি হয়। তাই, এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদীই নিত্যবহা। নদী-প্রবাহের দ্বারা শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের রূপের পরিবর্তন ঘটে এবং অবশেষে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মরু-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না বটে, কিন্তু কোন কোন বৎসরে কোন এক সময়ে হয়ত প্রবল বর্ষণ হইতে পারে বিশেষতঃ মরুভূমির উচ্চ পর্বতমালায়। তখন অস্থায়ী জলপ্রবাহ ও নদীর সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পরে নদীপ্রবাহ আর থাকে না; কারণ জল শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

মরুভূমির পার্বত্যভূমির ভূ-পৃষ্ঠ উদ্ভিজ্জশূন্য বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি নগ্ন। তাই, এখানে বৃষ্টির জল শোষিত হয় না। এইজন্য, পার্বত্যভূমিতে বৃষ্টিপাত হইলে প্রায় সমস্ত বৃষ্টির জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়জাত শিলার ছোট-বড় খণ্ডগুলিও জলস্রোতের সহিত বাহিত হয়। ফলে পার্বত্যভূমি হইতে নিম্নে উপত্যকায় শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালি ও কিছু কাদা লইয়া নদী অবতরণ করে। তাই, নদীর জলে প্রচুর পলল থাকে। আবার, উপত্যকার ভূমি বালি ও ধূলায় পূর্ণ। উপত্যকায় নদী প্রবাহিত হইবার সময় এই সকল বালি ও ধূলা ধুইয়া লয়;

ফলে নদীর জলে এই সকল ক্ষয়জাত পদার্থ এত অধিক পরিমাণে থাকে যে, নদীর স্রোতোবেগ অত্যন্ত মন্দীভূত হয়। এইজন্য উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে নামিলে নদীর জল বিস্তৃত হইয়া যায় এবং পললরাশি ছড়াইয়া পড়ে। শুষ্ক বায়ুর জন্য জলের বাষ্পীভবন অধিক বলিয়া জল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়; আর অধিক পলল থাকায় নদীর জলের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং ক্রমশঃ নদীপ্রবাহ লুপ্ত হয়। এইভাবে কালক্রমে নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা পার্বত্যভূমির পাদদেশে ছোটবড় শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালি ও মাটির দ্বারা পাললিক সমভূমি গঠিত হয়।

মরুভূমির ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশের উপর দিয়া নদীপ্রবাহ থাকে, তথায় এক বিশিষ্ট প্রকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি হয়। নদীপ্রবাহের দ্বারা উপত্যকার তলদেশ বিশেষ ক্ষয় হয় না, কেবল মাত্র পার্শ্বদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর, উপত্যকার তলদেশে পাললিক ভূমি গঠিত হয়। এইজন্য এই প্রকৃতির উপত্যকার তলদেশ সমতল ও প্রশস্ত এবং উহার পার্শ্বদেশ উচ্চ। উপত্যকার মৃত্তিকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা, আবার, মরুভূমির প্রবল বায়ুপ্রবাহের ফলে অপসারিত হয়। সাহারা মরুভূমির এইরূপ শুষ্ক উপত্যকাকে ওয়াদি (Wadi) বলে। এইরূপ উপত্যকার স্থানে স্থানে কূপ খনন করিলে জল পাওয়া যায়। এইজন্য ওয়াদির মধ্য দিয়া লোকেরা মরুভূমি অতিক্রম করে। আবার, কোন কোন ওয়াদিতে মরুদ্যান দেখা যায়। লক্ষ্য কর, এইভাবে মরুদ্যানের সৃষ্টি হইতে পারে।

মরুভূমির পর্বতের যে পার্শ্ব দিয়া নদী অবতরণ করে, ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণের ফলে সেই পার্শ্বদেশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া যায় এবং অপর পার্শ্বদেশ খাড়াখাড়িভাবে থাকে। বহু যুগ ধরিয়া এইরূপ নদীর কার্য চলে। কালক্রমে পর্বত প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পেনিপ্লেনে পরিণত হয়। ক্ষয়কার্যের মধ্য-অবস্থায় এইরূপ অঞ্চলে দেখা যায়, বহু সমতল শীর্ষদেশবিশিষ্ট পাহাড়, উহার এক পার্শ্ব সুউচ্চ ও অপর পার্শ্ব ঢালু, আর উহা ব্যবচ্ছিন্ন এবং উহাদের মধ্যে রহিয়াছে সমতলবিশিষ্ট প্রশস্ত উপত্যকাসমূহ। বর্তমান যুগে সাহারায় যে সকল পেনিপ্লেনের ভূপৃষ্ঠ শিলাময়, সেইগুলি এক যুগে পার্বত্যভূমি ছিল। সাহারায় স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ শিলাময়-সমভূমিও রহিয়াছে। ইহাদিগকে **হামাদা** বলে। এই স্থানে

মরূদ্যান বা কূপ থাকে না; তাই, ইহা মরুভূমিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মরুময়। পার্বত্যভূমি বা পেনিপ্লেন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া হামাদার সৃষ্টি হইয়াছে।

মরুভূমির অংশবিশেষে যত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হউক না কেন (মরুভূমিতে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না, তবে কোন কোন বৎসরে কোন এক সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত হইতে পারে।) মরুভূমির নদী সাধারণতঃ সাগরে পতিত হয় না। এইজন্য ইহারা দেশাভ্যন্তরস্থ নদী। এই অঞ্চলের নদীগুলি অববাহিকার বা বেসিনের নিম্নতম অংশে পৌঁছাইতে পারে। মরুভূমির শুষ্ক বায়ুর জন্য জল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। এই নিম্নতম-অংশে পললরাশি সঞ্চিত হয়, ফলে ইহার পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। আর, উহার পার্শ্বদেশে পাললিক ফ্যান (Fan) দেখা যায়। এইরূপ শুষ্ক বেসিনেব নিম্নতম অংশকে বলসন্ (Bolson) বলে। কোন কোন বেসিনেব নিম্নতম অংশে অস্থায়ী জলাভূমি বা হ্রদ বর্তমান থাকে। যে হারে জলের বাষ্পীভবন হয়, ঠিক সেই হারে এখানে নদীর দ্বাবা জল নীত হইলে এইরূপ জলাভূমি বা হ্রদের সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ জলাভূমি বা হ্রদের জল লবণাক্ত। নদী শুকাইলে হ্রদের জলও শুকাইয়া যায়। তখন হ্রদের তলদেশে লবণাক্ত কাদা বা মৃত্তিকা দেখা যায়। এখানে ক্ষার লবণও (alkalies) থাকে। এইরূপ হ্রদকে **'প্লেয়া'** (Playa) বলে। কোন কোন স্থানে স্থায়ী লবণাক্ত জলের হ্রদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কাম্পিয়ান, আরল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার আয়ার হ্রদও এই প্রকৃতির। ভারতের সম্বর হ্রদের জল লবণাক্ত। এই স্থানে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়।

মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর কার্য ও সমভূমির উৎপত্তি—মরুভূমিতে বৃক্ষাদি থাকে না বলিয়া বায়ু সজোরে প্রবাহিত হয়, কারণ বৃক্ষাদি বায়ুপ্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রবাহ দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিলার ক্ষয়সাধন করে। ভূ-পৃষ্ঠের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলাকণা বা ধূলি, বালি প্রভৃতি (ধূলি ও বালি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলা-কণা) এমন কি কাঁকর, ছোট ছোট নুড়ি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উত্তোলিত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। এই কার্যকে **ডিফ্লেসন** (Deflation) বলে। আবার, প্রবল বায়ুপ্রবাহ-বাহিত বালুকাকণার

ঘর্ষণে শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত (wind abrasion) হয়। এই ক্ষয়জাত শিলাকণাগুলিকে বায়ুপ্রবাহ অপসারিত করে। ইহার ফলে বড় বড় মরুভূমির এক বিস্তীর্ণ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ বড় বড় কাঁকর ও ছোট-বড় প্রস্তর-খণ্ডপূর্ণ সমভূমিতে পরিণত হয় (desert parement)। সাহারা মরুভূমির এইরূপ ভূ-ভাগকে রেগ (reg) বলে। নুড়ি ও কঙ্করপূর্ণ ভূমির নিম্নে মৃত্তিকা থাকিলে তথায় কিছু কিছু মরু-অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ (Zerophytes) জন্মে।

শুষ্ক অঞ্চলে ভূ-ভাগও এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যে ধূলি-ঝড় বহে, তাহার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ধূলিকণা অপসারিত হইয়া অন্যত্র সঞ্চিত হয়। আবার, শুষ্ক কর্ষিত-কৃষিক্ষেত্রের উর্বর-মৃত্তিকাও প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা অপসারিত হইলে ক্ষেত্রের উর্বরতা-শক্তি কমিয়া যায়। সমুদ্র-উপকূলে বা মরুভূমিতে এইভাবে বালুকা-স্তূপ বা বালিয়াড়ি গঠিত হয়। আর, এই প্রকারে মরুভূমির বালুকারাশি ইহার প্রান্তভাগের উর্বর ভূমিতে সঞ্চিত হইলে মরুভূমি প্রসারিত হয়।

মরুভূমির কোন বেসিনের নিম্নতম অংশে অস্থায়ী হ্রদ প্লায়া (Playa) থাকিতে পারে। নদীবাহিত মৃত্তিকা এখানে সঞ্চিত হইতে পারে। এইরূপ হ্রদ শুকাইলে ইহার তলদেশের মৃত্তিকা ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ধূলিকণা অন্যত্র বহুদূরে অপসারিত হইতে পারে। তাই, শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানতঃ বায়ু-প্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন হয়।

বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট বালুকাপূর্ণ সমভূমি (Aeolian Sand Plains)—বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বাহিত বালুকা পরে, আবার ভূ-পৃষ্ঠে অস্থায়িভাবে বা স্থায়িভাবে সঞ্চিত হয়। কারণ, সঞ্চিত বালুকারাশি পুনরায় বায়ুপ্রবাহের দ্বারা অপসারিত হইতে পারে কিংবা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বালুকারাশি জমাট বাঁধিয়া কালক্রমে বেলেপাথরে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবীর বহু অংশে বায়ুপ্রবাহ-বাহিত বালুকারাশির দ্বারা বেলেপাথর গঠিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন আছে।

বায়ুপ্রবাহ-বাহিত বালুকারাশি কোথাও অস্থায়িভাবে সঞ্চিত হইয়া বালুকাময় ভূমি গঠন করে; ঐরূপ স্থান হইতে বালুকারাশি পুনরায় বায়ুপ্রবাহের দ্বারা অপসারিত হইতে পারে। মরুভূমির বেলেপাথর বা অন্যজাতীয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত

হইয়া বালুকায় পরিণত হয়। এইভাবে বালুকাময় ভূমিও গঠিত হইতে পারে। তবে, বড় বড় মরুভূমির সাধারণতঃ এক-চতুর্থাংশের অধিক ভূ-পৃষ্ঠ বালুকাময় নহে। মরুভূমির বালুকাময় ভূমি বহু বালিয়াড়ি ও তন্মধ্যস্থ নিম্নঅংশ লইয়া গঠিত; তাই, ইহাকে মহাসাগরের তরঙ্গময় পৃষ্ঠের মত দেখায়।

বালিয়াড়ি এবং বালুকা-পাহাড়পূর্ণ মরু-অঞ্চল (Sand-ridge, Sand dune Areas)—বায়ুপ্রবাহের বেগ মন্দীভূত হইলে কিংবা বায়ুপ্রবাহ শিলাস্তূপ, ঝোপ, উন্নত-অবনত ভূমি বা অন্য কিছুর বাধা পাইলে, বায়ুপ্রবাহ-বাহিত বালুকারাশি স্তূপাকারে তথায় সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ি গঠন করে। অতি-শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলে, যথায় প্রচুর বালি আছে এবং সেখানে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, তথায় ১০০ ফুট উচ্চ বালিয়াড়ির সৃষ্টি হইতে পারে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে (লিবিয়ার মরুভূমি) ৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ বালিয়াড়িও দেখা যায়। আবার, আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলের সমুদ্র-উপকূলে প্রচুর বালি থাকিলে এবং ইহা উদ্ভিজ্জশূন্য হইলে, এইরূপ স্থানে বালিয়াড়ি গঠিত হইতে পারে।

নদীর বন্যার জল অপসারিত হইবার পর বালুকা-চরে যে ভাবে ঢেউ-এর মত গঠন-বিশিষ্ট ইহার পৃষ্ঠদেশ গঠিত হয়, মরুভূমির বালিয়াড়ির গঠনও সেরূপ। বালুকা-চরের ঢেউ-আকৃতির ভূমির পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া বুঝা যায়, জলস্রোতের গতির দিক। মরুভূমিতে যে দিক হইতে বায়ু বহিয়া আসে, বালিয়াড়ির সেই প্রতিবাত পার্শ্ব ঢালুভাবে এবং যে দিকে বায়ু বহিয়া যায়, বালিয়াড়ির সেই অনুবাত পার্শ্ব খাড়াভাবে অবস্থান করে। কারণ বায়ুপ্রবাহ বালিয়াড়ির প্রতিবাত পার্শ্বের বালুকা অপসারিত করে এবং উহার শীর্ষদেশে সঞ্চিত করে। আর, শীর্ষদেশের বালুকা অনুবাত পার্শ্বগাত্র বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

বালিয়াড়িগুলি সাধারণতঃ ধীরে ধীরে প্রবাহিত বায়ুর গতিপথ অনুসরণ করে। ইহার কারণ, বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রতিবাত পার্শ্বের বালুকা অপসারিত হইতেছে এবং অনুবাত পার্শ্বে সঞ্চিত হইতেছে। সমুদ্র-উপকূলের বালিয়াড়িগুলি এইভাবে উপকূল হইতে অভ্যন্তর দিকে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে, হয়ত, উর্বর ভূমি

বালুকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সাহারার বালিয়াড়িপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলকে **আর্গ** (Erg) বলে।

পূর্ব-সাহারার লিবিয়ার আর্গে কোনই উদ্ভিজ্জ জন্মে না, কারণ এই অঞ্চলে জল একেবারেই পাওয়া যায় না। আবার, সকল স্থানের আর্গ এই প্রকৃতির নহে, বালিয়াড়িপূর্ণ মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হইলে বৃষ্টির জল শীঘ্র শীঘ্র বালুকারাশি শোষণ করে; তাই এখানে বাষ্পীভবনের দ্বারা জল অপসারিত হয় না, বরং বালুকার নিম্নস্তরে জল সঞ্চিত হয়। এইরূপ অঞ্চলের নিম্নঅংশে কূপ খনন করিলে জল পাওয়া যায়। তাহাছাড়া, বালুকার প্রাকৃতিক ধর্ম অনুযায়ী ভূ-নিম্নস্থ জলের পৃষ্ঠদেশ (Water table) কিছু উপর দিকে উঠিয়া যায়। আবার, এই কারণে এই অঞ্চলের নিম্নতম অংশে ঝরণার সৃষ্টি হইতে পারে। আর, কখন কখন এইরূপ স্থানে ভূমির আর্দ্রতা বাড়িয়া যায়। তাই, এখানে মরূদ্যানের সৃষ্টি হইতে পারে। লক্ষ্য কর, আর একভাবে মরূদ্যানের সৃষ্টি হয়।

লোয়েস-মৃত্তিকাময় সমভূমি (Loess Plains): সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া দূরবর্তী স্থানে সঞ্চিত হইতে পারে। এইরূপভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ধূলিকণা সঞ্চিত হইয়া কোন কোন স্থানে মৃত্তিকাময় ভূ-ভাগ গঠিত হইতে পারে। বায়ুর দ্বারা পরিবহন ও অবক্ষেপণের ফলে সঞ্চিত প্রচুর ধূলিকণার স্তূপকে লোয়েস-মৃত্তিকা বলে। প্রধানতঃ মরুভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোয়েস-মৃত্তিকার সমভূমি গঠিত হইতে পারে।

শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের বিবিধ শিলা প্রধানতঃ যান্ত্রিক উপায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অতি-সূক্ষ্ম শিলাকণায় পরিণত হয়, ফলে এইরূপ ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। এইজন্য রাসায়নিক পরিবর্তনে ধূলিকণা সৃষ্টি হয় নাই। তাই, ইহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে নাই। আর, এই ধূলিরাশি বিবিধ শিলার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical Mixture) মাত্র। এই ধূলিকণাগুলি মসৃণ নহে, বরং সূক্ষ্ম কোণ ও কিনারা বিশিষ্ট। বায়ুর দ্বারা অবক্ষেপণ হয় বলিয়া উন্নত বা অবনত স্থানে কিংবা পর্বতচূড়ায় সর্বত্রই লোয়েস সঞ্চিত হয়।

লোয়েস-মৃত্তিকা জমাটভাবে থাকে না বা পাললিক-শিলার মত ইহাতে কোন স্তর দেখা যায় না। লোয়েস-মৃত্তিকায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত বহু ছিদ্র রহিয়াছে। পূর্বকালে যে সব উদ্ভিজ্জ এখানে জন্মিত, তাহাদের মূলগুলি এই সকল ছিদ্র সৃষ্টি করিয়াছে। লোয়েস-মৃত্তিকা জমাট বাঁধে নাই বলিয়া জলপ্রবাহের দ্বারা সহজে অপসারিত হইতে পারে এবং অন্যত্র স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইলে জমাট বাঁধিয়া কালক্রমে পাললিক-শিলায় পরিণত হইতে পারে। বিজ্ঞানীদের অভিমত যে, প্রাচীনকালে লোয়েস-মৃত্তিকা হইতে অতি-পুরু কাদাপাথর (mudstones or shales) গঠিত হইয়াছে।

লোয়েস-মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র বলিয়া জল সহজে শোষিত হয় এবং ইহা উর্বরা। এইজন্য এই মৃত্তিকা কৃষিকার্যের উপযোগী। পৃথিবীর বহু অংশে লোয়েস-মৃত্তিকায় গঠিত উন্নত কৃষিপ্রধান অঞ্চল রহিয়াছে।

ইউরোপের রাশিয়ার দক্ষিণাংশে উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল দেখা যায়; উহাও একপ্রকার লোয়েস-মৃত্তিকা। প্রাচীন হিমযুগে (ভূবিদ্যার ইতিহাসে কয়েকটি হিমযুগ বর্তমান ছিল।) মহাদেশীয় হিমবাহ-বাহিত মোরেন সঞ্চিত হয়। তখন এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক থাকায় মোরেনের ধূলিকণা বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া মধ্য-ইউরোপের পশ্চিমে জার্মানি হইতে পূর্বে-দক্ষিণ-রাশিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। এইভাবে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের অংশ-বিশেষে লোয়েস সঞ্চিত হইয়া উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর-চীনের বিস্তীর্ণ লোয়েস-মৃত্তিকাময় অঞ্চল বিখ্যাত। ইহা উর্বর পীতবর্ণ মৃত্তিকা। গোবি-মরুভূমি হইতে বায়ুবাহিত-ধূলিকণার দ্বারা এই অঞ্চলের লোয়েস মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে হোয়াং নদী প্রবাহিত। বন্যার সময় এই নদীর জল প্রচুর লোয়েস মৃত্তিকার পলল বহন করিয়া পীত সাগরে সঞ্চিত করে। এইজন্য নদীর অপর নাম পীত নদী ও সাগরের নাম পীত সাগর। এই অঞ্চলের কোন কোন অংশের লোয়েস-মৃত্তিকার গভীরতা ১০০ ফুটেরও অধিক। জলপ্রবাহের দ্বারা লোয়েস-মৃত্তিকাময় ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়। এখানে ঐরূপ বহু খাত দেখা যায়।

মহাদেশীয় হিমবাহ-সৃষ্ট সমভূমি (Glaciated Plains) : উত্তর-আমেরিকার উত্তরাংশে এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশে মহাদেশীয় হিমবাহ-সৃষ্ট-সমভূমি রহিয়াছে। হিমযুগের পূর্বে এই সকল অঞ্চলের জটিল প্রকৃতির কেলাসিত-শিলায় গঠিত কিংবা সরল প্রকৃতির পাললিক শিলায় গঠিত, এই দুই প্রকৃতির শিলা জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হয়। তারপর হিমযুগে মহাদেশীয় হিমবাহের বিশাল বরফ-স্তূপের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের রূপের (Remodelled) পরিবর্তন হয়। তাই, বর্তমান যুগে আমরা এই পরিবর্তিত রূপই দেখি। অবশ্য পরবর্তী যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

এই বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ বরফ-স্তূপের কার্যের বহু নিদর্শন ভূ-পৃষ্ঠে আজও রহিয়াছে ; যথা—ইহার দ্বারা শিলার ক্ষয়সাধন ও ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডের অবক্ষেপণ এবং হিমবাহের বরফ গলিলে, যে জলপ্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার দ্বারা ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণ কার্য। তাই, ইহাদের কার্যের ফলে যে সমভূমিগুলি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(১) ক্ষয়সাধনের ফলে সমভূমির উৎপত্তি এবং (২) অবক্ষেপণের ফলে সমভূমির উৎপত্তি।

মহাদেশীয় হিমবাহের বরফস্তূপ কয়েক হাজার ফুট উচ্চ এবং শত শত মাইল বিস্তৃত। বর্তমান যুগে আণ্টার্কটিকা মহাদেশে ও গ্রীনল্যাণ্ডে মহাদেশীয় হিমবাহ (Ice sheets) রহিয়াছে। হিমবাহ-প্রসঙ্গে হিমবাহের কার্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। এখানে ইহার কার্য ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

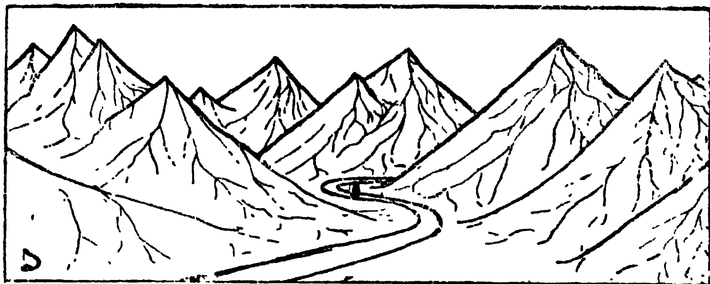
কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বরফের দ্বারা শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না,—গৌণ কারণে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উপর ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালি, মাটি প্রভৃতি থাকিতে পারে। হিমবাহের বিরাট বরফের স্তূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে উহাতে এগুলি আটকাইয়া যায় এবং গতিশীল বরফের স্তূপের সহিত বাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের শিলায় (Bed rock) ছোট-বড় ফাটল থাকিতে পারে।

এইরূপ ভূ-পৃষ্ঠে বরফ-স্তূপ থাকিলে ফাটলের মধ্যস্থ জল জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং বরফের এই অংশগুলি বিরাট বরফ-স্তূপের অংশে পরিণত হয়। তখন বরফ-স্তূপের প্রবল বলের (Force) জন্য শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠের ছোট-বড় শিলাখণ্ড উপড়াইয়া যায় এবং ঐগুলিও গতিশীল বরফের সহিত বাহিত হয়। কঠিন কেলাসিত-শিলা খুব শক্ত বলিয়া কম ক্ষয় হয়, আর পাললিক-শিলা সাধারণতঃ কোমল বলিয়া অধিক ক্ষয় হয়। তাই ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশের উপর বিরাট বরফ-স্তূপ থাকে, সেই স্থানের শিলা প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষয় হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা এবং শিলাস্তরগুলি বিভিন্নভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ অধিক, আবার কোন অংশ কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল কার্যের ফলে সমভূমির (Ice-scoured plains) উৎপত্তি হইতে পারে।

মহাদেশীয় হিমবাহ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে পৌছাইলে উহার অগ্রভাগের বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয়। তখন ছোট-বড় শিলাখণ্ড, বালি, কর্দম প্রভৃতি তথায় সঞ্চিত হয়। ঐগুলিকে মোরেন বলে। আর, বরফগলা জলের পরিমাণ অধিক হইলে ছোট-বড় নদীর সৃষ্টি হয়। নদীপ্রবাহের দ্বারা নুড়ি, কাঁকর, বালি, মাটি প্রভৃতি বাহিত হইয়া অন্যত্র সঞ্চিত হয়। ক্ষয়জাত পদার্থ-গুলির সঞ্চয়ণের ফলে সমভূমির (Drift plains) সৃষ্টি হইতে পারে।

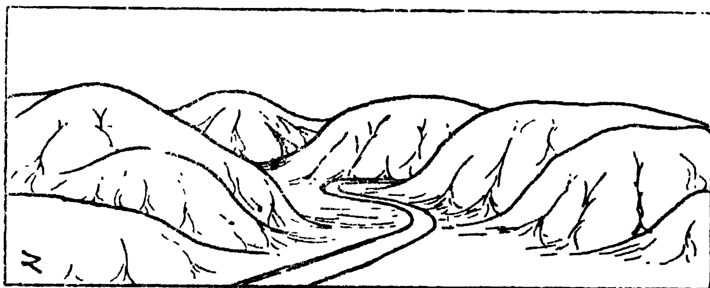
মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়সাধনের ফলে যে সমভূমির উৎপত্তি হয়, তাহার বিশেষত্ব—হিমবাহের আগমনের পূর্বে, হয়ত, কোন অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ উপত্যকা, পাহাড়-পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি লইয়া গঠিত ছিল। এই অঞ্চলে হিমবাহ আগমন করিলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরস্থ সমস্ত ক্ষয়জাত শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালি ও মাটি হিমবাহ অপসারিত করে। তারপর হিমবাহ-সংলগ্ন শিলাখণ্ডের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শিথিল শিলা অপসারিত হয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ কতকটা মসৃণ হইয়া যায়—অল্পউচ্চ বা পাহাড়ের সূচ্যগ্র চূড়া ক্ষয় হইয়া গোলাকার আকৃতির হয়। তাই, এইরূপ সমভূমিতে দেখা যায়, গোলাকৃতি

চূড়াবিশিষ্ট পাহাড়, প্রশস্ত উপত্যকা, আর স্থানীয় উন্নতি-অবনতি অত্যন্ত কম; আবার উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠের উপর হিমবাহ-বাহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলকণার পাতলা



(১) পার্বত্য অঞ্চলের মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা পর্বতগাত্র ক্ষয় হইবার পূর্ব অবস্থা

আবরণ; হয়ত নিকটস্থ কোন পাহাড়ের উপর হইতে হিমবাহের দ্বারা বিচ্যুত বিরাট শিলাখণ্ড। এই অঞ্চলের মৃত্তিকার পরিমাণ এত কম যে, স্থানে স্থানে



(২) উক্ত পার্বত্য অঞ্চলের মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা পর্বতগাত্রের বন্ধুর অংশ মসৃণ হইয়াছে, নদী-উপত্যকা প্রশস্ততর হইয়াছে এবং পর্বত-শৃঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গোলাকৃতি হইয়াছে

সামান্য কয়েকটি অংশ ছাড়া, কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। আর, অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভূমির অধিকাংশই শিলাময়,—উহার উপর মৃত্তিকার আবরণ বিশেষ নাই। আবার, ভূ-পৃষ্ঠের শিলায় হিমবাহের শিলার ঘর্ষণের চিহ্ন বর্তমান—ঐ চিহ্নগুলি আঁচড়-

কাটা-দাগের মত। কোন কোন স্থানে কতকগুলি অনুচ্চ শিলাময় ঢিপি একত্রে রহিয়াছে,—দূর হইতে ঐগুলি দেখায় যেন কতকগুলি মেষ একত্রে শুইয়া আছে (রোচে মুতোন্নে, roches montonnées)। এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সরলবর্গীয় বৃক্ষ, কারণ ঐগাছগুলির মূল মাটির অধিক নিম্নে প্রবেশ করে না।

মহাদেশীয় হিমবাহের গতিপথে অনুচ্চভূমি বা শিলাময় অনুচ্চ পাহাড়ের দ্বারা বাধা পাইলে, ঐ স্থান এক বিশিষ্ট প্রকৃতির রূপ ধারণ করে—যেভাবে ও যে কারণে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বালিয়াড়ির আকৃতি গঠিত, সেভাবে এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠের আকার ধারণ করে, যে দিক হইতে হিমবাহ আগমন করে, সেই দিকের ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমনিম্ন এবং বিপরীত পার্শ্ব খাড়াখাড়িভাবে থাকে। আবার, কখন কখন অনুচ্চভূমির সম্মুখের নিকটস্থ ভূমি অধিক ক্ষয়িত হইয়া ছোট-বড় গর্তে পরিণত হয়। আর গর্তগুলি সাধারণতঃ অগভীর হইলেও ইহার পার্শ্বদেশ খাড়াভাবে থাকে। এইগুলি জলপূর্ণ হইয়া হ্রদে পরিণত হয়। ইহাকে **কেট্‌লি** (Kettle) বলে। তাই, এই অঞ্চলে এইরূপ বহু ছোট-বড় হ্রদ দেখা যায়।

মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়সাধনের ফলে এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের রূপ পরিবর্তিত হয়—সমভূমি তরঙ্গায়িত বা মৃদুভাবে বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হয়। ইহার ফলে এই স্থানের জলনিকাশ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে, কারণ ভূমির ঢাল আর পূর্বের মত থাকে না। কোথায় বেসিন বা সরার মত আকৃতি বিশিষ্ট ভূমি; আবার, কোথাও অনুচ্চভূমি। আর, বেসিনগুলি এক সমতলে অবস্থিত নহে। এইজন্য একটি বেসিন হইতে অপর আর একটি বেসিনে নদীগুলি প্রবাহিত; আর, হয়ত, একাধিক ছোট-বড় হ্রদকে সংযুক্ত করিয়াছে। ভূমি বন্ধুর বলিয়া নদীগুলি স্থানে স্থানে ছোট-বড় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে বা খরস্রোতা হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক। ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকার আবরণ নাই বলিলেই চলে; এইজন্য নদী ও হ্রদের জল নির্মল; ফলে নদীগুলি হ্রদে বিশেষ পলল সঞ্চয় করে না। এই কারণে হ্রদগুলি সহজে মজিয়া যায় না।

উত্তর-আমেরিকার ও ইউরোপের যে অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহের উৎপত্তি-স্থল ছিল ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে, উল্লিখিত প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ রহিয়াছে। প্রাচীন

কেলাসিত-শিলায় গঠিত এই সকল অঞ্চলের ভূ-ভাগ, হিমযুগের পূর্বে পেনিপ্লেন ছিল। আর, এই অঞ্চলের জলবায়ু শীতল। প্রাচীন কেলাসিত-শিলা খুব শক্ত বলিয়া ইহা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আবার, শীতল জলবায়ুযুক্ত স্থানের শিলার ক্ষয়সাধন কম। এই দুই কারণে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে হিমবাহ অপসারিত হইলেও হিমবাহের কার্যের বহু নিদর্শন আজও এই অঞ্চলে বর্তমান।

মহাদেশীয় হিমবাহের অবক্ষেপণ ও উহার ফলে সমভূমির সৃষ্টি : টিল-সঞ্চিত সমভূমি—গতিশীল মহাদেশীয় হিমবাহের তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের শিথিল বা ক্ষয়প্রাপ্ত ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালুকা, মাটি প্রভৃতি আটকাইয়া যায়। হিমবাহের তলদেশে এই সকল পদার্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। আর, হিমবাহের ঐ অংশের বরফের পরিমাণ অপেক্ষা ইহাদের পরিমাণ অধিক হইলে হিমবাহ ইহাদিগকে আর আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না ; তখন ভূ-পৃষ্ঠেও এইগুলি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থগুলিকে **টিল** (Till) বা **গ্রাউণ্ড মোরেন** (Ground Moraine) বলে। হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ডগুলি সঞ্চিত হইলে, তাহাদিগকে মোরেন বা গ্রাবরেখা বলা হয়। সাধারণতঃ টিল অধিক দূর হইতে হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ড নহে,—প্রধানতঃ ২।৪ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে হিমবাহের দ্বারা বাহিত হয়। এইজন্য, এইগুলি স্থানীয় অঞ্চলের অপসরিত ক্ষয়জাত শিলা। কখন কখন বহু দূর হইতে বাহিত দুই-একটি শিলাখণ্ডও দেখা যায়। ইহাঁদিগকে **ইরাটিক** বা অনিয়মিতভাবে অবস্থিত (Erratic) শিলা বলে।

নদীপ্রবাহ বৃহৎ আকারের শিলাখণ্ড বহন করিতে পারে না ; কিন্তু হিমবাহ যে কোন আকারের, যে কোন ওজনের শিলাখণ্ড বহন করিতে পারে। তাই, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন গুরুত্বের শিলাখণ্ড লইয়া টিল গঠিত। পললের গুরুত্ব অনুযায়ী নদীপ্রবাহের অবক্ষেপণ-কার্য দেখা যায়। হিমবাহের অবক্ষেপণ-কার্য এইরূপ প্রকৃতির নহে,—শিলার গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, যে-কোনভাবে এইগুলি সঞ্চিত হইতে পারে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর মোরেন এলোমেলোভাবে ছড়ান থাকে। ইহারা স্তরীভূত অবস্থায় বর্তমান নহে। আর, টিলের গভীরতা

সর্বত্র একরূপ নহে,—নিম্নভূমি বা খাঁজে অধিক এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে কম গভীরতা দেখা যায়। আবার, অতি-শক্ত শিলাময় অঞ্চলের টিলের পরিমাণ কম এবং অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাময় ভূ-ভাগের টিলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। আবার, উচ্চভূমি বা নিম্নভূমি, এই দুই স্থানেই টিল সঞ্চিত হইতে পারে। কোন কোন অঞ্চলের বন্ধুর কোমল শিলাময় ভূমিতে টিল এমনভাবে সঞ্চিত হইয়াছে যে, উহা মৃদুভাবে তরঙ্গায়িত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আবার, সমভূমিতে টিল সঞ্চিত হইয়া উহা মৃদুভাবে তরঙ্গায়িত ভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাই **টিল-সমভূমি।**

সকল অঞ্চলের টিলের শিলার গঠন, আকার, আয়তন প্রভৃতি একরূপ নহে। টিলের শিলার প্রকৃতি প্রধানতঃ স্থানীয় শিলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে,—কঠিন-শিলাময় অঞ্চলের টিলের শিলাখণ্ডগুলি সাধারণতঃ বড় বড় আকারের এবং কোমল শিলাময় অঞ্চলে বালুকা, কাঁকর ও মাটি লইয়া টিল গঠিত। বেলেপাথরের ভূ-পৃষ্ঠ হইলে বালুকার পরিমাণ অধিক এবং কাদাপাথরের দ্বারা গঠিত ভূ-পৃষ্ঠ হইলে মাটির পরিমাণ অধিক দেখা যায়। তবে এইরূপ ভূমিতেও কখন কখন বড় বড় আকারের দুই-একটি আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলাখণ্ডও (Erratic) রহিয়াছে। ঐরূপ বিরাট আকারের শিলাখণ্ডগুলি হয়ত, শত শত মাইল দূর হইতে হিমবাহের দ্বারা বাহিত হইয়াছে।

ড্রামলিন (Drumlins)—টিলযুক্ত সমভূমি সামঞ্জস্যহীনভাবে মৃদুপ্রকৃতির তরঙ্গায়িত। তাই, ভূমির ঢাল মৃদুপ্রকৃতির। ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশকে স্ফীতি (swell) এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নঅংশকে ছায়াযুক্ত স্থান (swale) বলে। কোন কোন অঞ্চলের এই প্রকৃতির সমভূমিতে স্থানে স্থানে অনুচ্চ টিলা দেখা যায় এবং ইহারে গঠন অদ্ভুত—যেন একটি চামচের বাটির মত অংশটি উল্টাভাবে রাখা হইয়াছে। এইগুলি সাধারণতঃ টিল-মৃত্তিকায় (Clayey till) গঠিত। সম্ভবতঃ এইগুলি টিল-সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদিগকে ড্রামলিন বলে। আবার, কোন অঞ্চলে কঠিন-শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ড্রামলিন গঠিত হইয়াছে। ঐগুলি শিলাদ্বারা গঠিত। যে দিক হইতে হিমবাহ আসিয়াছে, ড্রামলিনের ঐ পার্শ্বদেশের

উচ্চ এবং বিপরীত দিক ক্রমনিম্ন অধিক রোচে মুতোঁন্নে-এর পার্শ্বদেশ ঢাল ইহার ঠিক বিপরীত)। ইহারা ২৫′—২০০′ উচ্চ এবং কয়েক ফুট হইতে এক মাইলের অধিক দীর্ঘ হইতে পারে। আর, হিমবাহ যে দিকে চলিয়াছিল; সেই দিক অনুসরণ করিয়া ড্রামলিনগুলি অবস্থিত। আবার, স্থানে স্থানে অনেকগুলি ড্রামলিন একত্রে রহিয়াছে।

টিল-সমভূমির জলনিকাশ-ব্যবস্থা—সামঞ্জস্যহীনভাবে তরঙ্গায়িত ভূমির জলনিকাশ সুচারুভাবে হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অধিকাংশ নিম্ন অংশগুলির (swale) জলনিকাশ-পথ নাই। তাই, এখানে বহু ছোট-বড় জলাভূমি ও হ্রদ দেখা যায়। নিম্ন অংশগুলি জলপূর্ণ হইলে জল ছাপাইয়া একটি নিম্ন অংশ হইতে অপর নিম্ন অংশে প্রবাহিত হয়। তাই, এখানে নদীগুলি জলাভূমি, হ্রদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং স্থানে স্থানে নদী খরস্রোতা কিংবা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নদীর এইরূপ অবস্থা বেশী দিন থাকে না। **টিল-সমভূমির** সর্বত্র শিলাগুলি জমাট বাঁধে নাই বলিয়া জলপ্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলা শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে নদীর স্রোতোবেগ মন্দীভূত হয় এবং ইহা বক্রগতি ধারণ করে। আর, জলপ্রপাত ও খরস্রোত-অংশ ক্রমশঃ লোপ পায়। তাই, বর্তমানে এই অঞ্চলের বহু নদী মন্দগতিতে প্রবাহিত।

প্রধানতঃ বেসিন-আকারবিশিষ্ট কোন নিম্নভূমির জলনিকাশের পথ না থাকিলে নিম্ন অংশে জল সঞ্চিত হইয়া হ্রদে পরিণত হয়; আর উহার পার্শ্বদেশের বা কূলের অংশবিশেষের নির্গম পথ দিয়া বাড়্‌তি জল বাহির হইতে পারে। আবার, কখন কখন হ্রদ জলপূর্ণ হইয়া কূল ছাপাইয়া জল বাহির হইতেও পারে। টিল-সমভূমি তরঙ্গায়িত অঞ্চল বলিয়া কোন নিম্নস্থানে বা বেসিনে জল সঞ্চিত হইয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছে। এই কারণে, এই অঞ্চলে অসংখ্য হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অঞ্চলে নিম্নলিখিতগুলি হ্রদের উৎপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে; যথা—(ক) অসমভাবে টিল সঞ্চিত হওয়া; (খ) কোন অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং (গ) কোন নদী-উপত্যকার বহির্মুখে মোরেন

সঞ্চিত হওয়া। কোন কোন স্থানে হিমযুগের পূর্বে সৃষ্ট বিস্তৃত ও গভীর উপত্যকা হিমবাহের দ্বার আরও গভীর ও বিস্তৃত হইয়াছে এবং উহার বহির্মুখে মোরেন সঞ্চিত হইয়া উপত্যকার মুখ অবরুদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে জল সঞ্চিত হইয়া বড় বড় হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর-আমেরিকার বৃহৎ পঞ্চহ্রদের সৃষ্টির ইতিহাস এই প্রকৃতির।

আর একভাবে এই অঞ্চলের হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে,—অচল * মহাদেশীয় হিমবাহের সম্মুখভাগে বহু ফাটল ও উহার তলদেশে সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল স্থান হইতে প্রচুর জল বাহির হইতে থাকে। আর, ফাটল সৃষ্টির ফলে হিমবাহের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ গলিলে ঐস্থানে হ্রদের উৎপত্তি হয়; কারণ, ফাটল ও সুড়ঙ্গ-পথে মোরেন সঞ্চিত হইবার জন্য ঐ অংশ উচ্চ হয়। এই প্রকৃতির হ্রদগুলি সাধারণতঃ অগভীর। ইহারা আকারে ছোট বা বড় হইতে পারে।

টিল-সমভূমির অগভীর হ্রদগুলি ক্রমশঃ মজিয়া যায়; কারণ, এই অঞ্চলের নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলল বহন করিয়া হ্রদে সঞ্চিত করে। তাই, এই অগভীর হ্রদগুলি কালক্রমে জলাভূমিতে পরিণত হয়। উত্তর-আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের দক্ষিণে এইরূপ প্রকৃতির বহু জলাভূমি আছে। বর্তমানে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ঐগুলির জলনিকাশ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

অগ্র- বা প্রান্ত-গ্রাবরেখা-অঞ্চলের সমভূমি (The Surface Features of Marginal or End Morairfes):

অগ্র-অংশের গ্রাবরেখার ও প্রান্তগ্রাবরেখার বিশেষত্ব—মহাদেশীয় হিমবাহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, কিন্তু কখন কখন এইরূপ অবস্থায় পৌছায় যে, তখন ইহার অগ্রভাগ অচল অবস্থায় থাকে এবং বরফ গলিতে সুরু করে। এইরূপ অবস্থায় অগ্রভাগে যে পরিমাণ বরফ গলে, ঠিক সেই পরিমাণে

* কতকগুলি কারণবশতঃ মহাদেশীয় হিমবাহের কোন এক বিরাট অংশ অচল অবস্থায় পরিণত হইতে পারে।

বরফ তথায় পৌঁছায়; কারণ তখনও হিমবাহ গতিশীল। মহাদেশীয় হিমবাহের প্রান্তদেশের বিস্তার, হয়ত, ২।১ হাজার মাইল হইতে পারে। আর, এই সুদীর্ঘ অংশের বরফ এক সঙ্গে, হয়ত, গলে না; আবার, অবিরামভাবে গলে না; কারণ বরফ গলিবার প্রাকৃতিক অবস্থা, যথা,—ঐ স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বরফ-সরবরাহ প্রভৃতি সর্বদা সমরূপ না থাকিতে পারে। এইজন্য ইহার অগ্রভাগ, হয়ত, সামান্য অগ্রসর হয়, আবার অচল হয় বা সামান্য প্রত্যাবর্তন করে কিংবা পুনরায় অগ্রসর হয়। আর, প্রান্তভাগের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কিংবা স্থিতি অবস্থায় থাকিতে পারে।

মহাদেশীয় হিমবাহের সম্মুখ অংশের বরফ গলিলে হিমবাহ-বাহিত মোরেনগুলি ঐ অংশে সঞ্চিত হয়। যেহেতু হিমবাহ সামান্যভাবে অগ্রসর হয় বা প্রত্যাবর্তন করে কিংবা অচল থাকে, কাজেই মোরেনগুলি কিছুটা বিস্তৃত-অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে টিল-মোরেন অপেক্ষা এই প্রকৃতির মোরেনের পরিমাণ অধিক। এইরূপ মোরেনকে অগ্র-অংশের গ্রাবরেখা (Marginal Moraine) বলে। আর, চরম অগ্রবর্তী স্থানে যে মোরেনগুলি থাকে, তাহাকে প্রান্ত-গ্রাবরেখা (End Moraine) বলা হয়। হিমবাহের সুদীর্ঘ প্রান্তভাগের বিভিন্ন অংশের অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কিংবা স্থিতি অসম এবং এই কার্যসমূহ সর্ব-অংশে এক সময়ে ঘটে না বলিয়া বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্নভাবে মোরেন সঞ্চিত হয়। এইজন্য এক একটি অংশের প্রান্ত বা অগ্র অংশের গ্রাবরেখা সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে গঠিত হয়; আর কোন একটি অংশে একটির পশ্চাতে আর একটি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধভাবে কতকটা বৃত্তের চাপের আকৃতির মত গঠিত হয়। ইহার কারণ, হিমবাহ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করিলে, এই অংশে মোরেন বিশেষ সঞ্চিত হয় না এবং আবার, স্থিতিশীল হইলে তথায় মোরেন সঞ্চিত হয়। পশ্চাৎগতির সময় প্রান্ত-গ্রাবরেখা টিলের উপর সঞ্চিত হয়। আর, পার্শ্ববর্তী দুইটি প্রান্ত গ্রাবরেখার মধ্যবর্তী অংশে কেবলমাত্র টিল দেখা যায় বা সামান্য পরিমাণে মোরেন সঞ্চিত হয়।

অগ্র-অংশের গ্রাবরেখা ছোট-বড় নানা আকারে ও আয়তনে শৈলশিরা (Marginal Moraine Ridges) গঠিত হইতে পারে। কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে, উহা ২।১ ফুট উচ্চ আর ২।১ গজ বিস্তৃত। আবার, কতকগুলিকে শৈলশিরা বলা যায় না,—ইহা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত। গ্রাবরেখা-অঞ্চলে বন্ধুর ভূমি, মধ্যে মধ্যে গভীর খাত প্রভৃতি রহিয়াছে। এইরূপ প্রকৃতির ভূমির বিস্তার সাধারণতঃ ১-৫ মাইল এবং দৈর্ঘ্য বহু মাইল। ইহার কোন অংশ পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে ১০০-২০০ ফুট উচ্চ। এই অংশের শিলার কতকগুলি স্তরীভূত এবং কতকগুলি অস্তরীভূত। আর, ভূ-পৃষ্ঠ ছোট-বড় শিলাখণ্ড ও কাঁকরে পূর্ণ; কারণ, মৃত্তিকা ও বালুকা বরফগলা জলের দ্বারা বাহিত হইয়াছে। তাই টিল-সমভূমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিলাখণ্ডে পূর্ণ। আর, এখানে রহিয়াছে বহু কেট্‌লি-হ্রদ।

মহাদেশীয় হিমবাহের বরফ-গলা-জল-বাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত সমভূমি (Glaciofluvial Plains. Out-wash Plains) ঃ মহাদেশীয় হিমবাহের বিরাট বরফস্তূপের অগ্র-অংশের বরফ গলিলে বরফ-গলা জল অসংখ্য ছোট ছোট জলধারা সৃষ্টি করে। তখন বরফস্তূপের ফাটলপথে বা উহার তলদেশের সুরঙ্গপথের মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলস্রোতের দ্বারা প্রচুর মোরেন বাহিত হয়। আর, অগ্র-মোরেনের দ্বারা প্রতিহত হওয়ায়, অগ্র-মোরেন-অংশে জলপ্রবাহের স্রোতোবেগ বিশেষভাবে মন্দীভূত হইয়া যায়। তাই, এই অংশ অতিক্রম করিলে স্রোতবাহিত মোরেন ফ্যান-আকৃতির (Fan) পাললিক সমভূমি সৃষ্টি করে। জলস্রোত-বাহিত বলিয়া গুরুত্ব অনুযায়ী পললরাশি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। তাই, প্রান্ত-গ্রাবরেখার সম্মুখে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি দেখা যায়। ইহার ভূমি সমতল। বালুকা, কাঁকর, ছোট ছোট শিলাখণ্ড, স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া এই সমভূমি গঠিত হয়। এই স্থানে সাধারণতঃ কাদা (clay) সঞ্চিত হয় না; কারণ জল-স্রোতোবেগে কাদা বাহিত হইয়া যায়। আর, অপেক্ষাকৃত বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি প্রান্ত-মোরেন-অংশে সঞ্চিত হয়। আবার, টিল-সমভূমির উপর জলস্রোত-বাহিত পললরাশি সঞ্চিত হইলে, আর এক প্রকৃতির সমভূমি গঠিত

হয়,—স্থানে স্থানে বিরাট হিমবাহের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশের বরফ গলিলে তখন ছোট ছোট গর্ত বা কেট্‌লি-হ্রদে পরিণত হয়, ফলে এই অঞ্চলে বহু ছোট ছোট কেট্‌লি-হ্রদ দেখা যায়। টিল-সমভূমি অন্তরীভূত শিলায় গঠিত বলিয়া হ্রদের জলের ভূ-স্তরের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। তাই, বসন্তে বরফ-গলা জল দ্বারা পূর্ণ হইলেও অল্পদিন পরে হ্রদগুলি শুকাইয়া যায়। এইরূপ সমভূমিকে পিটেড আউট-ওয়াশ (Pitted outwash plain) সমভূমি বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্যে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি রহিয়াছে।

আউট-ওয়াশ সমভূমির কোন কোন অংশ বালুকাময় বা কঙ্করময়। আর, বৃষ্টিপাতের পর, বৃষ্টির জল ভূমিতে শীঘ্র শীঘ্র শোষিত হয়। এইজন্য টিল-সমভূমি অপেক্ষা এই প্রকৃতির সমভূমি অধিকতর সমতল হইলেও ইহা কৃষিকার্যের উপযোগী নহে।

গতিহীন মহাদেশীয় হিমবাহ-সৃষ্ট সমভূমি (Stagnant Ice sheet)ঃ জলবায়ুর পরিবর্তন বা বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ কিংবা অন্য কারণবশতঃ মহাদেশীয় হিমবাহের এক বিরাট অংশ গতিহীন অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় ঐ অংশে অন্যত্র হইতে বরফ সরবরাহ থাকে না। তাই, ইহা যেন নিশ্চল বরফ-স্তূপ। তখন অগ্র-গ্রাবরেখা (marginal moraine) বিশেষ গঠিত হয় না; কারণ, হিমবাহের অগ্রগতি এবং প্রান্ত-অংশের বরফ-গলা জলপ্রবাহ, এই দুইটি কার্য একত্রে ঘটিলে অগ্র-গ্রাবরেখার সৃষ্টি হয়। এই বিরাট বরফ-স্তূপের বিস্তীর্ণ অংশের বরফ গলিতে থাকে—ইহার নানা অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়—ইহার তলদেশে ছোট বড় সুরঙ্গ গঠিত হয়। কোন কোন অংশে কতকগুলি ফাটল পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কোন কোন অংশে কতকগুলি সুরঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত; আবার, কোন স্থানে ফাটল সুরঙ্গে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে, বরফ-স্তূপের বিভিন্ন অংশের বরফ-গলা জল ফাটল ও সুরঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। বরফ-স্তূপের এইরূপ স্থানে জলপ্রবাহ-বাহিত বালুকা, কঙ্কর প্রভৃতি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় এবং বরফ গলিলে এই স্থানে এই সকল পদার্থের দ্বারা স্তরে স্তরে গঠিত অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট বহু শৈলশিরা দেখা যায়। ইহারা সামঞ্জস্য-

হীনভাবে অবস্থান করে। এইরূপভাবে সৃষ্ট ও গঠিত শৈলশিরাকে **এস্কার** (Esker) বলে। কোন কোন এস্কার বহু মাইল দীর্ঘ। অবশ্য সকল এস্কার এইভাবে সৃষ্টি না হইলেও অধিকাংশ এস্কার নিশ্চল বরফ-স্তূপ গলিলে সৃষ্টি হইয়াছে।

কখন কখন গতিহীন বিরাট বরফ-স্তূপ শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। তখন শত শত ফাটল-পথে বা পার্শ্ববর্তী দুইটি বরফ-স্তূপের মধ্যবর্তী অংশ দিয়া জল বহিয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠের যে যে স্থানের উপর দিয়া জল প্রবাহিত হইয়াছিল; বরফ গলিলে, তখন বালুকা, কঙ্কর, নুড়ি প্রভৃতির গঠিত শত শত শৈলশিরা (hummock) দেখা যায়। ফাটল-পথ পূর্ণ করিয়া ইহারা গঠিত বলিয়া এইরূপ শৈল-শিরাকে Crevasse fillings বলে। এইগুলি সংকীর্ণ বা প্রশস্ত হইতে পারে এবং উহাদের মধ্যস্থ নিম্নভূমিতে কেট্‌লি-হ্রদ, বা জলাশয়, বা জলভূমি দেখা যায়। আর, যে যে স্থানে ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন বরফ-স্তূপ ছিল, সেই অংশগুলি নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিম্ন স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া হ্রদের উৎপত্তি হয়। তাই এই হ্রদগুলির আকৃতি সংকীর্ণ ও দীর্ঘ। আবার, স্থানে স্থানে গভীর কেট্‌লি-হ্রদ বা অগভীর জলাভূমিও দেখা যায়।

সাধারণতঃ বরফ-স্তূপের তলদেশে সুরঙ্গে মোরেন সঞ্চিত হইয়া এস্কার, ফাটল-পথে মোরেন সঞ্চিত হইয়া Crevasse filling, হিমবাহের সম্মুখস্থ (Marginal lake) অস্থায়ী প্রশস্ত হ্রদে সঞ্চিত হইয়া **টেরাস** (Terrace) গঠিত হয়; টেরাসের স্থানে স্থানে কেট্‌লি হ্রদ দেখা যায়। ঐরূপ প্রশস্ত হ্রদের (Marginal lake) উৎপত্তি হইবার কারণ,— বরফ-স্তূপের সম্মুখের ভূ-ভাগ ক্রমউচ্চ হইলে, বরফ-গলা জল এই অংশে সঞ্চিত হইয়া হ্রদের সৃষ্টি হয় এবং ঐ স্থান জলপূর্ণ হইলে, কোন ছোট বড় নির্গম পথ দিয়া বা জল কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হয়। পরে, বরফ সম্পূর্ণভাবে গলিলে হ্রদের জল ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায় এবং অবশেষে যে সমভূমি গঠিত হয়, উহাকে টেরাস বলে। টেরাসের গর্তগুলি জলপূর্ণ হইয়া কেট্‌লি-হ্রদে পরিণত হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে বিস্তীর্ণ ড্রিফ্‌ট্‌-সমভূমি (Drift plains) রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বহু অংশ ঘনবসতিপূর্ণ ও উন্নত অঞ্চল। তাই,

এই প্রকৃতির সমভূমি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা (মোরেন) সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার উপাদানও বিভিন্ন।

নবীন ড্রিফট্-সমভূমিগুলিতে উল্লিখিত প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যায়, কারণ জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ইহাদের ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ পরিবতন ঘটে নাই। প্রাচীন ড্রিফট্ সমভূমির এই সকল বিশেষত্ব অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে,—জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, তুষার প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন, ক্ষয়জাত পদার্থগুলি সঞ্চয়ন প্রভৃতি কার্য সংঘটিত হইয়াছে,—মোরেন দ্বারা গঠিত শৈলাশিরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে, কেটলি-হ্রদ মজিয়া গিয়াছে, বিরাট শিলাখণ্ড (erratic) ক্ষয় হইয়া মৃত্তিকা, বালুকা বা নুড়িতে পরিণত হইয়াছে, হয়ত, নুড়ি, বালুকা প্রভৃতির উপর পাললিক ভূমি গঠিত হইয়াছে, জলপ্রবাহ-পথ পরিবর্তিত হইয়া নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে ইত্যাদি। এই অঞ্চলে আর এলোমেলোভাবে ছড়ান নানা জাতীয় ও নানা আকারের শিলাখণ্ড দেখা যায় না। সামঞ্জস্যহীন উঁচু-নীচু ভূ-পৃষ্ঠ ও নদীর ধারাপথ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই, এখানে ভূ-পৃষ্ঠ নবরূপ ধারণ করিয়াছে। তবে, স্থানে স্থানে হিমবাহের কার্যের সামান্য নিদর্শন আজও বর্তমান।

মহাদেশীয় হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ মজিয়া সমভূমির উৎপত্তি ও তাহার বিশেষত্ব (Glacial Lake Plains) : পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, টিল-সমভূমির হ্রদগুলি কালক্রমে মজিয়া যায়। আবার, হিমবাহের সম্মুখের ভূমি ক্রমউচ্চ হইলে যে অস্থায়ী হ্রদের (Marginal Lake) সৃষ্টি হয়, তাহাও শীঘ্র শীঘ্র লুপ্ত হয়। জলপ্রবাহের অবক্ষেপণ কার্যের ফলে গঠিত ভূ-ভাগ বলিয়া ইহা সমতল; প্রধানতঃ কাদা সঞ্চিত হইলে ইহা উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। প্রধানতঃ বালুকা সঞ্চিত হইলে ভূমি বেলেমাটিতে গঠিত হয় বলিয়া এইরূপ ভূমি কৃষিকার্যের উপযুক্ত নয়। উত্তর-আমেরিকার পঞ্চ-হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থানবিশেষ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের রেড্ নদীর অববাহিকা, উইনিপেগ হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি রহিয়াছে।

হিমবাহের সম্মুখের ভূ-ভাগে যে হ্রদের (Marginal Lake) উৎপত্তি হয়, তাহা জলপূর্ণ হইলে জল কোন নির্গম পথ দিয়া বাহির হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। হ্রদের বাড়্‌তি জল লইয়া যে সব জলধারা সৃষ্টি হয়, ইহারা ভূ-পৃষ্ঠে নদী-উপত্যকার সৃষ্টি করে। এইরূপ ক্ষেত্রে হিমবাহ হ্রদের জল অবরুদ্ধ করে। তাই, হিমবাহ গলিলে ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল অনুসরণ করিয়া জলধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে হিমবাহ ছিল, সে অংশ দিয়া জল বহিয়া চলে। কাজেই অস্থায়ী হ্রদ ও অস্থায়ী জলপ্রবাহ লুপ্ত হইতে পারে। এইরূপ স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে হ্রদ অবস্থিত ছিল, তথায় পলল স্তরে স্তরে সঞ্চয় হইয়া সমভূমি গঠিত হয়, আর, যে অংশে অস্থায়ী জলপ্রবাহ (Spillway) ছিল, তাহা পার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগ অপেক্ষা নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিম্ন অংশে রেলপথ, রাস্তা বা খাল নির্মাণ করা সুবিধা। জার্মানির বিখ্যাত মিডল্যাণ্ড-খাল হিমবাহ-সৃষ্ট নিম্ন-উপত্যকায় অবস্থিত। উত্তর-আমেরিকার পঞ্চ-হ্রদ হিমযুগে হিমবাহের দ্বারা সেন্ট লরেন্স নদীর প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়; ফলে হ্রদগুলির আয়তনও আরও বড় ছিল এবং হ্রদগুলির বাড়্‌তি জল মোহাক-হাডসন নদীপথে ও অন্যান্য দক্ষিণবাহিনী নদীপথে নিকাশ হইয়াছিল। হিমবাহের বরফ গলিলে সেন্ট লরেন্স নদীর প্রবাহপথ মুক্ত হইয়া যায় এবং ঐ সকল নদীগুলিও অবলুপ্ত হয়; কিন্তু উহারা যে উপত্যকা সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও তাহা বর্তমান।

পৃথিবীর বিভিন্ন হিমযুগ, তাহার উৎপত্তির হেতু এবং ইহার ফলাফল—গত দশ লক্ষ বৎসরে সম্ভবতঃ চারিবার পৃথিবীর জলবায়ু এত শীতল হয় যে, মহাদেশীয় হিমবাহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এক একবার পৃথিবীর জলবায়ু খুব শীতল হয় এবং উহার পরবর্তী সময়ে জলবায়ু উষ্ণ হইলে হিমবাহ প্রত্যাবর্তন করে। অতি-শীতল ও অতি-উষ্ণ জলবায়ুযুক্ত দুইটি যুগের মধ্যবর্তী সময়ই পৃথিবীর বর্তমান যুগ। তাই, বলা যায় যে, পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া এইরূপ অবস্থায় পৌছাইবে, তখন পৃথিবীতে মহাদেশীয় হিমবাহের অস্তিত্ব থাকিবে না। পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল বা উষ্ণ হইবার বা জলবায়ু-চক্রের কারণ,—(১) পৃথিবীর সৌর শক্তি গ্রহণের হ্রাস-বৃদ্ধি, (২) স্থলভাগের অবস্থান ও

আয়তনের পরিবর্তন, (৩) সমুদ্র-স্রোতের গতিপথের পরিবর্তন, (৪) বায়ুর চাপ-বলয়ের স্থান-পরিবর্তন এবং (৫) সম্ভবতঃ বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও আগ্নেয়গিরির ভস্মের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি। বর্তমান যুগে মেরুপ্রদেশের বরফরাশি সম্পূর্ণভাবে গলিলে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ ৮০ ফুট উচ্চ হইবে; ফলে নিম্নভূমির বহু অংশ সাগর গর্ভে নিমজ্জিত হইবে। আবার, পৃথিবীর শীতলতম জলবায়ু যুগে সাগর-পৃষ্ঠ আরও নিম্ন ছিল, উহা সম্ভবতঃ ১৫০-৩০০ ফুট নিম্ন ছিল। তাই, মহাদেশীয় হিমবাহ কেবলমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের রূপ-পরিবর্তন করে না, পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধিও করে।

সমভূমির তটরেখা (The Shore Feature of Plains): মানবের সমাজে, কর্মতৎপরতায়, ইতিহাসে তটরেখা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। তটরেখার এক পার্শ্বে স্থলভাগ এবং অপর পার্শ্বে জলভাগ; এই দুইটির প্রাকৃতিক দৃশ্য, পরিবহন-ব্যবস্থা ও কর্মতৎপরতা বিভিন্ন। এই স্থানেই স্থলভাগের যানবাহন ও জলপোত, এই দুইটির মধ্যে পরস্পর পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। তাই, ইহা বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এই কার্য সহজে ও সুলভে সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকা প্রয়োজন। কোন স্থানের তটরেখার প্রকৃতি, তটরেখার নিকট জলের গভীরতা ও ইহার নিকট ভূ-ভাগের প্রকৃতির উপর অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা নির্ভর করে।

বিভিন্ন প্রকৃতির তটরেখা গঠিত হইবার হেতু—তটরেখার প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নহে। নানা কারণে তটরেখার পরিবর্তন ঘটে,—(১) স্থলভাগের ভূ-পৃষ্ঠ বা সমুদ্রের তলদেশ উন্নত-অবনত হওয়া; (২) সমুদ্রের তরঙ্গের দ্বারা তটরেখার ক্ষয়সাধন-কার্য; (৩) সমুদ্রের দ্বারা অবক্ষেপণ-কার্য, (৪) স্থলভাগের উপর জলপ্রবাহের দ্বারা অবক্ষেপণ-কার্য এবং (৫) প্রবাল-কীটের দ্বারা সমুদ্রের তলদেশের পরিবর্তন-কার্য।

উপকূলের সমভুমির অংশবিশেষ মগ্ন হইয়া নূতন তটরেখার সৃষ্টি—প্রবল ভূ-আলোড়নের ফলে উপকূলের কঠিন কেলাসিত-শিলাময় সমভূমির অংশবিশেষ গভীরভাবে সাগর-গর্ভে মগ্ন হইলে, যে নব তটরেখার সৃষ্টি

হয়, তাহার সহজে পরিবর্তন ঘটে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, জলপ্রবাহ, সমুদ্র-স্রোত বা তরঙ্গের ক্ষয়সাধন সামান্য মাত্র। আবার, পৃথিবীর মহাদেশীয় হিমবাহের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলিলে সমুদ্রের জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া সাগর-পৃষ্ঠ উন্নত হইতে পারে; সেইরূপ ক্ষেত্রেও এইরূপ পরিবর্তন হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন ঘটিবার পূর্বে প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধনের জন্য যে রূপ পাইয়াছিল, অর্থাৎ সমোন্নতি রেখাগুলি (contour lines) যেভাবে ছিল, তাহাই রহিয়া যায়। তাই, এই স্থানে সাধারণতঃ খণ্ডিত তটরেখা গঠিত হয়,—উপসাগর, উপদ্বীপ, দ্বীপ প্রভৃতি গঠিত হয়। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলের উত্তরাংশ এই প্রকৃতির তটরেখা। এই অঞ্চলের কঠিন কেলাসিত-শিলায় গঠিত সমভূমি হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এখানে বহু চ্যুতি বর্তমান। ভূ-আলোড়নের ফলে উপকূলের এই সমভূমি মগ্ন হইয়াছে। গভীর নদী-উপত্যকাগুলি গভীর উপসাগরে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে মগ্ন-উপত্যক বা খাঁড়ি (Estuary) বলে। ইহাই **রিয়া-তটরেখা**। আবার, তটরেখার পার্শ্বের সমুদ্র অগভীর (ইহা মহীসোপানের অংশ হইলে) থাকিলে এবং মৃদু ঢালযুক্ত উপকূলের সমভূমি মগ্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উপসাগর ও উপদ্বীপ গঠিত হইতে পারে। তখন, এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ-কার্যের ফল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়—অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অগভীর সমুদ্রে পলল-অবক্ষেপণের ফলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। ফলে উপসাগরগুলি ভরাট হইয়া স্থলভাগে এবং উপদ্বীপের উচ্চঅংশগুলি নিম্নভূমিতে পরিণত হয়, কালক্রমে



স্কটলণ্ডের পার্বত্য উপকূল—প্রবল তরঙ্গের আঘাতে তটভূমির শিলার ক্ষয়-সাধন

তটরেখার বক্রতা কমিয়া সরলরেখার মত গঠন হয়। আবার, সমুদ্র-স্রোত ও তরঙ্গের কার্যের ফলে অগভীর উপসাগরের মুখে চরের (Bar) সৃষ্টি হয়, আর, উপসাগরের শীর্ষদেশে নদী-বাহিত পলল সঞ্চিত হইতে থাকে। এই উভয় কার্যের ফলে উপসাগরের মুখ ও শীর্ষদেশ, এই দুই অংশ ভরাট হইয়া যায়; হয়ত, উপসাগরের অবশিষ্ট অংশ লেগুনে পরিণত হয় এবং তটরেখার বক্রতা থাকে না, সরল প্রকৃতির হয়।

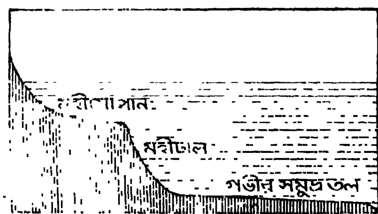
রিয়া প্রকৃতির তটরেখা (Ria Shore Lines)—এইরূপ প্রকৃতির তটরেখায় বহু ছোট ছোট উপসাগর ও উপদ্বীপ দেখা যায়। সাধারণতঃ কঠিন শিলাময় উপকূলের সমভূমি বসিয়া গিয়া ঐ প্রকৃতির তটরেখার সৃষ্টি হয়। কঠিন শিলাময় উপকূলের সমভূমিতে বহু উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী দুইটি উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি থাকে। এইরূপ অঞ্চল মগ্ন হইলে উপত্যকা-অংশ উপসাগরে এবং উচ্চভূমি অংশ উপদ্বীপে পরিণত হয়। আর কোন কোন বিচ্ছিন্ন উচ্চভূমি দ্বীপ সৃষ্টি করে। উপসাগরের মুখের জল গভীর এবং অভ্যন্তর ভাগ ক্রমশঃ অগভীর হইয়াছে। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব-উপকূলের উত্তরাংশের তটরেখা রিয়া প্রকৃতির।

রিয়া প্রকৃতি তটরেখার উপকারিতা—এই প্রকৃতির তটরেখাযুক্ত অঞ্চলে বহু গভীর উপসাগর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ দেখা যায়। আর, কোন কোন উপসাগরের তটরেখা এতই বক্র যে, তথায় বহু শাখা-উপসাগর রহিয়াছে। তাই, এই অঞ্চলে বহু ছোট-বড় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে। আবার, পোতাশ্রয়গুলি বাণিজ্যের সহায়ক। ইউরোপের পশ্চিম-উপকূল, গ্রেটবৃটনের পশ্চিম-উপকূল এবং মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলের উত্তরাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য রিয়া-উপকূল।

সদ্য-উত্থিত সমভূমির তটরেখা—উপকূলের নিকটস্থ অগভীর সমুদ্র বা মহীসোপান সাগর-পৃষ্ঠ হইতে অধিক উন্নত হইলে বিস্তীর্ণ নিম্ন-সমভূমি গঠিত হইতে পারে। আবার, মহাদেশীয় হিমবাহের বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও সাগর-পৃষ্ঠ নিম্ন হইয়া যায় ও তাহার ফলে ঐ প্রকৃতির সমভূমির উৎপত্তি হইতে

পারে। এই প্রকৃতির সমভূমির তটরেখা প্রধানতঃ অখণ্ডিত ও সরল। ইহার সরল প্রকৃতি তটরেখা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়,—সমুদ্র-স্রোত ও তরঙ্গের ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণের ফলে তটরেখা ক্রমশঃ বক্র আকার ধারণ করে।

সমুদ্রের ক্ষয়সাধনের ফলে তটরেখার বিশিষ্ট রূপ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর ও উপদ্বীপ লইয়া গঠিত বক্র তটরেখার উপদ্বীপের অগ্রভাগে বিশেষ-ভাবে তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ফলে উপদ্বীপের অগ্রভাগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে এবং উপদ্বীপ-প্রকৃতি-ভূ-ভাগ কালক্রমে লুপ্ত হয়। উপদ্বীপ-অংশ কঠিন শিলায় গঠিত হইলে ধীরে ধীরে এবং কোমল শিলায় গঠিত হইলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার, কঠিন ও কোমল, এই দুই প্রকৃতির শিলায় গঠিত তটভূমি তরঙ্গের আঘাতে বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তটরেখা বক্র আকার ধারণ করে। তটরেখা বায়ুপ্রবাহের গতি-পথের প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত হইলে ঐ অংশে অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর, তটভূমি উচ্চ হইলে ঐ ভূমির নিম্নদেশ (Base) অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে ঐ অংশ সুউচ্চ (cliff) হইয়া যায়। এই স্থানের কোন কোন অংশে গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এইরূপ উচ্চ তটভূমির শিলার প্রকৃতি, শিলার সংযোগস্থলের অবস্থান প্রভৃতির উপর ক্ষয়কার্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। তটভূমি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তটরেখা পশ্চাৎগামী হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ অগভীর সমুদ্রে পরিণত হয়। এইরূপভাবে সৃষ্ট সমুদ্রের অংশকে তরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়সাধনের ফলে **সৃষ্ট সোপান** (Wave-cut Terrace) বলা যাইতে পারে। এই অংশে নৌ-চলাচল বিপজ্জনক।



মহীসোপান ও মহীঢাল

সমুদ্রের অবক্ষেপণের ফলে তটরেখার বিশিষ্ট রূপ—সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গের আঘাতে তটভূমির শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আবার, ঐরূপ ক্ষয়জাত

শিলাখণ্ডগুলি তরঙ্গের দ্বারা বাহিত হইয়া পুনঃপুনঃ তটভূমিকে আঘাত করে। ইহার ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নুড়ি ও বালুকায় পরিণত হয়। জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্র-স্রোতের কার্যের ফলেও তটভূমির শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকা, কাদা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এই সকল ক্ষয়জাত শিলাখণ্ড ও নদীবাহিত পললরাশি তটরেখার নিকটস্থ সাগর-গর্ভে বা উপকূলের পার্শ্বে নানাভাবে সঞ্চিত হয়। ইহার ফলে তটরেখার রূপের এবং উপকূলের নিকটস্থ সাগর-গর্ভের পরিবর্তন হয়। এই অংশে মানুষের কর্মতৎপরতারও নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়—বন্দরের গভীর সমুদ্র অগভীর হইলে নৌ-চলাচলের অসুবিধা হয় ও বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। বন্দরের নিকটস্থ সাগর-শাখা বা সমুদ্রে এই সকল কার্য ও উহাদের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। জলের গতি-বিজ্ঞানের ইহা বিশিষ্ট অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে ভারতের কাণ্ডালা, কোচিন, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর উল্লেখ করা যায়।

ক্ষয়জাত পদার্থগুলি তরঙ্গ ও সমুদ্র-স্রোতের দ্বারা বাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত জলের তলদেশে সঞ্চিত হয়, যথা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর বা তটভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাঁজের মুখে। এই সকল স্থানে বালুকা, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া মগ্ন চরের (Bar) সৃষ্টি করে। উহা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বালুকা ও কঙ্করময় বেলাভূমিতে (Beaches of sand or pebbles) পরিণত হয়। তটভূমির শিলা অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এমন কি ঐরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত তটভূমির সম্মুখেও বেলাভূমির সৃষ্টি হইতে পারে; তবে ইহা অস্থায়ী, কারণ নবগঠিত বেলাভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে এবং পুনরায় সঞ্চিত হইয়া এইভাবে আর একটি বেলাভূমি সৃষ্টি হইতে পারে। আবার, কখন কখন উচ্চ তটভূমির পার্শ্বে যে টেরাসের (Wave-cut Terrace) সৃষ্টি হয়, তাহার সম্মুখে বালুকা, কঙ্কর প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট টেরাসের (Wave-built Terrace) সৃষ্টি হয়। ফলে সমুদ্র অগভীর হয়। উপকূলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত সমুদ্র-স্রোত বা জলের নিম্ন অংশের বিপরীতমুখী স্রোতের (undertow) দ্বারা ক্ষয়জাত পদার্থগুলি উপকূলের পার্শ্ব দিয়া বাহিত হইয়া, হয়ত, দূরের কোন খাঁজে বা গভীর জলের তলদেশে কতকটা শৈলশিরা

আকৃতিবিশিষ্ট মগ্ন চরের সৃষ্টি করে। কালক্রমে সাগর-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চ হইয়া উঠে, উহাই স্পিট (spits)। ক্ষুদ্র উপসাগরে মুখে এরূপ স্পিটের গঠন কতকটা হুকের (Hook) মত। কখন কখন অগভীর উপসাগরে মুখে চর (Bar) এইভাবে গঠিত হইয়া ইহাকে সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই বিচ্ছিন্ন জলভাগকে **লেগুন** বলে। মালাবার উপকূলে এইরূপ বহু লেগুন আছে। আবার, কখন কখন এই প্রকৃতির চর কোন দ্বীপকে প্রধান স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত করে।

সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ু সজোরে বহিতে পারে, কারণ তথায় বায়ুপ্রবাহের কোন বাধা থাকে না। আর, বায়ুপ্রবাহ সাগর-পৃষ্ঠে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এইজন্য ভারতের পার্শ্ববর্তী সাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম-বায়ু প্রবাহিত হইলে সাগর-পৃষ্ঠ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ হয়। তটভূমি, প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহকে গতিরোধ করিলে, উহা প্রবল তরঙ্গের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়; আর, ইহার বিপরীত পার্শ্বে তটভূমি অবস্থিত হইলে, উহার সম্মুখ অংশের সাগর-পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবাপন্ন থাকে। এইজন্য এই অংশে ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়। আবার, তটভূমির সম্মুখস্থ সাগরের প্রশস্ত অংশ অগভীর হইলে এই অংশ তরঙ্গের দ্বারা বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তটরেখা হইতে কয়েক শত গজ দূরে তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অগভীর অংশে তরঙ্গের শক্তি কমিয়া যায়। এই অগভীর অংশে তরঙ্গগুলি যতটুকু ক্ষয়সাধন করে, তাহা প্রত্যাবর্তন করিবার সময় অগভীর অংশের প্রান্তভাগে (যে স্থানে তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া যায়) ক্ষয়জাত পদার্থগুলিকে সঞ্চিত করে। ইহার ফলে তথায় তটরেখার সহিত কতকটা সমান্তরালভাবে অবস্থিত মগ্ন চরের সৃষ্টি হয়। পুরীর তটভূমির সম্মুখে কয়েক শত গজ দূরে এইভাবে মগ্ন চরের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার, কালক্রমে মগ্ন চর উন্নত হইয়া কতকগুলি দ্বীপের (Bars) সৃষ্টি করে। এইগুলি সংকীর্ণ ও দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট। ক্রমশঃ দ্বীপগুলি সংযুক্ত হইয়া যায় এবং উহার অভ্যন্তরস্থ অগভীর সমুদ্র-অংশ লেগুনে পরিণত হইতে পারে। লেগুনে, হয়ত, দুই চারিটি নদী পতিত হয়। তখন নদী-বাহিত জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া চরের কোন অংশ দিয়া জল-নির্গম-পথের

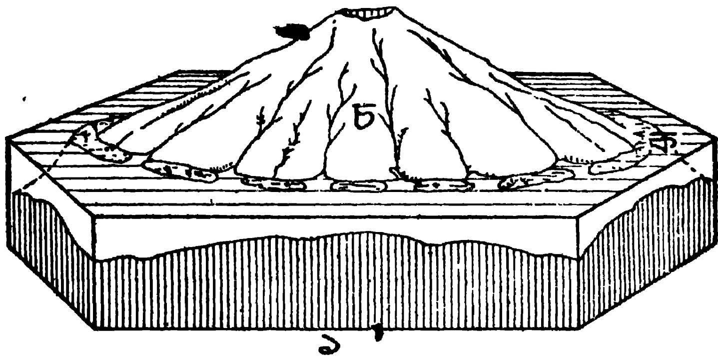
সৃষ্টি হয়। আর, ঐ পথ দিয়া সমুদ্রের জোয়ারের জল লেগুনে প্রবেশ করে ও ভাটার সময় বাহির হইয়া যায়। উহাকে জোয়ার-ভাটার নির্গম-পথ (Tidal inlets) বলা যায়। কতকটা এইভাবে চিল্কা হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। তট-রেখার বৃহৎ খাঁজ (বা উপসাগর, Bay), দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ, চিল্কা হ্রদে পতিত নদীগুলির পলি, অগভীর সমুদ্র—এইগুলির মিলিত কার্যের ফলে চিল্কা হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট চরের সকল অংশ তটরেখার সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত নহে, স্থানেস্থানে প্রধান ভূ-খণ্ডের সহিত সংযুক্ত (প্রধান ভূ-খণ্ডের যে অংশ সমুদ্রের দিকে প্রসারিত) আর, মধ্যে মধ্যে সাগরের সহিত লেগুনের সংযোগ পথ রহিয়াছে। নাব্য খালের দ্বারা লেগুনগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইলে জলপথের সৃষ্টি হয়। এইরূপ জলপথ সাধারণতঃ সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত নহে, কারণ প্রত্যেক লেগুন গভীর না হইতে পারে। সমুদ্র হইতে লেগুনগুলির প্রবেশপথও সব সময় সুনাব্য নহে; কারণ লেগুনের জল শান্ত প্রকৃতির হইলেও বায়ুপ্রবাহ প্রবল থাকিলে সাগর-পৃষ্ঠ উত্তাল তরঙ্গময় হইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের মধ্য দিয়া জাহাজ চালান বিপদজনক। ঐ স্থানে সাধারণতঃ মগ্ন চর থাকে বলিয়া জাহাজ উহার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মগ্ন হইতে পারে। মালাবার উপকূলের লেগুনগুলিকে সংযোগ করিয়া নাব্য খাল নির্মাণ করা হইয়াছে। কেরলের কোচিন বন্দর এইরূপ একটি লেগুনের কূলে অবস্থিত। এই লেগুনের প্রবেশ-পথকে অবশ্য গভীর করিতে হইয়াছে।

বিরামহীনভাবে তরঙ্গের কার্য চলে। লেগুনের চরের সম্মুখভাগে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ আঘাত করে ও উহাকে ক্ষয় করে। চরের বেলাভূমির বালুকা বায়ুবাহিত হইয়া চরের বিপরীত পার্শ্বে সঞ্চিত হয়, ফলে চর প্রশস্ত হইয়া যায়। লেগুনে পতিত নদীগুলি পললরাশি বহন করিয়া লেগুনের অগভীর জলের তলদেশে সঞ্চিত করে। এই দুইটি কার্যের ফলে লেগুন ক্রমশঃ মজিয়া যায় ও লেগুন লবণাক্ত জলের জলাভূমিতে পরিণত হয়। আর, লেগুনের চর বেলাভূমিরূপে গঠিত হয়। এইরূপ পরিবর্তন হইতে হাজার হাজার বৎসর সময় লাগে।

জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ-বাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের অবক্ষেপণের ফলে তটরেখার বিশিষ্ট-রূপ প্রাপ্তি—নদী সাগরে পতিত হইলে ইহার মোহনায় সাধারণতঃ ব-দ্বীপ গঠিত হয়। ব-দ্বীপের ভূমি সাগরের দিকে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। এইজন্য ব-দ্বীপের তটরেখা সমুদ্রের দিকে উত্তল আকৃতির (Convex front to the sea)। মহাদেশীয় হিমবাহের কার্যের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে গঠিত হইয়া, পরে উহা তটভূমিতে পরিণত হইলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির তটরেখা সৃষ্টি করে। টিল-সমভূমির অংশ সাগরে মগ্ন হইলে খণ্ডিত তটরেখার এবং আউট-ওয়াশ সমভূমি মগ্ন হইলে অখণ্ডিত তটরেখার সৃষ্টি করে। আবার, গ্রীনলাণ্ড বা আলাস্কার তটরেখা হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট।

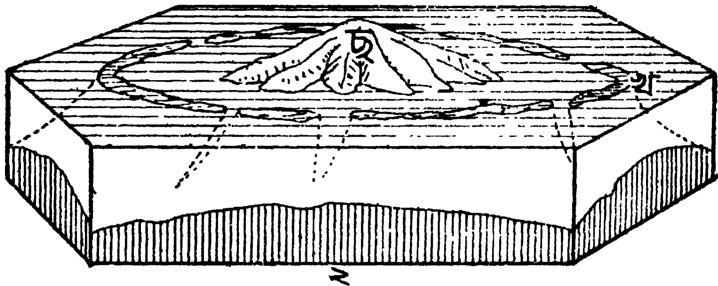
সমুদ্রের তরঙ্গগুলি তটভূমিতে বালুকা সঞ্চিত করে। বালুকারাশি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। দেশের অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহ প্রবল থাকিলে অভ্যন্তরভাগ অভিমুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বালুকা বাহিত হয়। বেলাভূমির বালুকার পরিমাণ অধিক হইলে ও বায়ুপ্রবাহ প্রবল থাকিলে মরুভূমির ন্যায় এই অঞ্চলে বালিয়াড়ি গঠিত হয় এবং উহা স্থলভাগের অভ্যন্তরভাগের দিকে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত উপকূলের বালিয়াড়ি অধিক দূর অগ্রসর হয় না, কারণ নানারূপ উদ্ভিজ্জ বালিয়াড়িতে জন্মায়; ফলে, উহার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। পশ্চিম-বঙ্গের কাঁথি-মহকুমার উপকূলে বালিয়াড়ি রহিয়াছে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের উপকূলে বালিয়াড়ির অগ্রগতি নিবারণের জন্য ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

প্রবাল কীটের দ্বারা বেলা-শৈলের সৃষ্টির ফলে তটরেখার বিশেষ প্রকৃতির রূপের উৎপত্তি—উষ্ণমণ্ডলের অগভীর সাগরে প্রবাল-কীট নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থি হইতে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। চুন জাতীয় পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহা চুনাপাথরে পরিণত হয়। অনুকূল অবস্থায়, কখন কখন উপকূলের নিকটস্থ অভীর জলে উপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে **বেলা-শৈল** গঠিত হইতে পারে। ঐরূপ বেলা-শৈলকে **প্রবাল প্রাচীর** (Barrier Reef) বলে। প্রশস্ত লেগুনের দ্বারা প্রবাল-প্রাচীর প্রধান ভূ-ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন



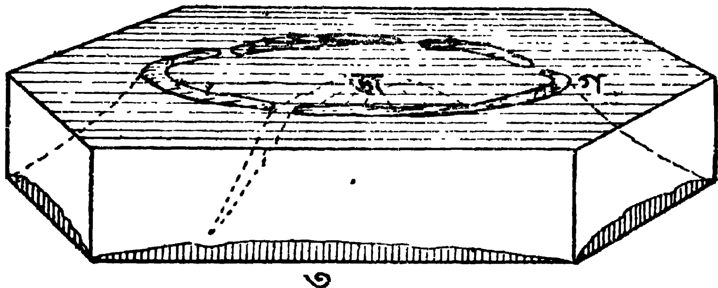
১

আগ্নেয়গিরিযুক্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের উপকূলের পার্শ্বে বেলা-শৈলের উৎপত্তি



২

আগ্নেয়গিরিযুক্ত দ্বীপটি অধিকাংশ সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছে ; জলপ্রবাহের দ্বারা আগ্নেয়-গিরি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, বেলা-শৈল ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার অভ্যন্তরভাগে লেগুনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বেলা-শৈল প্রবাল-প্রাচীরে পরিণত হইয়াছে



৩

ঐ দ্বীপটি সমুদ্রগর্ভে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হইয়াছে, প্রবাল-প্রাচীর প্রবাল-বলয়ে পরিণত হইয়াছে এবং মধ্যস্থ জলভাগই লেগুন

দেখা যায়। একটি সুদীর্ঘ প্রবাল-প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার মাইল এবং ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রবাল-প্রাচীর। রিফ্ বা বেলা-শৈলগুলি সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরি-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপকে বেষ্টন করে। আগ্নেয়গিরিযুক্ত দ্বীপটি ক্রমশঃ বসিয়া যায়, প্রবাল-কীটের অস্থির দ্বারা বেলা-শৈল (fringing reef) ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। কালক্রমে আগ্নেয়গিরি সাগর-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন হইলে নিমজ্জিত হয়। ঐ অংশ লেগুনে পরিণত হয়। আর, বেলা-শৈলকে তখন **প্রবাল-বলয়** (Atoll) বলে; কারণ উহার আকৃতি বলয়ের মত।

মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল (Ice-Scoured Hill Regions): সমভূমি অপেক্ষা পাহাড়িয়া অঞ্চল উচ্চ। এইজন্য মহাদেশীয় হিমবাহের বরফরাশির গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম, তবে ইহার প্রায় সর্ব অংশ বরফের আবরণে ঢাকা থাকে; হয়ত, দুই-একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়া বরফের উপর মাথা উঠাইয়া থাকিতে পারে। হিমবাহের দ্বারা আবৃত হইবার পূর্বে পাহাড়িয়া অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নদী-উপত্যকা, মালভূমি, বন্ধুর-ভূমি প্রভৃতিতে গঠিত হইলেও হিমবাহের কার্যের ফলে ইহার ভূ পৃষ্ঠের রূপের পরিবর্তন ঘটে,—বন্ধুর ভূ-ভাগ মসৃণ, পাহাড়ের সূচাগ্র চূড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গোলাকৃতি, স্থানে স্থানে রোচে মুতোন্ন (Roche mountonnée) আকৃতিবিশিষ্ট শিলাময় অংশ, প্রশস্ত উপত্যকা, মৃত্তিকার আবরণহীন শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠ ও তথায় এলোমেলোভাবে ছড়ান ছোট-বড় বিভিন্ন কোণযুক্ত অমসৃণ শিলাখণ্ড এই অঞ্চলে দেখা যায়। আর, এই অঞ্চলে রহিয়াছে ছোট-বড় অসংখ্য হ্রদ, খরস্রোতা নদী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য। আবার, নদীগুলি স্থানে স্থানে ছোট-বড় জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। জলপ্রপাত-গুলি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক।

মৃত্তিকাশূন্য ভূ-পৃষ্ঠ কৃষিকার্যের উপযোগী হইতে পারে না। তাই, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কাষ্ঠ সংগ্রহ করা ও শিকার করা।

স্থানবিশেষে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়ায় ঐ অংশ তৃণভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এরূপ স্থানে মেষ-চারণ হয়। প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই অঞ্চলে বিবিধ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাগজ, কাষ্ঠ-মণ্ড, ধাতু-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

কানাডা-শিল্ডের বন্ধুর অংশবিশেষে এইরূপ প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যায়। ইহাছাড়া, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইংল্যাণ্ড স্টেট্‌, স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি, এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া-উপদ্বীপের অংশবিশেষে এইরূপ প্রকৃতির পাহাড়িয়া অঞ্চল আছে। এই অংশগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন রূপান্তরিত-শিলায় গঠিত। স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি ভিন্ন প্রায় সর্বত্রই সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের পিনাইন পর্বতমালা কতকাংশ পাললিক শিলায় গঠিত বলিয়া ইহার অপেক্ষাকৃত নিম্নঅংশে, যেমন উপত্যকায়, বেসিনে মোরেন সঞ্চিত হইয়াছে। তাই ঐ অংশগুলি অপেক্ষাকৃত উর্বর। এই স্থানে কৃষিকার্য ও পশুপালন হয়।

উপত্যকা-হিমবাহের কার্যের ফলে পার্বত্য-ভূমির রূপের পরিবর্তন ও ঐ রূপের বৈশিষ্ট্য—জলের তাপমাত্রা ০° সে. হইলে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। সুতরাং কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা ০° সে. কিংবা ইহা অপেক্ষা কম হইলে নদনদী, জলাশয়ের জল জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং

বিভিন্ন অক্ষাংশে হিমরেখার উচ্চতা

ঐরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ তুষার দেখা যায়। সারাবৎসর হিমমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ঐরূপ থাকে বলিয়া এখানে চির-তুষারক্ষেত্র রহিয়াছে। আবার, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই তাপমাত্রা কম দেখা যায়। তাই, এইরূপ

উচ্চতায় পৌঁছান যায় যে, সেই উচ্চতার বায়ুর তাপমাত্রা ০° সে.; সেখানে জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে। এই উচ্চতা ঋতুভেদে কম-বেশী হইবে,—গ্রীষ্মকালে বাড়িবে এবং শীতকালে কমিবে। যে উচ্চতায় গ্রীষ্মকালেও বরফ গলিবে না, অর্থাৎ সেই অংশের বায়ুর তাপমাত্রা ০°সে. অপেক্ষা কম, সেই উচ্চতাকে **হিমরেখা** বলে। কোন স্থানের হিমরেখা, সেই স্থানের অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে,—নিরক্ষরেখার নিকট ১৮ হাজার ফুট উচ্চে, আল্পস্ পর্বতে ৯ হাজার ফুট উচ্চে এবং মেরুপ্রদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠে হিমরেখা অবস্থিত। চিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের হিমরেখার উচ্চতা লক্ষ্য কর।

হিমরেখার ঊর্ধ্বে পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত হয়। পেঁজা তুলার মত তুষার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলের মত আকারে জমাট বাঁধে। এই কেলসিত তুষার (ne've') সঞ্চিত হইয়া তুষারক্ষেত্র পরিণত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইলে বিরাট স্তূপের সৃষ্ট হয়। তখন উপর অংশের প্রবল চাপে নীচের অংশ কঠিন বরফে (Ice) পরিণত হয়। এইরূপ বিরাট বরফ-স্তূপ বিবিধ বরফ-স্তরে গঠিত,—এক একটি তুষারপাত একটি স্তরের সৃষ্টি করে। আবার, বরফ-স্তূপে উপর অংশে কেলসিত বরফ (ne've') ও তুষার দেখা যায়। এইরূপ বরফ-স্তূপ পর্বতগাত্র বহিয়া নীচের দিকে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে। এই গতিশীল বরফ-স্তূপকে হিমবাহ (Glacier) বলে।

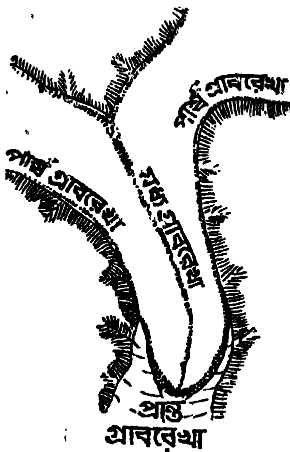
উপত্যকার উচ্চ অংশের প্রান্তদেশে তুষারক্ষেত্র অবস্থিত হইলে উপত্যকা বাহিয়া হিমবাহ নিম্নে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। ইহাকে **উপত্যকা-হিমবাহ** (Valley Glacier) বলে। হিমরেখার নিম্নে অবতরণ করিলে হিমবাহ গলিয়া যায়। হিমবাহ কেলাসিত কঠিন বরফ-কণিকা লইয়া গঠিত। তাই, ইহার গতির বিশেষত্ব আছে—তরল পদার্থ বা পিচের মত সান্দ্র পদার্থের মত গতি নহে। হিমবাহের তলদেশের কঠিন বরফ ভূ-পৃষ্ঠের শিলার সহিত শক্তভাবে আটকাইয়া থাকে। বরফ-কণার দ্বারা গঠিত বহু আনুভূমিক তল লইয়া হিমবাহ গঠিত। উপরের তল, তাহার নীচের তলের উপর দিয়া একটু অগ্রসর হয়। [কৃন্তন-ক্রিয়া (Shear)] এইজন্য নীচের তলের অপেক্ষা উপরের তলের গতি অপেক্ষাকৃত

অধিক। আর, পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মধ্যদেশের এবং তলদেশ অপেক্ষা উপরদেশের বরফের গতি অপেক্ষাকৃত অধিক। ঘর্ষণমাত্রার তারতম্যের জন্য হিমবাহের বিভিন্ন অংশের গতির এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আবার, জলবায়ু, বরফের পরিমাণ ও ভূমির ঢালের উপর হিমবাহের গতিবেগ নির্ভর করে। উপত্যকার তলদেশের পৃষ্ঠ বন্ধুর হইলে বা উপত্যকায় বহু বাঁক থাকিলে হিমবাহের কঠিন বরফ আড়াআড়িভাবে ফাটিয়া যায় (deep transverse cracks—crevasse)। ফাটলগুলি সাধারণতঃ গভীর। ফাটলগুলি প্রশস্ত হইতেও পারে। আবার, হিমবাহের উপর তুষারপাত হইলে ফাটলের মুখ তুষারাচ্ছিন্ন হইতে পারে। এইজন্য হিমবাহের উপর চলাফেরা বিপদ-সঙ্কুল।

উপত্যকার মধ্য দিয়া হিমবাহ অগ্রসর হইবার সময় উপত্যকার তলদেশের ও পার্শ্বদেশের শিথিল শিলা বা বিক্ষিপ্ত শিলা হিমবাহের বরফের সহিত দৃঢ়ভাবে আট্‌কাইয়া যায় ও শিলাখণ্ডগুলি উহার সহিত বাহিত হয়। আবার, এই সকল শিলাখণ্ডের দ্বারা উপত্যকার গাত্রদেশ মসৃণ হয়, বাঁকের মুখের শিলা অপসারিত হয়। ইহার ফলে V-আকারের নদী-উপত্যকা, U-আকারের উপত্যকায় পরিণত হয় ও উপত্যকা প্রশস্ত হইয়া যায়। হিমবাহ নূতন উপত্যকা সৃষ্টি করে না, বরং পূর্ব-সৃষ্ট উপত্যকায় নূতনভাবে রূপদান করে। উপহিমবাহ প্রধান হিমবাহের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের উপত্যকার তলদেশ বিভিন্ন তলে অবস্থিত থাকে,—প্রধান হিমবাহের উপত্যকার তলদেশ অপেক্ষা উপহিমবাহের উপত্যকার তলদেশ উচ্চে অবস্থিত; ইহার কারণ, প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টির ক্ষয়কার্য কম। উপহিমবাহের উপত্যকাকে **ঝুলান উপত্যকা** (Hanging valley) বলে। হিমবাহ অপসারিত হইবার পর, এইরূপ উপত্যকায় প্রবাহিত নদী, এই অংশে জলপ্রপাত সৃষ্টি করে। এখানে বহু উচ্চ স্থান হইতে জল পতিত হয় বলিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

উপত্যকা-হিমবাহের অগ্রভাগের গঠন উত্তল বা জিভের মত। হিমবাহ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে পৌছাইলে ইহার অগ্রভাগের বরফ ক্রমশঃ গলিয়া যায়। উপত্যকার পার্শ্বদেশ হইতে যে সকল শিলাখণ্ড হিমবাহের

দ্বারা বাহিত হয়, তখন জিভের মত আকারবিশিষ্ট হিমবাহের পার্শ্বে ঐগুলি সঞ্চিত হইয়া যে শিলাস্তূপ গঠিত হয়, তাহাকে **পার্শ্ব-গ্রাবরেখা** (Lateral Moraine) বলে। দুইটি হিমবাহ দুই দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইলে উহাদের মধ্যবর্তী অংশ দিয়া শিলখণ্ড-গুলি বাহিত হয় এবং জিহ্বা-আকৃতি হিম-বাহের অগ্রদেশের মধ্যভাগে সঞ্চিত হয়। এইরূপ শিলাস্তূপকে **মধ্য-গ্রাবরেখা** (Medial Moraine) বলা হয়। পার্শ্ব-গ্রাবরেখা ও মধ্য-গ্রাবরেখা, এই দুইটি হিমবাহ-সৃষ্ট উপত্যকার অন্যতম বিশেষত্ব। হিমবাহের অগ্রঅংশের শেষ প্রান্তে বরফ গলিয়া যায় এবং অর্ধ-চন্দ্রাকারে শিলাখণ্ড সঞ্চিত হয়। এই শিলাস্তূপকে **প্রান্ত-গ্রাবরেখা** (End Moraine) বলে। প্রান্ত-গ্রাবরেখা কেবলমাত্র উপত্যকার তলদেশে সঞ্চিত হয়। আবার, জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইলে বা তুষারের পরিমাণ কমিলে হিমবাহ ক্রমশঃ প্রত্যাবর্তন করে, তখন, প্রান্ত-গ্রাবরেখাগুলি একটির পশ্চাতে আর একটি গঠিত হয়।

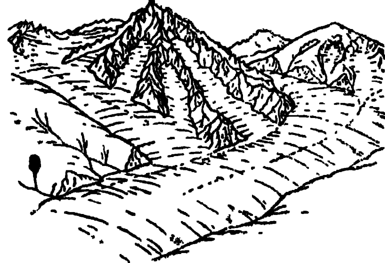


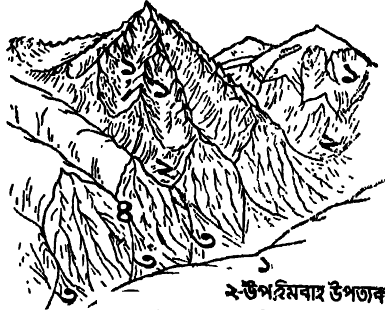
হিমবাহ ও গ্রাবরেখা

উচ্চ অক্ষাংশের (High Latitude) জলবায়ু শীতল। এই অঞ্চলের হিমবাহ ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে সমুদ্র-উপকূলে উহার অগ্রভাগের বিরাট অংশ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। ঐরূপ ভাসন্ত বরফ-স্তূপকে **হিম-শৈল** (Iceberg) বলে।

হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য—হিমবাহের দ্বারা উপত্যকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উপত্যকার পার্শ্বদেশ সু-উচ্চ; তলদেশ প্রশস্ত, গভীরতর ও অবতল অর্থাৎ U-অক্ষরের নিম্নাংশের মত এবং শাখা-শৈলশিরাযুক্ত বাঁক (Cverlapping spurs) অপসারিত হইয়া সরল আকৃতি

উপত্যকা দেখা যায়। আর, উপত্যকার তলদেশে স্থানে স্থানে ছোট বড় শিলাখণ্ড ছড়ান থাকে। জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া নদী-উপত্যকার নিম্ন অংশ পর পর অবস্থিত, উজান দিকের কোন অংশ, পরবর্তী অংশ হইতে নিম্ন হইতে পারে না। হিমবাহ-উপত্যকার নিম্ন অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশ বাহিতে পারে; কারণ বিরাট বরফ-স্তূপের বিশাল ভরের জন্য (Great mass) হিমবাহ এইরূপ উচ্চ স্থান অতিক্রম করিতে পারে। উপত্যকার তলদেশের স্থান বিশেষ কঠিন শিলায় ও স্থান বিশেষ কোমল শিলায় গঠিত হইলে, হিমবাহের দ্বারা বিভিন্ন-ভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। আবার, উপত্যকার তলদেশে স্থানে স্থানে মোরেন সঞ্চিত হইতে পারে। এইজন্য এইরূপ উপত্যকার তল-দেশ কতকগুলি সোপানে বা স্থানে স্থানে নিম্নাংশে বা বেসিনে পরিণত হয়। তাই, তলদেশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বা স্থানে স্থানে সঞ্চিত মোরেনের দ্বারা বাঁধের মত গঠন হইলে বেসিনে পরিণত হইতে পারে। একই উপত্যকায় পর পর কতকগুলি বেসিন থাকিতে পারে; আবার, কোন কোন বেসিন বড় আকৃতির হইতে





(১) সার্ক

বামপার্শ্বের উপরের চিত্র—পার্বত্য অঞ্চল ও উপত্যকা-হিমবাহ

নিম্নের চিত্র—ঐ পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহের কার্যের ফলাফল,—পর্বতের উচ্চ-অংশ হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই; কেবলমাত্র পর্বত-গাত্র ও উপত্যকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে পর্বত-শৃঙ্গের পার্শ্বদেশ অধিক ঢালু ও বন্ধুর হইয়াছে, ঐ অংশে সার্ক, আরেত, কল, হর্ণ প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে।

পারে। বেসিনে জলসঞ্চিত হইয়া হ্রদের উৎপত্তি হয়। আল্পাসের কমো, গার্ডা, ম্যাজোরে হ্রদগুলি এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

হিমবাহ-উপত্যকার শীর্ষদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করে,—গোলাকৃতি গর্ত ও উহার পার্শ্বদেশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। গর্তের উপর দিক বন্ধ ও নীচের দিক উন্মুক্ত। ইহাকে **সার্ক** (Cirque) বলে। নদী-উপত্যকার শীর্ষদেশে এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট অংশ দেখা যায় না। উচ্চ পার্বত্যভূমির পার্শ্ব-ই উপত্যকার শীর্ষদেশ। এই উচ্চভূমির তুষারপাতের তুষার-রাশি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এখানে তুষারক্ষেত্রের উৎপত্তি হয় এবং উহা জমাট বাঁধিয়া গঠিত করে বিরাট বরফস্তূপ। তখন ইহার বরফরাশি উপত্যকার শীর্ষদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে উপত্যকা-হিমবাহের উৎপত্তি।

গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উচ্চভূমির বরফস্তূপের প্রান্তের বরফরাশি সামান্য পরিমাণে গলিতে পারে; তখন বরফ-গলা জল উপত্যকার শীর্ষদেশের শিলাস্তরের ফাটলে প্রবেশ করে এবং রাত্রিতে শৈত্যের জন্য ফাটল-মধ্যস্থ জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। ইহার আয়তন বৃদ্ধির জন্য যে প্রবল চাপের উৎপত্তি হয়, তাহার দ্বারা এইস্থানের শিলাস্তর ফাটিয়া যায়। এইরূপ কার্যের ফলে অবশেষে এই অংশের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আবার, বরফ-গলা জল ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ডগুলির মধ্য দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া বহিয়া যায়। আর, শিলার কোন কোন খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইয়া জলপ্রবাহেয় সহিত বাহিত হয়; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলাকণাও জলের দ্বারা অপসারিত হয়। তাহা ছাড়া, কখন কখন বরফস্তূপ হইতে বরফের ছোট-বড় টুকরা ভাঙ্গিয়া এখানে হঠাৎ পড়ে (হিমানী-সম্প্রপাত)। এই কার্যের ফলে এই অংশের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে জলের ও বরফের কার্য চলে। ইহার ফলে উপত্যকার শীর্ষদেশে যে অর্ধচন্দ্রাকার গর্তে পরিণত হয়, তাহাকে **সার্ক** বলে। ইহার পশ্চাৎপার্শ্ব খাড়া, সম্মুখ অংশ উন্মুক্ত এবং পার্শ্বদেশও খাড়াখাড়িভাবে থাকে। আর, এই উপত্যকার পরবর্তী অংশের তলদেশ অপেক্ষা সার্কের তলদেশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন এবং ইহার তলদেশ সম্মুখ অংশ হইতে পশ্চাৎ অংশের

দিকে ক্রমনিম্ন ("The down-at-the-heel")। সার্কের তলদেশের গঠন এইরূপ হওয়ায়, এখানে জল সঞ্চিত হইতে পারে, অবশ্য হিমবাহ অপসারিত হইলে। এইরূপ ক্ষেত্রে এখানে হ্রদের উৎপত্তি হয়। ২২৭ পৃষ্ঠার চিত্রে লক্ষ্য কর। বরফে ঢাকা থাকা বলিয়া সার্কগুলিকে দেখা যায় না। হিমবাহ গলিলে তখন সার্কগুলিকে দেখা যায়।

কখন কখন কোন উচ্চভূমির দুইটি পরস্পর বিপরীত পার্শ্বদেশে সার্কের সৃষ্টি হয়। উভয় পার্শ্বের সার্কগুলি পশ্চাৎপার্শ্ব ক্ষয় হইবার ফলে, বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত সার্কগুলি পরস্পব নিকটবর্তী হয় এবং কালক্রমে উহাদের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি (Divide) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুরাধার শীর্ষবিশিষ্ট শৈলশিরায় পরিণত হয়। ঐরূপ আকৃতির শৈলশিরাকে **আরেত** (Arete) বলে। প্রধান আরেত-এর পার্শ্বে শাখা-আরেত্ও থাকিতে পারে। আবার, আরেত-এর ক্ষুরাধার শীর্ষদেশের স্থানবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন হইয়া যায়। তাই, আরেত-এর শীর্ষদেশের এই অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশগুলি যেন এক-একটি ফাঁকের (Gap) মত গঠন। ঐরূপ নিম্নঅংশকে **কল** (Col) বলে। কলের উচ্চতম অংশ বা শীর্ষদেশও ক্ষুরাধার (Sharp-edged gap) ও বক্রাকার—বৃত্তের চাপের মত অংশ। বড় বড় ও সুউচ্চ পর্বতমালার কলের উচ্চতম অংশের তীক্ষ্ণ কিনারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে ও ঐ অংশে ক্ষয়জাত শিলা সঞ্চিত হইতে পারে। তখন কলের তলদেশ কতকটা মসৃণ হয় (Smothed trough)। ও উহার গঠন তরঙ্গের নিম্ন অংশের মত। আবার, কোন উচ্চভূমির চতুর্পার্শ্বে সার্ক অবস্থিত হইলে, সার্কগুলি পরস্পর নিকটবর্তী হয় এবং কালক্রমে ঐ উচ্চভূমি সূচ্যগ্র গিরিশৃঙ্গে পরিণত হয়। উহাকে **হর্ণ** (Horn) বলে।

হিমালয় পর্বতমালা সুউচ্চ এবং ইহার উচ্চ-অংশ তুষারমণ্ডিত। তাই, এখানে চির-তুষারক্ষেত্র রহিয়াছে। এইজন্য বহু উপত্যকা-হিমবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। সার্ক, আরেত, কল প্রভৃতি এখানে দেখা যায়। এভারেস্ট শৃঙ্গের নিকট বেশ বড় বড় কল আছে, আবার, কোন কোন কলের তলদেশ কতকটা মসৃণ। আল্পসের ম্যাটারহর্ন হর্ণ-আকৃতির গিরিশৃঙ্গ।

উপত্যকা-হিমবাহের পরিবর্তন-চক্র (The Cycle of Glaciation by Valley Glaciers)—পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন-চক্র আছে,—কোন যুগ অতি-শৈত্যযুক্ত এবং পরবর্তী যুগ উষ্ণযুক্ত; আবার, তাহার পর শৈত্যযুক্ত জলবায়ু—এইরূপভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন-চক্র চলিতেছে। শৈত্যযুক্ত জলবায়ুতে হিমবাহের সৃষ্টি এবং ইহার পরবর্তী যুগের জলবায়ু উষ্ণ হইলে ঐস্থান হইতে হিমবাহ অপসারিত হয় অর্থাৎ হিমবাহের বরফ গলিয়া যায়। সুতরাং একই উপত্যকায় কোন এক যুগে হিমবাহ এবং পরবর্তী যুগে নদী প্রবাহিত হয় কিংবা এক যুগে নদী ও পরবর্তী যুগে ঐস্থানে হিমবাহ দেখা যায়। নদী-প্রবাহ উপত্যকার যে রূপ দান করে, তাহা, আবার, ঐস্থানে হিমবাহের সৃষ্টি হইলে ঐ উপত্যকা রূপের পরিবর্তন করিয়া এক নবরূপ ধারণ করে। ইহার কারণ, হিমবাহ বা নদী-প্রবাহের ক্ষয়কার্য বিভিন্ন প্রকৃতির।

মনে করা যাক, কোন এক স্থানের জলবায়ুর পরিবর্তন-চক্র চলিতেছে। ঐস্থানের উষ্ণ জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল হইলে ঐস্থানের উপত্যকার নিম্নলিখিতভাবে ক্রমশঃ পরিবর্তন হইবে,—ছোট-বড় নদী-উপত্যকায় নদী প্রবাহিত; উহাদের উৎস-ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হইবে ও ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ বাড়িবে; তখন ক্রমে ক্রমে তুষারক্ষেত্রের ও হিমবাহের উৎপত্তি হইবে। হিমবাহের বরফের পরিমাণ বেশী হইলে নদী-উপত্যকা বহিয়া অবতরণ করিবে; আর, নদীর উৎপত্তি-স্থান ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসিবে এবং কালক্রমে সমগ্র উপত্যকা হিমবাহের বরফে পরিপূর্ণ হইবে। আর, হিমবাহের প্রভাবে উপত্যকার ক্ষয়কার্য চলিবে,—উপত্যকার পার্শ্বদেশে ও তলদেশের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং স্পারগুলি অপসারিত হইবে; ফলে উপত্যকা গভীর, প্রশস্ত ও সোজা আকারে পরিণত হইবে। আর, উপত্যকার শীর্ষদেশে সার্কের সৃষ্টি হইবে। ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডগুলি পার্শ্ব-, প্রান্ত-, মধ্য-গ্রাবরেখা ক্রমশঃ গঠন করিবে। তারপর পর্বতের উচ্চ অংশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আরেত, কল প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে। উচ্চ পার্বত্য-অংশ অত্যন্ত বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইবে।

এইবার মনে করা যাক, এই উপত্যকার জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে থাকিবে— তখন উপত্যকার হিমবাহের বরফের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকিবে, কারণ, তুষারপাতের পরিবর্তে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। হিমবাহ ক্রমশঃ পশ্চাৎগামী হইলে নদীর উৎস-ক্ষেত্র অগ্রসর হইবে। আর, হিমবাহের অবক্ষেপণের পরিমাণ বাড়িবে, চরম অগ্রগতির স্থানে প্রান্ত-গ্রাবরেখা এবং যে যে স্থানে হিমবাহ সাময়িকভাবে স্থির থাকিবে সেথায়ও প্রান্ত-গ্রাবরেখা দেখা যাইবে। এইজন্য গ্রাবরেখাগুলি একটির পশ্চাতে আর একটি বর্তমান থাকিবে। উপত্যকার তলদেশে স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বা স্থানে স্থানে মোরেন সঞ্চিত হওয়ায় সেইসব নিম্ন-অংশে জল সঞ্চিত হইবে। ঐগুলি অস্থায়ী হ্রদে পরিণত হইবে। একটি হ্রদের বাড়তি জল ছাপাইয়া জলধারা সৃষ্টি করিবে এবং ঐ জলধারা উপত্যকার শিলা বা মোরেন ক্ষয় করিয়া প্রবাহ-পথ গঠন করিবে। হিমবাহ কালক্রমে উপত্যকা হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হইলে প্রায় সমগ্র উপত্যকায় নদী প্রবাহিত হইবে। তখন নদীর ক্ষয়কার্য চলিবে,—হিমবাহ-উপত্যকার বিশিষ্টরূপ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইবে। সার্ক, আরেত, কল প্রভৃতি পার্বত্যভূমির বিশিষ্ট গঠন থাকিবে না।

ইংরাজি U-আকৃতি-বিশিষ্ট উপত্যকা ইংরাজি V-আকৃতি-বিশিষ্ট উপত্যকায় পরিণত হইবে। শাখা-হিমবাহের উপত্যকার মুখে জলপ্রপাত দেখা যাইবে। তাই, কালক্রমে হিমবাহ-উপত্যকার সকল নিদর্শন লুপ্ত হইবে।

পৃথিবীর বহু অংশে এইভাবে নদী-উপত্যকা হিমবাহ-উপত্যকায় এবং হিমবাহ-উপত্যকা নদী-উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে, তাহার বহু নিদর্শন আছে।

ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্নীভবন
(Weathering and Denudation)

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার কোন কোন অংশের জমাট শিলাস্তর (Bed rock) অনাবৃত ; কোন কোন অংশের জমাট

শিলাস্তরের উপর ছোট-বড় শিলাখণ্ডের আবরণ (Regolith) রহিয়াছে, কিন্তু জমাট শিলাস্তরও এই শিলাখণ্ডগুলি একই শ্রেণীর শিলার অন্তর্গত; আবার কোন কোন অংশের জমাট শিলাস্তরের আবরণ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম শিলাকণিকায় গঠিত, আর জমাট শিলাস্তর ও এই আবরণের শিলাকণা এক শ্রেণীর নহে। যুক্তিসহকারে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত প্রথম স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ডগুলি কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অপসারিত হইয়াছে; দ্বিতীয় স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ঐস্থানেই রহিয়াছে এবং তৃতীয় স্থানের জমাট শিলাস্তরের আবরণের শিলাকণিকাগুলি অনত্র হইতে বাহিত হইয়া এইস্থানে সঞ্চিত হইয়াছে। যে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এই কার্যগুলি সাধিত হয়, সেই প্রাকৃতিক শক্তি এবং তাহাদের কার্য-প্রণালীর বিষয়, এইবার আমরা আলোচনা করিব।

ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্নাভবন—জমাট-শিলাস্তরে গঠিত ভূ-পৃষ্ঠের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ না হইলে অন্যস্থানে অপসারিত হইতে পারে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুইটি শ্রেণীর কার্য সংঘটিত হইতেছে,—প্রথমতঃ জমাট শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিবিধ পরিবর্তন হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডগুলি পরিবাহিত ও অন্যত্র সঞ্চিত হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর কার্যকে **ক্ষয়সাধন** বা জলবায়ুর কার্যের প্রভাবে ক্ষয়সাধন (Weathering) বলে; কারণ, মুখ্য বা গৌণভাবে জলবায়ু এই কার্য করে। আবার, ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডগুলি অপসারিত হইলে জমাট শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠ অনাবৃত বা নগ্ন হইয়া যায়। এইজন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যকে **নগ্নাভবন** (Denudation) বলা হয়। ইহাকে, আবার ইরোসনও (Erosion) বলে। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর কার্য গতি সম্পন্ন নহে অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে ঘটিতেছে বলিয়া গতিহীন-প্রণালী (Static process) বলা যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কার্য গতিসম্পন্ন (Mobile process)।

ক্ষয়সাধন (Weathering): বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এবং নানাভাবে জমাট শিলাস্তরের ক্ষয়সাধন হয়। শিলার ক্ষয়সাধন কার্যকে

প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলার ক্ষয়সাধন এবং (২) যান্ত্রিক উপায়ে শিলার ক্ষয়সাধন।

১। **রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ক্ষয়সাধন** (Chemical Weathering): প্রধানতঃ অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ কিংবা জল শিলার খনিজ পদার্থের সহিত রাসায়নিকভাবে মিলিত হইতে পারে কিংবা জলে দ্রবীভূত হইতে পারে। আর্দ্র জলবায়ুতে লোহায় মরিচা (Hydrous oxide of iron) পড়ে। অক্সিজেন ও জল লৌহের সহিত রাসায়নিকভাবে মিলিত হইলে মরিচার সৃষ্টি হয়। লৌহ বা অক্সিজেনের কোন ধর্ম মরিচায় থাকে না, বরং নূতন ধর্ম পায়। সুতরাং লৌহ ও মরিচা পৃথক্ পদার্থ। শিলার বিবিধ খনিজ পদার্থের সহিত অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্, জল প্রভৃতি রাসায়নিকভাবে মিলিত হইলে নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় ও উহাদের ধর্মও বিভিন্ন। এইজন্য, হয়ত, যে খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না, উহার রাসায়নিক পরিবর্তন হইলে, উহা জলে দ্রবীভূত হইতে পারে কিংবা জমাট শিলাস্তর বিভিন্ন ছোট-বড় অংশে বিভক্ত হইতে পারে। বিশুদ্ধ জলে সামান্য কয়েকটি খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়; কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ জলে দ্রবীভূত হইলে উহা কারবলিক্ এ্যাসিডে পরিণত হয়। এই এ্যাসিডে চুনাপাথর দ্রবীভূত হইতে পারে। খড়ি, চুনাপাথর জলে দ্রবীভূত হয় না, তবে ইহার সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযুক্ত হইলে তখন এইগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। গ্র্যানিট শিলায় ফেল্স্পার (Felspar) নামক খনিজ পদার্থ থাকে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থানে এই খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কাদার (clay) উৎপত্তি হইয়াছে। মাটির প্রধান উপাদান কাদা। এ্যলুমিনিয়াম ঘটিত কয়েকটি অতি-সাধারণ খনিজ পদার্থের (Amphibole, pyroxene) রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেও মাটির সৃষ্টি হয়।

শিলার খনিজ পদার্থগুলি অন্য কোন পদার্থের দ্বারা পরস্পর আটাকাইয়া থাকে। সংলগ্নকারী পদার্থটি গলিলে বা অপসারিত হইলে তখন খনিজ পদার্থগুলি পরস্পর বিচ্যুত হয় অর্থাৎ শিলাস্তর খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে; যথা—কোন কোন

পাললিক শিলায় লৌহের অক্সাইড্ সংলগ্নকারী (cementing) পদার্থ। কখন কখন শিলার খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায় ; ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে শিলা ফাটিয়া যায় ; যথা—পটাসিয়াম বা ক্যালসিয়াম, কার্বোনেট-এ (এইগুলি বিশিষ্ট দানাযুক্ত) পরিবর্তিত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন আগ্নেয়-শিলায় ঐগুলি থাকে।

খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘটিত হয়। কেবল মাত্র ভূ-পৃষ্ঠে এইরূপ কার্য দেখা যায় না, ভূ-নিম্ন জল ও বিবিধ খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। বৃষ্টির জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ দ্রবীভূত হয়, আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিবিধ জৈব পদার্থ পচিলে নানা জৈব এ্যাসিড সৃষ্টি করে এবং ঐগুলি জলে দ্রবীভূত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের এইরূপ জল শিলার ফাটলপথে ভূ-নিম্নে প্রবেশ করিয়া তথায় শিলার বিবিধ খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে পারে। তাহার ফলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রচুর জল ও উত্তাপ রাসায়নিক ক্রিয়ার অনুকূল অবস্থা। সুতরাং উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থানে রাসায়নিক ক্ষয়সাধন অধিক এবং শুষ্ক বা অতি-শৈত্যযুক্ত জলবায়ু অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃষ্টিবহুল অংশের শিলা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষয়জাত শিলার (decomposed rocks) আবরণ গভীরভাবে থাকে। একই অবস্থায় সকল প্রকার খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সমভাবে হয় না। তাই, একই স্থানের বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে ভূমির গঠন পরিবর্তিত হয়—কোন কোন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় সুউচ্চভাবে অবস্থান করে। আর, বিভিন্নভাবে ক্ষয়সাধনেব ফলে সমভূমি বন্ধুর হইতে পারে, ঐরূপ ক্ষয়কার্য যতই ধীরে ধীরে হউক না কেন। এইভাবে ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডগুলি সূক্ষ্ম বা ধারাল কোণ বা কিনারাযুক্ত হয় না।

২। **যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন** (Mechanical Weathering)—শিলাস্তরের খনিজ পদার্থগুলি কোন রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত না হইয়া শিলাস্তরের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ বা ফাটলের সৃষ্টি হওয়াকে যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন বলে। এইভাবে ক্ষয়জাত

শিলাখণ্ডগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোণ[illegible] ধারল কিনারাযুক্ত হয়। নিম্নলিখিতভাবে যান্ত্রিক উপায়ে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; যথা—

(১) **ভূ-আলোড়ন**—ভূ-আলোড়নের ফলে জমাট শিলাস্তরে ছোট-বড় ফাটলের সৃষ্টি হইতে পারে। সূক্ষ্ম ফাটলকে শিলার সংযোগ বা বিভেদ-তল বলে। তখন ফাটলপথে জল, বায়ু প্রবেশ করিয়া রাসায়নিকভাবে কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে।

(২) **পাতলা স্তরে স্তরে বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় ক্ষয়সাধন** (Exfoliation, Abrasion or corrosion)—শিলাখণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণ ও আঘাত, শিলাচূর্ণে-পরিবর্তনকরণ, অতি-পাত্‌লা পাতে পরিণতকরণ ইত্যাদি কার্যও যান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হয়।

(৩) **জল বরফে পরিণত হইবার ফলে শক্তির প্রভাব** (The expansive force of freezing water)—শৈত্যপ্রধান অঞ্চলের শিলাস্তরের ফাটলে জল প্রবেশ করে। রাত্রিতে ফাটল মধ্যস্থ জল বরফে পরিণত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে যে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়, তাহার প্রভাবে জমাট শিলাস্তর ফাটিয়া যায় (স্টীম অপেক্ষা এই কার্যের শক্তি অধিক)। এইরূপে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

(৪) **উদ্ভিদের মূলের কার্য** (The growth of plant roots in rock crevasses)—শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে উদ্ভিদের মূল প্রবেশ করে। মূল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, ফলে, ঐগুলি ক্রমশঃ মোটা ও দীর্ঘ হয় ; ইহা তখন কীলকের (wedge) মত চাপ দেয়। এই চাপের জন্য শিলাস্তর ফাটিয়া যায়।

(৫) **তাপের তারতম্য**—কোন কারণবশতঃ যেমন অগ্নিকাণ্ড বা সূর্যের প্রখর রৌদ্রের তাপে শিলাস্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইতে পারে এবং অবশেষে রাত্রিতে বা কিছু সময় পরে শিলাস্তর শীতল হইতে পারে। এইরূপভাবে তাপের তারতম্যের জন্য শিলাস্তর ফাটিতে পারে। আবার, শিলার বিবিধ খনিজ পদার্থের প্রসারণের হার একরূপ নহে,—কোনটি অপেক্ষাকৃত বেশী বা কম হারে আয়তনে বাড়ে বা কমে ; আর প্রত্যেক খনিজ পদার্থের তাপের

পরিবহন ক্ষমতাও একরূপ নহে। এই সকল কারণেও শিলাস্তর ফাটিতে পারে। সাধারণতঃ শিলার খনিজ পদার্থগুলি তাপের কুপরিবাহী। তাই, মরুভূমির দিবারাত্রির তাপের প্রসর ১০০° ফা. হইলেও শিলাস্তরের উপরে পাতলা আবরণ মাত্র অধিক উষ্ণ হয়, কিন্তু উহার নিম্নস্থ স্তরগুলি সামান্য মাত্র উষ্ণ হয়। ইহার ফলে উপরের পাতলা স্তর প্রসারিত হইয়া খসিয়া যাইতে পারে (**Exfoliation**)।

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন শিলা অধিক মাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া উহাদের আয়তন-প্রসরণের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাপের প্রভাবে শিলা ফাটে না। তবে, বহু যুগ ধরিয়া একই শিলার এইরূপভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। তাই, অনুমান করা যায় যে, তাপের প্রসারের জন্য মরুভূমির শিলায় যে অতি সামান্য শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা যুগে যুগে এই সামান্য শক্তি সমবেত হইলে, অবশেষে এই শক্তির প্রভাবে হয়ত, মরুভূমির শিলাস্তর ফাটিয়া যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, রাসায়নিকভাবে শিলার ক্ষয়সাধন হইলে শিলার খনিজ পদার্থগুলির রূপ ও ধর্ম পরিবর্তন হয়,—পূর্বের কোন কোন খনিজ পদার্থ আর বর্তমান থাকে না, নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। আবার, যান্ত্রিক উপায়ে শিলার ক্ষয়সাধন হইলে খনিজ পদার্থগুলির ধর্মের কোন পরিবর্তন বা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না; কেবলমাত্র আয়তনের বা আকারের পরিবর্তন হয়। একই সময়ে আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলে উভয় প্রণালীতে শিলার ক্ষয়সাধন হয়। তবে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলের ক্ষয়জাত খনিজ পদার্থের স্তর এত গভীরভাবে সঞ্চিত হয় যে, এই অঞ্চলে যান্ত্রিক ক্ষয়সাধনের সৃষ্টি-খনিজ পদার্থগুলিকে এই স্তর ঢাকিয়া রাখে। আবার, শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলে রাসায়নিক ক্ষয়সাধন যৎসামান্য এবং যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন অধিক বলিয়া বিবিধ ছোট-বড় সূক্ষ্ম-কোণযুক্ত ও ধারাল কিনারাযুক্ত শিলাখণ্ড (Coarse and angular materials) দ্বারা এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ গঠিত।

নগ্নীভবন (Denudation) ঃ শিলার ক্ষয়সাধন রাসায়নিকভাবে হউক বা যান্ত্রিকভাবে হউক, ক্ষয়জাত পদার্থগুলি সেইস্থানে সঞ্চিত হয়। ইহার

ফলে ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাস্তরের (Bed rock) উপর ক্ষয়জাত পদার্থের দ্বারা গঠিত আবরণের সৃষ্টি হয়। তখন, আর ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাস্তর দেখা যায় না। তবে, কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়জাত পদার্থগুলি অপসারিত হইলে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের জমাট-শিলাস্তর দেখা যায়। ফলে, ভূ-পৃষ্ঠ আবরণ শূন্য বা নগ্ন হইয়া যায়। তাই, এই কার্যকে নগ্নীভবন বলে।

ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐগুলি অদূর ভবিষ্যতে বা দূর ভবিষ্যতে কিংবা ধীরে ধীরে বা দ্রুত অপসারিত হয়। হয়ত, কোন এক স্থানের ক্ষয়জাত পদার্থগুলি আংশিকভাবে অপসারিত হইতে পারে, ফলে ঐ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাস্তর দেখা যাইবে না। সুতরাং, এইরূপ ক্ষেত্রে, ইহাকে নগ্নীভবন বলা যায় কি? এইরূপ সমস্যা দূর করিবার জন্য বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা 'নগ্নীভবন' কথাটির বিশেষ ব্যবহার করেন না। তাঁহারা নগ্নীভবন কথার পরিবর্তে ইরোসন (Erosion, the mobile processes) কথা ব্যবহার করেন। হয়ত, ইহাই যুক্তসঙ্গত। এই কার্যটি যে গতিসম্পন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষয়সাধন কার্যটি দুইটি অংশে বিভক্ত—একটি স্থিতি-সম্পন্ন এবং অপরটি গতিসম্পন্ন, পূর্বেই এই কথা বলা হইয়াছে। আর, এই দুইটির কার্যের সমষ্টিগত ফল ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন (Degradation) অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ অবনত হয় এবং অবক্ষেপণ—উহার জন্য-ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ উন্নত হয় (Aggradation)।

যে যে শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলির পরিবহন ও অবক্ষেপণ কার্য সংঘটিত তাহা-ই নিম্নে আলোচিত হইল।

১। **অভিকর্ষজ শক্তির কার্য** (The froce of gravity)—অধিক ঢালযুক্ত বা খাড়া পাহাড়ের বা উচ্চভূমির শিলা ফাটিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইলে ঐগুলি উচ্চভূমির গাত্র বহিয়া নিম্নে অবতরণ করে। আর, গাত্রদেশের ঢাল কম হইলে নিম্নমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। তাই, পাহাড়ের বা উচ্চ-ভূমির পাদদেশে ছোট-বড় শিলাখণ্ড সঞ্চিত হয়। ঐরূপ শিলাখণ্ডগুলিকে **ট্যালাস** (Talus) বলে। ট্যালাসগুলি গাত্র দিয়া গড়াইয়া কিংবা উপর হইতে

নীচে সোজাসুজি পড়িতে পারে। আবার, শিলাখণ্ড-গঠিত একটি বড় অংশ ঢালু স্থানের উপর দিয়া অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। উচ্চভূমির ঢালু অংশের মৃত্তিকা বৃষ্টির জল শোষণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, তখন উহার ওজন বাড়িয়া যায়, ফলে, স্থানচ্যুত হইয়া নীচে অবতরণ করে। প্রবল ভূমিকম্পের ফলেও পর্বতগাত্রের শিলাস্তর ফাটিয়া অংশবিশেষ নীচে নামিতে পারে। বৃষ্টির জলের দ্বারা পর্বতগাত্রের কঠিন-শিলাস্তরের নিম্ন-অংশে অবস্থিত কর্দমশিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বা উহা নত অবস্থায় থাকিলে উপরের, স্তরটি স্থানচ্যুত হয় ও শিলার ধস্ (Land slide) নামে। এইগুলি পৃথিবীর অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে সংঘটিত হয়।

২। **ভুনিম্নস্থ জলের কার্য** (underground water)—ভূ-ত্বকের সছিদ্র শিলা, শিলার ফাটল, বিভিন্ন শিলার সংযোগ-তল প্রভৃতি অংশে জল বর্তমান থাকিতে পারে। কোন স্থানের ভূ-নিম্নস্থ অংশ প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে গঠিত হইলে, প্রবেশ্য শিলাস্তরে জল থাকে এবং অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে জল বিশেষ থাকে না। গভীর প্রবেশ্য শিলাস্তরে জল পাওয়া যায়, আবার অগভীর অপ্রবেশ্য স্তরে জল পাওয়া যায় না। তবে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২।৩ মাইল গভীর অংশ পর্যন্ত জল পাওয়া যাইতে পারে। উহার নিম্নস্থ স্তরগুলি শুষ্ক। বালুকা, মাটি বিশেষতঃ বেলেমাটি, বেলেপাথর, বিবিধ শিলাখণ্ডে জমাটভাবে না থাকিলে তথায় জল সঞ্চিত হইয়া অবশেষে সংপৃক্ত হয়। আবার, আগ্নেয়শিলার স্তর অপ্রবেশ্য। তবে এইরূপ শিলাস্তরেও ইহার আয়তনে শতকরা এক ভাগ জল ধারণ করিতে পারে। এইজন্য ভূ-ত্বকের উচ্চতম-অংশের (২-১ মাইল গভীর দেশ) সাধারণতঃ সম্পূর্ণভাবে জলশূন্য অবস্থায় থাকে না।

বৃষ্টিপাতের জল ভূমিতে শোধিত হয়, শিলার ছিদ্রপথে, ফাটলপথে জল ক্রমশঃ নিম্নদিকে চালিত হয় এবং অবশেষে সেই অংশের সমস্ত ছিদ্র, ফাটল জলপূর্ণ হইতে পারে অর্থাৎ এই অংশ জলে সংপৃক্ত হয়। সারাবৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে; এইরূপ সংপৃক্ত অবস্থায় সর্বদাই থাকিত। নানাকারণে তাহা হয় না। কোন সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, কোন সময়ে কম বৃষ্টিপাত কিংবা একেবারেই

বৃষ্টিপাত হয় না। আবার ভূ-পৃষ্টের জলের বাষ্পীভবন ও জল অপসারিত হইতে পারে। আর, শিলাস্তরের ছিদ্রতার পরিমাণ, ফাটলের গভীরতা ও বিস্তৃতি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বায়ুর আদ্র`তা ও তাপমাত্রার উপর কোন স্থানের ভূ-গর্ভের জলের পরিমাণ, বা সংপৃক্ত স্তরের অবস্থান নির্ভর করে। ভূ-গর্ভের জলের দ্বারা সংপৃক্ত স্তরের পৃষ্ঠদেশকে ওয়াটার টেবল (Water table) বলে। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমতল নহে, তাই, ভূ-নিম্নে উচ্চ-অংশ হইতে নিম্নঅংশে জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া চলে। এই পৃষ্ঠদেশ বা ওয়াটার টেবল গ্রীষ্মকালে নিম্নে নামিয়া যায়, আর বৃষ্টির জল ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিলে উপর দিকে উঠে।

ভূগর্ভস্থ শিলার খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইলে তথায় ঐরূপ জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া চলে ; তাই দ্রবরূপে (Solute) খনিজ পদার্থ পরিবাহিত হয়, আবার উহা অন্যত্র সঞ্চিত হইতে পারে, কারণ অতিপৃক্ত (Supersaturated) অবস্থায় বা অন্য কারণে দ্রবণ হইতে দ্রাব্য নীচে জমা হয়।

চূনাপাথরে-গঠিত-ভূ-ত্বকের অংশবিশেষে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভূ-নিম্নে গহ্বর বা গুহার সৃষ্টি হয়। ঐরূপ গহ্বরের ছাদে ক্যালসিয়াম-বাই-কার্বনেটের দ্রবণ চুয়াইয়া পড়ে। দ্রবণের কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ কমিলে উহা ক্যালসিয়াম কার্বনেটরূপে বিন্দুতে বিন্দুতে ঐস্থানে জমে। এইভাবে গুহার ছাদে ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। আবার, ছাদের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সঞ্চিত হইয়া যে বস্তু গঠিত হয়, তাহা নীচের দিকে ঝুলে। আর, উহার ঠিক নীচে গহ্বরের তলদেশে দ্রবণ বিন্দু বিন্দু ভাবে পড়ে, তাহাও কার্বন-ডাই-অক্সাইড হারাইয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। তাই, উপর দিক একটি অংশ এবং উহার নীচ হইতে আর একটি অংশ গঠিত হয়। উপরটিকে **স্ট্যালাক্-টাইট** (Stalactite) এবং নীচেরটিকে **স্ট্যালগ্‌মাইট** (Stalagmite) বলে। উপরের অংশ অপেক্ষা নীচের অংশটি (Calcite) অপেক্ষাকৃত মোটা। আর, ঐ দুইটি অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া কালক্রমে দুইটি মিলিত হইয়া একটি স্তম্ভে পরিণত হয়।

ভূ-নিম্নস্থ চূনের জল বালুকাস্তরের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া বহিলে এবং উহাতে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ দ্রবীভূত থাকিলে, বালুকাস্তরের বালুকাকণাগুলি জমাট বাঁধিয়া বেলেপাথের সৃষ্টি করে। আবার, সিলিকাযুক্ত জল এইরূপ অংশে প্রবাহিত হইলে চূণজাতীয় পদার্থকে স্থানান্তরিত করিয়া বালুকাকণা সিলিকার সঙ্গে মিশিয়া কোয়ারট্জাইট শিলায় (Quartzite) পরিণত হয়। এইভাবে দ্রবণের চুনজাতীয় পদার্থ বা সিলিকা কিংবা উভয়ে একত্রে শিলাস্তরের বিভিন্ন অংশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ ধাতুগুলির আকর (ore) সৃষ্টি করে। ঐগুলি দ্রবণে তলদেশে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। শিলাস্তরের ফাটল মধ্যস্থ ধাতুর আকরপূর্ণ অংশকে **ভেন** (Vein) বলে। বিস্তীর্ণ অংশের শিলায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য পরিমাণ ধাতুর আকরগুলি থাকে, তাহা ভূ-গর্ভস্থ জলের কার্যের ফলে একটি ক্ষুদ্র অংশে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। কখন কখন ভূ-নিম্নে কাষ্ঠ বা অস্থিখণ্ড প্রথিত হইলে জলের দ্রবণের চুনজাতীয় পদার্থ বা সিলিকার সহিত একপ্রকার ক্রিয়া চলে। কাষ্ঠের বা অস্থিখণ্ডের প্রত্যেক অণুটি সিলিকার বা চুনের অণুর দ্বারা স্থানচ্যুত হয় এবং কাষ্ঠের অণুগুলি যেভাবে সাজান থাকে, ঠিক সেইভাবে সিলিকার বা চুনের অণুগুলি সজ্জিত হয়। তাই, কাষ্ঠের অণুর পরিবর্তে সিলিকার অণু লইয়া গঠিত হয়; আর কাষ্ঠের অভ্যন্তরের প্রত্যেক খুঁটিনাটি অংশের নক্শা একটুও পরিবর্তিত হয় না। ইহাকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে। লক্ষ্য কর, কাষ্ঠখণ্ড জীবাশ্মে পরিবর্তিত হইলে উহাতে জৈব পদার্থ থাকে না, অজৈব সিলিকার অণুতে গঠিত হয়।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলে মৃত্তিকার একপ্রকার জৈব পদার্থের (Humus) জারণের ফলে উহা জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবণে এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকা হইতে অপসারিত (leached soil) হয়। এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই, এই জৈব পদার্থ অপসারিত হইলে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। শীতপ্রধান দেশে বা শুষ্ক অঞ্চলে এই জৈব পদার্থ এইভাবে স্থানান্তরিত হয় না। এইজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস পায়।

ভূ-নিম্নে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য, এই দুই প্রকৃতির শিলার স্তর রহিয়াছে।

চিত্রে দেখ, প্রবেশ্য শিলাস্তরের **ক**-স্থানে বৃষ্টিপাতের জল পড়িলে, উহা অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগের **খ**-পর্যন্ত অংশে প্রবেশ করিবে এবং তারপর প্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্য দিয়া নিম্নমুখে চুয়াইয়া চুয়াইয়া চলিবে। অবশেষে প্রবেশ্য



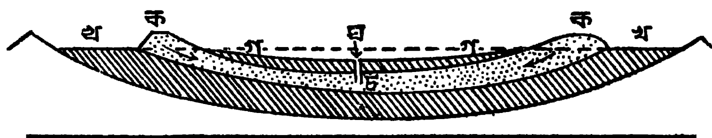
প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের দ্বারা গঠিত ভূ-ত্বকের অংশ বিশেষ প্রস্রবণের সৃষ্টি

শিলাস্তরের প্রান্তভাগের **প**-স্থান হইতে জল বাহির হইবে। আবার, প্রবেশ্য শিলাস্তরের গ-স্থানের পতিত জল **ফ**-স্থানে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের **চ**-ফাটল-পথে বাহির হইবে। ফলে, **প**- ও ফ-স্থানে **প্রস্রবণের** (Spring) সৃষ্টি হইবে। সর্বদা জল নির্গত হইলে, তাহাকে **অবিরাম প্রস্রবণ** বলা হয়। **প**-স্থানের উপরদিকের জল নিঃশেষ হইলে **প**-স্থান হইতে জল আর বাহির হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে উহাকে **সবিরাম-প্রস্রবণ** বলে।

ভূ-গর্ভের উষ্ণ অংশে জল প্রবেশ করিয়া পরে উহা প্রস্রবণরূপে বাহির হইলে, উহাকে **উষ্ণ প্রস্রবণ** বলে। আবার, ভূ-গর্ভের শিলাস্তরের নানাবিধ খনিজ দ্রব্য ও গ্যাসীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইতে পারে। এইজন্য কোন কোন প্রস্রবণের জলে খনিজ বা গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। উহাকে **খনিজ প্রস্রবণ** (Mineral Springs) বলে। আবার, পার্বত্য অঞ্চলের স্থান বিশেষে ঐরূপ প্রকৃতির প্রস্রবণ হইলে কিছু সময় অন্তর অন্তর নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে উষ্ণ বাষ্পসহ জল উৎক্ষিপ্ত হয়; তাহাকে **গেজার** (Geyser) বলে। গেজার সৃষ্টি হইবার হেতু,—ভূ-ত্বকের ফাটলপথে জল প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত অংশে পৌঁছাইলে জল স্টীমে (অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প) পরিণত হয় এবং স্টীম প্রবল চাপ দেয়। এই চাপের প্রভাবে ফাটলের মুখ দিয়া জল উৎক্ষিপ্ত হয়, আর স্টীমের চাপ কমিলে জল উঠে না এবং পুনরায় ভূ-নিম্নে জল স্টীমে পরিণত হইলে, আবার ফাটল-মুখ দিয়া জল উৎক্ষিপ্ত হয়। গেজারের জলে

সাধারণতঃ গন্ধক, বা অন্য কোন খনিজ পদার্থ থাকে। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে উষ্ণ ও খনিজ প্রস্রবণ আছে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলোস্টোন-পার্ক নামক স্থানের গুল্ড-ফেথফুল একটি প্রসিদ্ধ গেজার। এখানে আরও অনেকগুলি গেজার আছে। জার্মানির এপসম্ (Epsom) নামক স্থানের প্রস্রবণের জলে এপসম্ লবণ বা ম্যাগনেসিয়াম সলফেট্ বিদ্যমান ; আবার, ইংলণ্ডের হ্যারোগেট-এর প্রস্রবণের জলে হাইড্রোজেন সলফাইড রহিয়াছে। এইরূপভাবে বিভিন্ন খনিজ-প্রস্রবণের জলে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে। কখন কখন প্রস্রবণের পার্শ্বে জলে দ্রবীভূত খনিজ (চুনজাতীয়) পদার্থ সঞ্চিত (Tufa) হয়।

চিত্রে লক্ষ্য কর, খ ও গ অপ্রবেশ্য শিলাস্তর এবং উহাদের মধ্যস্থলে প্রবেশ্য শিলাস্তর ক, চাঁদের ফালির মত (Syncline) অবস্থায় রহিয়াছে। উহার প্রান্তভাগ ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত। ঐস্থানে বৃষ্টিপাত হইলে, জল চুয়াইয়া চ-অংশ



আর্টেজীয় কূপ

সংপৃক্ত করিবে। ঘ-স্থানে প্রবেশ্য শিলাস্তর পর্যন্ত কোন কূপ খনন করিলে জলের চাপে কূপ হইতে জল বাহির হইবে। ঐরূপ প্রকৃতির কূপকে **আর্টেজীয় কূপ** (Artesian Well) বলে। অস্ট্রেলিয়ায় ঐরূপ বহু কূপ আছে। আমাদের দেশেও স্থানবিশেষে দুই-একটি এই জাতীয় কূপ দেখা যায়।

৩। **ভূ-পৃষ্ঠের উপরস্থ জল ও জলপ্রবাহের কার্য**—জল ও জল-প্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়সাধন সমধিক। জলপ্রবাহ-ই ভূ-পৃষ্ঠের রূপের বিশেষ পরিবর্তন করে,—ইহার প্রভাবে উচ্চভূমি নিম্নভূমিতে ও বন্ধুর ভূমি সমভূমিতে পরিণত হয় এবং নদী-উপত্যকা, ব-দ্বীপ বা নূতন ভূমি গঠিত হয়।

বৃষ্টিপাতের জলের আঘাতে শিলাও ক্ষয় হয়। বৃষ্টির জলের দ্বারা পর্বতগাত্রের শিলার নিম্নদেশ বা কঠিন শিলাস্তরের নিম্নঅংশে অবস্থিত কর্দমশিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উপরের শিলাস্তরটি স্থানচ্যুত হইতে পারে। এইভাবে শিলাস্তর সহসা স্থানচ্যুত হইয়া অকস্মাৎ নীচে পড়িলে, **শিলা-সম্প্রপাত** (Rock Avalanche) বলে। আর, অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নামিলে তাহা **ধস** (land side) বলে। ভূ-পৃষ্ঠের স্থির জলরাশি ও দ্রবণ-শক্তির দ্বারা বা তরঙ্গের দ্বারা শিলা ক্ষয় করিতে পারে। চূনাপাথরে গঠিত ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় অধিক হয়; কারণ, জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ দ্রবীভূত থাকিলে ঐ দ্রবণে চূনাপাথর দ্রবীভূত হয়। ফলে, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চূনাপাথরের স্তরের উপর কাদাপাথর থাকিলে উপরস্থ পাথরের ফাটলপথে নীচে চূনাপাথরের স্তরে প্রবেশ করে এবং চূনাপাথর ক্ষয় হইলে ভূমি স্থানে স্থানে বসিয়া যায়। ফলে, কোন কোন নিম্নঅংশে ছোট ছোট হ্রদের (sink) সৃষ্টি হইতে পারে। স্থানে স্থানে আবার সুরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর হয়। ইহাই **কার্স্ট** অঞ্চল (Karst lands)।

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-প্রসঙ্গে নদীপ্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন এবং ক্ষয়জাত পদার্থগুলির পরিবহন- ও অবক্ষেপণ-কার্য, এইগুলি আলোচিত হইয়াছে। নদীপ্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়সাধন নির্ভর করে,—(১) জলের স্রোতোবেগ, (২) জলের পরিমাণ, (৩) স্রোত-বাহিত শিলাখণ্ডের পরিমাণ, (৪) নদীর প্রবাহপথের শিলার প্রকৃতি। আবার, স্রোতবেগ নির্ভর করে প্রধানতঃ নদীর গর্ভদেশের ঢালের মান; তাই, ভূমির ঢাল যতই বেশী থাকিবে, জলপ্রবাহের স্রোতোবেগ ততই অধিক হইবে। আর, প্রবল স্রোতবাহিত শিলাখণ্ডগুলির আঘাতে প্রবাহপথের শিলা অধিক ক্ষয় হইবে। জলস্রোতের বেগের উপর শিলাখণ্ড বহন করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে,—বিজ্ঞানী গিকি (Geikie) বলেন যে, স্রোতোবেগ ঘণ্টায় $\frac{1}{6}$ মাইল হইলে কাদার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা, $\frac{1}{3}$ মাইল সূক্ষ্ম বালুকাকণা, $\frac{1}{2}$ মাইল হইলে মোটা বালুকাকণা, $\frac{2}{3}$ মাইল হইলে ক্ষুদ্র কাঁকর, ১$\frac{1}{2}$ মাইল হইলে ১" ব্যাসযুক্ত নুড়ি বহন করিতে পারে।

টিলা বা ডাঙ্গার ছোট ছোট জলধারা ঐ উচ্চভূমির ঢালে ছোট ছোট নালার

সৃষ্টি করে। নালাগুলির পশ্চাৎ অংশ ও পার্শ্ব অংশ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে, আর, পার্শ্বদেশেও ছোট ছোট শাখানালার সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্রমে নালাগুলি বিস্তারিত হয় এবং উচ্চভূমির ঢালের মৃত্তিকা বা ক্ষয়জাত শিলা (Regolith) অপসারিত হয়। এইভাবে তরঙ্গায়িত বা বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারিত হয়। এইজন্য এই অঞ্চলের ভূ পৃষ্ঠ মৃত্তিকাশূন্য হইয়া উর্বরতা শক্তি হারায়। ইহাকে **মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন** (Land Erosion) বলে। বর্ধমান-বিভাগের পশ্চিমাংশের ভূমি তরঙ্গায়িত বলিয়া এই অঞ্চলের মৃত্তিকার ক্ষয় অধিক।

৪। **সমুদ্রের কার্য**—পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জলভাগ। সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতি বিস্তৃত জলভাগের তরঙ্গগুলি বড় বড়। বায়ুপ্রবাহের দ্বারা জলপৃষ্ঠে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বিস্তীর্ণ জলভাগে বায়ু অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার দ্বারা বড় আকারের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তটরেখাকে তরঙ্গ আঘাত করে; ইহার ফলে উপকূলের স্থলভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তরঙ্গের আঘাতে ও সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূলের ভূমি কিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অবক্ষেপণের ফলে ঐ অঞ্চলের ভূমি কিভাবে গঠিত হয়, তাহা ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

৫। **বায়ুর কার্য**—কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত আর্দ্র বায়ুর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে চূনাপাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রবল বায়ুপ্রবাহ শিলাকে শিথিল করে, আর, শিলাকণা, বালুকা, ধূলি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যায়। আবার, প্রবল বায়ু-প্রবাহ-বাহিত-শিলাকণার ঘর্ষণে কঠিন শিলার গাত্রদেশ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বায়ুপ্রবাহ এক অঞ্চলের শিলা ক্ষয় করে, ক্ষয়জাত পদার্থগুলি বহন করে এবং অবশেষে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমিলে ঐগুলিকে অন্য স্থানে সঞ্চিত হয়। বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়সাধন-ক্রিয়াকে ডিফ্লেশন্ (Deflation) বলে। বায়ুপ্রবাহের দ্বারা মরুভূমিতে বা সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমিতে বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। আবার, বায়ুপ্রবাহের দ্বারা লোয়েস-মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৬। **তুষার, হিমবাহ, হিমশৈল প্রভৃতির কার্য**—জল জমিয়া বরফে পরিণত হইলে যে কার্য করে, তাহাতে কোন গতির সৃষ্টি হয় না, এইজন্য গতিহীন

কার্যের সঙ্গে উহা আলোচিত হইয়াছে। আবার গতিশীল বরফস্তূপ বা হিমবাহের ও হিমশৈলের কার্য সম্বন্ধে ভূ-পৃষ্ঠ-গঠন-প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বারিমণ্ডল

(Hydrosphere)

মহাসাগর

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ জলময় অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ স্থলভাগ। জলময় অংশের মোট আয়তন প্রায় ১৪ কোটি ১০ লক্ষ বর্গমাইল। পৃথিবীর বিশাল জলভাগ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন না হইলেও পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত: (১) প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আটলান্টিক মহাসাগর, (৩) ভারত মহাসাগর, (৪) উত্তর বা সুমেরু মহাসাগর এবং (৫) দক্ষিণ বা কুমেরু মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া; ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর। ইহার আয়তন সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের $\frac{1}{3}$ অংশ। আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে আমেরিকা। আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক হইলেও আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে সমৃদ্ধ দেশগুলি থাকায় ইহা বাণিজ্য সহায়ক। ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পূর্বে অস্ট্রেলিয়া অবস্থিত। তাই, ইহার তিনদিকে স্থলভাগ রহিয়াছে। প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর, এই তিনটি মহাসাগর কুমেরু মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত। সুমেরু-বৃত্তের নিকট সুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। ইহাই ক্ষুদ্রতম মহাসাগর। সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগরের অধিকাংশই তুষারাচ্ছন্ন।

সমুদ্র-জলের লবণতা (Salinity of the Ocean): স্থলভাগের লবণজাতীয় পদার্থগুলি জলে দ্রবীভূত হয় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ঐগুলি নদীর জলের সহিত বাহিত হইয়া (দ্রবণরূপে) সমুদ্র-জলে মিশিতেছে। সমুদ্র-জলের পৃষ্ঠদেশে বাষ্পীভবন হয়; আর জলীয় বাষ্পের সহিত

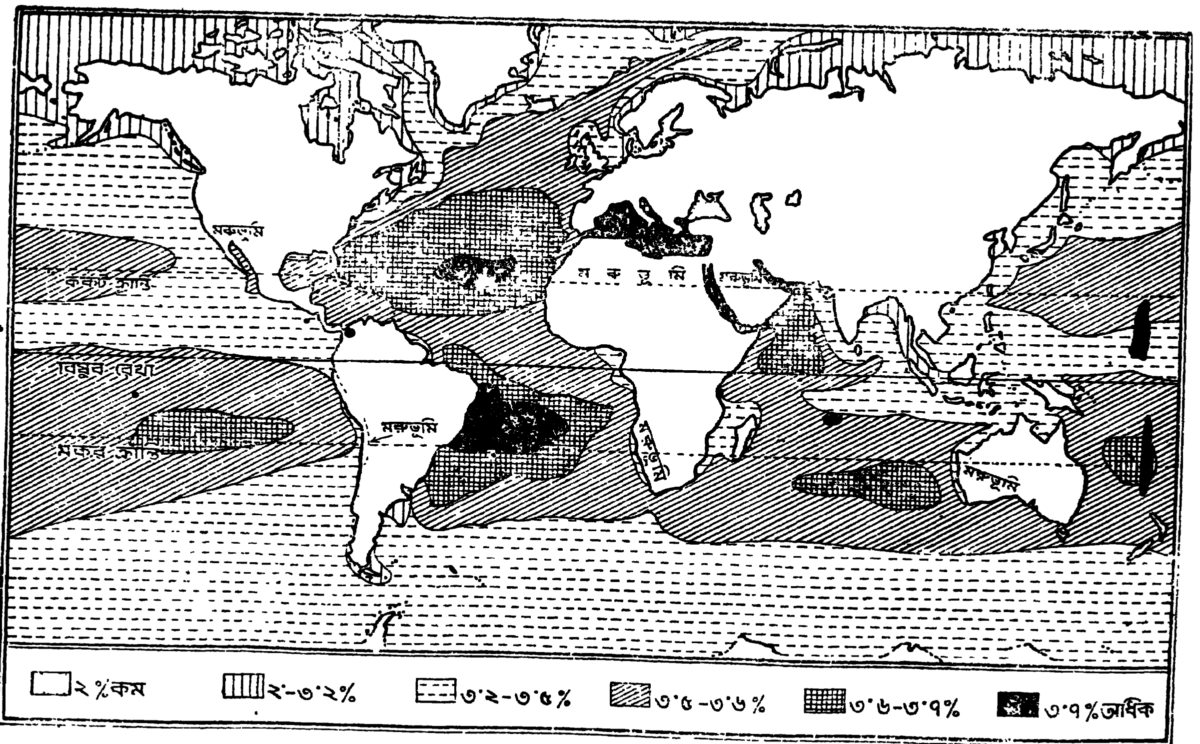
লবণ বাহিত হয় না। এইভাবে যুগে যুগে সমুদ্র-জলে লবণের পরিমাণ বাড়িতেছে ; ফলে সমুদ্র-জল লবণাক্ত হইয়াছে। হাজার পাউণ্ড সমুদ্র-জলে প্রায় ৩৫ পাউণ্ড সাধারণ লবণ (Sodium chloride) এবং বাকি অংশ অন্যান্য ধাতব লবণ (magnesium, potassium এবং calcium-এর chloride*) আছে।

*নিম্নে সমুদ্র-জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। সাগর-জল যে সকল পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, তাহার প্রত্যেকটি লবণ নহে বা খনিজ পদার্থগুলি সর্বদা লবণ অবস্থায় থাকে না, তবে সুবিধার জন্য লবণের নাম উল্লেখ করা হইল—

		শতকরা
সোডিয়াম ক্লোরাইড	...	৭৭·৮
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড	...	১০·৯
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	...	৪·৭
ক্যালসিয়াম সালফেট	...	৩·৩
পটাসিয়াম সালফেট	...	২·৫
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	...	০·৫
অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ	...	০·৩
		১০০

অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থগুলির মধ্যে সিলিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ জলজ প্রাণীরা ইহা গ্রহণ করিয়া তাহাদের খোলস গঠন করে। ঐ খোলস দ্বারা পরবর্তী যুগে শিলা গঠিত হয়। আবার, জলে দ্রবীভূত ফসফেট থিথাইয়া পড়িলে ইহা সঞ্চিত হয়। উহা আবার শিলার দ্বারা আবৃত হইতে পারে। পরে ভূ-আলোড়নে স্থলভাগে পরিণত হইলে ঐ স্থানে ফসফেটের খনির সৃষ্টি করে। এইভাবে লৌহ-আকর সৃষ্টি হইতে পারে। নদীর জলের দ্বারা সামান্য পরিমাণে খাদ্য-লবণ সমুদ্রে নীত হইলেও উহার বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলিয়া সমুদ্র-জলে খাদ্য-লবণের পরিমাণ এত অধিক। আবার, ক্যালসিয়াম কার্বনেট অধিক পরিমাণে নীত হইলে ও উহা সমুদ্রগর্ভে শিলার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার পরিমাণ এত কম।

সমুদ্রজলে মোট লবণের পরিমাণ ৩২০০০ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ এই লবণরাশি পৃথিবীর স্থলভাগকে ১৫৫ ফুট উচ্চ লবণস্তরে আবৃত করিতে পারে।



সমুদ্র-জলের লবণতা—সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের জলের লবণতা কম-বেশী লক্ষ্য কর

সাগর-জলে লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। নদীর দ্বারা আনীত মিঠা জলের (Fresh water) পরিমাণ এবং বাষ্পীভবনের মাত্রার উপর সাগর-জলের লবণের পরিমাণ নির্ভর করে। ক্রান্তীয় প্রদেশে বড় বড় মরুভূমি অবস্থিত এবং অধিক উষ্ণতা ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চলের জলের বাষ্পীভবন সমধিক। আর, এখানে অল্পসংখ্যক নদনদী সাগরে পতিত হইয়াছে। এইজন্য এই অঞ্চলের সমুদ্র-জল অধিক লবণাক্ত। অনুরূপ কারণে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর প্রভৃতির জল অধিক লবণাক্ত। তাহা ছাড়া, এই দুইটি সাগর স্থল-বেষ্টিত এবং উহাদের পার্শ্বে মরুভূমি অবস্থিত বলিয়া জলের বাষ্পীভবন অধিক।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবৎসর তাপমাত্রা অধিক হইলেও এখানে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হয় এবং আমাজন, কঙ্গো প্রভৃতি বড় বড় নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। তাই, এই অঞ্চলের সমুদ্র-জল অধিক লবণাক্ত নহে। ক্রান্তীয় অঞ্চল হইতে মেরুর দিকে সমুদ্র-জলে লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে, কারণ যতই মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাপমাত্রা কমিয়া গিয়াছে। এইজন্য বাষ্পীভবনের পরিমাণও ক্রমশঃ কম দেখা যায়। বাল্টিক সাগর স্থলবেষ্টিত হইলেও এখানে শৈত্যের জন্য বাষ্পীভবন কম এবং বহু নদী বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে। তাই, এই সাগর-জলে অল্প-লবণাক্ত। লবণাক্ত জল অপেক্ষা মিঠা-জল শীঘ্র জমিয়া যায় বলিয়া শীতকালে বাল্টিক সাগরের জল শীঘ্র জমিয়া যায়।

সমুদ্র-জলের তাপমাত্রা (Temperature of the Ocean): জল ধীরে ধীরে উষ্ণ বা শীতল এবং সাগর-জলের সঞ্চলন ও বিভিন্ন তাপযুক্ত জলের পরস্পর মিশ্রণ হেতু স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের তাপমাত্রার প্রসর অপেক্ষাকৃত কম। নিম্নলিখিত কারণে সাগর-জলের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়,—(১) সাধারণতঃ অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত জলের তাপমাত্রার হ্রাস হয়; (২) বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র-স্রোতের প্রভাবে জলের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়,—কোন অঞ্চলে উষ্ণ জলস্রোত প্রবাহিত হইলে উহার তাপমাত্রা বাড়িবে এবং শীতল জলস্রোত প্রবাহিত হইলে উহার তাপমাত্রা কমিবে; (৩) ঋতু-ভেদে ও দিবারাত্রি-ভেদে

৪০° ফাঃ
৬০° ফাঃ
কর্কট ক্রান্তি
বিষুব রেখা
মকর ক্রান্তি
৮০° ফাঃ

৪০° ফাঃ কম
৪০°-৬০° ফাঃ
৬০°-৮০° ফাঃ
৮০° ফাঃ অধিক

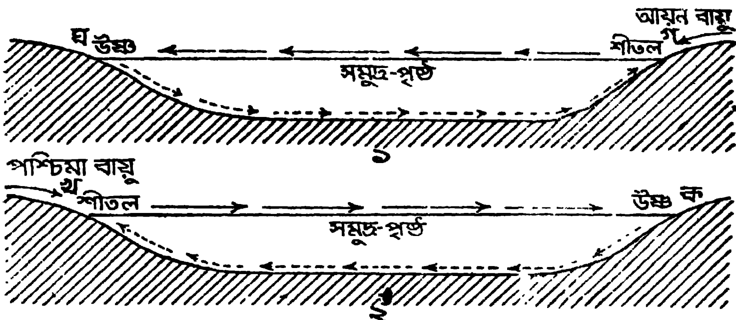
সমুদ্র-জলের তাপমাত্রা—অক্ষাংশ, সমুদ্র-স্রোত ও স্থলভাগের অবস্থানের জন্য সমুদ্র-জলের তাপমাত্রা কম-বেশী হয়

জলের তাপমাত্রা কম-বেশী হয় ; এবং (৪) জলের গভীরতা বৃদ্ধির সহিত তাপমাত্রা কমিয়া যায় ; তবে সমুদ্রের গভীর অংশের জলের তাপমাত্রা প্রায় সর্বত্র সমান—১২ হাজার ফুট গভীর জলের তাপমাত্রা ৩২° ফা-এর কিছু বেশী। মানচিত্রে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের বিভিন্ন অংশের জলের তাপমাত্রা লক্ষ্য কর।

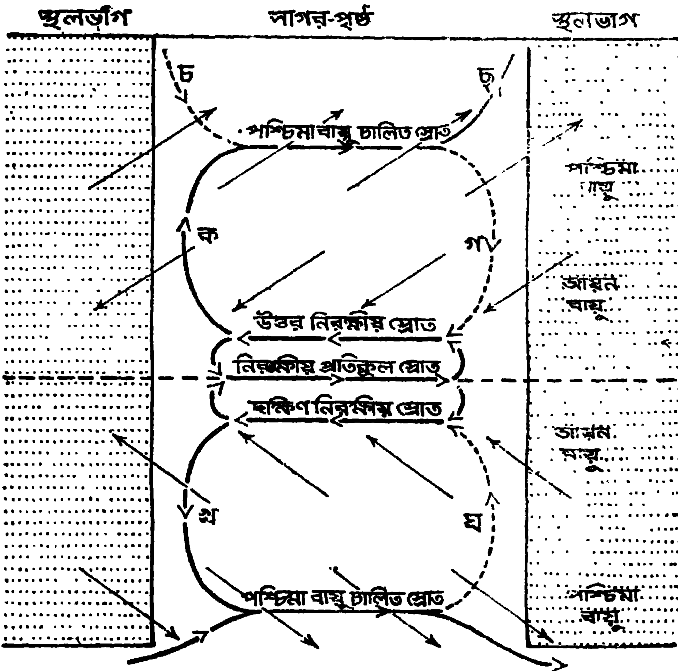
সমুদ্র-জলের ঘনত্ব : অধিক বাষ্পীভবন হইলে, সমুদ্র-জলের লবণের পরিমাণ বাড়ে, ফলে জলের ঘনত্বও বাড়িয়া যায়। আবার, নদীর জল বা বরফ-গলা জল সাগরের কোন অংশে পতিত হইলে, ঐ অংশের জলের ঘনত্ব কমিয়া যায়। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সহিত জলের ঘনত্ব কমিয়া যায়। আর, তাপমাত্রা কমিতে থাকিলে, জলের ঘনত্ব বাড়িতে থাকে। এইভাবে ঘনত্ব বাড়িয়া ৪° সে. জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর, পুনবায় জলের ঘনত্ব কমিতে থাকে এবং ০° সে. (শূন্য) জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। লক্ষ্য কর, ৪° সে. জলের ঘনত্ব গরিষ্ঠ। আবার, জল অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া বরফ জলে ভাসে। এই কারণে মেরুপ্রদেশের সমুদ্র-জলের উপরিভাগ বরফে পরিণত হইলেও উহার নিম্নদেশের জল জমিয়া যায় না। তাই, এই অঞ্চলের সমুদ্রে জলজ প্রাণীদের বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।

সমুদ্র-স্রোত (Ocean Currents) **:** সমুদ্রের এক অংশ হইতে অপর অংশে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সমুদ্র-জলের গতি আছে। এইরূপ জলের গতিকে সমুদ্র-স্রোত বলে। নিম্নলিখিত কারণগুলি সমুদ্র-স্রোতের সৃষ্টির হেতু,—(১) জলের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের তারতম্য, (২) নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণ এবং (৩) পৃথিবীর আহ্নিক গতি।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের জল উষ্ণ এবং মেরুপ্রদেশের জল হিম-শীতল। এইরূপ জলের তাপমাত্রার পার্থক্য হেতু, নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে উষ্ণ ও হাল্কা জলস্রোত সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ দিয়া মেরু-অঞ্চলের দিকে এবং তথা হইতে অপেক্ষাকৃত ভারী ও হিম-শীতল জলস্রোত সমুদ্রের নিম্নদেশ দিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সমুদ্র-স্রোত উত্তর-গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ-গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। আবার, স্থলভাগে বাধা পাইয়া স্রোতের



নিয়ত-বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণে সমুদ্র-স্রোতের সৃষ্টি

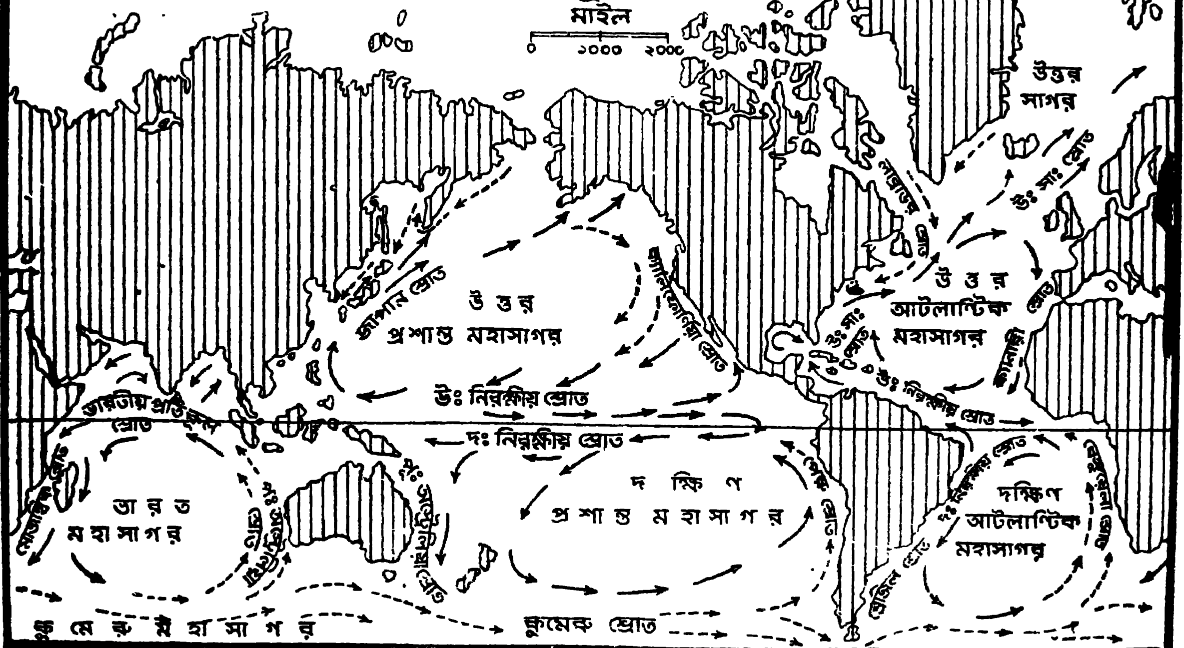


সমুদ্র-স্রোতের নক্শা—বায়ুপ্রবাহ ও পৃথিবীর আহ্নিক গতি সমুদ্র-স্রোতের দিক নিয়ন্ত্রণ করে

দিক্‌-পরিবর্তন হয়। কখন কখন সমুদ্র-জলের বিভিন্ন স্তরের উষ্ণতা বা ঘনত্বের সহসা পরিবর্তন ঘটে ; তখন ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী জলস্রোতের সৃষ্টি হয়।

সমুদ্র-স্রোতের গতিপথ ও প্রকৃতির একটি নক্‌শা দেওয়া হইয়াছে। উহা লক্ষ্য কর। উষ্ণমণ্ডলে আয়ন-বায়ুর (Trade winds) সংঘর্ষণে পশ্চিমমুখী দুইটি উষ্ণ-জলস্রোতের সৃষ্টি হয়, যথা—**উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোত** ও **দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোত**। ঐ দুইটি স্রোতের মধ্যস্থলে পূর্বমুখী একটি স্রোত প্রবাহিত হয়। উহার নাম **নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত** (Equatorial counter current) ; পূর্বোক্ত স্রোত দুইটি যেদিকে প্রবাহিত হয়, ইহা তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। মহাসাগরের পশ্চিম-প্রান্তে স্থলভাগ বাধা পাইয়া উ. নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর দিকে ও দ. নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া যায় এবং **ক**- ও **খ**-উষ্ণ-স্রোতে পরিণত হয়। প্রায় ৪০° উ. অক্ষাংশে শীতল স্রোত **চ**-এর সংস্পর্শে আসিয়া **ক**-স্রোতের জল কতকটা তাপ হারায় ; পরে প্রত্যায়ন-বায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া মহাসাগরের পূর্বাংশে **ক**-স্রোত, **ছ**- ও **গ**-শাখায় বিভক্ত হয়। **গ**-শাখা ঘুরিয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। উত্তর-গোলার্ধে এইভাবে জল-স্রোত দক্ষিণাবর্তে (ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরে) ঘুরিয়া আসে। তাই জলাবর্তের মধ্যস্থলে কোন জলস্রোত প্রবাহিত নয় না বলিয়া তথায় শৈবাল, আবর্জনা প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। ঐ সাগর-অংশের নাম **শৈবাল সাগর** (Sargasso Sea)। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল হইতে আগত **ছ**-স্রোত শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হয় বলিয়া পার্শ্ববর্তী জল অপেক্ষা ইহার জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। তাই, ইহাকে উষ্ণ স্রোত বলা হয়। আর, **গ**-স্রোত উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া পার্শ্ববর্তী জল অপেক্ষা ইহার জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে ; এইজন্য ইহাকে শীতল স্রোত বলা হয় ; যদিও **ছ**-স্রোতের জলের তাপমাত্রা অপেক্ষা **গ**-স্রোতের জলের তাপমাত্রা বেশী।

দক্ষিণ-গোলার্ধে **খ**-উষ্ণ স্রোত ও **ঘ**-শীতল স্রোত। এখানে জলস্রোত বামাবর্তে (ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে) ঘুরিয়া আসে। দক্ষিণ-


পৃথিবী
সমুদ্রস্রোত
মাইল
০ ১০০০ ২০০০
শীতল প্রবাহ
উষ্ণ প্রবাহ
সুমেরু মহাসাগর
সুমেরু মহাসাগর
উত্তর সাগর
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর
জাপান স্রোত
ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত
উঃ নিরক্ষীয় স্রোত
দঃ নিরক্ষীয় স্রোত
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
ল্যাব্রাডর স্রোত
উঃ সাঃ স্রোত
ক্যানারী স্রোত
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর
পেরু স্রোত
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
বেঙ্গুয়েলা স্রোত
ব্রেজিল স্রোত
ভারত মহাসাগর
ভারতীয় প্রতি স্রোত
মোজাম্বিক স্রোত
কুমেরু স্রোত
কুমেরু মহাসাগর

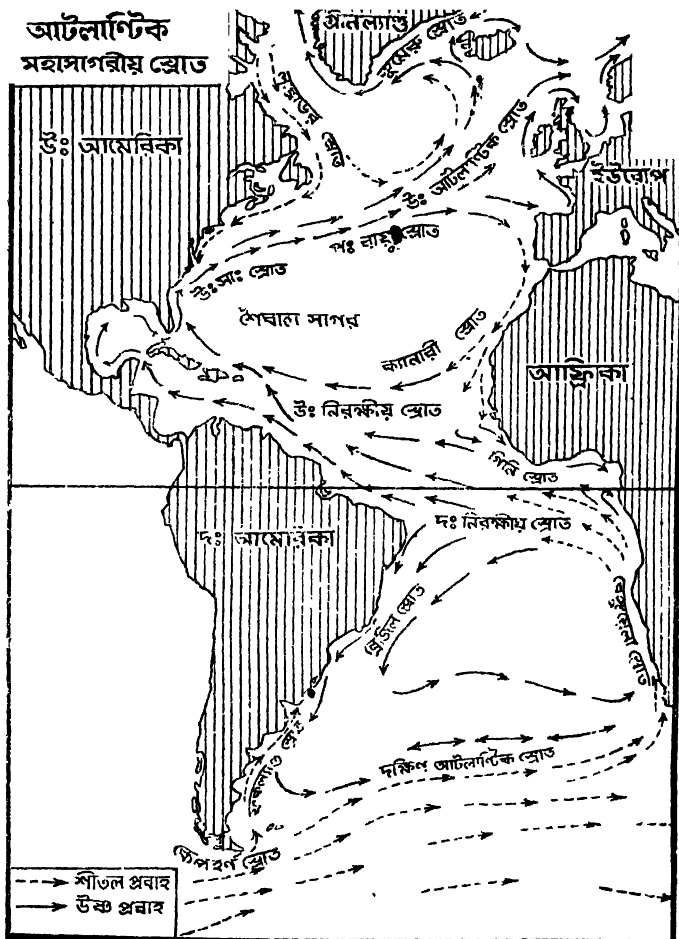
গোলার্ধের স্থলভাগ ভূ-বিষুবরেখা হইতে উত্তর-গোলার্ধের স্থলভাগের মত অধিক দূরে বিস্তৃত নহে বলিয়া এখানে পশ্চিমা-বায়ু বিনা বাধায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। এইজন্য উত্তর-গোলার্ধের **চ**- ও **ছ**-স্রোতের অনুরূপ স্রোত দক্ষিণ-গোলার্ধে নাই।

এই নক্শায় বর্ণিত স্রোতগুলির গতিপথ, তাপমাত্রা প্রভৃতি প্রায় অনুরূপ স্রোত প্রত্যেক মহাসাগরে প্রবাহিত হয়; তবে স্থলভাগের অবস্থানের জন্য স্থান-বিশেষে ইহাদের কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এইবার নকশায় **ক, খ** প্রভৃতি অক্ষরযুক্ত নামের স্রোতের পরিবর্তে প্রত্যেক মহাসাগর অনুরূপ প্রকৃত নামযুক্ত স্রোত লক্ষ্য কর। প্রশান্ত, আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরে প্রায় এইরূপ প্রকৃতির স্রোত প্রবাহিত হয়। ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত এবং এই মহাসাগরের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ু প্রবাহিত হয়। এইজন্য ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাবর্তে এবং শীতকালে বামাবর্তে স্রোত প্রবাহিত হয়। মানচিত্রে স্রোতগুলির গতিপথ লক্ষ্য কর।

সমুদ্র-স্রোতের মানচিত্রে আটলাণ্টিক মহাসাগরের স্রোতগুলি লক্ষ্য করা যায় যে, **খ**-স্রোতই শীতল **বেঙ্গুয়েলা, খ**-স্রোতই উষ্ণ **ব্রাজিল,** ক-স্রোতই উষ্ণ উপসাগরীয়, **চ**-স্রোতই শীতল **লাব্রাডর, গ**-স্রোতই শীতল **ক্যানারী** এবং **ছ**-স্রোতই **উত্তর-আটলাণ্টিক** স্রোত। দেখ, দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। উহা প্রথমে ক্যারেবিয়ান সাগরে প্রবেশ করিয়াছে; ইহার পর মেক্সিকো উপসাগর হইয়া ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্বদিকে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত নাম ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

এই স্রোত নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট শীতল লাব্রাডর স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। শীতল স্রোতের উপরস্থ বায়ুপ্রবাহ শীতল ও শুষ্ক এবং উষ্ণ স্রোতের উপরস্থ বায়ুপ্রবাহ উষ্ণ ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকে। বিভিন্ন প্রকৃতির বায়ুপ্রবাহ দুইটির মিলন হইলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ঘন কুজ্ঝটিকা এবং ঝড়ের সৃষ্টি

হয়। আর, শীতল লাব্রাডর স্রোতের সবুজ জলরাশির উষ্ণ ও উপসাগরীয়-



শীতল ও উষ্ণ স্রোতের গতিপথ লক্ষ্য কর

স্রোতের ঘননীল জলরাশির মধ্যস্থ সীমারেখাকে বা বিভেদ-রেখাকে হিমপ্রাচীর

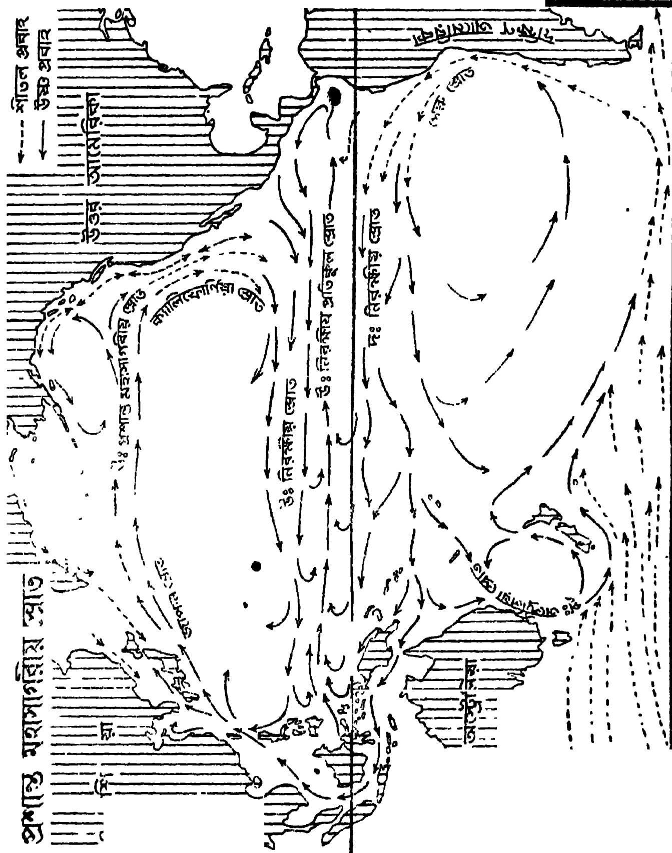
(Cold Wall) বলা হয়। [redacted] বহু হিমশৈল বহন করিয়া আনে। উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসিয়া হিমশৈল গলিয়া যায় এবং ইহাদের দ্বারা বাহিত মোরেনগুলি সমুদ্র-গর্ভে সঞ্চিত হয়। মোরেনের ক্রমঃ-সঞ্চয়নের ফলে এখানে মগ্ন চরের (Banks) সৃষ্টি হওয়ায় সমুদ্র অগভীর হইয়াছে। আবার, শীতল স্রোত বহু প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট ও উদ্ভিজ্জ বহন করিয়া আনে। এইগুলি মাছের খাদ্য। অগভীর সমুদ্র, মৃদু-উষ্ণ জল, মাছের খাদ্য-সরবরাহ,—এইগুলির বর্তমান হেতু এইস্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ আসে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছগুলি, আবার, কড্-মাছের খাদ্য বলিয়া বহু কড্-মাছ ডিম ছাড়িবার জন্য এখানে আসে; তাই, ইহা বিখ্যাত মৎস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত প্রত্যায়ন-বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উষ্ণ উত্তর-আটলাণ্টিক স্রোতরূপে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দিকে চালিত হইতেছে। পরে এই মহাসাগরের মধ্যভাগে এই উষ্ণ স্রোত দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—একটি উত্তর-পশ্চিমে এবং অপরটি পর্তুগালের দিকে। প্রথম শাখাটি গ্রেট্‌বৃটেন ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। আর, এই উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে এই অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। দ্বিতীয় শাখা ক্যানারী স্রোত নামে পর্তুগাল ও আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এবং পরে উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর, এই জলাবর্তের মধ্যভাগে কোন স্রোত থাকে না বলিয়া তথায় শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। উঃ এবং দঃ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগ দিয়া পূর্বাভিমুখী যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই **প্রতিস্রোত**।

প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ **কুরোসিয়ো** বা জাপান-স্রোত নক্‌শার অনুরূপ **ক**-স্রোত, শীতল **বেরিং**-স্রোত **চ**-স্রোত, শীতল **ক্যালিফোর্ণিয়া** স্রোত **গ**-স্রোত, উষ্ণ **পূর্ব-অষ্ট্রেলিয়া** স্রোত **খ**-স্রোত, শীতল পেরু বা **হামবোল্ট** স্রোত **ঘ**-স্রোত। ভারত মহাসাগরের উষ্ণ **আগুলহাস** স্রোত **খ**-স্রোত, এবং শীতল পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া স্রোত **ঘ**-স্রোত।

সাধারণভাবে সমুদ্র-স্রোতগুলি বর্ণনা করা হইল। এইবার প্রত্যেক মহাসাগরের স্রোতগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত—মানচিত্রে স্রোতগুলির গতিপথ লক্ষ্য কর। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল কুমেরু স্রোত পশ্চিমা-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া



শীতল ও উষ্ণ স্রোতের বিভিন্ন গতিপথ লক্ষ্য কর

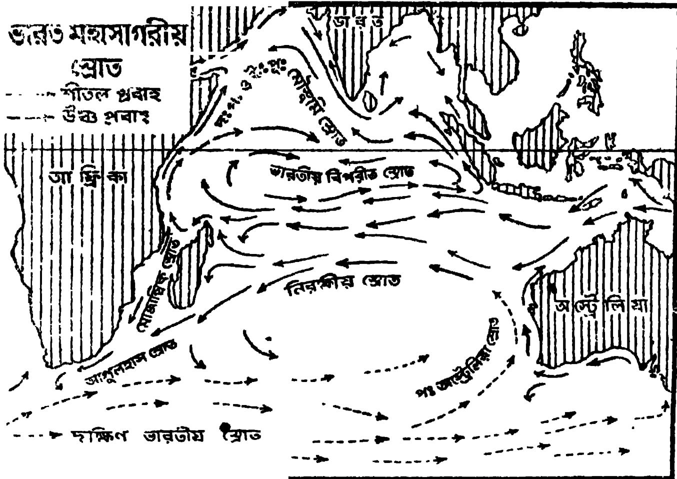
পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত। পরে, দক্ষিণ আমেরিকার নিকট দুইটি শাখায় বিভক্ত

হইয়াছে,—একটি শাখা আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বিতীয় শাখা উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হইয়াছে। তারপর, দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া **হামবোল্ট** বা পেরু স্রোত নাম ধারণ করিয়া উত্তরে প্রবাহিত। এই স্রোত উত্তর-পশ্চিমে ঘুরিয়া দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে : তখন উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে এবং নিউগিনির নিকট তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—একটি শাখা **নিউ-সাউথ-ওয়েলস** নামে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে; দ্বিতীয় শাখা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে; তৃতীয় শাখা উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া এশিয়ার পূর্ব-উপকূল অভিমুখে প্রবাহিত। এই উষ্ণ স্রোত **কুরোসিয়ো** (কৃষ্ণস্রোত) বা জাপান-স্রোত নামে জাপান দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া এই অঞ্চলে শীতল বেরিং-স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত নাম ধারণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে। এই উষ্ণ প্রবাহের পশ্চিম-প্রান্তে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—একটি শাখা আলাস্কা উপকূলের পার্শ্ব দিয়া বামাবর্তে (ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে) ঘুরিয়া পুনরায় প্রধান স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শাখা **ক্যালিফোর্ণিয়া-স্রোত** নামে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম-উপকূলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা পরে ঘুরিয়া উঃ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। নিরক্ষীরেখার নিকট উত্তর-নিরক্ষীয় প্রতিকূল স্রোত পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

জাপান দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্বে উষ্ণ কুরোসিয়ো স্রোত ও শীতল বেরিং-স্রোত মিলিত হওয়ায় এই অঞ্চলের সমুদ্রের জল মৃদু উষ্ণ। এই অঞ্চলও বিখ্যাত মৎস্য-শিকারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাছ ধরে। এই দুইটি স্রোতের উপরস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির বায়ুরাশির এই অঞ্চলে মিলিত হইবার ফলে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। আবার, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের উত্তরাংশের পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ-স্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া

অক্ষাংশের তুলনায় এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলে বিশেষতঃ উত্তর-চিলি ও পেরু উপকূলের পার্শ্ব দিয়া শীতল স্রোত প্রবাহিত হইবার জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক হইয়াছে।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত—পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া মহাদেশের বিশাল ভূভাগ অবস্থিত থাকায় এই মহাসাগরের উত্তরাংশে মৌসুমী-বায়ু প্রবাহিত হয়,—গ্রীষ্মকালে নিরক্ষরেখার উত্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ু প্রবাহিত।



বিভিন্ন ঋতুতে মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ কিভাবে সমুদ্রস্রোত নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা লক্ষ্য কর

সমুদ্র-স্রোত প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণ করে। এইজন্য এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাবর্তে এবং শীতকালে বামাবর্তে সমুদ্র-স্রোত প্রবাহিত। এই মহাসাগরের দক্ষিণাংশের স্রোতসমূহ প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের স্রোত-প্রবাহ পথের অনুরূপ।

শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা শীতল পশ্চিম **অস্ট্রেলিয়া-স্রোত** নাম ধারণ করিয়া অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-উপকূলের পার্শ্ব দিয়া উত্তর মুখে প্রবাহিত।

ইহা পরে ঘুরিয়া দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রবাহ মাদাগাস্কার দ্বীপে প্রতিহত হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—প্রধান শাখা **আগুলাস-স্রোত** দক্ষিণ-আফ্রিকার দক্ষিণে কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর শাখা গ্রীষ্মকালে পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া পরে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-স্রোত** নাম ধারণ করিয়া আরব ও ভারতের উপকূলের পার্শ্বে প্রবাহিত হয়; আর শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ুর প্রভাবে এই স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। আবার, আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের নিকট হইতে একটি শাখা-স্রোত সোমালিল্যাণ্ডের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয়। উহাকে **সোমালি স্রোত** বলে। ভারত মহাসাগরে প্রতিস্রোত নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না।

আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় স্রোত—মানচিত্রে লক্ষ্য কর। কুমেরু স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমা-বায়ুর প্রভাবে শীতল দক্ষিণ-আটলাণ্টিক স্রোত নামে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার নিকট ইহা বামাবর্তে ঘুরিয়া যায়। তখন আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পার্শ্ব দিয়া **বেংগুয়েলা-স্রোত** নাম ধারণ করিয়াছে ও উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইতেছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে এবং ব্রাজিলের সেণ্টরক্ অন্তরীপের নিকট প্রতিহত হওয়ায় দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, একটি শাখা ব্রাজিল-স্রোত নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার পূর্ব-উপকূলের পার্শ্ব দিয়া কিছু দূর প্রবাহিত হইতেছে ও বামদিকে ঘুরিয়া কুমেরু-স্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অপর শাখা উত্তর-পশ্চিমমুখী হইয়া উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী অংশটি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

জলবায়ুর উপর সমুদ্র-স্রোতের প্রভাব—(১) শীতল-স্রোতের উপরস্থ বায়ুরাশি শীতল; এই শীতল-বায়ুরাশি কোন অঞ্চলের উপর প্রবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের জলবায়ু শীতল হয়। আবার, উষ্ণ-স্রোতের উপরস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ; এই উষ্ণ বায়ুরাশি কোন অঞ্চলের উপর প্রবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ

হয়। এইজন্য কোন দেশের উপকূলের পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ-স্রোত প্রবাহিত হইলে ঐ দেশের জলবায়ু উষ্ণ এবং শীতল-স্রোত প্রবাহিত হইলে ঐ দেশের জলবায়ু শীতল হয়।

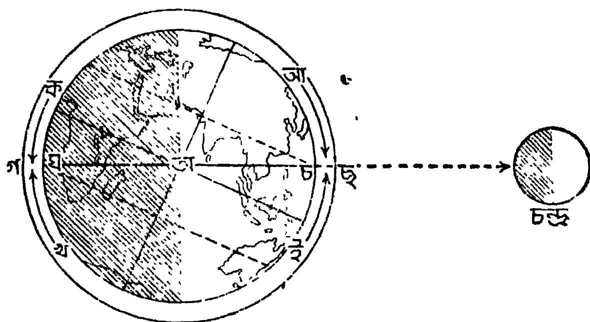
(২) উষ্ণ-স্রোতের উপরস্থ বায়ুরাশি জলীয় বাষ্পপূর্ণ; কারণ, বায়ু যতই উষ্ণ হয়, উহা সংপৃক্ত হইবার জন্য অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে; আর, শীতল বায়ুরাশি সংপৃক্ত হইতে হইলে অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হইলে ঘনীভূত হয় অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এইজন্য এইরূপ প্রকৃতির বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। আবার, জলীয় বাষ্পপূর্ণ শীতল বায়ুপ্রবাহ কোন উষ্ণ অঞ্চলে প্রবাহিত হইলে অতি-সংপৃক্ত হয় না, ফলে তথায় এইরূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয় না। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ-স্রোত প্রবাহিত। ইহার উপরস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ। এই বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া এই অঞ্চলের উচ্চভূমির পার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তর-চিলি ও পেরুর উপকূলের পার্শ্ব দিয়া শীতল পেরু-স্রোত প্রবাহিত। ইহার উপরস্থ বায়ুরাশি শীতল ও শুষ্ক বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহ উপকূলে প্রবাহিত হইলে, ইহার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। এইজন্য এই উপকূলে আটাকামা মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য শীতল বা উষ্ণ, এই কথা দুইটি তুলনামূলকরূপে ব্যবহার করা হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) উষ্ণ ও শীতল-স্রোতের মিলনস্থলে কুয়াসা ও ঝড়ের সৃষ্টি হয়; কারণ, এইস্থানে বিভিন্ন আর্দ্রতা ও উষ্ণতাযুক্ত বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ দুইটি বায়ুরাশি পরস্পর সংস্পর্শে আসিলে তখন ইহারা সহজে মিশিয়া যায় না, বরং ইহারা বিপরীত দিকে অথচ পাশাপাশিভাবে প্রবাহিত হয়। ইহার পর উষ্ণ-বায়ুরাশির কতকাংশ শীতল-বায়ুরাশির পার্শ্বদেশের অংশবিশেষে আঘাত করে, তখন ঐ অংশ ভিতরদিকে বাঁকিয়া যায় এবং ডিপ্রেসনের সৃষ্টি হয়। শীতল-বায়ুরাশি অপেক্ষা উষ্ণ-বায়ুরাশি লঘু বলিয়া উষ্ণ-বায়ুরাশি, শীতল-বায়ুরাশির উপর তির্যকভাবে (ঢাল ৮০ ফুটে ১ ফুট) উঠিয়া যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠে উষ্ণ-বায়ুরাশির

সীমান্ত (Warm Front) সৃষ্টি করে। আর, শীতল-বায়ুরাশি ঘুরিয়া উষ্ণ-বায়ুরাশির পশ্চাৎভাগে আঘাত করে। এই অংশে শীতল-বায়ুরাশির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলিত হয় ও শীতল-বায়ুরাশির সীমান্ত (Cold Front) সৃষ্টি করে। আর, শীতল-বায়ুরাশির পার্শ্বদেশের বক্রতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। তখন, উষ্ণ-বায়ুরাশির উভয় পার্শ্বে শীতল-বায়ুরাশি থাকে। উষ্ণ-বায়ুরাশি অপেক্ষা শীতল-বায়ুরাশির গতি অপেক্ষাকৃত অধিক। এইজন্য শীতল-বায়ুরাশির সীমান্ত (Cold Front) ক্রমশঃ উষ্ণ-বায়ুরাশির সীমান্তের নিকটবর্তী হয় এবং পরে ঐ সীমান্তে পৌছাইলে উষ্ণ-বায়ুরাশি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলিত হয় (Occlusion)। (নবম শ্রেণীর পাঠ্য-অংশে ইহা আলোচিত হইয়াছে।) এইজন্য এই অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি হয়। শীতল-বায়ুপ্রবাহের সহিত উষ্ণ-বায়ুপ্রবাহ মিলিত হইয়া শীতল হয় এবং উহার জলীয়-বাষ্প সংপৃক্ত হইয়া ঘন কুয়সার সৃষ্টি করে।

(৪) শীতল ও উষ্ণ-স্রোত মিলিত হইলে সেইস্থান সাধারণতঃ মৎস্য-শিকারক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

জোয়ার-ভাটা (Tides) ঃ প্রতিদিন সমদ্র-জলের দুইবার নিয়মিত-ভাবে স্ফীতি ও পতন হয়। এইরূপ জলের স্ফীতিকে জোয়ার এবং পতনকে ভাটা

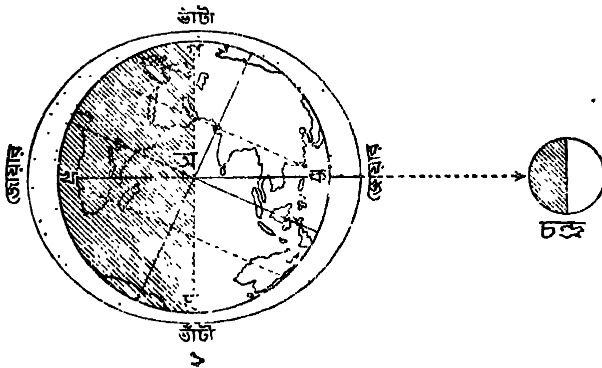


চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে সমুদ্রের জলের গতি—তীরচিহ্ন জলের গতি-নির্দেশক

বলে। কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্র-জলের জোয়ার-ভাটা হয়। এই

প্রাকৃতিক কারণগুলি অতি জটিল প্রকৃতির। তাই. এইরূপ পুস্তকে এই প্রাকৃতিক কারণগুলি বিশেষ আলোচনা না করিয়াও নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

মনে করা যাক, পৃথিবীতে কোন স্থলভাগ নাই, ইহা গভীর জলভাগের দ্বারা আবৃত। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর মহাকর্ষণ-ধর্মের প্রভাবে পৃথিবীর জলভাগের উপর, চন্দ্র ও সূর্য, প্রত্যেকেই দুইটি দুইটি অংশে জল-স্ফীতি সৃষ্টি করিবে। চন্দ্রের সকল অবস্থায় ইহার কেন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখা পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে দুইটি স্থানে ছেদ করিবে, তথায় চন্দ্রের দ্বারা জলস্ফীতি হইবে।



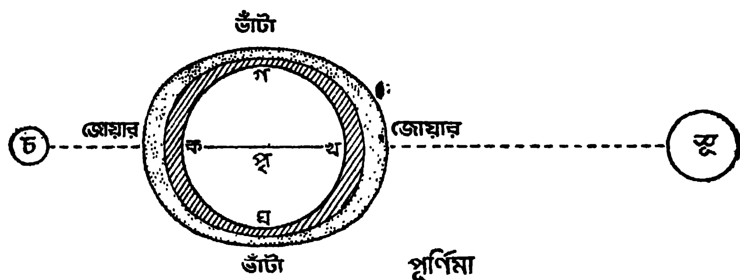
১

ক- ও খ-স্থানে জলের স্ফীতি

১ চিত্রে ছ- ও গ-স্থান এবং ২ চিত্রে ক- ও খ-স্থান ঐরূপ জলস্ফীতি হইবে। পৃথিবীর মোট জলরাশি নির্দিষ্ট বলিয়া জল সরিয়া আসিবার ফলে ঐ দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী অংশে (২ চিত্র গ- ও ঘ-স্থানে) ভাটা হইবে। পৃথিবীর যে-কোন নির্দিষ্ট স্থান ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে বলিয়া ২৪ ঘণ্টায় দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হইবে। ক-স্থানের জোয়ারকে **মুখ্য জোয়ার** এবং খ-স্থানের জোয়ারকে **গৌণ জোয়ার** বলে।

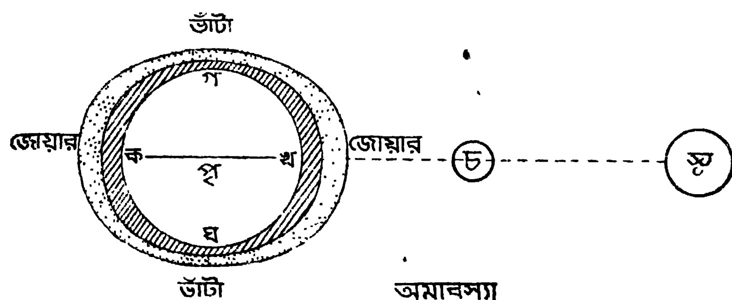
চন্দ্রের মত সূর্যও পৃথিবীর দুইটি বিপরীত অংশে জোয়ার সৃষ্টি করিবে। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য বহুগুণে বড় হইলেও চন্দ্র অপেক্ষা উহা দূরে অবস্থিত বলিয়া

সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের কার্যকরী আকর্ষণ-শক্তি প্রায় দুই গুণ বেশী। এইজন্য সূর্যের প্রভাবে জলস্ফীতির উচ্চতা অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাবে জলস্ফীতির উচ্চতা প্রায় দুই গুণ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য প্রায় সমসূত্রে অবস্থান করে। সুতরাং ঐ সময় চন্দ্র যেস্থানে জোয়ার সৃষ্টি করিবে, সূর্যও ঠিক সেইস্থানে জোয়ার



ভরা-জোয়ার ক- ও খ-স্থানে ভরা জোয়ার এবং গ-ও ঘ-স্থানে ভাটা

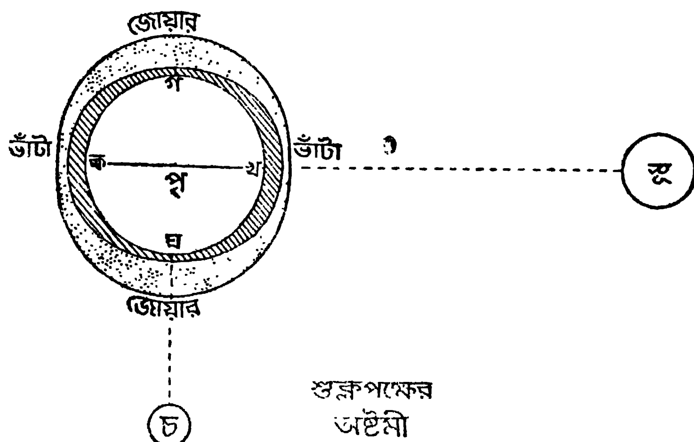
সৃষ্টি করিবে,—একটি জলস্ফীতির উপর আর একটি জলস্ফীতি গঠিত হইবে অর্থাৎ জলস্ফীতি দুইটির উচ্চতার সমষ্টি হইবে। তাই, সমুদ্রের জল অধিক স্ফীত হইবে। ইহাকে **ভরা-জোয়ার** (Spring tide) বলে। অষ্টমী তিথিতে



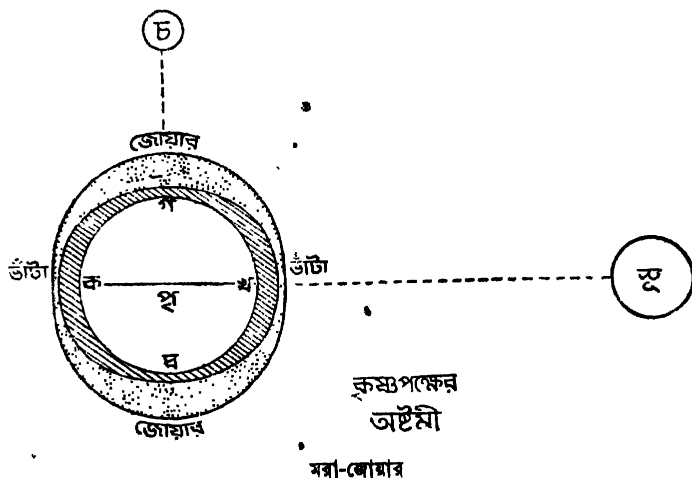
ভরা-জোয়ার—ক-ও খ-স্থানে ভরা-জোয়ার এবং গ-ও ঘ-স্থানে ভাটা

সূর্য ও চন্দ্র প্রায় সমকোণে অবস্থিত থাকে। এইজন্য চন্দ্র পৃথিবীর যেস্থানে জোয়ার সৃষ্টি করিবে, সূর্য ঠিক সেইস্থানে ভাটা সৃষ্টি করিবে। ইহার ফলে

জলস্ফীতি সামান্য হইবে। ইহাকে **মরা-জোয়ার** (Neap tide) বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভাটার সময় জল তত নামিয়া যায় না। তাই, এই সময় জোয়ার ও ভাটার জলের উচ্চতার পার্থক্য সামান্যমাত্র। চিত্রে লক্ষ্য কর।

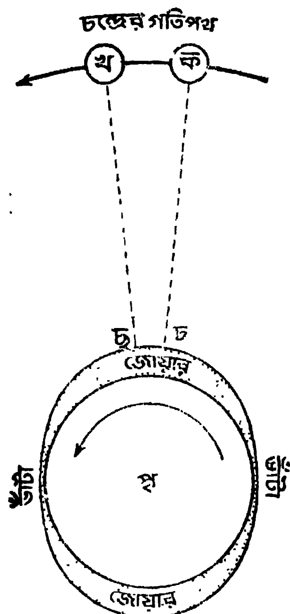


মরা-জোয়ার—গ- ও ঘ স্থানে মরা-জোয়ার এবং ক-ও খ-স্থানে ভাঁটা



মরা-জোয়ার

চিত্রে লক্ষ্য কর, চ-স্থানে জোয়ার হইতেছে এবং ক-স্থানে চন্দ্রের অবস্থান। ২৪ ঘণ্টার পর খ-স্থানে থাকিবে, কারণ চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় ২৮ দিনে একবার ঘুরিয়া আসে। চ-স্থান ছ-স্থানে পৌঁছাইলে চন্দ্রের সম্মুখীন হইবে। চ হইতে ছ পর্যন্ত যাইতে পৃথিবীর প্রায় ৫২ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং ৫২ মিনিট পরে ছ-স্থানে জোয়ার হইবে। এইজন্য মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের সময়ের ব্যবধান প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ স্থানে এইরূপ দেখা যায় না ; কারণ—(১) বিভিন্ন মহাসাগরের আয়তন, আকৃতি ও জলের গভীরতা, (২) উপকূলের নিকট জলের গভীরতা, (৩) তটরেখার আকৃতি, (৪) অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ *। মেক্সিকো উপসাগরের ও ক্যারিবিয়ান উপসাগরের উপকূলে ২৪ ঘণ্টায় ১ বার মাত্র জোয়ার-ভাটা হয়। আবার, প্রশান্ত মহাসাগরের হনলুলুর উপকূলে এক মিশ্র প্রকৃতির (Mixed type) জোয়ার-ভাটা হয়—পর্যায়ক্রমে একদিন উচ্চ-জোয়ার, পরদিন নিম্ন-জোয়ার দেখা যায়। ওয়াইট দ্বীপের অবস্থানের জন্য গ্রেট্-বৃটেনের সাউদাম্পটনে অতিরিক্ত দুইবার



১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পর পর জোয়ার

* জলের পরিমাণ এবং পাত্রের আয়তন ও আকারের উপর পাত্রস্থ জলের নিজস্ব কম্পন (Natural vibration) নির্ভর করে। আবার, অন্য আর একটি কম্পন উহার আরোপ করিলে ব্যভিচার (Interference) এবং ঐ কম্পাঙ্ক সমান হইলে অনুনাদের (Resonance) সৃষ্টি হয়। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিয়মিতভাবে কম-বেশী সরল দোলনগতির মত। ইহা ছাড়া, পৃথিবীর আবর্তনের জন্য অপকেন্দ্র বল ইত্যাদি কার্যকরী হয়।

জোয়ার-ভাটা হয়। আর, রাইন নদীর মোহনার নিকটস্থ সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা বিশেষ হয় না।

জোয়ার ও ভাটা, এই দুইটি অবস্থায় জন্য জলের উচ্চতার পার্থক্য বা সমুদ্র-জলের উঠা-নামা (Tidal Range) সকল স্থানে এইরূপ দেখা যায় না, কতকগুলি বিশেষ কারণের উপর জলের উচ্চতার পার্থক্য নির্ভর করে। মহাসাগরের মধ্যস্থ অংশের জলের এইরূপ উচ্চতার পার্থক্য এত সামান্য যে, তাহা বুঝা যায় না। আবার স্থলবেষ্টিত উপসাগর, বা সাগরের ; যথা—ভূমধ্যসাগর, বাল্টিক সাগরে জোয়ার-ভাটা বিশেষ হয় না। মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারেবিয়ান সাগরে জলের উঠা-নামা ২ ফুট মাত্র। মহাসাগরে উপকূলে সাধারণতঃ ৫-১০ ফুট পর্যন্ত জল উচ্চ হয় ; ইহার কারণ, সমুদ্র-জলের তরঙ্গের ন্যায় মহাসাগরের মধ্য অংশ হইতে জোয়ারের জলরাশি (Tidal Wave) যতই উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, ততই জলের উচ্চতা বাড়িয়া যায় ; আবার, মহী-সোপানের জলরাশি অগভীর বলিয়া তথায় জল অধিক পরিমাণে উঠা-নামা করে। তবে মহাসাগরের উপকূলেও স্থানে স্থানে জলের এইরূপ উঠা-নামার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সংকীর্ণ নদী-মোহনায় জোয়ারের জল প্রবেশ করিলে, উহা নদীর জলস্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা নদীব জলস্রোতের দ্বারা বাধা পায় এবং উহার ফলে জোয়ারের জল প্রাচীরমত উচ্চ হইয়া উঠে। ইহাকে **বানডাকা** (Bore) বলে। খাড়ি বা সাগরশাখায়ও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া উঠে।

ভারতে গ্রীষ্মকালে (Summer) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী প্রবাহিত হয়। আবার ঐ সময় এই দেশে নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে জল বহন করে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় ঐ বায়ুপ্রবাহ ও নদীর প্রচুর জলপ্রবাহের প্রভাবে জোয়ারের জলের খুব বেশী উঁচু হয়। হুগলী নদীর এইরূপ জোয়ারকে ষাঁড়াষাঁড়ী-বান বলে। ঐ সময় কখন কখন বানের জল ২৪ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। ফ্রান্সের চরবুর্গে ১৭ ফুট, ইংল্যাণ্ডের লিভারপুলে ২৯ ফুট ও অ্যাভন মাউথ ৩৩ ফুট, আমেরিকার ফ্যাণ্ডে উপসাগরে ৫০ ফুট পর্যন্ত জোয়ারের জল উঁচু হয়।

জোয়ার-ভাটার কার্য—জোয়ার-ভাটার জন্য নদীর মোহনায় পলি সহজে জমিতে পারে না, কারণ ভাটার জলের টানে পলি অপসারিত হয়। নদীর গতিপথ বক্র এবং নদীর মোহনা হইতে অভ্যন্তরের দিকে ইহার বিস্তার ক্রমশঃ কম হইলে জোয়ারের জলের প্রবল বেগের সৃষ্টি হয় এবং নদীর বক্র-গতির জন্য নদীর এককূল ভাঙ্গে এবং অন্যকূলে বা নদী মধ্যস্থ অংশে মগ্ন চরের সৃষ্টি হয়, আবার বক্র-অংশের নিকট ঘূর্ণি দেখা যায়। এইজন্য এইরূপ নদীতে ঐ সময় নৌ-চলাচল বিপদ্জনক। হুগলী নদী এই প্রকৃতির। তবে, জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া নদীতে প্রবেশ করিলে অগভীর নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। হুগলী নদীতে জোয়ারের সময় জাহাজগুলি যাতায়াত করে। শীতপ্রধান দেশের নদীতে ভালভাবে জোয়ার-ভাটা চলিলে, নদীগুলি সহজে জমিয়া যায় না; কারণ নদীর জল সামান্য পরিমাণে লবণাক্ত হয়; আর, মিঠা জল শীঘ্র জমিয়া যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

প্রাকৃতিক আঞ্চলিক বিবরণ

আমরা যে দেশে বাস করি, তাহার নাম ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। পূর্বে এদেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ। এই দেশ প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজদের অধিকারে ছিল। ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ঐ তারিখে আমাদের সোনার ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া দুইটি ডোমিনয়ন-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ দুইটি রাষ্ট্রের একটির নাম ভারত এবং অপরটির নাম পাকিস্তান। পূর্ববঙ্গ, আসামের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের নাম হয়, ভারত-ইউনিয়ন বা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। তাহার পর, ১৯৫০ খৃঃ ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

ভারত বিচিত্র দেশ। ইহার উত্তরে রহিয়াছে তুষারমণ্ডিত গিরিরাজ হিমালয় এবং দক্ষিণে নীল-সাগরে-ঘেরা দাক্ষিণাত্য-উপদ্বীপ। এই দেশের কোন অংশ শস্যশ্যামলা উর্বরা ভূমি বা দিগন্তব্যাপী বনভূমি, আবার কোন কোন অংশ শুষ্ক মরুময় অঞ্চল। ভারতের বিভিন্ন অংশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। তাই, পৃথিবীর সর্ব-অংশের কিছু-না-কিছু এদেশে দেখা যায়। এইজন্য ভারতকে বলা হয় **পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ** (Epitom of the world)।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শকহূণ-দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হলো লীন।"

ইহা শুধু কবির কথা নহে, ইহা ভৌগোলিক বিচারে সত্য,—এশিয়া মহাদেশের এক বিশিষ্ট স্থানে ভারতের অবস্থিতি, উত্তরের তুষারমণ্ডিত-মৌলি

হিমালয়, আর দক্ষিণের সাগরের অনন্ত বারিরাশির দ্বারা ভারতবর্ষ সুরক্ষিত ; ইহার উর্বরা শস্যশ্যামলা ভূমির খাদ্যশস্যের উৎপাদন-শক্তি, এইগুলি যুগে যুগে এশিয়ার বিভিন্ন অংশের মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করিয়াছে ; ফলে এই দেশ পরিণত হইয়াছে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র। তাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, রক্তধারা সম্মিলিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতা ও এক মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রাচীন যুগে এখানে আবির্ভাব হইয়াছিল এক প্রাণবন্ত সুসভ্য জাতি। সুসভ্য জাতির প্রধান লক্ষণ, সত্যকে জানিবার প্রবল আগ্রহ। জ্ঞানই সত্যের সন্ধান দেয়, জ্ঞান-সন্ধানের পথ দুর্গম ও পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিপত্তিময়। তাই, ঐ পথের যাত্রীর প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, সাহস, পরম অনুরাগ, কৌতূহল এবং বিচার, আলাপ-আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি। ঐ প্রাচীন জাতি ভারতে গড়িলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার, ফলে এদেশ শিক্ষা-দীক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হইল। তখন দেশ-বিদেশ হইতে এদেশে আসিলেন শত শত জ্ঞান-পিপাসু সাধুগণ। আর, এ দেশ হইতে দলে দলে ভারতীয়গণ সুদূর দেশে যাত্রা করিলেন জ্ঞান-বিতরণের জন্য। ইহার ফলে সমগ্র পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম ছড়াইয়া পড়িল। ঐ সব দেশে আজও ইহার নিদর্শন রহিয়াছে শত শত-ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, মন্দির-স্তূপ প্রভৃতিতে।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় চরিত্র, সামাজিক নীতি ও রাষ্ট্রনীতিই সমবেতভাবে ভারতকে পরিণত করিয়াছিল প্রকৃত সোনার ভারত—এই দেশে ছিল কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার, ছিল বিশাল বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য—অবশ্য সে যুগের তুলনায়। সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের মত প্রাকৃতিক প্রবল বাধা সত্ত্বেও তখন স্থলপথে তিব্বত, মধ্য-এশিয়া, তুর্কীস্তান, চীন প্রভৃতি দেশের ভারতীয়গণ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন ; আবার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও অকূল সাগর-মহাসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দ্বীপময় ভারত (ইন্দোনেশিয়া), পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য করিতেন।

ঐ দেশে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এইভাবে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠে।

তারপর দেখা যায় যে, মধ্যযুগের ভারতের জীবন-প্রভা ক্ষীণ, তাহার জাতির নৈতিক বল ও চরিত্র বল দুর্বল, বহির্বাণিজ্য মন্দীভূত ও বিদেশের সহিত যোগসূত্র লুপ্তপ্রায়; আর, রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তি প্রাণহীন। ফলে, জনসাধারণ হইল দরিদ্র। ইহার পর ভারত ইউরোপীয় জাতির অধিকারে আসে। তখন বর্তমান যুগের সভ্যতার অঙ্গগুলি ভারতে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল—রেলপথ, টেলিগ্রাম, দুই-চারিটি কলকারখানা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি; তবুও জনসাধারণ দরিদ্র রহিল।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারত-রাষ্ট্রের জনসাধারণের সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা ও মূর্খতা দূরীভূত করিবার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং ঐগুলির কার্যকারিতা ক্রমে ক্রমে সাধিত হইতেছে। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা-রচনা, সর্বাঙ্গসুন্দররূপে এগুলিকে কার্যকরী করা ও উহাদের সুফললাভের উপর নির্ভর করে, ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারতীয়দের জানিবার প্রয়োজন,—প্রাকৃতিক সম্পদগুলি দেশের কোন্ কোন্ অংশে রহিয়াছে, কিভাবে ঐগুলি সংগ্রহ করা যায়, কিরূপে সম্পদগুলিকে দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করা যায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা কিভাবে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সম্পদগুলিকে আহরণ করিয়াছেন ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভূগোল-বিদ্যা দেশে-বিদেশে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ও উহাদের সহিত দেশের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির পরস্পর প্রতি পরস্পরের যে-সম্বন্ধ ও মানব জাতির সহিত তাহাদের যে-সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাই বর্ণনা ও আলোচনা করে। এইজন্য দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নতিসাধন করিতে হইলে ভূগোল-বিদ্যা পঠন-পাঠন অপরিহার্য বলা যাইতে পারে।

ইতিপূর্বে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ও উহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পর যে-সম্বন্ধ আছে, তাহা, আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের

বিভিন্ন অংশে ও সমগ্রভাবে প্রাকৃতিক বিষয়গুলির কার্য-প্রণালী ও তাহাদের প্রভাব এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলির অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক, আর তাহাদের কর্মতৎপরতার বিষয় বর্ণনা ও আলোচনা করা হইবে।

অবস্থান ও আয়তন ঃ—দক্ষিণ-এশিয়ায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত। এই মহাদেশের দক্ষিণাংশে যে তিনটি বৃহৎ উপদ্বীপ রহিয়াছে, তন্মধ্যে যেটি মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহার নাম দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ বা উপদ্বীপময় ভারত। এই উপদ্বীপ ও মহাদেশের আরও কতক অংশ লইয়া ভারত-যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এই রাষ্ট্র উত্তর-দক্ষিণে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ এবং পূর্ব-পশ্চিমে আসাম হইতে কচ্ছ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং ইহার বিস্তার প্রায় দুই হাজার মাইল। উত্তর-দক্ষিণে ৮° হইতে ৩৭° উ. অক্ষাংশ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬৮° হইতে ৯৭° পূ. দ্রাঘিমার মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত। কর্কট-ক্রান্তি এই রাষ্ট্রের উত্তরভাগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মোট আয়তন (কাশ্মীর সহ) প্রায় ১২ লক্ষ ১০ হাজার বর্গমাইল।

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিভাগ (Physiographic Divisions) ঃ—ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, শিলার প্রকৃতি ও উৎপত্তি অনুযায়ী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) দাক্ষিণাত্যের বা দক্ষিণের মালভূমি, (২) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল এবং (৩) উহাদের মধ্যস্থ উত্তর-ভারতের বিশাল সমভূমি। অবশ্য প্রত্যেক প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে স্থানে স্থানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; তাই, আবার প্রত্যেকটি কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

[প্রাকৃতিক বিভাগগুলি বর্ণনা করিবার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশের শিলার প্রকৃতি, উহাদের উৎপত্তি-ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করা প্রয়োজন।]

ভারতের বিভিন্ন অংশের শিলা, উহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও উৎপত্তি-ইতিহাস—প্রাচীন শিলায় গঠিত সুপ্রাচীন উপদ্বীপময় ভারত, নবীন ভঙ্গিল-পর্বতমালায় গঠিত হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি এবং উহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত

সিন্ধু-গাঙ্গেয় বিশাল পাললিক-সমভূমি, এই তিনটি ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ হইলেও স্থলবিশেষে এইগুলির অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়,—হিমালয় পর্বতমালা সমগ্রভাবে পাললিক শিলায় গঠিত নয় ও ইহার অংশবিশেষ কম-বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; আবার, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির স্থানবিশেষে গভীরভাবে পলল-সঞ্চিত ভূমি বা ভাঁজযুক্ত পাহাড়ও রহিয়াছে কিংবা অন্য কিছু ভূ-বিস্থার নবীন যুগে ঘটিয়াছে।

স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত লঘু গ্র্যানিট-শিলার স্তরের দ্বারা গঠিত। এই গ্র্যানিট-শিলার স্তর ভূ-নিম্নে অবস্থিত গলিত ব্যাসল্ট-শিলার উপর ভাসিয়া আছে। ব্যাসল্ট অপেক্ষাকৃত গুরুশিলা। গ্র্যানিট-শিলার স্তরগুলির ৩ ভাগ উপরে এবং ১৭ ভাগ গলিত ব্যাসল্ট-শিলার মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। এইজন্য স্থলভাগের কোন অংশের ওজন বাড়িলে ঐ অংশ গলিত ব্যাসল্ট-শিলায় আর একটু ডুবিয়া যাইবে অর্থাৎ ঐ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ বসিয়া যাইবে। অনুরূপ কারণে কোন অংশের ওজন কমিলে ঐ অংশে ভূ-পৃষ্ঠ কিছু উন্নত হইবে। কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে পলল সঞ্চিত হইলে ঐ অংশের ওজন বাড়ে এবং কোন অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ঐ অংশের ওজন কমে। সুতরাং কোন অংশে অধিক পলল সঞ্চিত হইলে ভর বৃদ্ধির জন্য উহার ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ বসিয়া যাইবে এবং অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ভর হ্রাসের জন্য উহার ভূ-পৃষ্ঠ উঠিবে। কোটি কোটি বৎসর ব্যাপি ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ কার্য অহরহঃ চলিতেছে। এই সকল কারণে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের বিভিন্ন অংশে নানাভাবে বল (Force) বা চাপের সৃষ্টি হইতেছে, ফলে স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য শিলাস্তরগুলি পীড়ন-বিকৃতি (Stress-Strain) অবস্থায় রহিয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের যে স্বাভাবিক চাপ, তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক চাপ ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরের উপর পড়ে। তখন কঠিন শিলার ধর্ম পরিবর্তন হয়—প্রবল চাপের জন্য শিলা কাদার মত নরম হইয়া যায়, শিলার খনিজ পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, খনিজ পদার্থের অণু-পরমাণুর স্থান পরিবর্তন করে। আবার, শত শত মাইল দীর্ঘ ও গভীর শিলাস্তরের প্রান্তদেশে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ধীরে

ধারে অতি প্রবল পার্শ্বচাপ পড়িলে উহা বাঁকিয়া যায়, কুঁচকাইয়া যায়, ভাঁজে ভাঁজে গ্রন্থিত হয়, হয়ত একটি ভাঁজের উপর আর একটি ভাঁজ উঠিয়া যায় (Nappe) কিংবা কোন কোন শিলাস্তর ফাটিয়া উহা উঠিয়া পড়ে, (Nappe) বা নামিয়া যায়, পাশে সরিয়া ইত্যাদি বিভিন্নভাবে স্থান-পরিবর্তন করিতে পারে। হিমালয় পর্বতমালায় মূলদেশ (Base) ২০।২৫ মাইল গভীর। এত গভীর ও হাজার মাইলের অধিক দীর্ঘ শিলাস্তরগুলির উপর কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া যে অতি প্রবল পার্শ্ব চাপ পড়িয়াছিল, তাহা কল্পনাতীত। এইরূপ প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। আর, এইরূপ চাপ ও তাপের প্রভাবে ভু-ত্বকের শিলাস্তরের পীড়ন-বিকৃতি অবস্থায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়।

ব্যাসণ্ট গুরু শিলা ও গ্র্যানিট্ অপেক্ষাকৃত লঘু শিলা। গুরু শিলার বর্ণ সাধারণতঃ কালো। ধাতব পদার্থ থাকে বলিয়া এই জাতীয় শিলা গুরু। আবার, অধিকাংশ পাললিক-শিলা লঘু। পৃথিবীর আদি যুগে অতি-উষ্ণ ও গলিত পদার্থগুলি শীতল হইয়া যে শিলাগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে আগ্নেয়-শিলা বলে। এইগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত,—অম্লজ (acid), যথা—গ্র্যানিট্ এবং ক্ষারজ (Basic), যথা—ব্যাসণ্ট। আবার, আদি যুগ হইতে পৃথিবীর আগ্নেয়-শিলা বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ শক্তির দ্বারা জলের নীচে পরিবাহিত হইয়াছে ; তথায় পুনরায় জমাট বাঁধিয়া, যে বিশিষ্ট প্রকৃতি শিলায় পরিণত হইয়াছে, তাহাকে পাললিক-শিলা বলে। পরবর্তী যুগে আগ্নেয় ও পাললিক-শিলা, এই উভয় প্রকৃতির শিলা অনুরূপভাবে নূতনভাবে পাললিক শিলায় পরিণত হইয়াছে। যুগে যুগে অহরহঃ এই সকল কাজ চলিতেছে। আবার, প্রবল চাপ বা অধিক উত্তাপের জন্য আগ্নেয়-শিলা ও পাললিক-শিলার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন প্রকৃতির শিলার উৎপত্তি হয়। উহাকে রূপান্তরিত-শিলা বলে। রূপান্তরিত-শিলার খনিজ পদার্থগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। নাইস্ একপ্রকার রূপান্তরিত-শিলা। এই প্রকৃতির শিলা খনিজ পদার্থের মোটা মোটা দানা (grains) লইয়া অপেক্ষাকৃত পুরু স্তরে স্তরে গঠিত এবং আর একপ্রকার

রূপান্তরিত শিলা শিস্ট ; খনিজ পদার্থের ছোট ছোট দানা লইয়া পাতার ফলকের মত খুব পাতলা স্তরে স্তরে ইহা গঠিত। কাজেই এই জাতীয় শিলা স্তরে স্তরে ফাটিয়া যায়। প্রাচীন কালে সৃষ্ট রূপান্তরিত-শিলা, হয়ত, পুনঃপুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। এইজন্য এই জাতীয় শিলা খুব শক্ত। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রূপান্তরিত-শিলা ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণের ফলে পাললিক-শিলায় পরিণত হইতে পারে।

কতকগুলি শিলা স্তরে স্তরে গঠিত বলিয়া উহাদিগকে স্তরীভূত শিলা এবং যাহাদের মধ্যে স্তর দেখা যায় না, তাহাদিগকে অস্তরীভূত শিলা বলে। পাললিক-শিলা স্তরীভূত এবং রূপান্তরিত-শিলা অল্পবিস্তর স্তরীভূত। আগ্নেয়-শিলা সাধারণতঃ অস্তরীভূত। আবার, কতকগুলি শিলায় কেলাস বা স্ফটিক বা দানা যুক্ত খনিজ পদার্থ থাকে ; উহাদিগকে কেলাসিত শিলা বলে, যথা—গ্র্যানিট, নাইস প্রভৃতি ; আর যাহারা দানাযুক্ত নহে, তাহাদিগকে অকেলাসিত শিলা বলে, যথা—ব্যাসল্ট।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায় যে, একই শিলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হইয়া নানা জাতীয় শিলায় পরিণত হইতে পারে। আর, শিলায় রহিয়াছে উহার অতীত ইতিহাসের নিদর্শন। এই কথা পরে আলোচিত হইবে।

কোন কোন বিজ্ঞানী শিলাস্তরের গঠন অনুযায়ী শিলাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, যথা—আগ্নেয়-শিলা ব্যতীত ভারতের গোণ্ডয়ানা যুগ পর্যন্ত (Permian) যে শিলাস্তর গঠিত হইয়াছে, ঐ স্তরের শিলাগুলিকে প্রাথমিক শিলা (Primary rocks) ; প্রাথমিক শিলার ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণ কার্যের ফলে যে শিলাস্তর গঠিত হইয়াছে, উহার শিলাকে মাধ্যমিক শিলা (Secondary) ; এবং মাধ্যমিক শিলা হইতে অনুরূপভাবে যে শিলাস্তর উৎপত্তি হইয়াছে, উহার শিলাকে তৃতীয় শ্রেণীর (Tertiary) শিলা বলে। ইহা হইতে অবশ্য চতুর্থ শ্রেণীর (Quternary) শিলার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই আধুনিক শিলা। ভূ-বিদ্যায় আধুনিক কথার অর্থ, গত কয়েক কোটি বৎসর হইতে পারে।

উপরোক্ত শিলার প্রধান শ্রেণী-বিভাগের প্রত্যেকটি কতকগুলি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী যুগে নিম্নতম শ্রেণীর জীব হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীনকালের বিভিন্ন যুগের ঐসব জীবের জীবাশ্ম ঐ সব যুগের সৃষ্ট-শিলায় রহিয়াছে। তাই, যুগে যুগে বিভিন্ন জীবের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা শিলার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। এইভাবে চারিটি প্রধান যুগ কল্পনা করা হইয়াছে, যথা—(১) প্রথমযুগ বা আদিযুগকে আরকেওজোয়িক্ (Archoeo-zoic), (২) দ্বিতীয় যুগকে প্যালেওজোয়িক্ (Palaeozoic), (৩) তৃতীয় যুগকে মেসোজোয়িক্ (Mesozoic) এবং চতুর্থ যুগ বা সর্বশেষ যুগকে কাইনোজোয়িক (Kainozoic) বলে। আবার, প্রত্যেক যুগই কতকগুলি অংশে বিভক্ত।

আদিযুগে কোন উদ্ভিজ্জ ছিল না, অতিনিম্ন শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী জলে বাস করিত। দ্বিতীয় যুগে জলমধ্যে খোলসযুক্ত শ্রেণীর প্রাণী ও ইহার শেষদিকে স্থলচর প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ দেখা দেয়। তৃতীয় যুগে সরীসৃপ-প্রাণী ও ক্রমে ক্রমে সরলবর্গীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। চতুর্থ যুগে প্রথমে উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী ও বর্তমান সময়ের ফল-ফুল-ধারী উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং শেষভাগে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে।]

(১) দাক্ষিণাত্যের বা দক্ষিণের মালভূমি ঃ † ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ও শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী এই মালভূমি কচ্ছ হইতে সুরু করিয়া আরাবল্লী

† এদেশের প্রচলিত ভূগোলে দক্ষিণের মালভূমি বলিতে বুঝায়—গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণের মালভূমি। এই মালভূমি দুই অংশে বিভক্ত,—বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে মধ্যভারতের মালভূমি এবং উহার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। শিলা প্রকৃতি, ও শিলার উৎপত্তি-ইতিহাস ও ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি আরও বিস্তৃত ও এই সমগ্র মালভূমিই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলাই যুক্তিসঙ্গত।

পর্বতের পশ্চিম-প্রান্ত হইয়া দিল্লী পর্যন্ত এবং তথা হইতে যমুনা ও গঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তটের কতকটা সমান্তরাল হইয়া রাজমহল ও গঙ্গা-নদীর ব-দ্বীপের পশ্চিম-প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই সীমারেখা স্থানে স্থানে বিশেষ বক্র। মালভূমির প্রান্তভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আবার, রাজমহল ও গারোপাহাড়ের মধ্যস্থ ফাঁকের পাললিক সমভূমির নিম্নে এই মালভূমি প্রসারিত হইয়া শিলং-মালভূমির সহিত যুক্ত হইয়াছে—ঐ মালভূমি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বিচ্ছিন্ন অংশ এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবের পাললিক সমভূমির নিম্ন দিয়া হিমালয়ের নিকটস্থ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

[**দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উৎপত্তি-ইতিহাস**—অতি-প্রাচীন যুগে অস্ট্রেলিয়া, দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকা একত্রে যে একটি বিরাট ভূ-ভাগ ছিল, তাহার নাম গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ড। প্রাকৃতিক কারণে এই বিশাল ভূ-ভাগ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহার একটি অংশই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। তাই, ইহা পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন ভূ-ভাগ।

এই মালভূমির শিলা-সৃষ্টির ইতিহাস বলা সহজ নহে; কারণ ইহা অতি-প্রাচীন (আদিযুগে) যুগে সৃষ্ট; ইহার পাললিক-শিলা জটিলভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে আগ্নেয়-শিলার সহিত মিশিয়া গিয়াছে; তাই, এই প্রকৃতির শিলায় জীবাশ্ম বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অতি-প্রাচীনকালে-সৃষ্ট, এক-জটিল-প্রকৃতির ও কঠিন নীইস, গ্র্যানিট, শিস্ট প্রভৃতি কেলাসিত-শিলায় গঠিত এবং স্থানে স্থানে ভাঁজযুক্ত বা চ্যুতিপূর্ণ এই মালভূমির উপর সেই প্রাচীন-যুগে বিবিধ পাললিক-শিলা স্তরে স্তরে গভীরভাবে সঞ্চিত হয়। পরবর্তী যুগে ঐ শিলাগুলি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তরিত-শিলায় পরিণত হয়। পাললিক-শিলার স্তরগুলির নিম্নতম স্তরে বিশেষভাবে রূপান্তরিত কাদাপাথর এবং উহার উপরে শেল (Shale), চূণাপাথর ও বেলেপাথরের স্তর দেখা যায়। পরবর্তীযুগে কোটি কোটি বৎসরব্যাপী শিলার ক্ষয়সাধনের ফলে ঐ প্রাচীনকালে সৃষ্ট পাললিক-শিলার অধিকাংশ অপসারিত হইয়াছে এবং চতুর্থ যুগে প্রথম ভাগে এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উহার উপর লাভা সঞ্চিত

হইয়াছে। পরে ইহাই কৃষ্ণমৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এই মৃত্তিকা জলধারণ করিতে পারে এবং উর্বরা।]

[**দাক্ষিণাত্যের মালভূমির শিলা ও তাহাদের উৎপত্তিকাল:** আদি-যুগে নাইস, গ্র্যানিট শিস্ট, (গ্র্যানিট আগ্নেয়শিলা এবং নাইস ও শিস্ট রূপান্তরিত-শিলা) ধারওয়ার-আরাবল্লী শ্রেণীর ও কুড্ডাপা-দিল্লী শ্রেণীর শিলা; দ্বিতীয় যুগের প্রথম ভাগে বিন্ধ্য শ্রেণীর এবং শেষভাগে প্রাচীন গোণ্ডয়ানা শ্রেণীর শিলা (Lower Gondwana); তৃতীয় যুগে প্রথম ভাগ হইতে পর পর মধ্যযুগের গোণ্ডয়ানা শ্রেণীর শিলা (Middle Gondwana), শেষ যুগের গোণ্ডয়ানা শ্রেণীর শিলা (Upper Gondwana); চতুর্থ যুগের প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যের লাভা (Deccan lava) এবং ইহার পরবর্তী সময়ে উপকূলের সমভূমি ও নর্মদা-তাপ্তী নদীর উপত্যকার পাললিক ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

ধারওয়ার-আরাবল্লী শ্রেণীর শিলা—ইহা অতি-প্রাচীন ও জটিল প্রকৃতির শিলা। এক প্রকার আগ্নেয়শিলা (Extrusive rocks) ও প্লুটোনিক-শিলা (Plutonic rocks), এই দুই শ্রেণীর আগ্নেয়-শিলা বিশিষ্টভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মহীশূর-ধারওয়ার-বেল্লারী অঞ্চল, ছোটনাগপুরের দক্ষিণাংশ, নাগপুরের নিকটবর্তী স্থান এবং আরাবল্লী পর্বতের অংশ বিশেষে এই জাতীয় শিলা দেখা যায়। ইহা গুরুত্বপূর্ণ শিলা; কারণ, আকরিক লৌহ, আকরিক তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু এই শিলায় পাওয়া যায়।

কুড্ডাপা-দিল্লী শ্রেণীর শিলা—ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নঅংশে বা ভাঁজের অধঃভঙ্গের (Synclinal basin) নিম্নঅংশে জলের তলদেশে এই শ্রেণীর শিলা গঠিত হয়। চূণাপাথর, শ্লেট, কোয়ারট্জাইট্ (Quartzite) শিলা ইহার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লীতে যে শৈলশিরা (Ridge) রহিয়াছে, উহা কোয়ারট্জাইট্ শিলায় গঠিত। কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্তী অংশে, মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়-সমভূমিতে এই শ্রেণীর শিলা দেখা যায়।

বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলা—বিন্ধ্য পর্বত ও বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিন্ধ্য পর্বতের অধিকাংশ লাভাজাত শিলায় গঠিত এবং

ইহার পূর্বাংশে বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলা দেখা যায়। এই শ্রেণীর শিলা সাধারণতঃ বেলেপাথর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন বেলেপাথরে খনিজ পদার্থের অনুপাত একপ্রকার থাকে না। প্রত্যেক শ্রেণীর শিলায় এইরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। তাই, প্রত্যেক শ্রেণীর শিলাই আবার অসংখ্য উপশ্রেণীতে বিভক্ত—শিলার খনিজ পদার্থের অবস্থিতি ও উহাদের অনুপাতের হারের উপর এই উপশ্রেণী-বিভাগ নির্ভর করে। স্থানে স্থানে বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলায় সমুদ্র-গর্ভে সৃষ্ট শেল, চূণাপাথরও দেখা যায়। কাইমুর পাহাড়ের চূণাপাথর সংগ্রহ করিয়া জাপলা, ডালমিয়ানগর, চুর্ক প্রভৃতি স্থানে সিমেণ্ট তৈয়ারী হয়। এই পাহাড়টি বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলায় গঠিত।

গোণ্ডয়ানা শ্রেণীর শিলা—দ্বিতীয় যুগের শেষভাগ হইতে প্রথম যুগের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে চ্যুতি-সৃষ্ট-বেসিনে (Fault basin) গভীরভাবে পলল সঞ্চিত হইয়া (স্থলভাগের ক্ষয়জাত শিলা) পরে প্রধানতঃ বেলেপাথরে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য ইহার স্তরগুলি গভীর এবং এই স্তরে সামান্য পরিমাণে কাদা (Clay) ও শেলও (Shale) রহিয়াছে। আবার, হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ডও দেখা যায়। কারণ সেই যুগে ভারতের আরাবল্লী পর্বতে মহাদেশীয় হিমবাহ সৃষ্টি হইয়াছিল। দামোদর নদ, গোদাবরী নদী-, পেনগঙ্গা নদী-উপত্যকায় ও তালচরে এই শ্রেণীর শিলা দেখা যায়। ভারতের প্রায় যাবতীয় কয়লা এই শ্রেণীর শিলাতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্য-লাভা—চতুর্থ যুগের প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূ-ত্বকে যে সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটল সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে অতি-উষ্ণ লাভা নির্গত হয় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাভার দ্বারা প্লাবিত হয়। ইহার গভীরতা ২০০০ ফুট হইতে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত এবং বিস্তার প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল। পূর্বে ইহার বিস্তার আরও অধিক ছিল এবং ক্ষয়সাধনের ফলে ইহার বহু অংশ অপসারিত হইয়াছে ও ইহার কিছু অংশ আরব সাগরের তলদেশে বিস্তৃত। এই লাভা-গঠিত ভূ-পৃষ্ঠ কতকটা সমতল প্রকৃতির, কারণ প্রাচীন যুগের সৃষ্ট পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা—সমস্তই লাভার দ্বারা

আবৃত হইয়াছিল। আর, লাভা পরিবর্তিত হইয়া কৃষ্ণমৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে।]

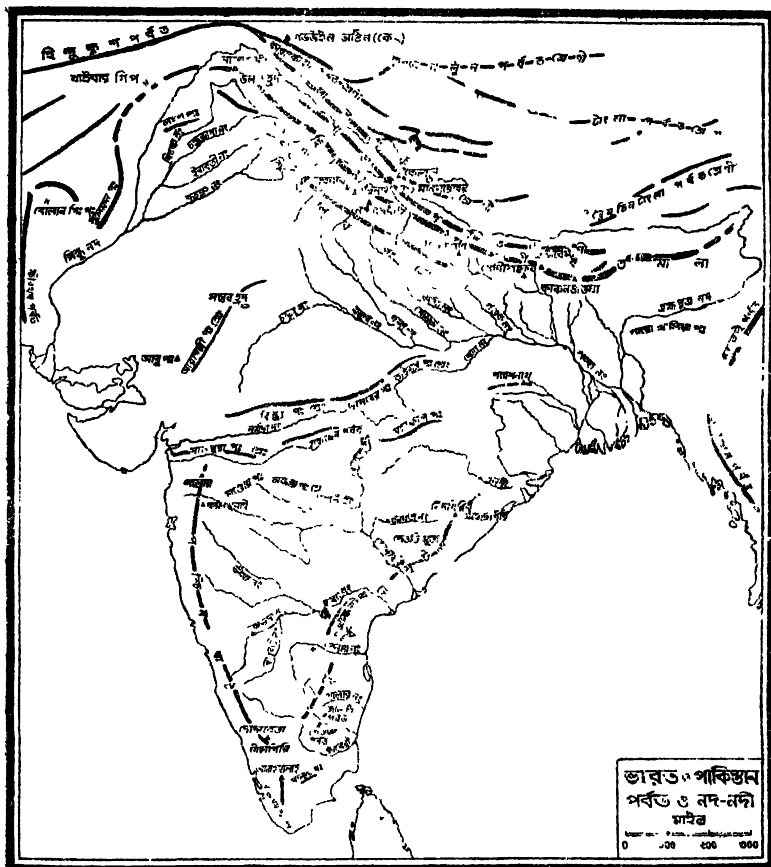
[**হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল লঘুশিলায় এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি গুরুশিলায় গঠিত,—তাহার প্রমাণ**—ভারতের উত্তরে সু-উচ্চ হিমালয়ের পার্বত্যভূমি ও তিব্বতের উচ্চ-মালভূমি এবং দক্ষিণাংশে উহাদের অপেক্ষা বহু-নিম্ন দাক্ষিণাত্যের মালভূমি রহিয়াছে, কিন্তু পেণ্ডুলাম-পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, দাক্ষিণাত্য-মালভূমির নিম্নে যে শিলারাশি অবস্থিত, তাহার ওজন অপেক্ষা হিমালয়ের পার্বত্যভূমি ও তিব্বতের মালভূমির নিম্নে যে শিলারাশি রহিয়াছে, তাহার ওজন কম। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, হিমালয়ের পার্বত্যভূমি 'লঘুশিলায়' এবং দাক্ষিণাত্য-মালভূমি 'গুরুশিলায়' গঠিত। এইজন্য বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের শিলার ওজন অধিক বলিয়া উহার ভূ-পৃষ্ঠ নিম্ন এবং হিমালয়-অঞ্চলের শিলার ওজন কম বলিয়া উহা উচ্চ। হিমালয় পর্বতমালা যে সু-উচ্চ হইয়াছে, তাহা ইহাই একমাত্র কারণ নহে। এই বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করিব।]

দাক্ষিণাত্য-মালভূমির ভূ-পৃষ্ঠের বিবরণঃ এই বিশাল মালভূমির বিভিন্ন অংশের ভূ-পৃষ্ঠের গঠন বা শিলার প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া ইহাকে নানা অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়; তবে, স্থূলভাবে দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) মধ্যভারতের মালভূমি এবং (২) সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণের মালভূমি।

মধ্যভারতের মালভূমি—এই মালভূমি উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত, দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত। আবার, এই মালভূমিকে নিম্নলিখিতভাবে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা—

রাজস্থানের মালভূমি—ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীন পেনিপ্লেন। ইহার পশ্চিমাংশের আরাবল্লী পর্বতমালা প্রায় ৪৩০ মাইল দীর্ঘ। এই পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে গঠিত,—উত্তর-পূর্বাংশ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশিরার সমষ্টি এবং দিল্লীর শৈলশিরা ইহার প্রান্তভাগ; উদয়পুর-অঞ্চল

উচ্চ শৈলশিরা ও তন্মধ্যস্থ উপত্যকায় পূর্ণ। এই অংশে দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত আবু-পাহাড় ইহার উচ্চতম (৫,৬৪৬′) অংশ। আরাবল্লী পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম পর্বতমালা। এই পর্বতের ক্ষয়সাধন-চক্র



১৭৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। রাজপুতনায় মালভূমির পূর্বাংশে চম্বল নদীর উপত্যকা, আর উত্তর-পূর্বাংশ সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

মালবের মালভূমি—ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা—দক্ষিণাংশ লাভাজাত শিলায় গঠিত মালভূমি এবং উত্তরাংশ স্ক্যার্পল্যাণ্ড (Scarpland)—এই অংশটি বিন্ধ্য-শ্রেণীর শিলায় গঠিত। দক্ষিণাংশে রহিয়াছে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত। প্রকৃতপক্ষে পর্বত দুইটি লাভাজাত শিলায় গঠিত মালভূমির উচ্চ-প্রান্তভাগ। এই অঞ্চলে নর্মদা ও তাপ্তী নদী গ্রস্ত-উপত্যকায় প্রবাহিত। ঐ দুইটি নদীর উপত্যকার অংশ-বিশেষে গভীরভাবে পলল সঞ্চিত হইয়াছে; কারণ গভীর ও প্রশস্ত গিরিখাতে নদী-উপত্যকা সৃষ্টি হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ডের মালভূমি—ঝান্সির নিকটবর্তী অঞ্চল নাইস (Gneiss) নামক এক কঠিন ও কেলাসিত শিলায় এবং অবশিষ্ট-অংশ বিন্ধ্য-শ্রেণীর শিলায় গঠিত। ইহা প্রধানতঃ ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি এবং স্থানে স্থানে শিলাময় ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে। আর, পান্নার নিকটবর্তী অঞ্চলে কন্‌গ্লমেরেট (Conglomerate) নামক শিলায় হীরক পাওয়া যায়।

বাঘেলখণ্ড বা রেওয়ার মালভূমি—এই অঞ্চলের প্রধানতঃ বেলেপাথরে গঠিত (বিন্ধ্য-শ্রেণী-শিলা) কাইমুর পাহাড় শোণ নদের বামতটে দেড় হাজার-দুই হাজার ফুট খাড়াভাবে অবস্থিত। বাঘেলখণ্ডের উত্তরাংশে পাললিক ভূমি রহিয়াছে।

নর্মদা নদীর ও শোণ নদের উপত্যকা—সমান্তরালভাবে অবস্থিত দুইটি গভীর ও সুদীর্ঘ চ্যুতির মধ্যস্থ ভূমি বসিয়া যে গ্রস্ত-উপত্যকা সৃষ্টি হইয়াছিল, জব্বলপুরের পরবর্তী অংশে নর্মদা নদী ঐ উপত্যকায় প্রবাহিত। এই উপত্যকায় গভীরভাবে (কোন কোন স্থানে ৫০০′), পললরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। আর, শোণ নদ সংকীর্ণ উপত্যকায় প্রবাহিত। ঐ নদের বামকূলে কাইমুর পাহাড় প্রায় ৩০০ মাইল জুড়িয়া প্রাচীরের মত উচ্চ (Sandstone scarp) হইয়া দণ্ডায়মান।

সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণী—লাভার দ্বারা গঠিত মালভূমির সু-উচ্চ প্রান্তভাগই (Scarp) সাতপুরা পর্বত নামে পরিচিত। ইহার উত্তর-পূর্বে মহাদেব পর্বত। ইহা প্রাচীন বেলেপাথরে গঠিত শিলাস্তূপ। ইহার

পূর্ব-পার্শ্বদেশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। মহাদেব পর্বতের পূর্বে মহাকাল পর্বত। ইহা নাইস ও লাভা শিলায় গঠিত। এই পাহাড়িয়া অঞ্চল গভীর নদী-উপত্যকা-পূর্ণ ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি। **অমরকণ্টক** ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার নিকট শোণ নদ ও নর্মদা নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র।

ছোটনাগপুরের মালভূমি—এই মালভূমির উত্তর-পূর্বে গঙ্গা নদী ও পূর্বে গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ। গঙ্গা নদীর প্রবাহপথ যেস্থানে ঘুরিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে, ঐ স্থান পর্যন্ত রাজমহল পাহাড় বিস্তৃত। ঐ পাহাড় গোণ্ডয়ানা যুগের ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত। এই অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের মালভূমির অধিকাংশ প্রাচীন নাইস-শিলায় (Archaean gneiss) গঠিত ; আর দামোদর-উপত্যকা গোণ্ডয়ানা যুগের পাললিক-শিলায় গঠিত। চ্যুতির সৃষ্টির ফলে যে উপত্যকা (Fault-trough) সৃষ্টি হইয়াছে, দামোদর নদ ঐ উপত্যকায় প্রবাহিত। সিংভূম-জেলার ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলায় আকরিক লৌহ, তাম্র, মাঙ্গ্যানিজ পাওয়া যায়। এই মালভূমির কতকাংশ বিশেষতঃ রাঁচি মালভূমি বন্ধুর পেনিপ্লেন।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণাংশ—মধ্যভারতের মালভূমির দক্ষিণে ত্রিভুজের মত যে মালভূমি রহিয়াছে, তাহাকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণে এই মালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমি পূর্বে ক্রমনিম্ন বলিয়া এখানকার অধিকাংশ নদ-নদী পূর্ববাহিনী। ইহার কারণ, সম্ভবতঃ এই বিরাট শিলময় ব্লক বা বস্তু (Great Block) পূর্বদিকে একটু নত বা কাত হইয়াছে কিংবা এক বিশাল ভূ-খণ্ডের পশ্চিমাংশ বসিয়া আরব সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশই এই মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এই অংশের উত্তর-পশ্চিম ভাগ লাভাজাত শিলায় এবং অবশিষ্ট অংশ গ্র্যানিট, নাইস, শিস্ট প্রভৃতি প্রাচীন কেলাসিত শিলায় গঠিত। লাভাজাত শিলায় গঠিত বা কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল উর্বর এবং কেলাসিত শিলায় গঠিত অঞ্চল সাধারণতঃ অনুর্বর। কতক অংশে কুড্ডাপা-শ্রেণীর বা ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলা রহিয়াছে।

এই মালভূমির পশ্চিম-প্রান্তে **পশ্চিমঘাট** পর্বতমালা অবস্থিত। ইহা মালভূমির সুউচ্চ পশ্চিম-প্রান্ত। গোয়া হইতে এই পর্বতমালার উত্তরাংশ লাভাজাত শিলায় এবং দক্ষিণাংশ প্রাচীন কেলাসিত শিলায় গঠিত। গোয়ার উত্তরে উপকূলের সমভূমি সংকীর্ণ এবং এখানে প্রধান পর্বতমালার পশ্চিম-প্রান্তের বহু শাখা-শৈলশিরা সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত। আর, পর্বতমালার এই উত্তরাংশ ব্যবচ্ছিন্ন। গভীর গিরিখাত, সূচ্যগ্রচূড়া প্রভৃতি এই অংশে দেখা যায়। এই পর্বতমালার দক্ষিণাংশে (গোয়ার দক্ষিণে) গোলাকার পর্বত-চূড়া রহিয়াছে। এই অঞ্চলের উপকূলভাগের সমভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্ব-পার্শ্বদেশ ক্রমনিম্ন হইয়া মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** এই পর্বতমালার প্রধান গিরিপথ। এই মালভূমির পূর্ব-প্রান্তে **পূর্বঘাট** পর্বতমালা। ইহা একটানা পর্বতশ্রেণী নহে—স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকৃতির শিলায় গঠিত ও বিভিন্ন নামে পরিচিত। তাই, ইহাদিগকে পূর্বের পর্বতসমূহ উল্লেখ করা যুক্তসঙ্গত।

পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণ-প্রান্ত **নীলগিরি** পর্বতের সহিত সংযুক্ত। **দোদাবেত্তা** (৮৭৬০′) ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ। নীলগিরি নাইস-শিলায় গঠিত উচ্চ শিলাস্তূপ (Block)। ইহার দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথ। এই গিরিপথ পশ্চিম-উপকূলের সমভূমি ও পূর্বের মালভূমির সংযোগ-পথ। ইহার দক্ষিণে **আনাইমালাই** এবং তাহার দক্ষিণে **পলনি** পর্বত ; আর, সর্বদক্ষিণে উপকূলের সহিত সমান্তরাল-ভাবে **কার্দমম** পর্বত অবস্থিত। **আনাইমুদী** (৮৮৪০′) গিরিশৃঙ্গ আনাই-মালাই পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ এবং ইহাই দক্ষিণ-ভারতের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। এই পর্বতসমূহ নীলগিরির পর্বতের শিলার মত একই প্রকার শিলায় গঠিত।

কঠিয়াবাড়-উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অন্তর্গত। ইহার পশ্চিমাংশ লাভাজাত শিলায় গঠিত। কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের অংশবিশেষ ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি বা স্ক্যার্পল্যাণ্ড। এই অংশের গীর পাহাড় উল্লেখযোগ্য।

উপকূলের সংকীর্ণ নিম্ন-সমভূমি ও তটরেখা—ভারতের তটরেখা বিশেষ খণ্ডিত নয়। ইহার উপদ্বীপ বা তটরেখার নিকট উপসাগরের সংখ্যা খুব

কম ; তাই এদেশের তটরেখা সকল প্রকৃতির। এইজন্য দেশের আয়তনের তুলনায় তটরেখা দৈর্ঘ্য কম এবং স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ও অত্যন্ত কম।

দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-উপকূলের উত্তরাংশের নাম **কঙ্কণ** এবং দক্ষিণাংশের (গোয়ার দক্ষিণে) নাম **মালাবার**। মালাবার উপকূলে কতকগুলি ছোট ছোট লেগুন বা উপহ্রদ রহিয়াছে। **কঠিয়াবাড় উপদ্বীপ, কাম্বে উপসাগর, কচ্ছ উপসাগর, কচ্ছ দ্বীপ, কচ্ছের রণ,** এই উপকূলের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণতম অংশে **কুমারিকা** অন্তরীপ। পূর্ব-উপকূলের কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কৃষ্ণানদীর মোহনা পর্যন্ত অংশকে **করমণ্ডল** এবং ইহার উত্তরাংশকে **উত্তর-সিরকাস** ও পরবর্তী অংশকে **উড়িষ্যার উপকূল** বলে। ভারত ও সিংহলের মধ্যে **পক প্রণালী** ও **মান্নার উপসাগর**।

পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলে সংকীর্ণ সমভূমি বর্তমান। এই সমভূমি বেশী প্রশস্ত নহে ; তবে, পশ্চিম-উপকূলের সমভূমি অপেক্ষা পূর্ব-উপকূলের সমভূমি অধিক প্রশস্ত। পূর্ব-উপকূলে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী বড় বড় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত বলিয়া ব-দ্বীপের মৃত্তিকা উর্বরা। অন্ধ্রপ্রদেশের **কোলার** ও **পুলিকট** এবং উড়িষ্যার **চিল্কা** হ্রদ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে চিল্কা ও পুলিকট বৃহৎ লেগুন।

কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়-উপদ্বীপের উত্তরাংশ ভূমিকম্প-বলয়ের অন্তর্গত ; তাই, ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের ভূর্মির ও তটরেখার পরিবর্তন পুনঃপুনঃ ঘটিয়াছে,—ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বসিয়া কচ্ছের রণের উৎপত্তি হইয়াছে। কচ্ছের রণ অগভীর উপসাগর। গ্রীষ্মকালে ইহার অধিকাংশ স্থান শুকাইয়া লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। কঠিয়াবাড়ের উত্তর-উপকূলের ভূমি নিম্ন। নর্মদা নদী-উপত্যকায় যে চ্যুতি সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা প্রসারিত হইয়া কঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ-উপকূল গঠিত হইয়াছে। কাম্বে উপসাগরের পার্শ্বের ভূ-ভাগ পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। ইহার দক্ষিণে কঙ্কণ-উপকূলের তটরেখা এক বিশিষ্ট প্রকৃতির,—পর্যায়ক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগরশাখা বা নদীমোহনা ও ছোট ছোট শৈলশিরার অগ্রভাগযুক্ত অন্তরীপ অবস্থিত। সম্ভবতঃ পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম-পার্শ্বে চ্যুতি

সৃষ্টি হইবার ফলে ভূ-ভাগ বসিয়া এইরূপ নবীন প্রকৃতির তটরেখা গঠিত হইয়াছে। তাই, এই অংশের উপকূলের ভূমি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানে স্থানে শৈলশিরার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। গোয়ার পর মালবার উপকূল। এই অংশের তটরেখা ও উপকূলের ভূমি বিভিন্ন প্রকৃতির। এই উপকূলের ভূমি অধিকতর প্রশস্ত। সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া এই উপকূলভাগ গঠিত হইয়াছে। এখানে রহিয়াছে ছোট-বড় লেগুন। ঐরূপ একটি লেগুনের উপর কোচিন বন্দর অবস্থিত। কঙ্কণ-উপকূলের নিকট একটি ছোট দ্বীপের উপর বোম্বাই বন্দর অবস্থিত। বোম্বাই ও গোয়াতে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে।

করমণ্ডল উপকূলের তটরেখা একটানা রেখার মত। আর, উপকূলের ভূমির পৃষ্ঠ ও গঠন দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা সাগরগর্ভ হইতে সদ্য-উত্থিত ভূ-ভাগ ; কারণ, উপকূলে লেগুন, লেগুনের মুখের চর (bar); উপকূলের সমভূমির স্থানে স্থানে অভ্যন্তবমুখী কুয়েস্টা (Cuesta) শ্রেণীর পাহাড় এবং প্রাচীন শিলায় গঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। উপকূলের নিকটস্থ প্রাচীন শিলময় দ্বীপগুলিই প্রাচীন শিলায় গঠিত পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। কাবেরী ও কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপের উপকূলের ভূমি নিম্ন এবং ব-দ্বীপের তটরেখা সমুদ্রের দিকে উত্তল (Convex) প্রকৃতির। মহানদী-ব্রাহ্মণীর যুক্ত ব-দ্বীপ এইরূপ প্রকৃতির। ব-দ্বীপের ভূমি ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অঞ্চলের বিশাখাপতনমে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। কাঁথি-মহকুমার উপকূল বালিয়াড়িপূর্ণ। আর, গঙ্গার ব-দ্বীপের উপকূল অতি-নিম্নভূমি এবং ছোট-বড় নদীর খাঁড়িতে পূর্ণ।

(২) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল : ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশে এই পার্বত্য-ভূমি অবস্থিত। ভারতের উত্তরে ধনুকের মত বাঁকিয়া হিমালয় পর্বতমালা রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় হাজার মাইল এবং প্রস্থ দেড় শত হইতে আড়াই শত মাইল। আর, পূর্বাংশ অপেক্ষা ইহার পশ্চিমাংশ অধিক প্রস্থ। হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠ পর্বতমালা। এশিয়া মহাদেশের ২৪,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ, ৯৪টি

গিরিশৃঙ্গের মধ্যে [redacted]র সবগুলি হিমালয় ও কারাকোরামে অবস্থিত। এইরূপ উচ্চ একটিও গিরিশৃঙ্গ অন্য মহাদেশে নাই। কুড়ি হাজার ফুটের অধিক উচ্চ বহু গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ে রহিয়াছে। এই পর্বতমালার গিরিপথগুলি এত উচ্চ যে, অন্য মহাদেশের ঐরূপ উচ্চতাসম্পন্ন গিরিশৃঙ্গগুলি প্রসিদ্ধ। হিমালয় নবীন ভঙ্গিল-পর্বতমালা।

ভৌগোলিক হিসাবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলকে পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়; এইগুলি নিম্নলিখিতভাবে দক্ষিণ হইতে উত্তরে পর পর অবস্থিত; যথা—(১) সমভূমির পার্শ্বে **অব-হিমালয়** বা **শিবালিক** পর্বতশ্রেণী ও উহার উত্তরে দীর্ঘায়ত উপত্যকা। উহার পশ্চিমাংশ ডুন-উপত্যকা নামে অভিহিত। (২) **মধ্য-হিমালয়** (Lesser Himalaya) পর্বতশ্রেণী,—ছয় হাজার হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পাহাড়-পর্বত। (৩) প্রধান-হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শাখা-শৈলশিরাযুক্ত অঞ্চল। এই অঞ্চল প্রধানতঃ ১৫ হাজার ফুট উচ্চ। ইহাকে কতকটা ব্যবচ্ছিন্ন পেনিপ্লেনের মত দেখায়। (৪) হিমালয়ের প্রধান পর্বতশ্রেণী। এই অংশে তুষারমণ্ডিত বহু গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত। (৫) সিন্ধু-নদের ও ব্রহ্মপুত্রনদের উপত্যকা ও উহার উত্তরে তিব্বতের মালভূমির প্রান্তদেশ; উহা প্রায় ১২ হাজার হইতে ১৪ হাজার ফুট উচ্চ। আর প্রান্তদেশের নিকটস্থ তিব্বতের ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতগুলির উচ্চতা ১৯ হাজার ফুট পর্যন্ত।

হিমালয়ের প্রধান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম-প্রান্তে **নাঙ্গাপর্বত**; ইহার উচ্চতম অংশ বা শৃঙ্গ ২৬,৬২৯ ফুট উচ্চ। উহার পার্শ্বে গভীর গিরিখাতে সিন্ধুনদ প্রবাহিত। আর, পূর্ব-প্রান্তে **নামচা-বারওয়া** গিরিশৃঙ্গ (২৫,৪৪৫´) ও উহার পার্শ্বে ১৮,০০০′ ফুট গভীর গিরিখাতে ব্রহ্মপুত্র নদ বা দিহিং নদী প্রবাহিত। এই পর্বতমালা সু-উচ্চ। এখানে তুষারমণ্ডিত বহু গিরিশৃঙ্গ রহিয়াছে,—পশ্চিম হইতে পূর্বে যথাক্রমে **নাঙ্গাপর্বত, নন্দাদেবী** (২৫,৬৪৫´), **ধবলগিরি** (Dhaulagiri—২৬,৭৯৫′), **এভারেস্ট** (২৯,০২৮′), **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (২৮,১৪৬′) ও **নামচা-বারওয়া**। এভারেস্ট পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার নিকটস্থ পাঁচটি গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ২৬,০০০ ফুটের এবং আর ১৩টির উচ্চতা

২২,০০০ ফুটের অধিক। তন্মধ্যে **গৌসাইস্থা**[redacted]), **চো-ইয়ো** (২৬,৮৬৭′), **মাকালু** (২৭,৭৯০′), **লোৎসে** (২৭,৮৯০′) এবং গৌরীশঙ্কর (২৩,৪৪০′)। এইরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার আশেপাশে ১১টি শৃঙ্গের উচ্চতা ২২,০০০ ফুটের অধিক। নন্দাদেবীর নিকটস্থ **কামেট** (২৫,৪৪৭′) উল্লেখযোগ্য গিরিশৃঙ্গ। ভুটান সীমান্তের **চোমো-হ্লারি** (Chomo-Lhari) গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত।

প্রধান পর্বতশ্রেণীর বহু অংশ হিমরেখার উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া এখানে চিরতুষারক্ষেত্র দেখা যায়। আর, এই চিরতুষারক্ষেত্রকে সঞ্চিত জলভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। এই তুষারক্ষেত্র বহু উপত্যকা-হিমবাহ সৃষ্টি করিয়াছে; আর, হিমরেখার নিম্নে হিমবাহ অবতরণ করিলে হিমবাহের বরফ গলিয়া যায়। ফলে, বহু নদ-নদী সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল নদ-নদী উত্তর-ভারতের সমভূমির উপর প্রবাহিত হইয়া উহাকে উর্বর ও সরস করিয়াছে। হিমালয় পর্বতের হিমরেখার উচ্চতা পূর্বে ১৪,০০০ ফুট এবং পশ্চিমে উহার উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে; পশ্চিম-প্রান্তে ১৯,০০০ ফুট। তিব্বতের দিকে ইহার উচ্চতা আরও ৩,০০০ ফুট অধিক, কারণ ঐ পার্শ্বের জলবায়ু শুষ্ক। এই পর্বতশ্রেণী সু-উচ্চ হইলেও তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বহু নদ-নদী ইহাকে ভেদ করিয়া অর্থাৎ গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত। সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীর গভীর গিরিখাত ব্যতীত গঙ্গা (ভাগীরথী ও অলকানন্দা), সরদা (কালী), ঘর্ঘরা (সেলি, কোরনলী ও ভেরী), গণ্ডক, অরুণ, তিস্তা, তোর্সা, মনাস, সুবর্ণশিরি প্রভৃতি নদ-নদী ইহাদের উৎসক্ষেত্রের নিকট ক্ষয়সাধন করিয়া পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে এবং কোন কোনটি হিমালয়ের প্রধান শ্রেণীকে ভেদ করিয়াছে। এইজন্য এই পর্বতশ্রেণীকে প্রধান জল-বিভাজিকা (Divide) বলা যায় না।

মধ্য-হিমালয়ের পর্বতমালার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। কাশ্মীরে ইহা **পিরপঞ্জল** নামে অভিহিত। এই পর্বতমালার বহু অংশে চিরতুষার ক্ষেত্র দেখা যায় না। তাই, এই পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি প্রধানতঃ বৃষ্টির জলে পুষ্ট।

অব-হিমালয়ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে এই পর্বতমালা সুস্পষ্ট এবং পূর্বাংশে মধ্য-হিমালয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে* কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। এই পর্বতমালা কাশ্মীরে **পাব্জি পর্বতমালা,** পূর্ব-পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে **শিবালিক** পর্বতমালা নামে পরিচিত। পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতমালা বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকাময়, কঙ্করময় ও শিলাময় বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রধান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে ট্রান্স-হিমালয় বা তিব্বতের পর্বতশ্রেণী। কাশ্মীরে প্রধান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে **জাস্‌কর, লাডাক** ও **কারাকোরাম** পর্বতশ্রেণী পর পর অবস্থিত। কারাকোরাম পামিরের মালভূমি হইতে বাহির হইয়াছে এবং হিমালয়ও অন্যান্য পর্বতের সহিত সংযুক্ত হইয়া পামিরের সহিত মিলিত হইয়াছে। কারাকোরাম পর্বতমালা সু-উচ্চ। ইহার ৩৩টি শৃঙ্গ ২৪,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। তন্মধ্যে K_2 বা **গডউইন-অস্টেন** গিরিশৃঙ্গ (২৮,২৫০) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। এখানে সুবিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র রহিয়াছে। তাই, বহু উপত্যকা-হিমবাহের সৃষ্টি হইয়াছে; উহার মধ্যে **বালটোরো, বিয়াকো,** ও **বাটুরা** (৩৬ মা.—৩৯ মা. দৈর্ঘ্য) এবং **সিয়াচেন** (৪৫ মা.) হিমবাহ উল্লেখযোগ্য। হিমমণ্ডল ভিন্ন এত দীর্ঘ উপত্যকা-হিমবাহ পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই; তবে, কেবলমাত্র পামির মালভূমিতে ইহাদের অপেক্ষা একটি হিমবাহ দৈর্ঘ্যে কিছু বড়। হিমালয়ের উপত্যকা-হিমবাহের কোন একটি ১৫।১৬ মাইল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য; কাঞ্চনজঙ্ঘা নিকটবর্তী অঞ্চল, সিকিম-বদরিনারায়ণ-অঞ্চলে ১৫।১৬ মাইল দৈর্ঘ্য উপত্যকা-হিমবাহ রহিয়াছে; তবে হিমালয়ের পশ্চিমাংশের হিমবাহগুলি আরও দীর্ঘ এবং আরও নিম্নে অবতরণ করিয়াছে।

তিব্বতের দিকে হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বের ঢাল কম এবং ভূমির বন্ধুরতাও কম। আর, ইহার উত্তরে কৈলাস পর্বত অবস্থিত। ইহাকে লাডাক পর্বতের

---

* Heim এবং Gausser-এর মতে হিমালয় পর্বতের শিলাস্তরে ঘন ঘন ভাঁজের জন্য শিলাস্তর ফাটিয়া অন্য আর একটি শিলাস্তরের উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং পরে বাঁকিয়া (nappe) অব-হিমালয়ের পর্বতকে আবৃত করিয়াছে।

সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। প্রতিসাম্য আকৃতির এই পর্বত অধুনা যুগে সৃষ্ট কন্‌গ্লমেরেট শিলায় (Tertiary Conglomerate) গঠিত। এইরূপ শিলায় গঠিত এত উচ্চ পর্বত পৃথিবীতে আর কোথায়ও দেখা যায় না। এইরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতির শিলার জন্য আলোক বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। তাই, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। ইহা হিন্দু ও তিব্বতীয়দের পবিত্র তীর্থস্থান। আবার, ইহার নিকট মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল (হ্রদ) অবস্থিত। ঐ দুইটি স্বাদু জলের হ্রদ। গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে অবস্থিত মানস-সরোবরের জল রাক্ষসতালে বহিয়া পড়ে; আবার রাক্ষসতালের জল নদীখাতের শিলাখণ্ড, কাঁকর প্রভৃতির মধ্যদিয়া বহিয়া প্রায় ২০ মাইল পরে শতদ্রু নদীরূপে আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামী প্রণবানন্দ বলেন যে, আগস্ট মাসে রাক্ষসতালের জল এই শুষ্ক নদীখাতের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয়।

গিরিপথ—উত্তরের পার্বত্য-অঞ্চলের গিরিপথ সু-উচ্চ বলিয়া শীতকালে গিরিপথগুলি বরফে ঢাকিয়া যায়। কারাকোরাম পর্বতমালার **কারাকোরাম** (১৮,২৯০′), **সাসার** (১৮,২৯০′), **মুজটাগ্** (১৯,০৩০′) গিরিপথ উল্লেখযোগ্য। গিরিপথগুলি প্রকৃতপক্ষে কল (Col)। কারাকোরাম কথার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কর। কাশ্মীরে **বানিহল** (পিরপঞ্জল ৯,২৯০′), **জোগি লা** (প্রধান হিমালয়, ১১,৫৭৮′। লা কথার অর্থ গিরিপথ) **বুর্জিল** (প্রধান হিমালয় ১৩,৭৫৫′), শতদ্রু নদী-উপত্যকায় **সিপ্‌কি**, উত্তরপ্রদেশের **লিপুলেখ** ও সিকিমের **জেলেপ লা** উল্লেখযোগ্য গিরিপথ।

উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমি—নামচা-বারওয়ার নিকটস্থ দিহিং নদীর গভীর গিরিখাতের পর হিমালয় পর্বতশ্রেণী ঘুরিয়া এক বক্র অংশ গঠন করিয়াছে। ইহার সংলগ্ন আসামের পাহাড়গুলি দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পূর্ব-দক্ষিণে প্রসারিত। পর্বতমালার এইরূপভাবে দিক্-পরিবর্তনের হেতু, সম্ভবতঃ চীনের প্রাচীন-শিলায়-গঠিত ইউনান-মালভূমির ও প্রাচীন-শিলায়-গঠিত শিলং-মালভূমির অবস্থান।

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের পাহাড়গুলি নবীন ও ভঙ্গিল এবং প্রধানতঃ বেলেপাথর, চূণাপাথর, কাদাপাথরের দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের সমান্তরালভাবে অবস্থিত শৈলশিরা ও তন্মধ্যস্থ নদী-উপত্যকা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের শিলাস্তরের ভাঁজ সরলভাবে গঠিত (জুরা-শ্রেণীর ভাঁজযুক্ত)। এই অঞ্চলের **পাটকই, নাগা, বরাইল** ও **মিজো** (লুসাই) পাহাড় উল্লেখযোগ্য। নাগাপাহাড়ের **জাপাভো** (১০,০০০′) এই অঞ্চলের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। আর, **টৌনগুপ** গিরিপথ উল্লেখযোগ্য।

আসামের মধ্যভাগে যে প্রাচীন কেলাসিত-শিলায়-গঠিত মালভূমি রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা হইতে সুর্মা-উপত্যকাকে পৃথক্ করিয়াছে। এই শিলার গঠন বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি দাক্ষিণাত্য-মালভূমির শিলার অনুরূপ। তাই, এক প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল, ইহাই বিজ্ঞানীদের অভিমত। গ্র্যানিট, স্লেট, কোয়ারট্‌-জাইট, শিস্ট প্রভৃতি প্রাচীন কেলাসিত শিলার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলের অংশবিশেষ; আবার আর এক প্রাচীন যুগে সৃষ্ট (Eocene) চূণাপাথর, বেলেপাথরের দ্বারা আবৃত। এই অঞ্চলের **গারো, খাসি,** জয়ন্তিয়া, মিকির ও **রেঙ্গমা** পাহাড় উল্লেখযোগ্য। মিকির ও রেঙ্গমা পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বরাইল পাহাড়, এই প্রাচীন মালভূমির সহিত পূর্বে অবস্থিত নবীন ভঙ্গিল পাহাড়গুলির সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

[**হিমালয় পর্বতমালার গঠন ও উৎপত্তির ইতিহাস**—পর্বতের অভ্যন্তরের বিবিধ শিলাস্তরের গঠন, ভাঁজ ও চ্যুতি, অবস্থান, শিলার প্রকৃতি ইত্যাদির বৃত্তান্তের উপর পর্বতের গঠন নির্ভর করে। হিমালয় পর্বতমালা কেবলমাত্র পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা নহে, ইহার গঠন-প্রকৃতিও জটিল। আর, এই পর্বতমালার সর্ব-অংশের বিশেষতঃ পূর্বাংশের শিলাস্তরের ও শিলার প্রকৃতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বিজ্ঞানী হিমালয়ের উৎপত্তি-ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ে সংক্ষেপে ও স্থূলভাবে আলোচনা করিব।

হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন অংশে, এমন কি, কোন এক বিশেষ অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা দেখা যায়,—আগ্নেয়-শিলা, রূপান্তরিত-শিলা ও পাললিক-শিলা। কোন কোন পাললিক-শিলায় সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কতকগুলি পাললিক-শিলায় কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায় না;—শিলার জীবাশ্ম দেখিয়া বিজ্ঞানীরা শিলার উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করেন। আবার এখানে প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৃষ্ট শিলা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ শিলাই দাক্ষিণাত্যের শিলার মত, আর কতকগুলি তিব্বতের শিলার মত। আবার প্রবল চাপের জন্য শিলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হইয়াছে। এইজন্য ইহার অধিকাংশ শিলা রূপান্তরিত-শিলা। হিমালয়ের উচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন গ্র্যানিট ও নাইস শিলায় গঠিত; তবে এভারেস্ট নহে, উহা চুণাপাথর জাতীয় শিলায় গঠিত। হিমালয়ের কোন কোন পর্বতশ্রেণী, যেমন পিরপঞ্জলে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমির অবশিষ্ট অংশ এবং ইহা প্রধানতঃ গ্র্যানিট শিলায় গঠিত, আবার কারাকোরাম প্রাচীনকালে সৃষ্ট চুণাপাথর হইতে মধ্য যুগের সৃষ্ট শিলায় গঠিত; এই অংশে টারসারি যুগের শিলা দেখা যায় না। তবে কারাকোরামের অন্তঃদেশ গ্র্যানিট ও নাইস শিলায় গঠিত। আর, শিবালিক পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের ক্ষয়জাত শিলার পললের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। তবে, হিমালয় পর্বতমালার অন্তঃদেশ (Core) গ্র্যানিট ও নাইস শিলায় গঠিত। কোন কোন অংশ বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও (যেমন—শিবালিক) ইহার বহু অংশই নবীন এবং কোন কোন অংশ এখনও সামান্যভাবে উন্নত হইতেছে। আর, হিমালয়ের মূল বা তলদেশ ভূ-নিম্নে ২০।২৫ মাইল পর্যন্ত গভীরভাবে অবস্থিত। এইভাবে ইহার বৈচিত্র্যের অন্ত নাই।

হিমালয় পর্বতমালার কোন কোন শিলাস্তর যেমন গভীর সেরূপ সুদীর্ঘ। শিলাস্তরগুলিতে বিবিধ প্রকারের বহু ভাঁজ ও চ্যুতি বর্তমান। শিলাস্তরের ভাঁজ ও চ্যুতির প্রকারভেদের অন্ত নাই,—কোনটি সরল প্রকৃতির সমান্তরাল, তবে অধিকাংশই ভাঁজগুলি বিভিন্ন কোণ রচনা করিয়া নতভাবে অবস্থিত; কোথায়ও ভাঁজগুলি দূরে দূরে, আবার কোথায়ও ভাঁজগুলি ঠেসাঠেসিভাবে

রহিয়াছে ; কোথায় একটি ভাঁজের উপর পাশের ভাঁজটি উঠিয়া, পুনরায় বাঁকিয়া প্রথমটির মাথার উপর দিয়া বহু দূর প্রসারিত। এইরূপে ভাঁজকে Recumbent fold বলে। আর, ছাদের মত অংশটিকে ফরাসী ভাষায় নেপে (nappe = ছাদ) এবং জার্মান ভাষায় ডেকেন (Decken) বলে। নেপের উচ্চতম অংশই গিরিশৃঙ্গ। হিমালয় পর্বতের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি এক একটি নেপের উচ্চতম অংশ। আবার, স্থানে স্থানে শিলাস্তর ফাটিয়া চ্যুতির সৃষ্টি করিয়াছে—একটি স্তর ফাটিয়া অন্য স্তরের উপরে উঠিয়াছে,—ইহা যেন টালির ছাদ—যেমন একটি টালির উপর অপর একটি টালির কতক অংশ থাকে। এইভাবে চ্যুতি সৃষ্টি হইলে নেপে গঠিত হয়। শিলাস্তরের ভাঁজ যেমন বিভিন্নভাবে গঠিত হইতে পারে, সেইরূপ শিলাস্তর ফাটিলে স্তরগুলিও বিভিন্নভাবে স্থানচ্যুত হইতে পারে। আনুভূমিকভাবে প্রবল পার্শ্ব-চাপের ফলে শিলাস্তরে এইভাবে ভাঁজ ও চ্যুতি সৃষ্টি করিতে পারে। শিলাস্তরে ভাঁজ পড়িলে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অর্থাৎ শিলাস্তর যতটুকু স্থান আনুভূমিকভাবে ব্যাপিয়া থাকে, স্তরে ভাঁজ পড়িলে এতটুকু স্থানের প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ভাঁজ ও চ্যুতির সৃষ্টি হইলে শিলাস্তর বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়—কখন কখন ৫০ মাইলের অধিক, অর্থাৎ ভাঁজ-সৃষ্টির পর শিলাস্তরের অগ্রভাগ ৫০ মাইল পশ্চাতে সরিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে বিস্তীর্ণ অংশের শিলাস্তর অপরিসর স্থানে স্তূপীকৃত হয়। এইভাবে পর্বতের সৃষ্টি হয়।

ভূ-বিদ্যার তৃতীয় যুগে (Mesozoic times) বর্তমানে যে স্থানে হিমালয় পর্বতমালা বর্তমান, তথায় ভূ-পৃষ্ঠের সুদীর্ঘ ভাঁজের অধোভঙ্গে (Geosyncline) টেথিস (Tethys) নামক সমুদ্র ছিল। এই অধোভঙ্গ স্থানই পৃথিবীর দুর্বল অংশ। উহার উত্তরে মধ্য-এশিয়ার মালভূমি ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য-মালভূমি অবস্থিত ছিল। মালভূমি দুইটি প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত ও সুদৃঢ়। মালভূমি দুইটি হইতে ক্ষয়জাত শিলা পললরূপে টেথিস সমুদ্র-গর্ভে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। ফলে এই সমুদ্রের উত্তরাংশে তিব্বতের ক্ষয়জাত শিলা এবং দক্ষিণাংশে দাক্ষিণাত্যের ক্ষয়জাত শিলার পলল গঠিত হইল। এই অগভীর সমুদ্রে যতই পলল সঞ্চিত হইতে লাগিল সমুদ্র-গর্ভ ততই অবনত হইল। এইরূপে

হাজার হাজার ফুট গভীরভাবে পললরাশি সঞ্চিত হইল। এই অবক্ষেপণ-কার্য চলিল কোটি কোটি বৎসরব্যাপী।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন অংশে পলল সঞ্চিত হইলে ঐ অংশের ওজন বাড়ে, আবার কোন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐ অংশের ওজন কমে। ইহার ফলে ভূ-ত্বকের ভরসাম্য (Isostatic Equilibrium) থাকে না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে শিলাস্তরের পুনরায় ভরসাম্যের চেষ্টা করে। এইজন্যই ভূ-আলোড়ন হয়। ফলে ভূ-ত্বকের বিকার দেখা যায়। টেথিস সমুদ্রে গভীরভাবে পলল সঞ্চিত হওয়ায়, আর ভরসাম্য রহিল না—তখন শিলাস্তর পীড়ন-বিকৃতি (Stress and Strain) অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আর, এইরূপ ক্ষেত্রে শিলাস্তরের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) ধর্মের জন্য প্রদত্ত বলকে বাধা দেয়; কিন্তু চাপ প্রবল হইলে শিলাস্তরের বিকার (Deformation) দেখা যায়। শিলাস্তরের ভাঁজই শিলাস্তরের বিকার-অবস্থা। আনুভূমিকভাবে প্রবল পার্শ্ব-চাপ ধীরে ধীরে অথচ সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রয়োগ করিলে সুদীর্ঘ ও গভীর শিলাস্তর ভাঁজে ভাঁজে গ্রথিত হয়;—এক একটি স্তর হয়ত ২।১ শত ফুট গভীর এবং শত শত মাইল দীর্ঘ, আর স্তরটি ভূ-নিম্ন কয়েক মাইল নিম্নে অবস্থিত হইতে পারে। ভরসাম্য না থাকিবার ফলে, হয়ত, এইরূপ প্রবল পার্শ্বচাপের উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে ক্রমশঃ ভূ-ত্বকের ভারসাম্য-অবস্থায় (Isostatic Adjustment) ক্রমশঃ পৌছায়। এইরূপ প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবার, জার্মান বিজ্ঞানী হেবগ্‌নারের "মহাদেশের ধীর স্থান-পরিবর্তন" (Continental Drift) মতবাদ গ্রহণ করিলে সহজে বুঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উত্তরে এবং মধ্য-এশিয়ার মালভূমি দক্ষিণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়; ফলে এইরূপ আনুভূমিক প্রবল পার্শ্বচাপের উদ্ভব হয়। হিমালয়ের পর্বতের শিলার প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্য-মালভূমিই অধিক এবং মধ্য-এশিয়ার মালভূমি সামান্য পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছিল। যে মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করা হউক না কেন, আনুভূমিকভাবে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে (Thrust) হিমালয় পর্বত যে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিমালয়ের ধনুকের মত বক্র আকৃতি হইবার কারণ, দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া বহুদূর বিস্তৃত ছিল, এখনও পাললিক ভূমির নিম্নে মালভূমির কঠিন শিলাময় অংশ রহিয়াছে। এইজন্য হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অংশ উত্তরে সরিয়া গিয়াছে; আবার, আসামের প্রাচীন শিলায় গঠিত ও সুদৃঢ় শিলং মালভূমির অবস্থানের জন্য হিমালয়ের পূর্বাংশ অবস্থান ঐরূপ হইয়াছে।

একই যুগে বা এক সময়ই সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয় নাই—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ গঠিত হইয়াছে। এই পর্বতমালার সৃষ্টি তিনটি প্রধান অবস্থা (Phase) দেখা যায়: (১) টারসারি যুগের অলিগোসিন (Oligocene time) সময় প্রাচীন কেলাসিত-শিলা ও পাললিক-শিলার দ্বারা হিমালয় পর্বতের মেরুদণ্ড* (Central axis) গঠিত হয়, অর্থাৎ এই পর্বতমালার প্রধান শ্রেণীর অধিকাংশই গঠিত হয়। এই যুগে লাডক-অঞ্চলে চুণাপাথরের সৃষ্টি হয়। (২) পরবর্তী মাইওসিন সময়ে (Miocene times) মারি-অঞ্চলের পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়িয়া পর্বত গঠিত হয়। মারি উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে (পাকিস্তান)। (৩) প্লাইয়োসিন সময়ের (Post Pliocene) পরে (মাইওসিন সময়ের পরবর্তী সময় প্লাইয়োসিন সময়) পূর্ববর্তী যুগের পললরাশি লইয়া শিবালিক পর্বতের সৃষ্টি; আর এখানে গঠন-ক্রিয়া আজও চলিতেছে।

ভাঁজ ও চ্যুতির প্রকৃতি অনুযায়ী হিমালয় পর্বতমালাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়—হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির কঠিন শিলাময় অংশ বিস্তৃত; উহা অবশ্য গভীর পললরাশির দ্বারা আবৃত; যেমন শিবালিক পর্বতমালার পললরাশি। (প্রকৃতপক্ষে শিবালিক হিমালয়ের অংশ নহে, কারণ ইহা হিমালয়ের ক্ষয়জাত শিলায় গঠিত।) শিবালিক পর্বতের পার্শ্বে ইয়োসিন (Eocene) সময়ে সৃষ্ট পাললিক-শিলায় গঠিত শিলাস্তরের ছাদের মত ভাঁজযুক্ত

*প্রতিসাম্য ভাঁজের মধ্যরেখা বা অক্ষরেখার (axis) মধ্য দিয়া একটি সমতল (axis-plane) কল্পনা করা যায়। ঐ সমতলের উভয় পার্শ্বের ভাঁজ পরস্পর সাম্য। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালার একটি নির্দিষ্ট অক্ষরেখা কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ রেখাকে মধ্যরেখা (Central axis) বলে। ইহাকে আমরা মেরুদণ্ড বলিতে পারি।

(Recumbent folds) অংশ, এই অংশের অন্তঃস্থলে (Core) রহিয়াছে অঙ্গার যুগের সৃষ্ট শিলা। ইহার পরবর্তী অঞ্চল নেপে (nappe) অংশ ; ইহাই প্রধান পর্বতমালা। এই অঞ্চলে রহিয়াছে অতি প্রাচীনকালে সৃষ্ট নাইস। এই নাইস-শিলাময় অংশের স্থানে স্থানে দেখা যায় পরবর্তী-যুগের সৃষ্ট নাইস ও গ্র্যানিট। ইহা ছাড়া, টেথিয়া সাগরে সৃষ্ট পাললিক শিলা রহিয়াছে ; উহাতে জীবাশ্ম আছে। আর, তিব্বত মালভূমির ক্ষয়জাত শিলা। এই পাললিক শিলাগুলি প্রাচীন যুগ (Cambrian age) হইতে আধুনিক যুগ (Tertiary age) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে ; আর, অধিকাংশই পরিবর্তিত শিলায় পরিণত হইয়াছে।

(৩) **মধ্যভাগের সমভূমি**—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণের মালভূমি, এই দুইটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে এই বিশাল সমভূমি অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তানের সীমান্ত হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। যমুনা নদীর পশ্চিমের সমভূমি প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ঐ নদীর পূর্বের সমভূমি প্রধানতঃ পূর্বে ক্রমনিম্ন। নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই সমভূমি উর্বরা। আর, স্থানে স্থানে পললরাশির গভীরতা ৫.৬ হাজার ফুট ; যমুনা নদীর দক্ষিণাংশের সমভূমির পললরাশির গভীরতা কম।

এই সমভূমির সর্বাংশের ভূমির গঠন বা মৃত্তিকার প্রকৃতি একরূপ নহে— বিশেষতঃ পশ্চিমাংশের প্রাচীন পাললিক সমভূমিতে নদীপ্রবাহ ভূমি ক্ষয় করিয়া ঐ সমভূমিতে এক নূতন নদী-উপত্যকা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন পাললিক সমভূমির পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা এই নবগঠিত উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠ নিম্নে অবস্থিত। তাই, নবগঠিত সমভূমির পার্শ্বে প্রাচীন পাললিক সমভূমির প্রান্তদেশ খাড়াভাবে অবস্থিত। এই খাড়াপ্রান্তদেশকে বন্যাগঠিত সমভূমির উচ্চকূল (Flood plain Bluff) বলে। উচ্চভূমি হইতে অধিক-ঢালযুক্ত অংশের উপর দিয়া জলধারা নিম্নস্থ উপত্যকার ভূমিতে অবতরণ করে। ইহার ফলে ঐ উচ্চভূমির কিনারা নানাভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ বন্ধুর ভূমিতে (Badland) পরিণত হয়। চম্বল নদীর উপত্যকার শেষ অংশে এইরূপ ব্যাডল্যাণ্ড আছে। আবার, নবগঠিত উপত্যকার ভূমি সাধারণ বেলেমাটিতে

গঠিত। প্রাচীন পাললিক সমভূমির স্থানবিশেষে কঙ্করময় মৃত্তিকা দেখা যায়। ঐ ছোট-বড় কাঁকরগুলি চূণাপাথরের গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান-বিভাগে এইরূপ কাঁকরকে ঘুঁটিং বলে।

হিমালয় পার্বত্যভূমির পাদদেশের শিবালিক পর্বতের দক্ষিণে এবং তরাই-ও ডুয়ার-অঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচুর বালুকা বা কঙ্কর সঞ্চিত হইয়া বালুকাময় ও কঙ্করময় ভূমি গঠিত করিয়াছে। পার্বত্যভূমি হইতে ছোট ছোট নদী অবতরণ করিবার পর ইহাদের ধারাপথ এইরূপ ভূমিতে লুপ্ত হইয়া যায়; তখন এই নদীর জল বালুকা ও কঙ্করের মধ্য চুয়াইয়া চুয়াইয়া বহিয়া চলে। আর, ঐ প্রকৃতির ভূমি অতিক্রম করিলে পুনরায় নদীপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

গঙ্গার ব-দ্বীপের ভূমি নবীন পাললিক। এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠে ব-দ্বীপের সকল প্রকার প্রকৃতি দেখা যায়—স্থানে স্থানে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, বিল, জলাভূমি, নদীর লেভি (levee) ইত্যাদি রহিয়াছে।

থর মরুভূমি—আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে থর মরুভূমি অবস্থিত। ইহা পাললিক সমভূমি না হলেও ইহার অধিকাংশই নিম্ন পেনিপ্লেন, আর উত্তর-পশ্চিমাংশ লুপ্ত ঘাগর নদীর পাললিক সমভূমি বালুকার দ্বারা আবৃত। এই পেনিপ্লেন-অংশে স্থানে স্থানে শিলাময় ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে: এই অঞ্চলের সকল অংশ প্রকৃত মরুভূমি না হইলেও ইহা শুষ্ক মরুপ্রায় ভূমি। ইহার পশ্চিমাংশে স্থানবিশেষ বালিয়াড়িপূর্ণ। বালিয়াড়িগুলি সাধারণতঃ ৫০ ফুট উচ্চ—এমন কি, কোন কোনটি ১০০ ফুটও উচ্চ। যোধপুরের নিকট চূণাপাথরের পাহাড় রহিয়াছে বলিয়া এই অঞ্চল তত বালুকাপূর্ণ নহে। থর মরুভূমি বৎসরে প্রায় ৫০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

নদনদী (The River System)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের নদীগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়; যথা—(১) নদীগুলির যে সাগরে পতিত হইতেছে সেই হিসাবে, যেমন—বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীসমূহ, আরব সাগরে পতিত নদীসমূহ বা অন্তর্বাহিনী নদীসমূহ;

(২) উৎপত্তি স্থান হিসাবে, যেমন—হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে বা দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন নদীসমূহ ; (৩) আঞ্চলিক হিসাবে, যেমন—উত্তর-ভারতের বা দাক্ষিণাত্যের নদনদী। এই পুস্তকে অঞ্চল অনুযায়ী নদনদীগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ করা হইল।

উত্তর-ভারতের নদনদী : এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদনদী হিমালয়ের বরফ-গলা জলে পুষ্ট বলিয়া বারমাসই নদনদীতে জল থাকে। নদীগুলি উর্বর সমভূমিতে প্রবাহিত ; এইজন্য ইহারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের উপযুক্ত ও নাব্য। ইহাদের তীরে বহু জনবহুল নগর ও গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার, এই অঞ্চলের প্রবাহিত কতকগুলি নদনদী দক্ষিণের বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই, এই নদীগুলি কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া সারাবৎসর নদীগুলিতে জল থাকে না। আর, বর্ষাকালে অতিবর্ষণ হইলে অধিকাংশ নদনদীতে বন্যা হইতে পারে এবং অন্য সময়ে ইহাদের প্রবাহ ক্ষীণ হইয়া যায় বা নদীগর্ভ শুষ্ক বালুকাপূর্ণ হয়। উত্তর-ভারতে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, এই তিনটি প্রধান নদনদী। ইহাদের প্রত্যেকের বহু উপনদী আছে এবং প্রত্যেকটি উপনদীসহ স্বতন্ত্র অববাহিকায় প্রবাহিত।

সিন্ধুনদ, উহার উপনদী ও অববাহিকা (The Indus River System and its basin)—সিন্ধুনদের অববাহিকায় কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অবস্থিত। ইহা ভারত-পাকিস্তানের দীর্ঘতম নদ (১৭০০ মা.)। ইহার প্রধান উপনদী বিতস্তা (Jhelum), চন্দ্রভাগা (Chenab), ইরাবতী (Ravi), বিপাশা (Beas) এবং শতদ্রু (Sutlej)। এই স্থানে কেবলমাত্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত উপনদীগুলির নাম উল্লেখ করা হইল।

সিন্ধুনদ উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের কৈলাস পর্বতের উত্তর পার্শ্বের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত। প্রধান হিমালয়ের উত্তরে, গারতং, ঘর, জাসকর, লাডাক ও গিলগিট, ইহার প্রধান উপনদী। গিলগিট নদীর সহিত মিলিত হইবার পর সিন্ধুনদের প্রবাহপথ ঘুরিয়া গিয়াছে এবং পরে নাঙ্গপর্বতের

পার্শ্বে গভীর গিরিখাতের মধ্যে প্রবাহিত। ইহার পর পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইতেছে। ইহার মোহনায় ব-দ্বীপ আছে। সিন্ধুর অন্যতম প্রধান উপনদী **শতদ্রু** তিব্বতের মানস-সরোবর ও রাক্ষসতালের বাড়তি জল লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রধান হিমালয়ের গভীর খাতের মধ্যে প্রবাহিত। এই নদী শিবালিক পর্বত ভেদ করিয়া পাঞ্জাবের রূপারের নিকট সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। **চন্দ্র** ও **ভাগা** এই দুইটি নদী মিলিত হইয়া **চন্দ্রভাগা** নাম ধারণ করিয়াছে। নদী দুইটি প্রধান হিমালয়ের (১৬,০০০′) হিমবাহের দ্বারা পুষ্ট। **বিতস্তা** মধ্য-হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া কাশ্মীর-উপত্যকায় উলার হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কৃষ্ণগঙ্গা ইহার উপনদী। **ইরাবতী** ও **বিপাশা** মধ্য-হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিপাশা শতদ্রুর সহিত এবং বিতস্তা ও ইরাবতী, চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে চন্দ্রভাগা শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়া **পঞ্চনদ** নাম ধারণ করিয়াছে এবং সিন্ধুনদে পড়িতেছে। এই নদীগুলি কতটা অংশ ভারতে বা পাকিস্তানে প্রবাহিত, তাহা মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায়।

পাঞ্জাব শুষ্ক অঞ্চল ও ইহা সমভূমি; এইজন্য এই অঞ্চলে এই সকল নদনদী হইতে বহু সেচখাল খনন করা হইয়াছে।

গঙ্গানদী, উহার উপনদী, অববাহিকা ও উপত্যকা (The Ganga River System and its basin and valley)—ইহা ভারত-পাকিস্তানের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী (১৫১৪ মা.)। উত্তরপ্রদেশে প্রধান হিমালয়ে **গঙ্গোত্রী** (১৩৮০০′) নামক স্থানে এক হিমবাহ হইতে গঙ্গা নদী নির্গত হইয়াছে। হিমালয়-পার্বত্য-অংশের ১৮০ মাইল, ইহার প্রবাহপথ **ভাগীরথী** নামে অভিহিত। এই অংশে **অলকনন্দা** ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। হরিদ্বারের নিকট গঙ্গানদী সমভূমিতে অবতরণ করিয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। পরে মালদহ জেলায় পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা প্রবেশ করিয়াছে। তারপর ধুলিয়ানের নিকট গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মূলশাখা **পদ্মা** নামে প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার পার্শ্ব দিয়া ও পরে পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য

দিয়া বরাবর বহিয়া অবশেষে **মেঘনা** নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। গঙ্গার প্রধান শাখানদী—ভাগীরথী। ইহা পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া বরাবর বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। **দামোদর, অজয়** ও **ময়ূরাক্ষী** ভাগীরথীর উপনদী। গঙ্গার বিশাল ব-দ্বীপ আছে। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ইহার পশ্চিমাংশ মাত্র ভারতের অন্তর্গত।

গঙ্গার ছোট-বড় বহু উপনদী আছে। তন্মধ্যে **যমুনা, রামগঙ্গা, গোমতী. ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী** ও **শোণ** প্রধান। শোণ ভিন্ন অন্যগুলি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়াছে। যমুনা প্রধান হিমালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ গিরিশৃঙ্গ নন্দাদেবীর নিকটস্থ **যমুনোত্রী** (১১,০০০′) নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন। প্রায় ৮৬০ মাইল অতিক্রম করিয়া ইহা এলাহাবাদের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার উল্লেখযোগ্য উপনদী **চম্বল, বেতুয়া** ও **কেন**; আবার, **বানস** চম্বলের উপনদী। এই নদীগুলি মালভূমি-অঞ্চল হইতে উৎপন্ন। গোমতী তরাই অঞ্চল, রামগঙ্গা মধ্য-হিমালয়, ঘর্ঘরা তিব্বতের মানস-সরোবরের নিকটস্থ স্থান, গণ্ডক প্রধান হিমালয় এবং কুশী তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঘর্ঘরা ও কুশী (অরুণ) প্রধান হিমালয় পর্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত। আবার, ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও কুশীর কতকগুলি বড় বড় উপনদী রহিয়াছে। **কালী, সর্দা** ও **রাপ্তী** ঘর্ঘরার প্রধান উপনদী। শোণ নদ মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক গিরিশৃঙ্গের নিকট হইতে নির্গত হইয়া পাটনার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে।

সিন্ধুনদের অববাহিকা অপেক্ষা গঙ্গানদীর অববাহিকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী এবং গঙ্গানদীর উপনদীর সংখ্যাও বেশী; এইজন্য সিন্ধুনদ অপেক্ষা গঙ্গানদী অধিক পরিমাণে জল বহন করে। গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলির বহু অংশ সুনাব্য; তাই জলপথরূপে নদীগুলি ব্যবহৃত হয়। সিন্ধুনদ ও উহার উপনদীগুলি নাব্য হইলেও এইগুলি জলপথ হিসাবে বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। তবে, শুষ্ক সমভূমি অঞ্চলে প্রবাহিত বলিয়া নদীগুলি হইতে সেচখাল খনন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলির মধ্যে কতকগুলির সেচখালের

দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা থাকিলেও সিন্ধুনদের অববাহিকার জলসেচ-ব্যবস্থা উন্নততর।

ব্রহ্মনদ, উহার অববাহিকা ও উপনদী (The Brahmaputra River System, its basin and valley)—পৃথিবীর নদনদীগুলির মধ্যে **ব্রহ্মপুত্র** নদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ,—(১) ইহার গতিপথে বিশেষভাবে দিক্-পরিবর্তন হইয়াছে,—(১) তিব্বতে ইহার সুদীর্ঘ গতিপথ পূর্ববাহিনী, আসামে পশ্চিমবাহিনী, আবার পূর্ব-পাকিস্তানে দক্ষিণবাহিনী; (২) গভীর গিরিখাতের মধ্যে প্রবাহিত—নামচা-বারওয়া গিরিশৃঙ্গের পূর্বপার্শ্বে ১৮,০০০ ফুট গভীর গিরিখাতের মধ্যে ইহার প্রবাহ-পথ; (৩) এই নদী প্রচুর জল বহন করে,—গ্রীষ্মকালেও ডিব্রুগড়ের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদ, ইউরোপের রাইন নদীর নিম্ন অংশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বহন করে; এবং (৫) আসামের প্রধান বাণিজ্যপথ। আসাম-উপত্যকা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ব্রহ্মপুত্র বা ইহার উপনদীগুলি হইতে জলসেচের প্রয়োজন হয় না; আর, ইহার উপনদীগুলি সুদীর্ঘ না হইলেও ইহার অসংখ্য ছোট-বড় উপনদী প্রচুর পরিমাণে জল বহন করে। এইজন্য ভারত ও পাকিস্তানের কোন নদনদী এত অধিক পরিমাণে জল বহন করে না।

হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত-মালভূমির মানসসরোবর নামক হ্রদের পূর্বদিকের পার্বত্য ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিব্বতে এক সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রায় ৮০০ মাইল **সানপো** নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত। ইহার পর গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া **দিহিং** নামে বহিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে **লোহিত** ও **দিবং** নদীর সহিত মিলিত হইয়া **ব্রহ্মপুত্র** নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর আসামের মধ্য দিয়া বরাবর বহিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। এইস্থানে এই নদ **যমুনা** ও **ব্রহ্মপুত্র** এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যমুনা-শাখা গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত এবং ব্রহ্মপুত্র-শাখা ভৈরববাজারের নিকট **মেঘনার** সহিত মিলিত হইয়াছে। মেঘনা নাম ধারণ করিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এক সময়ে সানপো ও দিহিং, এই দুইটি স্বতন্ত্র নদী ছিল। সে-যুগে দিহিং

উৎসস্থানের দিকে অল্প-বিস্তর ক্ষয় করিতে করিতে পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ; ইহার ফলে, কালক্রমে, সান্‌পোর সহিত দিহিং মিলিত হইয়া (River Capture) একটি প্রবাহপথে পরিণত হয়। ভারত-পাকিস্তানের নদনদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় স্থানীয় (১,৮০০ মা.)।

ব্রহ্মপুত্র নদের বহু উপনদী আছে। তন্মধ্যে আসামের প্রবাহিত **সুবণশিরি** ও **মানস** এবং দক্ষিণ-পার্শ্বের (Right bank) **লোহিত, ধনশিরি ও কলংস্নুতী** বামপার্শ্বের (Left bank) প্রধান উপনদী। পশ্চিমবঙ্গের প্রবাহিত **তিস্তা** ও **তোর্সা বা ধরলা** (পূর্বপাকিস্তানে তোর্সা ধারলা নামে পরিচিত) ইহার উল্লেখযোগ্য উপনদী। সমভূমি অংশে ব্রহ্মপত্র ও উহার বহু উপনদী নাব্য।

দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণের মালভূমির নদ-নদী (The Rivers of the Deccan and Central India)—দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণের মালভূমির নদ-নদীগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : মধ্যভারতের নদ-নদী ও দক্ষিণ-ভারতের নদ-নদী।

মধ্যভারতের মালভূমির নদ-নদী—এই অঞ্চলে প্রবাহিত নদ-নদীগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : গঙ্গার অববাহিকার নদ-নদী ও অন্যান্য নদ-নদী। বিন্ধ্যপর্বতমালা ও তাহার পূর্বে সম্প্রসারিত পাহাড়গুলি গঙ্গানদীর অববাহিকা হইতে এই অঞ্চলে প্রবাহিত অন্যান্য নদ-নদীর অববাহিকাকে পৃথক্ করিয়াছে ; তাই এই পর্বতশ্রেণীই জল-বিভাজিকা। গঙ্গার অববাহিকার নদ-নদীগুলির অধিকাংশই যমুনার উপনদী, যথা—বেতুয়া, কেন, চম্বল ও উহার উপনদী বানস এবং গঙ্গার উপনদ শোণ এবং ভাগীরথীর উপ নদ-নদী দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি। এই নদ-নদীর বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য নদ-নদীগুলির মধ্যে **নর্মদা ও তাপ্তী**, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যপ্রদেশের মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক গিরিশৃঙ্গের নিকট হইতে নির্গত হইয়া নর্মদা পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে এবং পরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবর্তী গ্রস্ত-উপত্যকার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে। ইহার মোহনায় প্রশস্ত খাঁড়ি আছে। জব্বলপুরের নিকট মার্বেল পাহাড়ের

গিরিখাতের মধ্যে প্রবাহিত এবং এখানে **জলপ্রপাতের** সৃষ্টি হইয়াছে। **নর্মদা** হিন্দুদের পবিত্র নদী এবং অমরকণ্টকও হিন্দুদের তীর্থস্থান। **শোণনদও** অমরকণ্টকের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। **তাপ্তী** মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতের দক্ষিণের মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে।

দক্ষিণ-ভারতের নদনদী—এই অঞ্চলের প্রধান নদনদীগুলি পূর্ববাহিনী এবং ইহারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মুখে ব-দ্বীপ রহিয়াছে। **মহানদী** মধ্যপ্রদেশের বাস্তার-মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ছত্রিশগড়-সমভূমি ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উড়িষ্যায় স্থানবিশেষে সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা পরে **ব্রাহ্মণী-নদীর** সহিত একত্রে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে।

গোদাবরী পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া বোম্বাই ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে প্রবাহিত। ইহার মুখে বড় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। ইহার প্রবাহপথ ৯০০ মাইল দীর্ঘ। দক্ষিণ-ভারতের ইহা দীর্ঘতম নদী। গোদাবরীর বহু বড় বড় উপনদী আছে। দক্ষিণপার্শ্বের (Right bank) **মঞ্জীরা** এবং বামপার্শ্বের **পুর্ণা**, **প্রাণহিত** (ওয়ার্দা, পেনগঙ্গা ও ওয়েনগঙ্গার মিলিত ধারা), **ইন্দ্রবতী** ও **শবরী** প্রধান উপনদী।

কৃষ্ণা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। ইহার বামপার্শ্বের **ভীমা** এবং দক্ষিণপার্শ্বের **তুঙ্গভদ্রা** প্রধান উপনদী। এই নদী দুইটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়াছে। **কাবেরী** পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ আছে। গোদাবরী ও কাবেরী হিন্দুদের পবিত্র নদী। কাবেরী নদীকে দক্ষিণের গঙ্গা নদী বলা হয়। কাবেরীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-ভারতের নদনদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট; তাই, বর্ষার প্লাবনের পর অন্য সময়ে ইহারা প্রায় শুকাইয়া যায়। নদীগুলি মালভূমির উপর প্রবাহিত বলিয়া

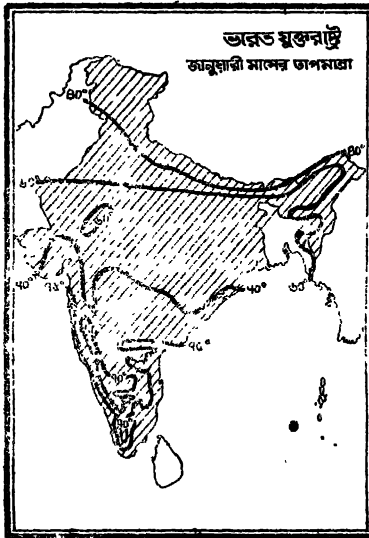
ইহাদের গতিবেগ প্রবল। এইজন্য নদীগুলি নাব্য নহে। ইহাদের তীরে উর্বর সমভূমি বিশেষ নাই বলিয়া ইহাদের উপত্যকা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নহে এবং ইহাদের তীরে বড় বড় শহর দেখা যায় না; তবে ইহাদের ব-দ্বীপগুলি উর্বর বলিয়া তথায় লোকবসতি ঘন। নদীতে স্থানে স্থানে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকান হয় এবং খালপথে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হইয়া থাকে।

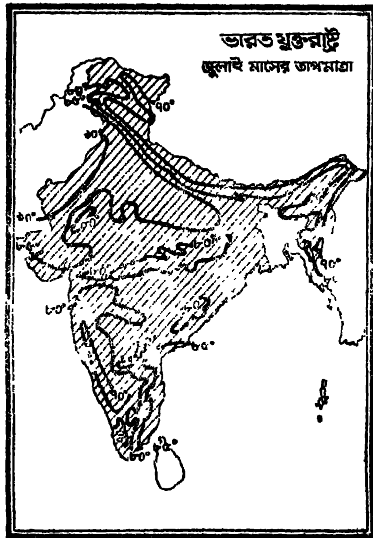
জলবায়ু

পৃথিবীর প্রায় সকল অংশের জলবায়ু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়,—শুষ্ক ও উষ্ণ, শুষ্ক ও শীতল, আর্দ্র ও উষ্ণ, আর্দ্র ও শীতল, মৃদুভাবাপন্ন, চরম ভাবাপন্ন, অতি-উষ্ণ, অতি-শীতল প্রভৃতি জলবায়ুযুক্ত অঞ্চল এই দেশের স্থানবিশেষে রহিয়াছে। এই দেশের কোন কোন অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (১০০″—৪০০″), আবার, কাশ্মীরের লেহ-অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র ২″-৩″। মালাবার উপকূলের জলবায়ু কতকটা নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত, আবার, কাশ্মীর-উপত্যকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের জলবায়ুর মত, আর লেহ-এ জানুয়ারীর গড় তাপমাত্রা ১৭·৩° ফা.; অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় জল জমিয়া যায়, তাহা অপেক্ষা প্রায় ১৫° ফা. কম। ইহা লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা নহে, গড় তাপমাত্রা। সুতরাং লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা আরও অনেক কম। রাজস্থানের মরুঅঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা অধিক এবং হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যন্ত কম থাকে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির জলবায়ু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়; ইহার কারণ, এই দেশের বিশাল আকৃতি, ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-বৈচিত্র্য, পাহাড়-পর্বতের অবস্থান, বিভিন্ন ঋতুর বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া কর্কটক্রান্তি গিয়াছে বলিয়া এই দেশের অধিকাংশ স্থানের জলবায়ু উষ্ণ বলা যায়। এই অংশে গ্রীষ্মই অধিক এবং শীত অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। ভারত একটি বিশাল দেশ বলিয়া সকল স্থানের অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন এক প্রকার নহে; তাই, এদেশের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়।

তাপমাত্রা—জানুয়ারী মাসে সূর্য মকরক্রান্তির নিকট থাকে বলিয়া ভারতে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে। কাশ্মীরসহ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ৮° উ. হইতে ৩৭° উ. পর্যন্ত বিস্তৃত; তাই, জানুয়ারী মাসে ইহার দক্ষিণভাগ হইতে উত্তরদিকে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কম দেখা যায়,—তুতিকোরিনে জানুয়ারী গড় তাপমাত্রা প্রায় ৮০° ফা, অমৃতসরে প্রায় ৫৫° ফা. এবং লেহ-এ ১৭·৩° ফা.। আবার, উত্তর-পশ্চিম ভারত সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত এবং শুষ্ক অঞ্চল বলিয়া এখানে অধিক শীত অনুভূত হয় এবং ইহার দিবারাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্যও বেশী। এই সময়

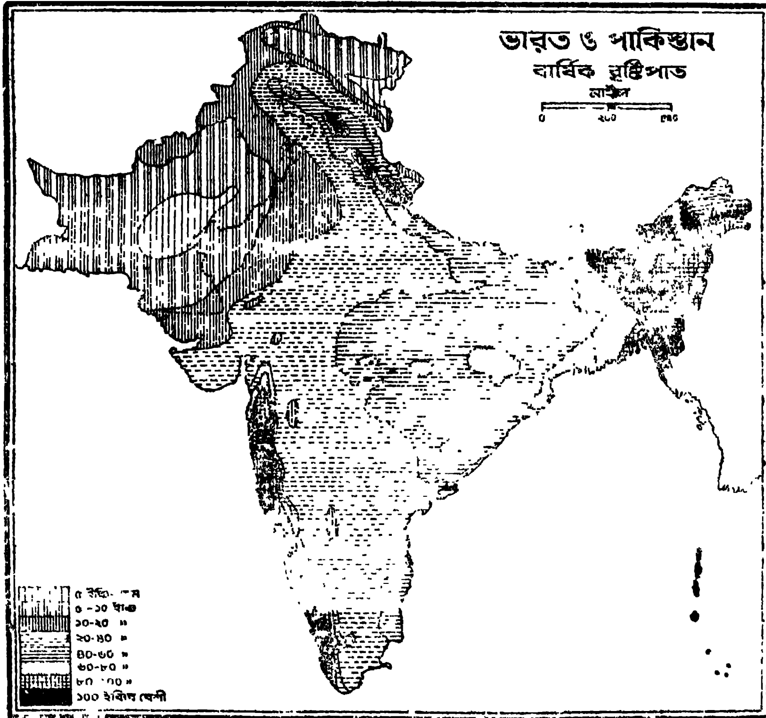




পার্বত্য-অঞ্চলে বিশেষতঃ হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলের শীত তীব্র; দক্ষিণ-ভারতের পার্বত্য-অঞ্চলের অক্ষাংশ কম বলিয়া ইহার শীত মৃদু (নীলগিরি পর্বতস্থ উটকামণ্ডের জানুয়ারী তাপমাত্রা ৩৬°-৬৮° ফা.)। আর, দক্ষিণ-ভারতের উপকূলের নিম্নভূমিতে শীত বিশেষ অনুভূত হয় না।

জুন-জুলাই মাসে কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানে সূর্যরশ্মি প্রায় লম্বভাবে পড়ে। সেইজন্য তখন ভারতের অধিকাংশ স্থানই উত্তপ্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম

ভারতের শুষ্ক অঞ্চল অধিক উত্তপ্ত হয়। বৃষ্টিবহুল স্থানের বায়ু আর্দ্র বলিয়া তখন তথায় তাপমাত্রা কিছু কম থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, হিমালয়ের পাদদেশে ও পশ্চিম-উপকূল বৃষ্টিবহুল স্থান ; তাই, এই সকল অঞ্চলের জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রা কিছু কম। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল শুষ্ক বলিয়া তখন ইহার তাপমাত্রা অধিক। করমণ্ডল-উপকূলে শুষ্ক স্থলবায়ু প্রবাহিত



হয় বলিয়া ইহার গ্রীষ্ম শুষ্ক ও উষ্ণ এবং তাপমাত্রা কিছু বেশী। উচ্চতার জন্য উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে গ্রীষ্মঋতু সুখশীতল।

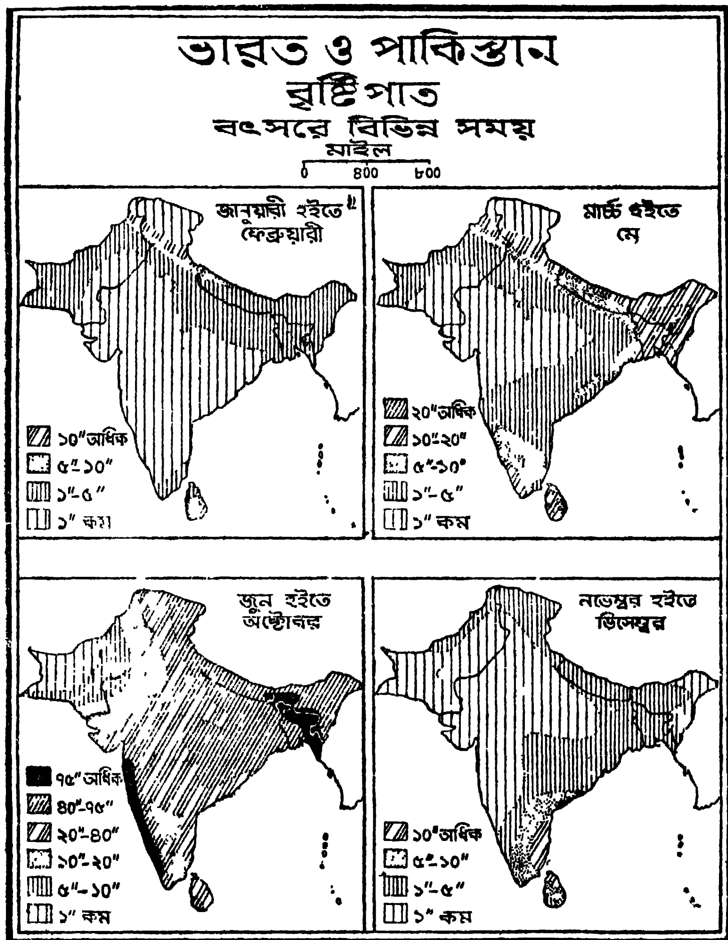
বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মৌসুমী-বায়ু সেবিত দেশ ; এই মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ দুই প্রকারের—(১) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু ;

ইহা গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয়। আর, (২) উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ ; ইহা শীতকালে প্রবাহিত হয়।

গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের বায়ুরাশি অধিক উত্তপ্ত হইয়া বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। তখন ঐ নিম্নচাপের দিকে ভারত মহাসাগর হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সজোরে বহিয়া আসে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ বলে। এই বায়ুপ্রবাহের এক অংশ আরব সাগর পার হইলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পায়। সেই কারণে এই বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে এই পর্বতমালার পশ্চিম-ঢালে এবং কঙ্কণ- ও মালাবার-উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর পৌঁছাইলে এই বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প কম থাকে ; তাই, এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহের অপর শাখা বঙ্গোপসাগর পার হইয়া প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব-পাকিস্তানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে আরও অগ্রসর হইলে হিমালয় ও আসামের পাহাড়গুলিতে বাধা পায়। সেইজন্য হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আসামের খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ-ঢালে জলীয় বাষ্পপূর্ণ এই বায়ুপ্রবাহ সর্বপ্রথম বাধা পায় বলিয়া উহার দক্ষিণ-ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। তাহার পর এই বায়ুপ্রবাহ যতই পশ্চিমে অগ্রসর হয়, ততই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া আসে। তাই, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। পরে, ইহা রাজস্থানে প্রবেশ করে। আরাবল্লী পর্বত অতিক্রম করিলে ইহাতে জলীয় বাষ্প বিশেষ থাকে না বলিয়া ঐ পর্বতের পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত হয় নামমাত্র। এই কারণেই রাজস্থানের পশ্চিমাংশে থর মরুভূমির সৃষ্টি। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কলিকাতায় ৬০", পাটনায় ৪৪", এলাহাবাদে ৩৯", দিল্লীতে ১৭" এবং অমৃতসরে ২২"। এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বদিক হইতে যতই পশ্চিমে অগ্রসর

হওয়া যায়, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততই কম দেখা যায়। বায়ু জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।



অক্টোবর মাসের পর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে, কারণ উত্তর-ভারত ক্রমশঃ শীতল হয়। এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্গোপসাগর

অতিক্রম করিয়া করমণ্ডল উপকূলে পৌঁছাইলে নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই অঞ্চলে ইহার প্রভাবে বৃষ্টিপাত ঘটে। তাই, বৎসরে এই অঞ্চলে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়।

জানুয়ারী মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের* তাপমাত্রা কমিয়া যায়; ফলে বায়ুরাশি শীতল হওয়ায় তথায় বায়ুর উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তখন এই উচ্চচাপের বায়ু ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ুপ্রবাহকে **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ু** বলে। ইহা গাঙ্গেয় উপত্যকায় উত্তর-পশ্চিম হইতে এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমি ও সাগরে উত্তর-পূর্ব দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। ইহা স্থলবায়ু এবং অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চল হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহ শুষ্ক। এইজন্য ইহার প্রভাবে আকাশ মেঘমুক্ত হয় এবং কখনও বৃষ্টিপাত ঘটায় না। এইজন্য শীতকালে ভারতের অধিকাংশ স্থানের বৃষ্টিপাত সামান্য।

শীতকালে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে সৃষ্ট ঘূর্ণবাত পশ্চিম হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কখন কখন প্রবেশ করে। ইহার (Western Disturbances and their Secondary Depressions) প্রভাবে সেই সময় হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। কখন কখন ইহার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত দেখা যায়।

লক্ষ্য কর, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আয়ন-বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও এদেশে প্রকৃত (True) আয়ন-বায়ু প্রবাহিত হয় না। এই দেশে আয়ন-বায়ু মৌসুমী-বায়ুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার কারণ, নিরক্ষরেখার উত্তরে এশিয়া মহাদেশের বিশাল স্থলভাগের অবস্থান; এইজন্য গ্রীষ্মকালে ভারতের দক্ষিণে নিরক্ষরেখার নিকট বায়ু নিম্নচাপ বলয়ের (Doldrums) সৃষ্টি হয় না, বরং সিন্ধু ও থর মরুভূমিতে বায়ুর নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়।

ঋতুসমূহ (Seasons)—ভারত-সরকারের আবহাওয়া-বিভাগ† ভারতের

---

* প্রকৃতপক্ষে মধ্য-এশিয়ার বায়ুর উচ্চচাপ এই বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি-স্থল। ইহা শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ। Climatology by—Austin Miller এবং Climate of the Continents —by Kendrew দেখ।

† The Weather in India, by C. W. B. Normand; An outline of the field Sciences of India.

চারিটি ঋতু নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—(১) শীত—জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, (২) গ্রীষ্ম ঋতু—মার্চ হইতে মে, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুর প্রবাহিত সময়—জুন হইতে অক্টোবর এবং (৪) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সময়—নবেম্বর-ডিসেম্বর মাস। এই চারিটি বিভিন্ন সময়ের গড় বৃষ্টিপাত মানচিত্রে লক্ষ্য কর।

বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু ক্রমশঃ অগ্রসর হয়,—জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কুমারিকা অন্তরীপ ও করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে; আর জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে অমৃতসরে পৌঁছায়। জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে দুইভাবে বৃষ্টিপাত হইতে পারে; যথা—(১) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত; (২) ঘূর্ণি-বৃষ্টিপাত বা ডিপ্রেসন।

(১) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত**—কোন পাহাড় বা পর্বতমালা কিংবা উচ্চভূমিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু প্রতিহত হইলে তথায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইভাবে হিমালয়ের পাদদেশ, আসামের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল প্রভৃতি উচ্চভূমির ঢালে বৃষ্টিপাত হয়।

(২) **ঘূর্ণি-বৃষ্টিপাত**—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র বিস্তীর্ণ বায়ুরাশি (Air Masses)। সুতরাং ইহা অগ্রসর হইবার সময় অন্য প্রকৃতির (শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত শীতল বা উষ্ণ) বিস্তীর্ণ বায়ুরাশির সহিত মিলিত হইলে সীমান্ত-তল (Front or Surface of Discontinuity) সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ঘূর্ণবাত বা ডিপ্রেসনের (Depression) উৎপত্তি হইতে পারে। ডিপ্রেসনের মধ্যভাগে বায়ুর অধিক মাত্রায় নিম্নচাপ অঞ্চল থাকে এবং ইহার মধ্যস্থ বায়ুর ঘূর্ণন-গতি ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত; আর প্রবাহিত বায়ুর পথ অবলম্বন করিয়া ডিপ্রেসন অগ্রসর হয়। ক্রমশঃ ইহার বেগ কমিয়া যায় এবং অবশেষে ডিপ্রেসন লুপ্ত হয়। এইরূপ ডিপ্রেসন সৃষ্টি হইলে ইহার মধ্যস্থ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটে। মে হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে মধ্যে মধ্যে এইভাবে ডিপ্রেসনের উৎপত্তি হয়। উপকূলের

নিকট সৃষ্টি হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে ডিপ্রেসন প্রবেশ করে এবং ইহাদের প্রভাবে সমভূমির উপর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কখন কখন আরব সাগর হইতে আগত মৌসুমী-বায়ুর সহিত বঙ্গোপসাগর হইতে আগত মৌসুমী-বায়ু পরস্পর স্থলভাগের উপর মিলিত হইয়া ডিপ্রেসনের সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রভাবেও বৃষ্টিপাত হয়। আর, ডিপ্রেসন যে সকল স্থান অতিক্রম করে তথায় বৃষ্টিপাত, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বাদলা আবহাওয়া দেখা যায় এবং ইহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিলে বৃষ্টিপাতও ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ডিপ্রেসন লুপ্ত হইলে পুনরায় আকাশ নির্মল হয়। ডিপ্রেসনের স্থায়ীত্বের উপর বৃষ্টিপাতের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। এইজন্য বর্ষাকালে ভারতে একটানা বৃষ্টিপাত হয় না,—কয়েকদিন ধরিয়া বা কিছু সময় ধরিয়া বৃষ্টিপাত ও তাহার পর পরিষ্কার আবহাওয়া এবং হয়ত, ইহার কয়েকদিন পর পুনরায় বৃষ্টিপাত হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বৃষ্টিপাত ও পরিষ্কার আবহাওয়া দেখা যায়।

ডিপ্রেসন সৃষ্টির বা স্থায়ীত্বের কোন স্থিরতা নাই—কখন ঘন ঘন ডিপ্রেসন সৃষ্টি হয়; আবার, কখন বহুদিন পরে ডিপ্রেসন সৃষ্টি হয়। এইজন্য প্রতি বৎসর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় না। নিম্নলিখিতভাবে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা যায়; যথা—(১) বিলম্বে মৌসুমী-বায়ুর আগমন; (২) বর্ষাকালের মধ্যভাগে অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া; (৩) শীঘ্রই অর্থাৎ অক্টোবর মাসের পূর্বেই মৌসুমী-বায়ু প্রত্যাবর্তন করা, এবং (৪) বিলম্বে মৌসুমী-বায়ু প্রত্যাবর্তন করা। (২) ও (৩) অবস্থা ঘটিলে এদেশে কৃষিকার্যের বিশেষ ক্ষতি হয়।

কোন এক স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রতি বৎসর একরূপ থাকে না,—কোন বৎসর অধিক, আবার কোন বৎসর কম বৃষ্টিপাত হয়। যে স্থানের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত কম, তথায় বৃষ্টিপাতের এইরূপ তারতম্য (Variability) বেশী দেখা যায়।

ঝড়ঝঞ্ঝাবাত : কালবৈশাখী (Nor' Westers)—ইহা একপ্রকার স্থানীয় প্রবল বায়ুপ্রবাহ। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে

কখন কখন বৈকালে বা সন্ধ্যায় বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হয়। ইহাকে কালবৈশাখী বলে। উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে আগমন করে বলিয়া ইহাকে ইংরাজিতে Nor' wester বলে। ঝড়ের গতিবেগ প্রবল হইলে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। আউশ ধান্য, পাট প্রভৃতি কৃষিকার্যের এইরূপ বৃষ্টিপাত বিশেষ উপযোগী।

মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিশেষে কখন কখন উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুরাশির উপর অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ুরাশি অবস্থান করে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির বায়ুরাশির অবস্থান নানা কারণে হইতে পারে,—বঙ্গোপসাগর হইতে আর্দ্র বায়ুরাশি প্রবাহিত হইয়া আসিতে পারে কিংবা স্থানীয় অরণ্যভূমির বৃক্ষের অধিক প্রস্বেদন-ক্রিয়ার বা নদনদী বা জলাভূমির অধিক বাষ্পায়ন-ক্রিয়ার জন্য নিম্নস্তরের বায়ুরাশি অধিক আর্দ্র হইতে পারে। গ্রীষ্ম-কালে দিবাভাগে ভূ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়; তখন এই আর্দ্র নিম্ন-বায়ুস্তর অধিক উত্তপ্ত হইয়া লঘু হইয়া যায়। ফলে এই বায়ুর প্রবল পরিচলন-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আর, ইহার উর্ধ্বগতির বেগ মিনিটে প্রায় ২,৫০০ ফুট হইতে পারে। এই বায়ুরাশি উর্ধ্বে উঠিয়া শীতল হইলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া স্তূপ-মেঘ ও বাদল-মেঘের মিশ্রিত মেঘ (Cumulo-nimbus), সৃষ্টি করে এবং তৎসহ বজ্রপাত, বজ্রনাদ, প্রবল পরিচলন-বৃষ্টিপাত এবং বায়ুর প্রচণ্ড আলোড়ন বা ঝড় দেখা যায়। আর, বারিবর্ষণ প্রচুর হইলেও ইহা অল্প সময় স্থায়ী। উর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ু এবং নিম্নগামী শীতল বায়ু, এই দুইটির সংঘর্ষণের ফলে বায়ুর প্রচণ্ড আলোড়ন (Severe Turbulance) সংঘটিত হয়; কারণ নিম্নস্তরের বায়ু প্রবলবেগে আরোহণ করিলে, উচ্চস্তরের শীতল বায়ু প্রবলবেগে অবতরণ করে (Convectional Overturning)। আবার, এইরূপ অবস্থায় দ্রুত গতিসম্পন্ন নিম্নগামী উচ্চস্তরের বায়ুর সহিত নিম্নস্তরের বায়ুর মিলন হয় এবং ইহার ফলে প্রবল ধাক্কার জন্য নিম্নস্তরের বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে সজোরে প্রবাহিত হয়। এইভাবে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কখন কখন কালবৈশাখীর সময় প্রবল ঝড়ের তীব্র আলোড়ন ও জোরাল উর্ধ্বমুখী গতির (ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৫০ মাইল বায়ুর উর্ধ্বগতি) সহিত বৃষ্টির জলবিন্দু বহু উর্ধ্বে অতি-শৈত্যযুক্ত

স্থানে (–২০° সে.) নীত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিলা-বৃষ্টি দেখা যায়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের ধূলি-ঝড় (Dust Storms)—যে কারণে কালবৈশাখী উৎপত্তি হয়, কতকটা সেইরূপ কারণে গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে বৈকালে ধূলি-ঝড় ঘটে। এইরূপ নিম্নস্তরের উত্তপ্ত ও লঘু বায়ুরাশি প্রবল পরিচলন-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেও ইহা শুষ্ক বায়ুরাশি বলিয়া ইহার প্রভাবে মেঘ ও বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় না। বিভিন্ন বায়ুস্তর অধিক উত্তপ্ত থাকায় ধূলি-ঝড়ের পর বায়ুর তাপমাত্রা বিশেষ কমে না। আর, বায়ুমণ্ডল ধূলিময় হয় অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা বায়ুতে ভাসন্ত অবস্থায় থাকে এবং অতি ধীরে ধীরে অবতরণ করে, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছু ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

আশ্বিন-কার্তিকের ঝড়—ইহা একপ্রকার উষ্ণমণ্ডলের প্রবল ঘূর্ণবাত (Tropical Cyclones)। ইহার উৎপত্তি-স্থল বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু প্রত্যাবর্তনের সময় কখন কখন এই ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপরস্থ বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ ও উষ্ণ; আর জলীয় বাষ্পের জন্য এই বায়ুতে প্রচুর শক্তি (জলীয় বাষ্পের লীন তাপের জন্য শক্তি) বর্তমান এবং এই শক্তির প্রভাবে বায়ুর অস্থিরতা (Turbulance) বৃদ্ধি পায়। আবার, সমুদ্রের উপর বায়ু অপ্রতিহতভাবে বহিতে পারে। তখন এই অঞ্চলে কখন কখন অল্প-পরিসর স্থানে অধিক মাত্রায় সহসা বায়ুর নিম্নচাপ-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের সমচাপ-রেখাগুলি অতি নিকটে নিকটে থাকে, চাপমাত্রার পার্থক্য অধিক (Pressure gradients are steep)এবং সাধারণতঃ গোলাকার হয়। তখন চারিদিকের বায়ুর উচ্চচাপের স্থান হইতে নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ু ঘুরিতে ঘুরিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হয় এবং কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া পূর্বেকার বায়ুর সহিত ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। এইরূপ ঘূর্ণবাতের ফলে সাধারণতঃ প্রচুর বারিবর্ষণ হয় এবং কেন্দ্রের বর্ষণই সর্বাধিক। এই বায়ু বামাবর্তে (Anti-clockwise) ঘুরিতে ঘুরিতে প্রবাহিত-বায়ুর পথ অবলম্বন করিয়া প্রবলবেগে দেশের মধ্যে প্রবেশ

করে। ইহার গতিবেগ সাধারণতঃ ৭৫ হইতে ১৩০ মাইল পর্যন্ত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের ঘূর্ণন-গতি যেরূপ প্রবল, সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবলবেগে অগ্রসর হয়। এইজন্য বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির মাত্রা সমধিক; ফলে ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি প্রচণ্ড। তাই, আশ্বিন-কার্তিক মাসের ঝড়ের দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটে।

দক্ষিণ-ভারতের এপ্রিল-মে মাসের বৃষ্টিপাত (Mango Rains of South India)—গ্রীষ্মকালে শুষ্ক সময়ে এই অঞ্চলে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া পরিচলন-প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে বৈকালে বা সন্ধ্যায় পরিচলন-বৃষ্টিপাত হয়।

জলবায়ু অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিভাগ (Climatic Regions)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র বিশাল দেশ নহে, এদেশের বিভিন্ন অংশের জলবায়ু বৈচিত্র্যময়। আর, জলবায়ুর জটিলতার সীমা নাই। বিভিন্ন ভূগোল-তত্ত্ববিদ্‌গণ* জলবায়ু অনুযায়ী ভারতকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। স্ট্যাম্প্ (L. Dadley Stamp) যেভাবে ভারতকে জলবায়ু হিসাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিব।

নিম্নলিখিতভাবে জলবায়ু অনুযায়ী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

১। আসাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল—

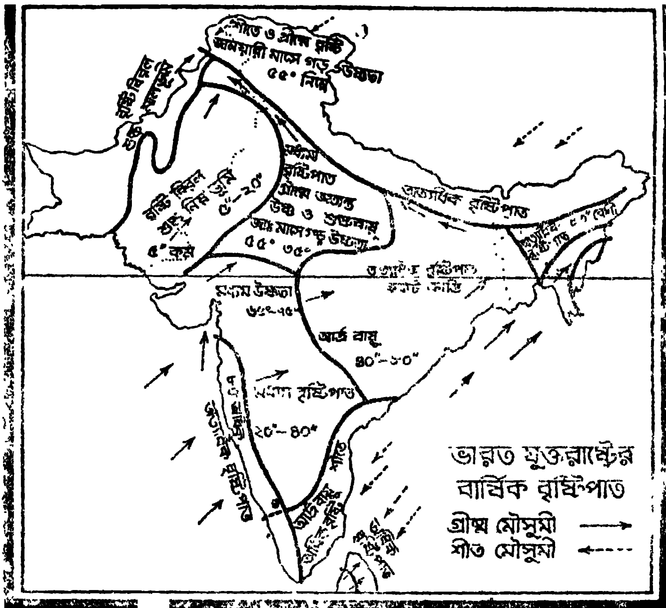
(ক) **ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা**—গৌহাটি-নিকটস্থ স্থান খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। এই স্থানের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬৭"; পূর্বে ও

---

*Kendrew, Stamp, Thornthwaite, Normand, Kazi Ahmed, Spate প্রভৃতি জলবায়ু অনুযায়ী ভারতকে বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। Kendrew যে ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু রদ-বদল করিয়া স্ট্যাম্প এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ করিয়াছেন। এইরূপ বিভাগে দুইটি বিশেষ ভুল আছে—যেমন, পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল দেখান হয় না এবং নাগপুর অঞ্চলকে অতিবর্ষণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কোপেন-প্রণালী অনুযায়ী স্পেট ভারতকে যেভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত জলবায়ুর সহিত অনেকটা মিল থাকিলেও এই পুস্তকে গ্রহণ করা হইল না, কারণ এইভাবে বিভক্তকরণ এদেশে প্রচলিত হয় নাই।

উত্তরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। বায়ুর আর্দ্রতা অধিক বলিয়া গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশী হয় না। আর, শীত মৃদু প্রকৃতির।

(খ) **আসামের মালভূমি ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল**—এই অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০"-এর অধিক এবং জলবায়ু আর্দ্র। গ্রীষ্ম ঋতু মৃদু এবং এবং শীতকালে শৈত্যও অপেক্ষাকৃত অধিক।



(গ) **সুরমা-উপত্যকা**—এই অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০"-এর অধিক এবং জলবায়ু অতিশয় আর্দ্র। শীত মৃদু এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ অধিক নহে।

২। **পূর্বের অত্যধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল**—এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০" হইতে ৮০" এবং জলবায়ু মোটামুটি আর্দ্র। গ্রীষ্ম ও শীত, উভয়ের মাত্রা

পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে।

৩। **উত্তর-পশ্চিম ভারত**—উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব-রাজস্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে মধ্যমা বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মের প্রথম অংশ অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ এবং জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা ৫৫°—৬০° ফা.। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয় এবং জানুয়ারীর গড় তাপমাত্রা ৫৫° ফা.-এর কম। এই অংশের গ্রীষ্ম ও শীতের ও দিবারাত্রির তাপমাত্রার প্রসর অধিক।

৪। **হিমালয়-অঞ্চল**—ইহার পাদদেশের বৃষ্টিপাত ৬০″ হইতে ১৫০″; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। জলবায়ু অত্যন্ত আর্দ্র। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা ভেদে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়, উচ্চতা যতই অধিক হইয়াছে, ততই অধিকতর শৈত্য অনুভূত হয় এবং হিমরেখার ঊর্ধ্বে চিরতুষারক্ষেত্র রহিয়াছে। আর, অধিক উচ্চস্থানে তুষার-পাত হয়।

৫। **পশ্চিম-রাজস্থান, থর মরুভূমি ও কচ্ছ**—ইহা বৃষ্টিবিরল অঞ্চল। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০″—২০″। গ্রীষ্মের উষ্ণতা অধিক। শীত ও গ্রীষ্মের এবং দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার প্রসরও বেশী। তাই, এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক।

৬। **পশ্চিম-উপকূল (কঙ্কন ও মালাবার উপকূল)**—এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল, উপকূলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮৫″ হইতে ১০০″ এবং পর্বতগাত্রে ১০০″-এর অধিক। মালবার উপকূল ৩ মাস বৃষ্টিশূন্য; তাই, এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। গ্রীষ্ম ও শীতের দিবারাত্রির তাপমাত্রার প্রসর কম। এইজন্য এখানে শৈত্য অনুভূত হয় না।

৭। **গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল**—এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ১০″—৪০″ হইলেও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য

অধিক দেখা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল শুষ্ক; এই অংশের বৃষ্টিপাত ২০″। গ্রীষ্ম শুষ্ক ও উষ্ণ এবং উপকূল অপেক্ষা এই অঞ্চলের শীত কিছু বেশী।

৮। করমণ্ডল ও উত্তর-সার্কাস উপকূল এবং তামিলনাদ—গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুর প্রভাবে সামান্য মাত্র বৃষ্টিপাত হয়। এখানে প্রধানতঃ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সময় বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাঝারি রকমের। এই অঞ্চলে শীত বিশেষ অনুভূত হয় না। গ্রীষ্ম শুষ্ক ও উষ্ণ।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ-সংস্থান (Natural Vegetation)

কোন স্থানে স্বভাবতঃ যে উদ্ভিজ্জ জন্মে, তাহাকে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলে। বিবিধ কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্থানবিশেষে প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বিলোপ হইলেও অধিকাংশ স্থানে মানুষের দ্বারাই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইয়াছে,—মানুষ এই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পরিষ্কার করিয়া অরণ্যভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করে এবং উহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এইভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ লোপ পায়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলিয়া ইহার বহু অংশের বিশেষতঃ উত্তর-ভারতের সমভূমির স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বহুলাংশে নষ্ট হইয়াছে। তবে, প্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা বিরল-বসতি-স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বর্তমান।

অরণ্য দেশের বৃষ্টিপাতের সাহায্য করে, বৃষ্টির জল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবহাওয়ার সমতা রক্ষা করে। ইহা ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া বন্যা আটকায় ও জমির উর্বরতা সৃষ্টি করে। আর, অরণ্যজাত দ্রব্য দেশের নানা প্রয়োজনে লাগে। তাই, অরণ্য দেশের মঙ্গল সাধন করে। এইজন্য অরণ্যকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য

দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ অরণ্য থাকা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের শতকরা প্রায় ২২·৩ অংশ অরণ্য। তাই, আমাদের দেশের



সরকার অরণ্য-সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ৬০% এবং সমভূমির ২০% অংশ অরণ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া,

প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত-সরকার বন-মহোৎসবের আয়োজন করিয়া বৃক্ষ-রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উদ্ভিজ্জের উপর বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রভাব সমধিক। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন জলবায়ু বলিয়া এদেশে নানা জাতীয় গাছপালা জন্মে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুযায়ী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে মোটামুটি ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—(১) ৮০"-র অধিক বৃষ্টিপাতের স্থানে উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ-উদ্ভিজ্জ; (২) ৪০" হইতে ৮০" বৃষ্টিপাতের স্থানে মৌসুমী-অঞ্চলের পর্ণমোচী-উদ্ভিজ্জ; (৩) ২০" হইতে ৪০" বৃষ্টিপাতের স্থানে কতকটা সাভানা-দেশীয় উদ্ভিজ্জ বা শুষ্ক অঞ্চলের পর্ণমোচী ও কাঁটাগাছ এবং (৪) ২০"-র কম বৃষ্টিপাতের স্থানে গুল্ম, কাঁটাগাছ প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ বা মরু-উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। ইহা ছাড়া, (৫) উপকূলে বিশেষতঃ নদী-মোহানার নিকটস্থ নিম্ন ও জলা ভূমিতে ম্যান্‌গ্রোভ এবং (৬) উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে শীতপ্রধান-দেশীয় উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে।

(১) **উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ-উদ্ভিজ্জ** (Evergreen Rain Forest of Tropical Countries)—(ক) যে স্থানে ৮০"-এর অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং তাপমাত্রা অধিক, তথায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ জন্মে; যথা—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম-ঢালের বৃষ্টি-বহুল অঞ্চল এবং আসামের স্থানবিশেষ। এইসব অরণ্যে আবলুশ, তুন, গর্জন, শিশু প্রভৃতি শক্ত কাষ্ঠের মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। ইহারা নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরহরিৎ-উদ্ভিজ্জ। (খ) হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাংশের পাদদেশে, আসামের স্থানবিশেষে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতের স্থানে কতকটা এইরূপ জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়।

(২) **মৌসুমী অঞ্চলের পর্ণমোচী-উদ্ভিজ্জ** (Monsoon deciduous Forest)—যে স্থানের বৃষ্টিপাত ৪০" হইতে ৮০", তথায় এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। ইহাদের পাতা বসন্তে বা গ্রীষ্মের প্রথমভাগে ঝরিয়া যায়; তাই, ইহাদিগকে পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে। শাল, সেগুন, বহরা, জারুল, শিমুল,

পিয়াল, অর্জুন, মহুয়া প্রভৃতি এই জাতীয় বৃক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকূলের স্থানে স্থানে চিরহরিৎ এবং পর্ণমোচী, এই উভয় জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। আবার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে ও উড়িষ্যার স্থানে স্থানে শাল, সেগুন, পিয়াল, অর্জুন, মহুয়া প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে।

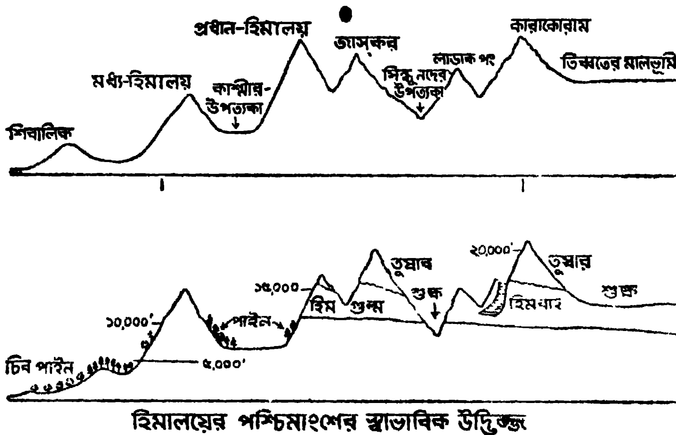
(৩) **সাভানা-অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ বা শুষ্ক অঞ্চলের পর্ণমোচী ও কাঁটাগাছ**—যে স্থানের বৃষ্টিপাত ২০″ হইতে ৪০″, শুষ্ক ও উষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর অধিক, তথায় শুষ্ক অঞ্চলের কাঁটাগাছ ও গুল্ম জন্মে। বাবলা গাছ শুষ্ক অঞ্চলের পর্ণমোচী। মধ্যভারত, রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশবিশেষে এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়।

(৪) **মরুদেশীয় উদ্ভিজ্জ** (Dry or Xerophytic Vegetation)—যে স্থানের বৃষ্টিপাত ২০″-র কম, তথায় কাঁটাগাছ, গুল্ম প্রভৃতি জন্মে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির শুষ্ক অঞ্চল, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও রাজস্থানের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ আছে।

(৫) **ম্যানগ্রোভ** (Mangrove Forests)—গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের উপকূলভাগের মৃত্তিকা লবণাক্ত এবং নিম্নভূমি বলিয়া এই সব অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিজ্জ জন্মে। সুন্দরী, গোলপাতা প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ।

(৬) **হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ** (Himalayan Forests)—হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সংস্থানের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। চিত্রে লক্ষ্য কর। হিমালয়ের পূর্বাংশে তরাই ও ডুয়ার্সে উষ্ণ-আর্দ্র-অঞ্চলের চিরহরিৎ-অরণ্য রহিয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায় না। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতাভেদে পর পর ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ, সরলবর্গীয় বৃক্ষ, তৃণভূমি, হিমগুল্ম (আল্পীয় উদ্ভিজ্জ) প্রভৃতি দেখা যায়। (১) তরাই-বনভূমি ৪,০০০′ ফুট পর্যন্ত ; ইহা উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি হইলেও শাল প্রভৃতি

পর্ণমোচী বৃক্ষও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, বাঁশ ও একপ্রকার লম্বা ঘাস জন্মে। (২) ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য ৪,০০০′ হইতে ৮,০০০′ ফুট পর্যন্ত; এখানে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, যথা ওক, লরেল, বার্চ, এ্যালডার, ম্যাগ্নোলিয়া, ম্যাপেল ইত্যাদি। (৩) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ৮,০০০′ হইতে ১২,০০০′ পর্যন্ত; এখানে সিলভার-ফার, স্প্রুশ, সাইপ্রেস, দেওদর ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। (৪) আল্পীয় উদ্ভিজ্জ ১২,০০০′ হইতে ১৬,০০০′ পর্যন্ত;



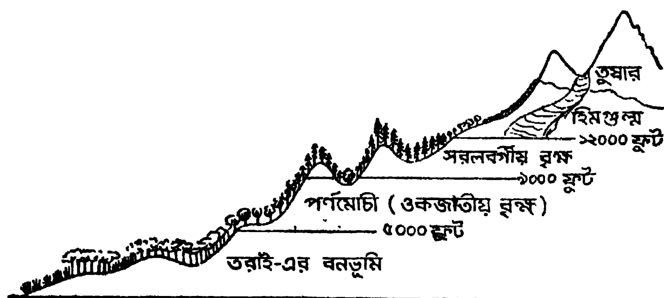
হিমালয়ের পশ্চিমাংশের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

জুনিপার, রোডোডেনড্রন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এখানে দেখা যায়। (৫) ১৬,০০০′-র অধিক উচ্চস্থানে চিরতুষার ক্ষেত্র রহিয়াছে।

বনভূমির অবস্থান—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২,৮১,০০০ বর্গমাইল বনভূমি। তন্মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে, ৯% পশ্চিমঘাট পর্বত, ১০% পূর্বঘাট পর্বত, ১৬% হিমালয় এবং অবশিষ্ট অংশ উত্তর-ভারতের সমভূমিতে রহিয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক বনভূমি রহিয়াছে এবং আসাম দ্বিতীয় স্থানীয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫,০০০ বর্গমাইল বনভূমি আছে।

অরণ্যজাত দ্রব্য ও তাহার ব্যবহার: অরণ্য হইতে শক্ত ও নরম কাঠ পাওয়া যায়। এইগুলি আমাদের বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়।

তাহা ছাড়া, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। **শাল**—ইহা অতি ভারী ও শক্ত কাঠ; ইহা প্রধানতঃ রেলপথের পাড়নের (sleepers) জন্য ব্যবহৃত হয়। কয়লা-খনির খুঁটিও তৈয়ারী হয়। **সেগুন**—গাড়ী, নৌকা, আসবাবপত্র প্রভৃতি এই কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাঠে উত্তম পালিশ ও নক্সা করা যায়। উই বা কীটপতঙ্গের দ্বারা সেগুন কাঠ সহজে আক্রান্ত হয় না। **অর্জুন**—সেগুন অপেক্ষা শক্ত ও ভারী। এই কাঠে উত্তম পালিশ করা যায়। নৌকা, গাড়ী, ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। **আন্দামান-পাডাক্**—ইহা অতি উৎকৃষ্ট কাঠ। ইহার দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। **গামারী**—



হিমালয়ের পূর্বাংশের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। বাক্স, নৌকা প্রভৃতি এই কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। **জারুল**—উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। নৌকা, ঘরবাড়ী, রেলগাড়ীর মেঝে প্রভৃতি এই কাঠ হইতে তৈয়ারী হয়। **তুঁত**—ইহার কাঠ হইতে হকি, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। **মাকাই**—আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার কাঠ হইতে চায়ের বাক্স তৈয়ারী হয়। **আবলুশ**—ইহা শক্ত ও মূল্যবান্ কাঠ। এই কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। **মহুয়া**—ইহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত। ইহার ফুল ও ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফুল হইতে মদ্য এবং ফল হইতে তৈল পাওয়া যায়।

বিশপ—পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা এবং আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। সেতু ও বাড়ীঘর নির্মাণে ইহার কাঠ ব্যবহার করা হয়। **পুন**—পশ্চিমঘাট পর্বতে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার কাঠ উৎকৃষ্ট। **তুন**—হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া যায়। চা-বাক্স, খেলনা প্রভৃতি ইহার কাঠ হইতে তৈয়ারী হয়। **বোগাপোমা**—জলপাইগুড়ি জেলা ও আসামে পাওয়া যায়। সেগুন-কাঠ অপেক্ষা ইহা শক্ত। ইহার কাঠ হইতে আসবাবপত্র ও বাড়ীঘর তৈয়ারী হয়। **শিশু**—উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মে। ইহার কাঠ নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। **গর্জন**—আসামে ইহার নাম হোলাং। এই কাঠ হইতে রেলপথের পাড়ন প্রস্তুত হয় এবং নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। **নাহার**—ইহা অতি শক্ত কাঠ। এই কাঠ হইতে রেলপথের পাড়ন তৈয়ারী হয়। তাহা ছাড়া, কয়লা-খনির খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আসামে নাহার প্রচুর পাওয়া যায়।

চন্দন—মহীশূরে পাওয়া যায়। ইহার কাঠ হইতে সুন্দর সুন্দর খেলনা, বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া, চন্দন-তৈল পাওয়া যায়। উহার দ্বারা সুগন্ধি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। **কুল, বাবলা, পলাশ, কুশুম** প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। **বাবলাগাছের ছাল, হরীতকী** (হরিতকি নামক পর্ণমোচী গাছের ফল) প্রভৃতি দিয়া কাঁচা-চামড়া পাকা করা হয় (Tanning)। **খদিরবৃক্ষ** হইতে রঙ ও পান **খাইবার খয়ের প্রস্তুত** হয়। **বাঁশ** ও **সাবাই ঘাস** হইতে কাগজ তৈয়ারী হয়। **শিমূল, গেঁউয়া, পিটুলি** ও **ছাতিম** গাছের কাঠ হইতে দিয়াশলাই-এর কাঠি প্রস্তুত হয়। **বাঁশ**—এদেশে নানাজাতীয় বাঁশ জন্মে। বাড়ীঘর তৈয়ারী করা এবং নানাবিধ কাজে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। **বেত**—সাধারণতঃ জলাভূমির পার্শ্বে দেখা যায়। ইহার ব্যবহারও কম নহে। পাইনজাতীয় গাছ হইতে ধুনা, রজন ও তার্পিণ তৈল পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, বনভূমি হইতে মোম, মধু, গাছের আঁশ ও ছাল, আঠা এবং ঔষধের জন্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করা হয়।

মৃত্তিকা (Soils)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগের মৃত্তিকা এইবার আমরা আলোচনা করিব।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা—এই অঞ্চলের কোন অংশের ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ও উচ্চতার উপর মৃত্তিকার উপাদান ও প্রকৃতি নির্ভর করে বলিয়া বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা রহিয়াছে। হিমরেখার পরবর্তী নিম্ন অংশে শিলাখণ্ড ও কঙ্করপূর্ণ মৃত্তিকা এবং তাহার নিম্ন অংশে বোলডার্ ক্লে* (Boulder Clay) দেখা যায়। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য-অঞ্চলে পোডজল (Podzol) নামক ধূসর রঙের অম্লজ মৃত্তিকা রহিয়াছে। ইহা উর্বর মৃত্তিকা নহে। তবে এই মৃত্তিকায় আলু উৎপন্ন হয়। ইহার নিম্ন অংশে পিঙ্গল বর্ণের (Brown Forest Soils) যে মৃত্তিকা রহিয়াছে, তাহা উর্বর। এখানে ওক, চেস্টনাট, বীচ, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি বর্তমান। নিম্ন উপত্যকায়ও বিশেষতঃ হিমালয়ের পশ্চিমাংশের পাদ-পাহাড়ে (Foot Hills) ল্যাটেরাইট বা লালরঙের দোয়াঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়।

উত্তর-ভারতের সমভূমির মৃত্তিকা—ইহা পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। ইহাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) **প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকা**—এই জাতীয় মৃত্তিকা বহু পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যস্থ জৈব পদার্থ জলের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে (leached); তাই, ইহা অনুর্বর মৃত্তিকা। ইহাতে চূণজাতীয় কঙ্কর দেখা যায়। (খ) **নবীন পাললিক মৃত্তিকা**—ইহা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে রহিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ উর্বর মৃত্তিকা, তবে বেলেমাটি-অঞ্চল অনুর্বর।

আবার, মাটির কণিকার আকৃতি অনুযায়ী তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) **বেলেমাটি**—মাটির কণিকাগুলি আকারে বড বলিয়া

* হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ড, বালুকা, কাদা, কঙ্কর প্রভৃতি কোন স্থানে অনিয়মিতভাবে সাঞ্চত হইলে ঐগুলিকে বোলডার্ ক্লে বা টিল বলে।

এই মাটি জল ধারণ করিতে পারে না। ইহার উর্বরতা শক্তিও কম। (খ) **কাদামাটি** (Clayey Soil)—ইহার কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র ('০০৪ মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র) বলিয়া ইহা জমাটভাবে থাকে। এইজন্য ইহার মধ্য দিয়া জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার মধ্যে জৈব পদার্থ (Humus) ও চূণাজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে সহজে হলকর্ষণ করা যায়। (গ) **দোয়াঁশ মৃত্তিকা** (Loamy Soil)—ইহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ক্লে ও বালি (বড় বড় কণিকাযুক্ত মাটি) মিশ্রিত থাকে ; এইজন্য এই মৃত্তিকায় সহজে হলকর্ষণ করা যায় এবং ইহা সাধারণতঃ উর্বর মৃত্তিকা।

ইহা ছাড়া, জলবায়ু বা বিশেষ পরিবেশের ফলে আরও দুই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখা যায় ; যথা—(ক) **মরুভূমি-অঞ্চলের বা মরুপ্রায় অঞ্চলের মৃত্তিকা**—এই শ্রেণীর মাটি থর মরুভূমি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রহিয়াছে। ইহা অল্প-বিস্তর লবণাক্ত মৃত্তিকা।* (খ) ব-দ্বীপের উপকূলে বা লেগুনের পার্শ্বে লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্য-মালভূমির মৃত্তিকা—উত্তর-ভারতের সমভূমির মৃত্তিকা প্রধানতঃ পাললিক (Water Transported Soils) এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির মৃত্তিকা প্রধানতঃ স্থিতিশীল (Residual Soils)। নিম্নলিখিত শ্রেণীর মৃত্তিকা এই অঞ্চলে বর্তমান ; যথা—(ক) **কৃষ্ণমৃত্তিকা** (Regur or Black Cotton Soils)—দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা লাভাজাত মৃত্তিকা এবং ব্যাসাল্ট-শিলা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা। জমাট, আঠালো (Heavy and Clayey) মৃত্তিকা বলিয়া ইহা জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে এবং সাধারণতঃ উর্বর। (খ) **লালমাটি বা রাঙামাটি** (Red Loams)—

* রাশিয়ান বিজ্ঞানী Z. J. Schokalasky *Soils of India* পুস্তকে ভারতবর্ষের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটিশূন্য না হইলেও এই শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন উপায় নাই, কারণ নির্ভরযোগ্য শ্রেণীবিভাগ অন্য কেহ করেন নাই। মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের নামকরণ সাধারণতঃ রাশিয়ান ভাষায়। এই ভদ্রমহিলা মরুভূমি-অঞ্চলের মৃত্তিকাকে সেরোজেম (Serozems) নামকরণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রায় অবশিষ্ট অংশে এই জাতীয় মৃত্তিকা রহিয়াছে; ইহা প্রধানতঃ বেলেমাটি। কেলাসিত শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে; এজন্য কোয়ারট্জের কণিকা বালুকায় পরিণত হইয়াছে। তাই, এই মৃত্তিকার জল ধারণ করিবার ক্ষমতা কম। (গ) **ল্যাটেরাইট্-মৃত্তিকা** (Lateritic soils)—লৌহ ও এ্যালুমিনাম ঘটিত পদার্থ এই মৃত্তিকায় প্রচুর রহিয়াছে এবং ইহার বর্ণ লাল। মালাবার, পশ্চিমঘাট পর্বত, ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব-প্রান্ত এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ল্যাটেরাইট্-মৃত্তিকা রহিয়াছে। এই মৃত্তিকার উর্বরতা-শক্তি কম, কারণ ইহাতে জৈব পদার্থ (humus) বিশেষ নাই। (ঘ) **কফি-মৃত্তিকা** (Coffee Soils)—ইহা নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতে দেখা যায়। ইহার বর্ণ লাল। জৈবপদার্থপূর্ণ দোয়াঁশ মৃত্তিকা বলিয়া ইহা উর্বর।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ধমান-বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ। এই অংশে রাঙামাটি, ল্যাটেরাইট্ মৃত্তিকা প্রভৃতি দেখা যায়।

জলসেচ (Irrigation)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুর প্রভাবে বৎসরের একটি নিদিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। এদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের সব জলটুকু ভূ-পৃষ্ঠের উপর রহিলে দেশের সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের উপর ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি গভীর জল দাঁড়াইত; কিন্তু নিম্নলিখিত কারণের জন্য এদেশে কৃষিকার্যের জন্য কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ প্রয়োজন, যথা—(১) এদেশে সর্বত্র বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে কৃষিকার্যের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয় না; (২) প্রতি বৎসর মৌসুমী-বায়ু নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না;—ফলে কোন বৎসর অধিক এবং কোন বৎসর কম বৃষ্টিপাত হয়; (৩) কোন কোন বৎসর অগ্রে বা বিলম্বে মৌসুমী-বায়ু প্রবাহিত হয়; (৪) আবার,

কখন কখন বর্ষাঋতুর মধ্যভাগেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া যায় এবং (৫) যে স্থানের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কম, তথায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য অধিক দেখা যায়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ (প্রায় ৭০% কৃষিজীবী)। সুতরাং সুচারুরূপে কৃষিকার্য করিতে হইলে এদেশের অধিকাংশ স্থানে জলসেচ প্রয়োজন।

জলসেচ-ব্যবস্থা ঃ ভারতের কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর উহা প্রায় ২৯% দাঁড়াইবে। তখন ইহার পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি একর হইবে। ইহার আয়তন সমগ্র গ্রেট্‌বৃটেন অপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের আয়তনের তুলনায় ইহাকে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে না। এদেশে নদনদীগুলি যে পরিমাণ জল বহন করে, তাহার মাত্র ১৩% অংশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর জলসেচ-কার্যে ব্যবহার করা হইবে। ১৯৫৬ খৃঃ ৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইয়াছে।

নদনদী হইতে সেচখাল ব্যতিত **কূপ, জলাশয়** ও **পুকুর** হইতে ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রধানতঃ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলের সমভূমিতে কূপ, এবং দাক্ষিণাত্যে জলাশয় হইতে জলসেচ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, স্বাভাবিক খাল-বিল এবং ছোট-ছোট নদী (পশ্চিমবঙ্গের কাঁদর) হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়।

কূপ বা জলাশয় হইতে জল উঠাইবার প্রণালী—পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ়-অঞ্চলে দোণের* সাহায্যে কিছু নিম্ন-স্থান হইতে

* এইগুলি লোহার পাতের (Iron sheet) তৈয়ারী। দ্রোণের দুইটি অংশ,—একটি আনুভূমিক ও অপরটি প্রথমটির সহিত প্রায় ৪৫° কোণে দাঁড়ান। প্রথমটির তিনটি সমতল পরস্পর লম্ব এবং দ্বিতীয়টির পার্শ্বদেশের তল, সমতল হইলেও তলদেশ বক্র আর পার্শ্বদেশ ক্রমশঃ পরস্পর নিকটে নিকটে আসিয়া অবশেষে প্রান্তদেশ অতি অল্প পরিসর হইয়াছে। এই প্রান্তদেশে একটি রিং থাকে এবং পা রাখিবার জন্য ছোট একটি প্লেট আছে। কাঠ বা বাঁশ দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার তৈয়ারী করা হয়; ঐ লিভারের দণ্ডের একপ্রান্তে কৌশলে দড়ি ও বাঁশের সাহায্যে দ্রোণের রিং-এর সহিত আটকান হয়। লিভারের অপর প্রান্তে কোন ভারী জিনিস থাকে। ইহাতে যান্ত্রিক সুবিধা আছে। এইজন্য এই প্রণালীতে সহজে প্রচুর জল তোলা যায়। এদেশের প্রচলিত ভূগোলে দ্রোণের উল্লেখ নাই। ডঃ এস. সি. বসু দ্রোণকে টিনের তৈয়ারী ডোঙা বলিয়াছেন। ইহার গঠন ডোঙার মত নহে।

উচ্চ স্থানে জল তোলা হয়। আবার স্থানে-স্থানে কাঠের বা তালগাছের গুঁড়ির ডোঙার সাহায্যেও জল উঠান হয়। খুব ঘনভাবে বোনা বাঁশের তৈয়ারী এক প্রকার ঝুরির সাহায্যেও জল উঠাইবার ব্যবস্থাও দেখা যায়। ঝুরির দুই পাশে দড়ি বাঁধা থাকে, আর দুই জন লোক ঐ দড়ি দুইটি ধরিয়া ও দুলাইয়া জল তোলে।

অন্ধ্রপ্রদেশে, বিহারে লিভারে এক প্রান্তে বালতি ঝুলাইয়া জল তোলে, অবশ্য লিভারে অপর প্রান্তে কোন ভারী জিনিস, যেমন পাথর বা মাটি থাকে। বিহারের স্থানে-স্থানে বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে গো-মহিষের সাহায্যে জল উঠাইবার ব্যবস্থা আছে। কপি কলের সাহায্যে জল তোলা হয়। দড়ির এক প্রান্তে সাধারণতঃ চামড়ার তৈয়ারী বড় থলিয়া থাকে এবং অপর প্রান্ত গো-মহিষ টানে। আর, কূপের নিকট নত-তল (Inclined plain) থাকে। জল উঠাইবার সময় একজোড়া গরু বা মহিষ ঐ নত-তলের উপর দিক্ হইতে নীচের দিকে নামে। পাঞ্জাবে পারসিক চক্রের সাহায্যে কূপ হইতে জল উঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণ-ভারতের জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা—দক্ষিণ-ভারতের বহু অংশে বিশেষতঃ মাদ্রাজ রাজ্যে ছোট-ছোট নদী-উপত্যকায় বা ঢালু জমির নিম্ন দিকে (Contour line-এ নিম্নে) বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হয়। কোন-কোন স্থানে (রামনাদ জেলায়) এক-একটি নদীর ধারা-পথে পর-পর এইরূপ অসংখ্য জলাশয় দেখা যায়। এই জলাশয়গুলি সাধারণতঃ সাময়িক, কারণ ইহারা বৃষ্টির জলে পুষ্ট ও অগভীর। অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামসাগর জলাশয় উল্লেখযোগ্য। ইহার দ্বারা ২৪ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। বর্ধমান বিভাগে বিশেষতঃ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কতকটা এইরূপ প্রকৃতির বহু জলাশয় রহিয়াছে—ক্রমনিম্ন ভূ-পৃষ্ঠের নিম্ন দিকে বাঁধ তৈয়ারী করিয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপ জলাশয়কে স্থানীয় লোকেরা বাঁধ বলে। ডাঙ্গা বা উচ্চ ভূমির (এইগুলিতে সাধারণতঃ চাষ-আবাদ হয় না) বৃষ্টির জল গড়াইয়া এইরূপ জলাশয়ে সঞ্চিত হয়। কোন বৎসর বৃষ্টিপাত কম হইলে ঐরূপ জলাশয়ে জল সঞ্চিত হয় না, ফলে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না। তাহা ছাড়া,

এইরূপ জলাশয়ে প্রচুর পলি সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ মজিয়া যায়। এইভাবে অসংখ্য জলাশয় মজিয়া গিয়াছে। জলাশয়ের বাঁধের পর ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে বলিয়া কৃষিক্ষেত্রে সহজে জলসেচ হইয়া থাকে।

নলকূপ—বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে নলকূপ হইতে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে জল উঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

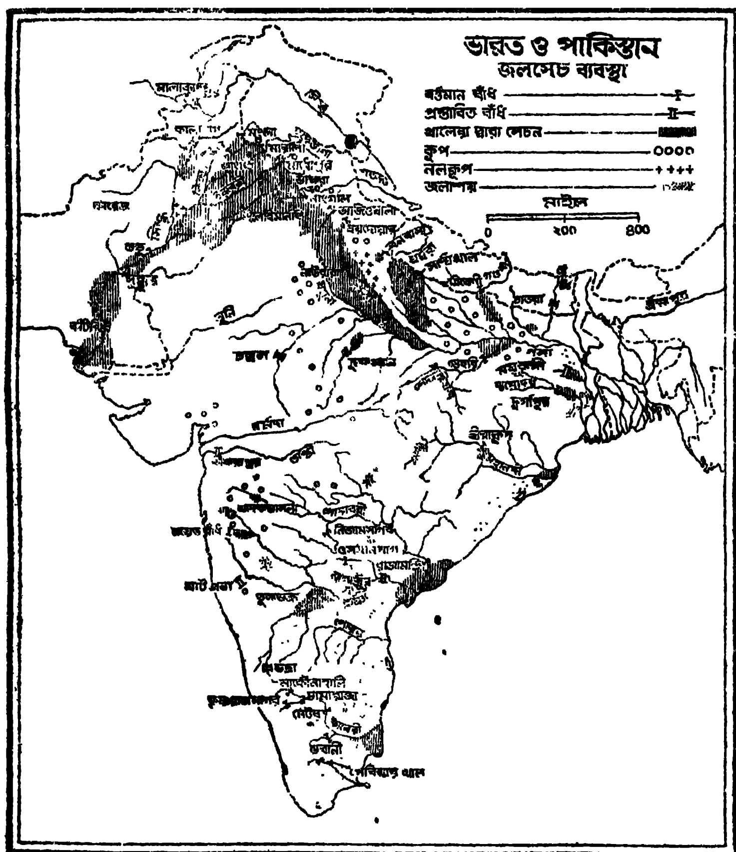
কূপ বা নলকূপ হইতে জল-উঠান ব্যয়বহুল। সেচখালের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যয় অপেক্ষা কূপ বা নলকূপের দ্বারা জলসেচের ব্যয় ৪।৫ গুণ অধিক। এইজন্য যে স্থানে সেচখাল নাই, সেখানে সাধারণতঃ কূপ হইতে জলসেচ হইয়া থাকে।

সেচখাল—সেচখাল দুই প্রকার—**প্লাবন-খাল** ও **স্থায়ী-খাল**। নদী হইতে সুদীর্ঘ খাল কাটিয়া জল বহুদূরে লইয়া যাওয়া হয়। বর্ষাকালে নদীর জল বাড়িলে এই সকল খাল জলে ভরিয়া যায়। তখন ঐ জলে সেচকার্য চলে। বর্ষার শেষে নদীর জল কমিলে খালগুলি শুকাইয়া যায়। তখন আর সেচকার্য চলে না। এইরূপ খালকে **প্লাবন-খাল** বলে। মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের কোন-কোন অংশে প্লাবন-খাল আছে। বর্তমানে অধিকাংশ খালকে স্থায়ী খালে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হিমালয়ের হিমবাহপুষ্ট নদী যেখানে পার্বত্যভূমি হইতে সমভূমিতে অবতরণ করে, তথায় নদী হইতে খাল কাটিলে উহাতে বারমাসই জল থাকে। আবার, গিরিখাতে বা যে স্থানে নদী-উপত্যকা সংকীর্ণ, তথায় নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্যন্ত সুদৃঢ় বাঁধ নির্মাণ করিলে ঐ বাঁধে নদীর জল সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হয়। ঐ স্থান হইতে খাল কাটিয়া নদীর জল বহু দূরে লইয়া যাওয়া হয়। এই দুই প্রকার খালকে **স্থায়ী খাল** বলে। এই সকল খালে বারমাস জল থাকে। তাই, সারাবৎসর স্থায়ী খালের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জল পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবের সেচখাল—অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের সেচখালই এদেশের বৃহত্তম জলসেচ-ব্যবস্থা ছিল। ভারত বিভক্ত হইবার পর পূর্বাংশের সেচখাল-

গুলি পাঞ্জাবের (ভারতে) অন্তর্গত। নিম্নে খালগুলির বর্ণনা করা হইল। (১) **বারি-দোয়াবের খাল**—ইরাবতী (Ravi) নদীর মাধোপুর হইতে নির্গত হইয়া বারি-দোয়াবে বিস্তৃত। ইহার শেষাংশ পাকিস্তানে প্রসারিত।



ইহার দ্বারা প্রায় ৮·৩ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। (২) **শতদ্রু নদীর খাল**—শতদ্রু নদীর তীরস্থ হুসৈনিওয়ালা (ফেরোজপুরের নিকটস্থ) ও তাহার পূর্ববর্তী অংশে সুলেইমানকি নামক স্থান দুইটি হইতে সেচখাল নির্গত হইয়া ভারত

ও পাকিস্তান, এই দুই রাষ্ট্রে বিস্তৃত। ইহার এক শাখা বিকানীরে প্রসারিত। **সিরহিন্দ-খাল**—শতদ্রু নদীতীরস্থ রূপার নামক স্থান হইতে খাল বাহির হইয়াছে। বর্তমানে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার খালগুলির সহিত সিরাহিন্দ-খাল সংযুক্ত হইয়াছে। পরে এই খালগুলি বর্ণনা করা হইবে। (৩) **পশ্চিম-যমুনা-খাল**—যমুনা নদীর তাজওয়ালা নামক স্থান হইতে এই সেচখাল বাহির হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাঞ্জাবের পূর্বাংশের প্রায় ১০ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। ইহা অতি প্রাচীন খাল। পাঠানযুগে ইহা নির্মিত হয়।

উত্তরপ্রদেশের সেচখাল—এই রাজ্যের নিম্নলিখিত সেচখালগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) **পূর্ব-যমুনা খাল**—সম্রাট শাজাহানের সময় ইহা নির্মিত হয় এবং কালক্রমে খালটি মজিয়া যায় এবং ১৮৩০ খৃঃ পুনরুদ্ধার হয়। নশেয়ারার নিকট হইতে এই খাল সুরু হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই রাজ্যের পশ্চিমাংশের প্রায় ৪ লক্ষ একর ক্ষেত্রের জলসেচ হয়। (২) **আগ্রা-খাল**—দিল্লীর নিকটস্থ ওখলা হইতে এই খাল নির্গত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ৪.৫ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। (৩) গঙ্গা নদীর **উচ্চঅংশের ও নিম্নঅংশের খাল** (The Upper and Lower Ganges Canals)—উচ্চঅংশের খাল হরিদ্বারের নিকট হইতে এবং নিম্নঅংশের খাল নরোরার নিকট হইতে সুরু হইয়াছে। এই খালের দ্বারা দোয়াবের প্রায় ২৭ লক্ষ একর ক্ষেত্রের জলসেচ হয়। (৪) **সার্দা-খাল**—ঘর্ঘরার উপনদী সার্দা (বনবাসার নিকটস্থ) হইতে সেচখাল বাহির হইয়াছে। ঘর্ঘরা ও গঙ্গা নদীর মধ্যস্থ প্রায় ২১ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্রে ইহার দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে। (৫) **যমুনা নদীর দক্ষিণ-অঞ্চলের সেচখাল**—বেতুয়া, কেন ও ধদন নদীর সেচখালগুলি উল্লেখযোগ্য। এই খালগুলির দ্বারা এই শুষ্ক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে বিশেষ সাহায্য করা হইয়াছে।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের খাল—বিহারের শোণনদ ও ত্রিবেণীর সেচখাল এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর সেচখাল রহিয়াছে। দামোদর-খাল হইতে ১০ লক্ষ একর এবং ময়ূরাক্ষী-খাল হইতে ৬ লক্ষ একর

কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা হইতেছে। বিহারের সেচখাল দুইটির দ্বারা ৮ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়।

দাক্ষিণাত্যের সেচখাল—এই অঞ্চলের সেচখালগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) ব-দ্বীপের সেচখাল এবং (খ) মালভূমির ও নদী-উপত্যকার সেচখাল।

ব-দ্বীপের সেচখাল : (ক) **কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের সেচখাল**—ইহা অতি প্রাচীন সেচখাল। ১৯৩৬ খৃঃ ইহাকে নূতনভাবে গঠন করা হইয়াছে। ব-দ্বীপ-অঞ্চলের প্রায় ১০ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়; এজন্য ইহাকে মাদ্রাজের শস্যভাণ্ডার বলে। (খ) **কৃষ্ণার ব-দ্বীপের সেচখাল**—বিজয়ওড়াদার নিকট কৃষ্ণা নদীর ব্যারেজ আছে। ঐ স্থান হইতে সেচখালগুলি নদীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত। ইহাদের দ্বারা প্রায় ১১ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। (গ) **গোদাবরীর ব-দ্বীপের সেচখাল**—রাজমুন্দ্রীর নিকট গোদাবরী নদীর উপর ড্যাম আছে। প্রকৃতপক্ষে গৌতমী ও বশিষ্ঠ, এই দুইটি গোদাবরীর শাখানদী ও নদীমধ্যস্থ দুইটি দ্বীপের উপর দিয়া, চারিটি অংশে, এই ড্যাম নির্মিত। এই সকল খালের দ্বারা প্রায় ১২ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ-অঞ্চলে প্রচুর ধান্য, ইক্ষু ও তামাক উৎপন্ন হয়। (ঘ) **মহানদীর ব-দ্বীপের সেচখাল**—কটকের নিকট মহানদী বাঁধ বাঁধিয়া ব-দ্বীপ-অঞ্চলে সেচখালের জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমানে খালগুলিকে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা প্রায় ১০ লক্ষ একর স্থানে জলসেচ হয়।

ইহা ছাড়া, নদীর নিম্ন অংশে ছোট-ছোট কতকগুলি জলসেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়। উহাদের মধ্যে মাদ্রাজ-রাজ্যের তাম্রপর্ণী নদীর সেচখাল উল্লেখযোগ্য।

মালভূমি-অঞ্চলের নদীর সেচখাল—পশ্চিমঘাট পর্বতে কতকগুলি নদনদীর উৎস-ক্ষেত্রের নিকট বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকান হইয়াছে। এইগুলির দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেচখালের দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা আছে; যথা—(১) কৃষ্ণা ও গোদাবরী এবং উহাদের উপনদীসমূহ; (ক) নাসিকের

নিকট গোদাবরী নদীর বাঁধ, ও (খ) উহার উপনদী প্রভারার বাঁধ, (গ) পুনার নিকট নিরা ও (ঘ) মুথানদীর বাঁধ (ভীমার উপনদীর), (ঙ) ভীমার বাঁধ (কৃষ্ণার উপনদী), (চ) কৃষ্ণার বাঁধ ; (ছ) ঘাটপ্রভা ও (জ) মালপ্রভার বাঁধ। এই দুইটি কৃষ্ণার উপনদী।

অন্ধ্রপ্রদেশের **কুর্ণুল-কুডডাপা খাল**—বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেচখাল। ইহা তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত ও পেন্নার (Penner) নদীকে সংযোগ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য নির্মিত হইলেও ইহার দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় নাই। মাদ্রাজ-রাজ্যের **পেরিয়ার নদীর বাঁধ ও সেচখাল** বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে কেরল-রাজ্যে কার্দমম পর্বতের পশ্চিম-পার্শ্বে নদীর উৎস-স্থানের নিকট বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ নদীটি আরব সাগরে পতিত হইতেছে। তাই, ৫,৭০০ ফুট দীর্ঘ সুরঙ্গের মধ্য দিয়া একটি খাল পর্বত ভেদ করিয়া পর্বতের পূর্ব-পার্শ্বে আসিয়াছে; পরে ভাইগাই নদীর সহিত ঐ খাল সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদীর খালের দ্বারা মাদুরা-সমভূমিতে জলসেচ হয়। মহীশূরের কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্**-বাঁধ ও **কৃষ্ণরাজাসাগর** বাঁধ এবং মাদ্রাজের **মেট্টুর** বাঁধ উল্লেখযোগ্য। এই সকল জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে।

প্রত্যেক রাজ্যেই ছোট-ছোট বহু সেচখাল রহিয়াছে।

বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা (Multi-purpose Projects)

এত দিন পর্যন্ত, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নদীতে বাঁধ নির্মাণ করা হইত,—কোন নদীতে বাঁধ তৈয়ারী করিয়া জল আটকান হইত এবং ইহার ফলে যে জলাশয় সৃষ্টি হইত, তাহা হইতে খালপথে জলসেচ ব্যবস্থা থাকিত কিংবা উচ্চ স্থানে অবস্থিত জলাশয় হইতে নলপথে জল নিম্নে আনিয়া জলশক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইত। তাই, এইরূপ বাঁধ হইতে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধিত হইত। ইতিপূর্বে জলসেচ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং পরে জলশক্তির কথা আলোচিত হইবে।

বর্তমানে নদনদীতে যে সকল বাঁধ তৈয়ারী হইতেছে, তাহাদের দ্বারা বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, যথা—(ক) জলসেচ, (খ) জলবিদ্যুৎ, (গ) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) ভূমির ক্ষয়-নিবারণ, (ঙ) মৎস্যের চাষ, (চ) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, (ছ) নৌবাহন-ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইজন্য এইগুলিকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলা হয়। আর, বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার দ্বারা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে। তাই, এইগুলির কার্যকারিতার উপর দেশের ব্যাপক সমৃদ্ধি নির্ভর করিবে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান পরিকল্পনা উল্লেখ করা হইল।

(১) **দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা**—বিহার-রাজ্যের পালামৌ জেলার ৩৫০৪′ উচ্চ খামারপাত নামক গিরিশৃঙ্গ হইতে দামোদর নদ নির্গত হইয়াছে এবং পূর্ববাহিনী হইয়া প্রবাহিত। ইহা বরাকর নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া বর্ধমান শহরে কিছু পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাহিনী এবং পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া কলিকাতায় কিছু দক্ষিণে ফলতার নিকট হুগলী নদীতে পতিত হইতেছে। বিহার-রাজ্যে বরাকর, যমুনিয়া, কোনার, বোকারো প্রভৃতি ইহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। আর, এই নদনদীগুলি ছোটনাগপুর-মালভূমির প্রায় ৭০০০ বর্গ-মাইল স্থানের জল-নিকাশ করে। এই অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। তাই, বৃষ্টিপাতের জল এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতি ধৌত করিয়া দেয়; এবং ছোট-বড় জলধারা ঐগুলিকে বহন করিয়া নদনদীতে ঢালিয়া দেয়; আর বর্ষাকালে দামোদর নদের প্লাবনের জলের সহিত বাহিত হইয়া আসে ও স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইলে অর্থাৎ সমভূমি-অংশে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়; ফলে পশ্চিমবঙ্গ-অংশে নদীগর্ভ উচ্চ হইয়াছে। এইজন্য নদীর ধারাপথ বন্যার জল বহন করিতে পারে না, তখন দেখা যায় ধ্বংসকারী প্রবল বন্যা। আবার, অন্য সময় নদী প্রবাহ অতি ক্ষীণ হইয়া যায়। প্রবল বন্যার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৬ লক্ষ ঘনফুট জল এবং স্বাভাবিক বন্যায় ২½ লক্ষ ঘনফুট জল বর্ধমানের কিছু উপর অংশ দিয়া প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু নদের নিম্নঅংশে ৫০ হাজার ঘন ফুটের অধিক জল বহন করিতে পারে না। এইজন্য এই নদের নিম্ন-অংশে প্রবল বন্যা দেখা যায়।

দামোদর নদের উপত্যকার নিম্নঅংশে নদীর বামতটে উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া বন্যা নিবারণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রবল বন্যায় সময়-সময় ঐ বাঁধের স্থানবিশেষ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন প্রধান রেলপথ, রাস্তা, ঘরবাড়ী, কৃষিক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট ঘটে; আর, দক্ষিণতটে কোন বাঁধ না থাকায় ঐ অঞ্চলে প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা দেখা যায়। তাহা ছাড়া, পূর্বতন দামোদর- ও এডেন-খালে প্রতি বৎসর সময় মত জল সরবরাহ হইত না।

এই সকল অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা রচিত করিয়া তাহার অধিকাংশ কার্যকরী করা হইয়াছে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে টেনিসি-উপত্যকা কর্তৃপক্ষের (T. V. A.) অনুকরণে দামোদর-উপত্যকা-কর্পোরেশন (D. V. C.) গঠিত হয়। এই সমিতির দ্বারা ইহাব কার্য পরিচালিত হইতেছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য :—(১) সেচ, শিল্প, পানীয় প্রভৃতির জন্য জল সরবরাহ, (২) বন্যা-নিবারণ, (৩) ভূমির ক্ষয়-নিবারণ, (৪) জলবিদ্যুৎ- ও তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদন, (৫) বাঁধের জলাশয়ে ও সেচখালে মৎস্যের চাষ, (৬) নাব্যখাল-খনন প্রভৃতি।

দামোদর নদের পাঞ্চেৎহিল, বরাকর নদীর তিলাইয়া ও মাইথন, কোনার নদীর বাঁধ (Dam) এবং দুর্গাপুরের ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। কোনার ভিন্ন অন্য বাঁধগুলির নিকট জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হয়। ইহার মোট পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট। বোকারোতে ১½ লক্ষ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দুর্গাপুরে যে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, তাহার পরিমাণ প্রায় ১½ লক্ষ কিলোওয়াট। বোকারো ও দুর্গাপুরের বিদ্যুৎশক্তি-কেন্দ্র সম্প্রসারিত ও চন্দ্রপুরায় (১২৫ হা. কি. ও.) নূতন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ১৯৬০ খৃঃ প্রায় ৫ লক্ষ কি. ও. তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইবে। বর্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ স্থানে সেচখালের দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে। দুর্গাপুর হইতে ভাগীরথী তীরস্থ ত্রিবেণী পর্যন্ত প্রায় ৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি নাব্যখাল তৈয়ারী হইতেছে। এই জলপথে কয়লাখনি-অঞ্চল হইতে পণ্যদ্রব্য বহন করা সুবিধা হইবে।

আর, এই সকল বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপন্ন বিদ্যুৎ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ-ব্যবস্থা হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা—ইহার কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই নদী সাঁওতাল পরগণার মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া ঐ জেলা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা কাটোয়ার কিছু উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মাসানজোর নামক স্থানে ময়ূরাক্ষীর উপর উচ্চ বাঁধ (বা কানাডা-ড্যাম) নির্মাণ করিয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। সিউড়ীর নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে ব্যারেজ তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ময়ূরাক্ষীর উপনদী বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা ও ব্রহ্মাণীর উপর ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সেচখালের দ্বারা বীরভূম এবং বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ বিশেষে জলসেচ হইবে। কানাডা-ড্যামে বর্ষার সময় ৪ হাজার ও অন্য ঋতুতে ২ হাজার জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।

মহানদী-পরিকল্পনা (হীরাকুদ-বাঁধ)—মধ্যপ্রদেশের বাস্তার-মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া মহানদী মধ্যপ্রদেশে ও উড়িষ্যায় প্রবাহিত। ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৫১,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ দামোদরের অববাহিকার ছয় গুণ বড়। বন্যার সময় ১৬ লক্ষ ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে এই নদীর দ্বারা বাহিত হয়। এই পরিকল্পনায় মহানদীর উপনদী টেল, ইব, মন্দ, হাস্‌দো, জঙ্ক, হাম্প ও অঙ্গে বাঁধ এবং মহানদীর উপর হীরাকুদ, টিকাপাড়া ও নারাজ নামক স্থানে তিনটি বাঁধ তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র হীরাকুদে বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। অন্যগুলি হয়ত ভবিষ্যতে তৈয়ারী হইবে।

সম্বলপুর হইতে ৭ মাইল দূরে হীরাকুদ নামক স্থানের নিকট মহানদীর উপর বিরাট বাঁধ তৈয়ারী (১৯৫৭) হইয়াছে (বাঁধের নদীর উপর ৩ মাইল এবং মোট ১৬ মাইল দীর্ঘ ও জলাশয়ের আয়তন ২৮৮ বর্গমাইল, ৬৬ লক্ষ একর-ফুট জল)। ইহার পশ্চিম-কূলের বারগড়-সেচখালের দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে এবং ব-দ্বীপ-অঞ্চলে আরও ১৮ লক্ষ একর ক্ষেত্রের জলসেচ করিবার সুবিধা হইবে। এই বাঁধের নিকট প্রচুর জলবিদ্যুৎ

(প্রায় ৩ লক্ষ কিলোওয়াট) উৎপন্ন হইবে। তবে, বর্তমানে (১৯৫৮) প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াট তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

উপকারিতা—(ক) বারগড়-অঞ্চলে ৬ লক্ষ এবং ব-দ্বীপ-অঞ্চলে ১৮ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচ-ব্যবস্থা; (খ) প্রচুর জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন; (গ) হীরাকুদে অ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। (ঘ) বন্যা-নিবারণ; (ঙ) শিল্পে ও কৃষিকার্যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুবিধা।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা—পাঞ্জাবে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে ভাকরার নিকট শতদ্রু নদীর উপর বিরাট বাঁধ (Dam) তৈয়ারী হইতেছে। ইহার উচ্চতা ৭৪০′ এবং ইহা পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ বাঁধ। বাঁধের পশ্চাতে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ জলাশয় (গোবিন্দসাগর—৭৪ লক্ষ একর-ফুট জল) সৃষ্টি হইবে। ইহার আট মাইল নীচে নাঙ্গালের নিকট ১০০′ উচ্চ ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে সেচখাল নির্গত হইয়াছে। পাঞ্জাবে এবং রাজস্থানের প্রায় ৩৬ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা হইতেছে। নাঙ্গালের নিকটস্থ গাঙ্গুওয়াল ও কোটলাতে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; বর্তমানে (১৯৫৮) প্রায় ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে ভাকরাতে ৪$\frac{১}{৫}$ লক্ষ এবং এই পরিকল্পনায় প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে। এই স্থান হইতে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ও দিল্লীতে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। ইহার ফলে কৃষির ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। ৮·৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং ৬ লক্ষ গাইট লম্ব আঁশের তুলা উৎপন্ন হইবে। নাঙ্গালে রাসায়নিক সারের ও ভারী জল (heavy water) তৈয়ারী কারখানা স্থাপিত হইবে।

শোণ-উপত্যকা পরিকল্পনা—উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় শোণ নদের উপনদী রিহান্দে উপর (শোণ নদের সঙ্গমস্থান হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে পিপরি নামক স্থানে) বাঁধ (বাঁধ, Dam ২৭০′ উচ্চ, ১৮০ বর্গমাইল, হ্রদের আয়তন) নির্মিত হইতেছে। এই স্থানে দুই লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি

উৎপন্ন হইবে এবং উত্তরপ্রদেশ- ও বিহার-রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা হইবে।

কুশী-পরিকল্পনা—হিমালয় পার্বত্য-অঞ্চল হইতে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে কুশী তৃতীয় স্থানীয়। উপনদী-সহ কুশী পার্বত্য-অঞ্চলের ২৪ হাজার বর্গমাইল স্থানের জল নিকাশ করে, তন্মধ্যে ২২০০ বর্গমাইল তুষারক্ষেত্র। আর, এই অঞ্চলে এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি পৃথিবীর উচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি অবস্থিত। কুশী সমভূমিতে প্রবলবেগে অবতরণ করিয়াছে ও প্রতি বৎসর বিহারের সমভূমিতে ধ্বংসকারী বন্যার সৃষ্টি করে। গত ২০০ বৎসরে এই নদীর প্রবাহ-পথ প্রায় ৭০ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর (সহর্সা-সাবজেলা) ও দ্বারভাঙ্গা জেলার প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল স্থান অনুর্বর, বন্যাপীড়িত, অস্বাস্থ্যকর হইয়া কৃষিকার্যের ও বসবাসের অযোগ্য অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। এই নদীতে অকস্মাৎ বন্যা হয়—২৪ ঘণ্টায় ৩০′ পর্যন্ত নদীর জল বাড়িয়া যায়, আবার কোন অংশ ২০ মাইল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। সমভূমি অংশে মূলধারা-পথ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে, বহু বিল ও জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। তাই, কুশী নদী বিহারের অভিশাপ-স্বরূপ।

এই সকল বিপদ-আপদ ও অসুবিধা দূরীভূত করিয়া কুশীর জল কৃষিকার্যে ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সদ্ব্যবহার করিবার জন্য পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। মূল পরিকল্পনা পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানে নিম্নলিখিত আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে,—নেপাল রাষ্ট্রের তরাই-অঞ্চলে হনুমাননগর নামক স্থানে ব্যারেজ নির্মিত হইতেছে। ঐ স্থান হইতে নির্গত সেচখালের দ্বারা নেপালের তরাই-অঞ্চল, এবং বিহারের সমভূমিতে (প্রায় ১৪ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্র) জলসেচ-ব্যবস্থা থাকিবে। নদীর উভয় কূলে উচ্চ বাঁধ তৈয়ারী করা হইতেছে, ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বন্যার জলে প্লাবিত হইবে না।

চম্বল-পরিকল্পনা—চম্বল যমুনার উপনদী। ইহা মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (৫৫ হাজার বর্গমাইল) জল-নিকাশ করে। এই নদীতে মাতাটিলা নামক স্থানে বাঁধ (Dam) নির্মিত হইতেছে; এই স্থানে যে জলাশয় সৃষ্টি হইবে,

তাহার নামকরণ গান্ধিসাগর হইয়াছে। এই স্থান হইতে বহির্গত সেচখালের দ্বারা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রায় ১১ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে এবং এখানে প্রায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা—কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রা। মহীশূর-রাজ্যে হোসপেটের নিকট এই নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। আর, ১৪৬ বর্গ মাইল জলাধারে ৩০ লক্ষ একর-ফুট জল সঞ্চিত হয়। ইহা হইতে সেচখালের দ্বারা মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ৮.২৩ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হইবে। তাহা ছাড়া, ১,৪৪,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

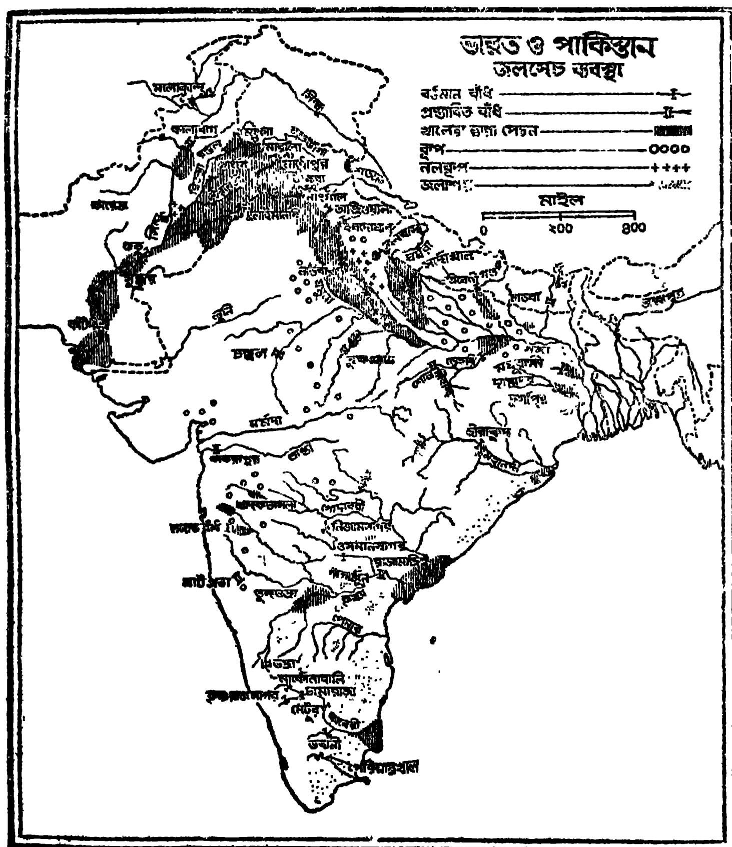
কৃষ্ণা-ব্যারেজ বা নাগার্জুনকোণ্ডা-ব্যারেজ পরিকল্পনা—অন্ধ্রপ্রদেশে মাচেরলা রেলস্টেশনের নিকট ব্যারেজ নির্মিত হইতেছে। ইহার দ্বারা এই রাজ্যের ১৭ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে এবং কৃষ্ণার ব-দ্বীপের সেচখালে জল সরবাহের বিশেষ সুবিধা হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তিও পাওয়া যাইবে।

মারোরা-পরিকল্পনা—উত্তরপ্রদেশে হরিদ্বার হইতে প্রায় ৫৭ মাইল উজানে গঙ্গার উপনদী নয়ার-এ ১৯০ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহা হইতে ২,৩২,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে এবং ৩৮ হাজার একর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হইবে।

নর্মদা-তাপ্তী বহুমুখী পরিকল্পনা—নদী দুইটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (৬৮ হাজার বর্গমাইল) জল-নিকাশ করে। এই অঞ্চলের বন্যা-নিবারণ, জলসেচ, নৌবাহন-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহা ভারতের অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পনা। বর্তমানে সুরাটের নিকটস্থ কাকরাপার নামক স্থানে তাপ্তী নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। আর, ইহা হইতে বোম্বাই-রাজ্যের সুরাট-জেলার প্রায় ৬,৫২,০০০ একর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা হইতেছে। পরে বাঁধটি আরও উচ্চ করিয়া ২লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎশক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে।

গঙ্গা বা ফারাক্কা-ব্যারেজ—গঙ্গানদী যে স্থানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিতেছে, তাহার নিকট ফারাক্কা নামক স্থানে গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা ও রেলপথ নির্মিত হইবে; ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সহিত



উত্তরাংশের সংযোগ স্থাপিত হইবে। ফারাক্কার কিছু দক্ষিণ হইতে গঙ্গার প্রধান শাখানদী ভাগীরথী নির্গত হইয়াছে। এই নদীর মুখে পলি ও বালি সঞ্চিত হওয়ায় নদী-পথে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল বিশেষ প্রবাহিত হয় না। এইজন্য ইহার

প্রবাহপথ অগভীর এবং নিম্নঅংশ বা হুগলী নদীর বিভিন্ন অংশে চর সৃষ্টি হওয়ায় কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। আর, বৎসরের অধিকাংশ সময়ে মিঠা জল (Fresh water) বিশেষ প্রবাহিত না হওয়ায় হুগলী নদীর জল লবণাক্ত জলে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে পানীয় জল, কল-কারখানার জন্য জল ইত্যাদি সরবরাহের বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া, ভাগীরথীর পূর্বদিকে ভূ-ভাগের কৃষিকার্যের জলসেচ প্রয়োজন। আবার, কলিকাতা হইতে জলপথে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যাইতে হইলে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, কারণ বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভাগীরথীতে পরিমিত জলের অভাবে নাব্য থাকে না।

এই সকল অন্তরায় দূরীভূত করা প্রয়োজন। তাই, এই পরিকল্পনা সুচারুরূপে কার্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের প্রভূত উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে। এই পরিকল্পনার কার্য সত্বর আরম্ভ হইতে পারে।

বিপাশা বা রাজস্থান-পরিকল্পনা—পাঞ্জাব-রাজ্যে বিপাশা নদীতে বাঁধ বাধিয়া বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করা হইবে। এই জলাশয়ের জলের পরিমাণ গোবিন্দসাগরের জলের পরিমাণের সমান হইবে। এই স্থান হইতে প্রধান খাল শতদ্রুর হারিকে-বাঁধের (Harike barrage) নিকট ঐ নদী অতিক্রম করিবে এবং রাজস্থানের পশ্চিমাংশে প্রসারিত হইবে। তথায় প্রায় ৩৩ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচ হইবে। ইহার ফলে বিকানীর ও জশল্মীর জেলার মরু-অঞ্চল শস্যশালিনী হইবে।

জলশক্তি (Hydro-Electric Power)

জলশক্তি হইতে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে কোন অঞ্চলে কতকগুলি ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকা প্রয়োজন, যথা—(১) সারাবৎসর পরিমিত বৃষ্টিপাত, কারণ সারাবৎসর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে পরিমিত জলের প্রয়োজন ; (২) ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ প্রকৃতি, কারণ উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে জল পতিত হইলে ইহা শক্তি অর্জন করে ; এবং (৩) বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রের

নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎ-শক্তি নিয়োগ করিবার অনুকূল অবস্থার বর্তমান।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং বহু অংশের বৃষ্টিপাত পরিমিত নহে। আবার, সমভূমি-অংশের ভূ-পৃষ্ঠ জলশক্তি উৎপত্তির প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই, বৃষ্টিবহুল বন্ধুর ভূভাগে জলশক্তি উৎপাদনের কতকটা অনুকূল অবস্থা দেখা যায়; যেমন—

(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও আসাম, এবং (২) পশ্চিমঘাট পর্বত, দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি, কার্দামম প্রভৃতি পর্বত। তবুও সারাবৎসর পরিমিত জল পাইবার জন্য এই সকল পার্বত্য অঞ্চলে নদনদীতে বা উপত্যকায় উচ্চ বাঁধ তৈয়ারী করিয়া জল আটকাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাপশক্তির দ্বারাও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যায়। তাহার জন্য প্রয়োজন কয়লা। ভারতের কয়লার খনিগুলি প্রধানতঃ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উত্তর-, পশ্চিম-, ও দক্ষিণ-ভারতে কয়লা বিশেষ পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ সকল স্থানে জল-শক্তির দ্বারা তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করাই সুবিধা। ভারতে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া জলাশয় সৃষ্টি করিতে হয় বলিয়া জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মাণ করা ব্যয়বহুল। কিন্তু এখানে সুলভে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই দক্ষিণ-, পশ্চিম-, ও উত্তর-ভারতে প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এইজন্য এই সকল স্থানে কল-কারখানা চালান সুবিধা হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ কি. ও. জলশক্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১০ লক্ষ কি. ও. শক্তি (১৯৫৬) কার্যকরী হইয়াছে। ১৯৬১-এ ৩০ লক্ষ কি. ও. শক্তি পাওয়া যাইবে। আর মোট তড়িৎ-শক্তি ৬৯ লক্ষ কি. ও. হইবে। নিম্নে প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি উল্লেখ করা হইল।

বোম্বাই-রাজ্য—এই রাজ্যে পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে টাটা কোম্পানি খোপোলি, ভিবপুরি ও ভীরা নামক তিনটি স্থানে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। এইগুলি হইতে ২,৬৫,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় এবং উহার সাহায্যে বোম্বাই, পুণা, কল্যাণ প্রভৃতি শহরের কল-কারখানা চালান হয়। কোয়না-পরিকল্পনা হইতে ২,৪০,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। ইহার নির্মাণ কার্য চলিতেছে।

মাদ্রাজ-রাজ্য—জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে বোম্বাই-এর পর মাদ্রাজের স্থান। এই রাজ্যের নীলগিরি অঞ্চলের পিকারা (৬৬,০০০ কি. ওয়াট), ময়ার (৩৬,০০০ কি. ওয়াট) রহিয়াছে। এই অঞ্চলের কুণ্ডায় ১,৮০,০০০ কি. ওয়াট শক্তিসম্পন্ন তড়িৎ-শক্তি-কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে। কাবেরী নদীর মেটুর বাঁধের (৪০,০০০

কি. ওয়াট) ও দক্ষিণে পাপনাশম (২৮,০০০ কি. ওয়াট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের তড়িৎ-কেন্দ্রগুলি তড়িৎ-বাহী তারের (গ্রিড্-সিস্টেম) দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

মহীশূর-রাজ্য—এই রাজ্যের নিম্নলিখিত তড়িৎ-কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কাবেরীর জলপ্রপাত শিবসমুদ্রম্ (৪২,০০০ কি. ওয়াট) হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। ইহা হইতে ৪০ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়। সিমগা ও জোগ-জলপ্রপাত হইতে যথাক্রমে ১৭ হাজার ও ১২০ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। ভদ্রা নদীর পরিকল্পনা হইতে ১৮০ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে।

কেরল-রাজ্য—এই রাজ্যের পল্লীভসল (৩৭ হাজার) তড়িৎ-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। পেরিয়ার (১০৫ হাজার), লেরিয়া-মানগালস্ (৪৫ হাজার) এবং পোরিনগালকুথু-এ (৩২ হাজার) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে।

উত্তরপ্রদেশ—গঙ্গা নদীর উচ্চঅংশের খালের (Upper Ganges Canals) ৮টি ছোট ছোট জলপ্রপাতের জলশক্তির দ্বারা তড়িৎ-শক্তি (২১,২০০) উৎপন্ন করিয়া এই রাজ্যের পশ্চিমাংশের ও দিল্লীর কলকারখানা চালান হয়। তাহা ছাড়া নলকূপ হইতে তড়িৎ-শক্তির দ্বারা জল-উঠান হয়। চন্দৌসীতে তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র (২৯ হাজার) রহিয়াছে। এইগুলি পরস্পর গ্রিডের দ্বারা সংযুক্ত। বর্তমানে হরিদ্বারের নিকট পাথরীতে গঙ্গা-খালের উপর নূতন তড়িৎ-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে ২০,৪০০ কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। সার্দা-খাল হইতে খটিবা নামক স্থানে ৪১,৪০০ কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। আর, রিহান্দ-পরিকল্পনা হইতে প্রচুর (২৫০ হাজার) তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে।

পাঞ্জাব—বিতস্তার উপনদী উল (uhl) বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহার নিকটস্থ যোগিন্দ্রনগরে (৪৮ হাজার) তড়িৎ-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে পাকিস্তানেও বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে শতদ্রু-

পরিকল্পনার গাঙ্গুওয়াল ও কোটলাতে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি হইতে ৪৮ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা হইতে ৫৯৮ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

বিহার—দামোদর-পরিকল্পনার তিলাইয়া (৪ হাজার), মাইথন (৬০ হাজার), পাঞ্চেট (৬০ হাজার), এবং ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার কানাডা-বাঁধ (৪ হাজার) হইতে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে কুশী, গণ্ডক প্রভৃতি পরিকল্পনা হইতে প্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

উড়িষ্যা—মহানদীর হীরাকুদ-বাঁধের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এখানে বর্তমানে ১২৩ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ২৭০ কি. ও. শক্তি পাওয়া যাইবে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত মাচকুণ্ড-কেন্দ্রে (দুদুমা-জলপ্রপাত) ৩৪ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয় ও উহার অধিকাংশ অন্ধ্রপ্রদেশে সরবরাহ হইতেছে। পরে এখানে ৬৮ হা. কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ—নিজামসাগর কেন্দ্রে (হায়দরাবাদ হইতে ১০০ মা. উ.প) ১৫ হা. কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। উড়িষ্যার মাচকুণ্ডের উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তন-অঞ্চলে সরবরাহ হয়। তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা হইতে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি (১৪৪ হা. কি. ও.) মহীশূর ও এই রাজ্যে ব্যবহার করা হইতেছে।

কাশ্মীর—বিতস্তা (Jhelum) নদীতে মাহোরার (Mahora) নিকট ১৯০৭ খৃঃ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে ৩,২০০ কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। বিতস্তার উপনদী সিন্ধ-এ গান্দারবলের নিকট ৬০০০ কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ—দামোদর বা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি বিহার-রাজ্যে অবস্থিত। কেবল দার্জিলিং-এ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র রহিয়াছে। ডুয়ার্স-অঞ্চলে জলঢাকা নদীর পরিকল্পনায় ১২—২৪ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

আসাম—শিলং-এ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ রহিয়াছে। বর্তমানে গৌহাটি-শিলং রাস্তার নিকট অবস্থিত উমট্রু-এ (৭৫০০ কি. ও.) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

মাটির ক্ষয় (Soil Erosion)

জল, তুষার-বরফ, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বহিভাগের অতি-সূক্ষ্ম শিলাকণা বা মৃত্তিকা (প্রধানতঃ অতি-সূক্ষ্ম শিলাকণার দ্বারা গঠিত) বাহিত হইয়া যায় ; ইহাকে মাটির ক্ষয় বলে। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সর্ব অংশে সর্বদাই কিছু-না-কিছু মাটির ক্ষয় হইতেছে। উহাকে স্বাভাবিক মাটির ক্ষয় (Normal Erosion) বলা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারিত হইলে, তাহাকেই মাটির ক্ষয় বলে।

উদ্ভিজ্জশূন্য উঁচু-নীচু ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকার ক্ষয় অধিক ; কারণ, এইরূপ স্থানে বৃষ্টিপাতের জল জোরে বহিয়া যায় ; তাই উপর অংশের উর্বর মৃত্তিকা জলপ্রবাহের সহিত বাহিত হয় এবং মাটির মধ্যে জল প্রবেশ করে না। ইহার ফলে ভূমি অনুর্বর হইয়া যায়। আবার, এই কারণে উচ্চভূমির বৃষ্টিপাতের জলের প্রায় সব অংশ গড়াইয়া নদীতে পড়ে। আর, ভূ-পৃষ্ঠের ধূলি, মাটি, বালি প্রভৃতি জলের সহিত বাহিত হয় ও নদীর জলে প্রচুর পলল থাকে। এই অতিরিক্ত পললের জন্য নদীর গর্ভদেশ ক্রমশঃ মজিয়া যায়। তাই অধিক বর্ষণ হইলে এই অঞ্চলের নদীগুলি ধারাপথ দিয়া অধিক জল বহন করিতে পারে না। তাই প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিতগুলি মাটির ক্ষয়সাধনের কারণ বলা যায় ;—(১) উদ্ভিজ্জশূর্ণ ভূ-পৃষ্ঠ। ভারতের বহু অংশের বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ উদ্ভিজ্জশূর্ণ হইয়াছে। আবার, কাঠ, জ্বালানী, কাঠকয়লা প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার সময় যেখানে-সেখানে গাছ কাটা হয় ; ইহার জন্য বনভূমি নষ্ট হইয়া যায়। পার্বত্য-অঞ্চলে আদিবাসীদের "জুম-প্রণালী"তে কৃষি-কার্যের দ্বারা বনভূমির বিশেষ ক্ষতি হয়। ভারত সরকার বনভূমির ২৫% সংরক্ষণ করেন এবং অবশিষ্ট ৭৫% অরক্ষণ অবস্থায় রহিয়াছে। (২) পশুচারণের

জন্যও মাটির ক্ষয় হয়। ঢালু ভূমিতে পশুচারণ অপরিমিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে হইলে ঘাস ও ছোট ছোট চারাগাছ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পুনরায় শীঘ্র শীঘ্র বনভূমি সৃষ্টি হইতে পারে না। (৩) ঢালুস্থানে কখন কখন কৃষিকার্যের জন্যও মাটির ক্ষয় হয়,—হলকর্ষণ উপর হইতে নীচের দিকে করিলে যে ছোট ছোট নালার উৎপত্তি হয়, উহাদের মধ্যে দিয়া জল গড়াইয়া চলে; ফলে মাটির প্রচুর ক্ষয় হয়।

প্রতিকার—(১) বন্ধুর বা পার্বত্য ভূমিতে বনভূমি সৃষ্টি করিলে (Afforestion) মাটির ক্ষয় কম হইবে। ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের ২২.৩% বনভূমি রহিয়াছে; এদেশের মঙ্গলের জন্য অন্ততঃ ৩৩.৩% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। তাই সে সকল অঞ্চলের বনভূমি যথেষ্ট নহে বা অসংরক্ষিত, তথায় নূতন বনভূমি সৃষ্টি করা ও সংরক্ষিত করা অপরিহার্য, (২) ঢালু ভূমিতে পরিমিত পশুচারণ প্রয়োজন। (৩) গ্রীষ্মকালে কর্ষিত ক্ষেত্রের শুষ্ক মাটি ধূলিতে পরিণত হয় বলিয়া উহা বায়ু-প্রবাহের দ্বারা সহজে উড়িয়া যায়; এজন্য কৃষিক্ষেত্রকে ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নহে। ঢালু ভূ-পৃষ্ঠে সোপানের মত ক্ষেত্রগুলি থাকিলে উহাদের আইলগুলি জল আটকাইয়া রাখে। আর, এরূপ স্থানে লম্বালম্বিভাবে ড্রেনকাটা প্রয়োজন।

কৃষিকার্য ও কৃষিজাত দ্রব্য

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষিকার্যের উপর গৌণ বা মুখ্যভাবে নির্ভর করে। এদেশের মোট আয়তন ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর; তন্মধ্যে ৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর কৃষিকার্যের উপযোগী। কিন্তু ৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হয় (১৯৫৪-৫৫)।* ইহা সত্ত্বেও ভারতে যথেষ্ট খাদ্যভাব রহিয়াছে এবং প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। ইহার কারণ—(১) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু এই দেশের কৃষিসম্পদের মূল কারণ হইলেও প্রতি বৎসর যথাসময়ে পরিমিত

* Kanwar Sain, Chairman, Central water and Power Commission—The Statesman—June 27, 1956.

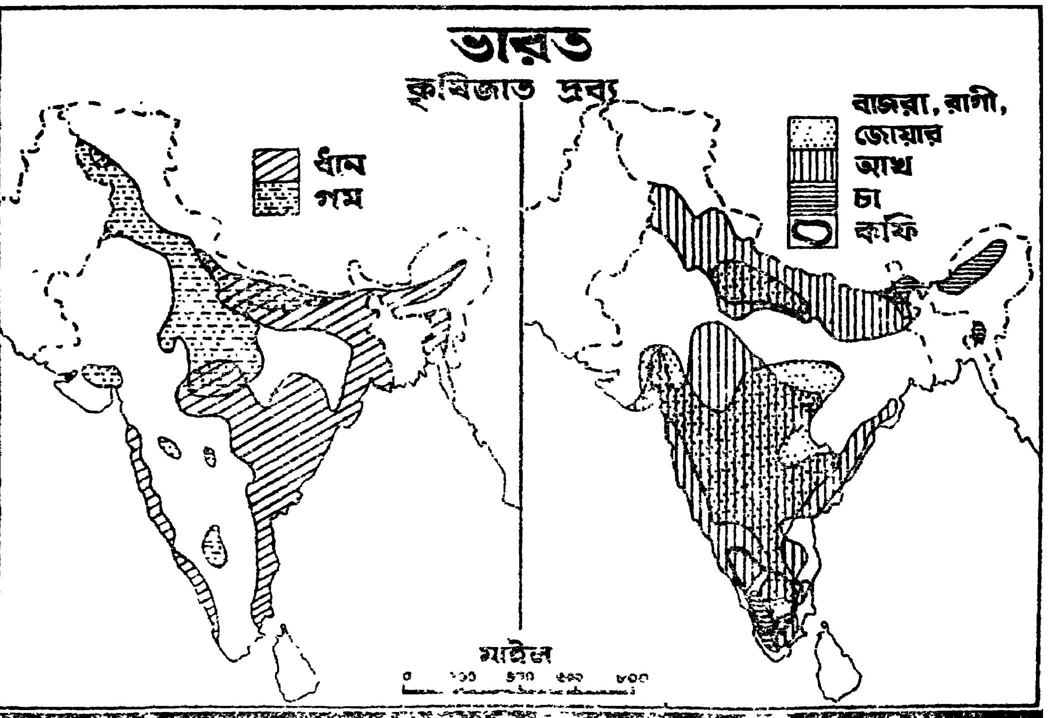
বৃষ্টিপাত সর্বত্র হয় না ; তাই জলসেচের প্রয়োজন হয়। আবার, এদেশের কর্ষিত ভূমির প্রায় ১৮% অংশে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। এইজন্য ভারতের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র বারিবর্ষণের উপর নির্ভরশীল। তাই, বৎসর বৎসর এদেশের উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণের তারতম্য যথেষ্ট দেখা যায়। (২) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ফসল উৎপন্নের হার অত্যন্ত কম। প্রতি একরে এত কম ফসল উৎপন্ন হইবার সম্ভবতঃ প্রধান কারণ—(ক) উৎকৃষ্ট বীজের অভাব, (খ) কৃষিক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ হয় না, (গ) কোন এক কৃষকের ক্ষেত্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ও বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে বলিয়া চাষের অসুবিধা হয়, (ঘ) জলসেচ-ব্যবস্থাবিহীন বহু কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে, (ঙ) কৃষকেরা দরিদ্রতার জন্য কৃষিকার্যের জন্য সময়মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে না।

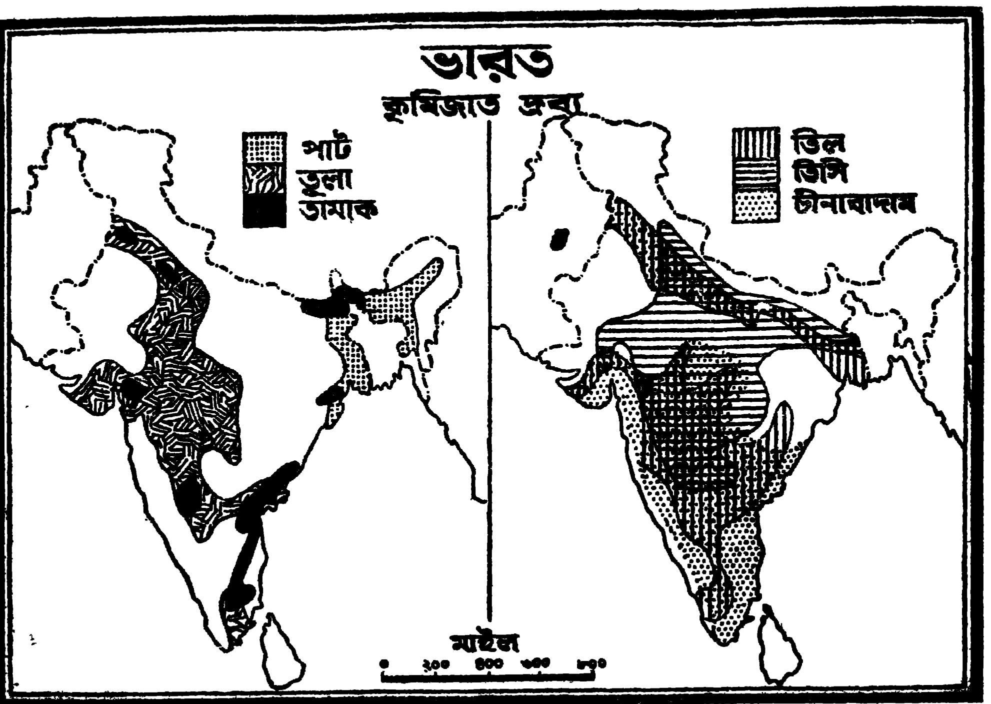
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, উষ্ণতা ও মাটির উপাদানের উপর ফসলের প্রকৃতি ও ফলন নির্ভর করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ বলিয়া এদেশে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির ফসল উৎপন্ন হয়। নিম্নে এদেশের প্রধান প্রধান ফসলের কথা বলা হইল।

ধান্য—যে স্থানের ভূমি পলিমাটির দ্বারা গঠিত, জলবায়ু উষ্ণ এবং বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেইখানে ধান বেশী জন্মে। তাই, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও বোম্বাই-এ প্রচুর ধান জন্মে (প্রত্যেক রাজ্যে ১৮ লক্ষ টনের অধিক, ১৯৫৬—৫৭)।† কেরল, মহীশূর, পাঞ্জাবে অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। মোট ৭ কোটি ৮২ লক্ষ একরে ২ কোটি ৮১ লক্ষ টন ধান পাওয়া গিয়াছে।

গম—এদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পর গমের স্থান ; মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এবং উর্বর জমি গমচাষের উপযোগী। ভারতের শীতকালে মাঝারি রকমের তাপমাত্রা থাকে বলিয়া ঐ সময় এদেশে গম উৎপন্ন হয়। এদেশের ৩ কোটি ২৯ লক্ষ একর ভূমিতে ৯১ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে।

† ১৯৫৬—৫৭-এর ফসল উৎপন্নের পরিমাণ উল্লেখ করা হইল। উৎপাদনের পরিমাণের মান অনুযায়ী রাজ্যগুলি পর পর উল্লেখ করা হইয়াছে।


ভারত
কৃষিজাত দ্রব্য
ধান
গম
বাজরা, রাগী, জোয়ার
আখ
চা
কাফি
মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৮০০


ভারত
কৃষিজাত দ্রব্য
পাট
তুলা
তামাক
তিল
তিসি
চীনাবাদাম
মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৮০০

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও বোম্বাই-রাজ্যে (প্রত্যেক রাজ্যে ৩ লক্ষ টনের অধিক) উৎপন্ন হয়।

মিলেট—জোয়ার, বাজরা ও রাগী—প্রধানতঃ শুষ্ক ও কঙ্করময় অঞ্চলে এই ফসলগুলি উৎপন্ন হয়। ৪ কোটি ১৩ লক্ষ একর স্থানে ৭৪ লক্ষ টন জোয়ার, ২ কোটি ৭৫ লক্ষ একর স্থানে ২৯ লক্ষ টন বাজরা এবং ৫৭ লক্ষ একর স্থানে ১৯ লক্ষ টন রাগী উৎপন্ন হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও মহীশূরে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। প্রধানতঃ মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূরে রাগী উৎপন্ন হয়।

ভুট্টা—(Maize or Indian Corn)—অল্প উত্তাপযুক্ত (৬৮°—৭২°ফা.) মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত (৪০"-এর কম হইলেও চলে) ভুট্টা-আবাদের অনুকূল অবস্থা। এইজন্য গ্রীষ্মকালে ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ভুট্টা জন্মায়। এই সময় সমভূমি-অঞ্চলের উত্তাপ অধিক বলিয়া এইস্থানে উৎকৃষ্ট ভুট্টা বিশেষ উৎপন্ন হয় না। তবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে মাঝারি শ্রেণীর প্রচুর ভুট্টার চাষ হয়। ৯২ লক্ষ একর ভূমিতে ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে।

ডাল (Pulses)—এইগুলি ভারতের অন্যতম প্রধান ফসল। এদেশের ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ একর জমিতে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন নানা শ্রেণীর ডাল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছোলা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে ইহা প্রধান খাদ্য হিসাবে ও পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ২ কোটি ৪ লক্ষ একর ভূমিতে ৫৯ লক্ষ টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে ছোলা জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গে ২½ লক্ষ টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে। অড়হর আর একটি উল্লেখযোগ্য ডাল। ইহা ২০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও অন্ধ্রপ্রদেশে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, মটর (৬ ল. ট.), কলাই (৩½ ল. ট.), খেসারি (২·৮ ল. ট.), মুগ (২·৬ ল. ট.), কুলত্থি (২ ল. ট.), মসুরী (১·৯ ল.ট.) উৎপন্ন হইয়াছে।

ইক্ষু (Sugar Cane)—ভারতের প্রায় ৫০ লক্ষ একরে ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টন ইক্ষু (গুড় বা চিনি নহে) উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তর-ভারতের সমভূমির পাঞ্জাব হইতে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল, অন্ধ্রপ্রদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং বোম্বাই-রাজ্যের দাক্ষিণাত্য-মালভূমির সেচ-অঞ্চল, এই তিনটি প্রধান ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চল। উত্তর-ভারতের ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত অনুকূল এবং শেষোক্ত অঞ্চলের উৎপাদনের হারও অধিক। তাই, এই অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার বৃদ্ধির সহিত উৎপাদন-অঞ্চলও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ভারতের প্রায় ৬০% ইক্ষু উত্তরপ্রদেশে, ১০% বিহারে উৎপন্ন হইত। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের হারাহারি অংশ ক্রমশঃ কমিতেছে এবং দক্ষিণ-ভারতের অংশ কিছু কিছু বাড়িতেছে।

তৈলবীজ (Oilseeds)—তৈলবীজ ভারতের বিশিষ্ট ফসল। ভারতের ২ কোটি ৯৯ লক্ষ একর ভূমিতে ৬০ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নে এদেশের উৎপন্ন প্রধান প্রধান তৈলবীজগুলি উল্লেখ করা হইল।

চীনাবাদাম (Groundnut)—১ কোটি ৩১ লক্ষ একর ভূমিতে ৪১ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬ ল. ট.), মাদ্রাজ (১২ ল. ট.), বোম্বাই (৮ ল. ট.), উত্তরপ্রদেশ (৩ ল. হ.), মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে উৎপন্ন হইয়াছে। ভারত হইতে চীনাবাদাম, তৈল ও খইল প্রচুর রপ্তানি হয়। খাদ্য হিসাবে এবং উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত করিতে চীনা-বাদাম যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়।

রাই-সরিষা (Rape and Mustard)—উত্তর ভারতের তৈলবীজ দুইটি উল্লেখযোগ্য। ভোগ্য ও বাণিজ্যযোগ্য পণ্য (Commercial or Cash Crops) হিসাবে পরিগণিত। খাদ্য হিসাবে ভারতেই এই তৈলবীজ দুইটি ব্যবহৃত হয়। ৬২ লক্ষ একর ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে প্রচুর জন্মায়।

তিসি (Linseed)—এই তৈলবীজ খাদ্য হিসাবে বিশেষ ব্যবহার হয় না। রং ও পালিশের কাজের জন্য তিসির বিশেষ চলন আছে। বিদেশেও প্রচুর তিসি রপ্তানি হয়। ৩৮ লক্ষ একর ভূমিতে ৩'৫ লক্ষ টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় সমভূমিতে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, উত্তর-প্রদেশ ও বিহারেও উৎপন্ন হয়।

তিল (Sesamum)—ইহার তৈল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহা প্রধানতঃ শুষ্ক অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ৫০ লক্ষ একর ভূমিতে ৪½ লক্ষ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই অল্পবিস্তর তিল উৎপন্ন হইলেও উত্তরপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

রেড়ি (Castor)—দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই ও মহীশূরে উৎপন্ন হয়। ইহা যন্ত্রাদি ঘর্ষণ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Lubricating Oil)। ১৪ লক্ষ একর জমিতে ১'৩ লক্ষ টন রেড়ি উৎপন্ন হইয়াছে।

তুলা (Cotton)—ইহা অর্থকরী ফসল (Cash Crops)। ভারতের নানাবিধ প্রকৃতির মৃত্তিকাময় অঞ্চলে ও বিভিন্ন জলবায়ুতে তূলার চাষ-আবাদ হয়,—উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত। আবার, বিভিন্ন জাতীয় কার্পাস তূলা উৎপন্ন হয়,—লম্বা, মাঝারি, ছোট আঁশযুক্ত, এই তিন প্রকার আঁশযুক্ত তূলা (staple) এদেশে জন্মায়। পূর্বে ছোট আঁশযুক্ত তূলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত; বর্তমানে লম্বা ও মাঝারি আঁশযুক্ত তূলার উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর-এর অংশবিশেষে লম্বা ও মাঝারি আঁশযুক্ত তূলার চাষ-আবাদ হয়। ভারত বিভক্ত হইবার পর তূলার চাষ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ১ কোটি ৯৮ লক্ষ একর জমিতে ৪৭ লক্ষ গাঁইট তূলা (প্রতি গাঁইট ৩৯২ পাঃ) উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ বোম্বাই (১৭ ল. গাঁ.), পাঞ্জাব (৯ ল. গাঁ.), অন্ধ্রপ্রদেশ (৪), মধ্যপ্রদেশ (৩), মাদ্রাজ (৩), উত্তরপ্রদেশ (৩), রাজস্থান ও মহীশূরে উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশ হইতে ছোট আঁশযুক্ত তূলা কিছু কিছু রপ্তানি হয়।

পাট (Jute)—উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত পলিমাটি-অঞ্চল পাট চাষের উপযোগী। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার (পূর্ণিয়া জেলা), ত্রিপুরায় প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের তরাই-অঞ্চলে অল্পবিস্তর জন্মায়। ভারত বিভক্ত হইবার পর পাটের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। প্রায় ৪২ লক্ষ গাঁইট (bale) পাট উৎপন্ন হইয়াছে। মেস্তা (mesta) প্রায় ১৪ লক্ষ গাঁইট উৎপন্ন হয়।

শণ (Hemp)—পাট অপেক্ষা শণের তন্তু শক্ত। দড়ি, ক্যাম্বিস প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এদেশে প্রায় ৩৩ হাজার টন শণ উৎপন্ন হয়।

চা (Tea)—ভারতের ৭ লক্ষ ৯২ হাজার একর স্থানে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন ('৫৭) হইয়াছে। উহার মধ্যে ২১৩ লক্ষ পা. ভারতে পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ৪০৪ লক্ষ পা. রপ্তানি হইয়াছে। চা-উৎপাদনে আসাম-রাজ্য প্রথম স্থানীয় (৫০%)। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও মাদ্রাজের নীলগিরি-অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। কাংরা, দেরাদুন ও রাঁচি অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

কফি (Coffee)—কফি-উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা,—(ক) উষ্ণমণ্ডলের বৃষ্টিবহুল পর্বতগাত্র ; কারণ, জল জমিয়া থাকিলে কফিগাছের অনিষ্ট হয় ; (খ) জৈব-পদার্থপূর্ণ (humus) উর্বর মৃত্তিকা ; এবং (গ) ছায়াযুক্ত স্থান। এইজন্য মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরলের পাহাড়ের ঢালে কফি জন্মায়। এদেশে প্রায় ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৫৭) কফি উৎপন্ন হইয়াছিল।

রবার (Rubber)—সারাবৎসর উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থান রবারগাছের অনুকূল। দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের জলবায়ু কতকটা এইরূপ বলিয়া কেরল, মহীশূর ও মাদ্রাজে রবার উৎপন্ন হয়। এই গাছের রস হইতে রবার প্রস্তুত হয়। ২৭৩ হাজার একর স্থানে ৪৯ হাজার টন রবার উৎপন্ন হইয়াছে।

তামাক (Tobacco)—ভারতের ৯ লক্ষ একর স্থানে ৩ লক্ষ ৬ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশে কয়েকটি বিশেষ অংশে তামাকের চাষ

হয়,—অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপ, উত্তর-বিহার, গুজরাট, মহীশূর, মাদ্রাজের মধুরাই-অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার।

আলু (Potatoes)—প্রায় ৭ লক্ষ একর স্থানে ১৮ লক্ষ টন আলু (১৯৫৬) উৎপন্ন হইয়াছে।

মসলা (Condiments and Spices)—ভারতে বিবিধ মসলা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে **লঙ্কা**, (chillies) **আদা**, (ginger) **গোলমরিচ** (black pepper) ও দারুচিনি উল্লেখযোগ্য; এদেশে ৩,৫৪,০০০ টন শুষ্ক লঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে। পাটনা জেলা, তাপ্তী-উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ লঙ্কা-উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ আদা-উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। কেরলে ভারতের অর্ধেক গোলমরিচ জন্মায়। ইহা ছাড়া, মাদ্রাজ ও মহীশূরে উৎপন্ন হয়। এদেশে ৩২ হাজার টন গোলমরিচ উৎপন্ন হইয়াছে। কেরল ও সিকিমে দারুচিনি উৎপন্ন হয়।

সিঙ্কোনা (Cinchona)—দার্জিলিং জেলার মংপু ও নীলগিরি-অঞ্চলে সিঙ্কোনা জন্মায়। এই গাছের ছাল হইতে ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ কুইনিন্ প্রস্তুত হয়।

পশুপালন (Animal Husbandry)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪'৮৯ কোটি গরু, ৩'৪৮ কোটি মহিষ, ৩'৮৭ কোটি মেষ এবং ৫'৬৬ কোটি ছাগ আছে। এদেশে যে পরিমাণে পশুর খাদ্য পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অধিক বলা যাইতে পারে। প্রায় ২৫টি বিভিন্ন জাতীয় উৎকৃষ্ট গরু ও ৬টি বিভিন্ন জাতীয় মহিষ থাকিলেও এদেশের অধিকাংশ গবাদি পশু নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

মৎস্য-শিকার (Fisheries)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা মৎস্য-শিকার করা। ভারতের বহু লোক নিরামিষভোজী হইলেও এদেশের যাহারা খাদ্যের সহিত মৎস্য গ্রহণ করে, এইরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে। ভারতের মৎস্য-শিকার সংক্রান্ত বিষয়কে প্রধানতঃ

চারিটি অংশে বিভক্ত করা যায়,—(ক) দেশের অভ্যন্তরের মিঠা জলের মাছ; (খ) উপকূলের ও খাঁড়ির মাছ; (গ) গভীর সমুদ্রজলের মাছ এবং (ঙ) মাছের চাষ ও গবেষণার কার্য।

(ক) দেশের অভ্যন্তরের মিঠা জলের মাছ—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বহু নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি প্রভৃতিতে নানা জাতীয় মিঠা জলের মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। মাছ ধরিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা বা আধুনিক যুগের যন্ত্রাদি ব্যবহার করা এখনও এদেশে প্রচলিত হয় নাই।

(খ) উপকূলের ও খাঁড়ির মাছ—ভারতের উপকূলের তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫০০ মাইল। এই অংশের নিকটবর্তী সমুদ্রে নানা জাতীয় প্রচুর মাছ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর মাছ ধরিবার ব্যবস্থা দেখা যায় এবং কোন কোন অংশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ও আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। কেরল, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অল্পবিস্তর মাছ ধরিবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল রাজ্যে বিশেষতঃ মাদ্রাজ, কেরল ও বোম্বাই-রাজ্যে ট্রলারও ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, মান্নার, কচ্ছ উপসাগরে মুক্তা এবং মান্নার উপসাগরে শঙ্খ ধরা হয়। হাঙ্গরও ধরা হয় এবং ইহা হইতে তৈল পাওয়া যায়।

সুন্দরবন অঞ্চলে অসংখ্য খাঁড়ি ও জলাশয়ে অনেক প্রকার লোনা জলের মাছ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, গঙ্গা, রূপনারায়ণ নদনদীর ইলিশ মাছ উল্লেখযোগ্য।

(গ) গভীর সমুদ্র-জলের মাছ—উপকূলের নিকটস্থ ১০০ ফাদম গভীর সমুদ্র-অংশকে অগভীর সমুদ্র বলা হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নিকটস্থ এইরূপ অগভীর সমুদ্র-অংশের আয়তন প্রায় ১,১৫,০০০ বর্গমাইল। ইহার পরবর্তী সমুদ্র-অংশ আরও গভীর। গভীর সমুদ্রে হাঙ্গর বা তিমি জাতীয় জলচর প্রাণী পাওয়া যায়। ইহাদের চামড়া, অস্থি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ শিল্পে এবং সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মাদ্রাজ রাজ্যে মাছ হইতে তৈল ও সার তৈয়ারী করিবার প্রায় ৬৫০টি

কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গে কাঁথি-উপকূলে হাঙ্গরের তৈলের একটি কারখানা রহিয়াছে।

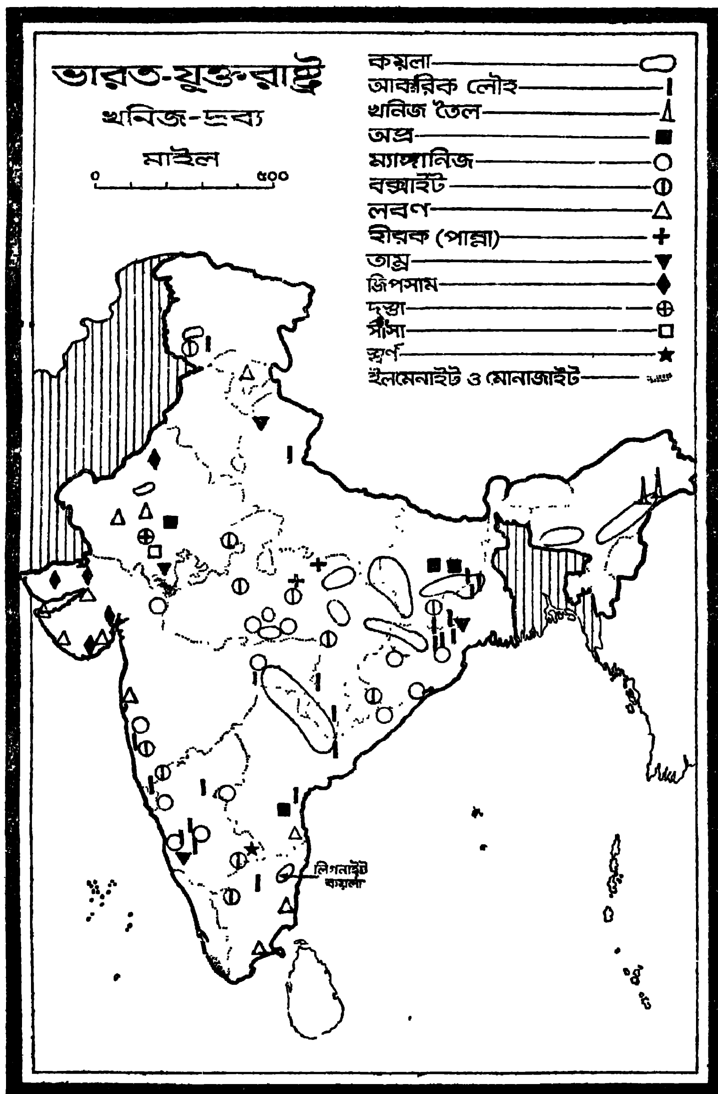
(ঙ) **মাছের চাষ ও গবেষণা কার্য**—প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাছের চাষ ও গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে,—কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে মিঠা জলের মাছের গবেষণা-কেন্দ্র, মাদ্রাজ রাজ্যের মান্দাপমের সমুদ্রের মাছের গবেষণা-কেন্দ্র এবং বোম্বাই-রাজ্যে গভীর সমুদ্র-জলে মাছ ধরিবার শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ খৃঃ সমগ্র ভারতে ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার টন মাছ ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে সামুদ্রিক মাছ, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ২২% বৃদ্ধি পাইয়াছে।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বিবিধ খনিজ সম্পদ থাকিলে, সকল স্থানের আকরিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় নাই এবং এখনও অনেক স্থানে খনির কাজ ভালভাবে হয় না। প্রাচীন শিলায় গঠিত ও বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে অধিকাংশ খনিজ দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। ইহার অন্যতম অংশ ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার মালভমি ভারতের শ্রেষ্ঠ খনিজ অঞ্চল। হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে হয়ত খনিজ পদার্থ রহিয়াছে; কিন্তু ঐ অঞ্চলের খনিজ পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই। আর, উত্তর-ভারতের সমভূমিতে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না। অধুনা ভারতের বিভিন্ন স্থানে খনিজ-সম্পদ আবিষ্কার, জরিপ প্রভৃতি কার্যের জন্য পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন নূতন খনি এবং খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে।

অভ্র, ইল্‌মেনাইট, মোনাজাইট ও জারকন উত্তোলনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থানীয় এবং ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে তৃতীয়-স্থানীয়। এদেশে যথেষ্ট আকরিক লৌহ থাকিলেও তাম্র, দস্তা, সীসা,* নিকেল, পারদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য অলৌহ ধাতু কমই পাওয়া যায়।

কয়লা—ভারতে কয়লা প্রধানতঃ গোণ্ডওয়ানা-শিলায় (Gondwana system of Indian Geology) পাওয়া যায়। আর, টার্সিয়ারি শিলায়


ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
খনিজ-দ্রব্য
মাইল
০
৫০০
কয়লা
আকরিক লৌহ
খনিজ তৈল
অভ্র
ম্যাঙ্গানিজ
বক্সাইট
লবণ
হীরক (পান্না)
তাম্র
জিপসাম
দস্তা
সীসা
স্বর্ণ
ইলমেনাইট ও মোনাজাইট
লিগনাইট কয়লা

(Tertiary rocks) সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এদেশের ভূ-গর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন,—তাঁহাদের অভিমত যে, ভূ-গর্ভের এক হাজার ফুটের অনধিক গভীর অংশে এক ফুট বা তাহার অধিক বেধযুক্ত কয়লা-স্তরের মোট কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টন। এদেশে প্রায় ৪৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে (১৯৫৮ খৃঃ)।

গোণ্ডওয়ানা-কয়লা—এই শ্রেণীর কয়লার খনিগুলির অবস্থান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়,—

(১) দামোদর-উপত্যকার কয়লার খনি—(ক) পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ-অঞ্চল, এই স্থানে প্রায় ৮৫০ কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে এবং ভারতের ৩০% কয়লা উত্তোলিত হয়। (খ) বিহার রাজ্যের ঝরিয়া, বোকারো, করণপুরা, গিরিডি ও রাজমহল। ইহাদের মধ্যে ঝরিয়ায় ৯০০ কোটি টন, এবং করণপুরায় ৯৫০ কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে। এই খনিগুলি হইতে ভারতের ৫৮% কয়লা উত্তোলিত হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনিগুলি হইতে এদেশের প্রায় ৯০% কয়লা পাওয়া যায়।

(২) করণপুরার পশ্চিমে খনিগুলি অশ্বক্ষুরের ন্যায় বক্রাকারে অবস্থিত—ইহার অপর প্রান্ত তালচের-খনি পর্যন্ত প্রসারিত। ইহাদের মধ্যে বিহারের হুটর ও ঔরাঙ্গা, মধ্যপ্রদেশের টাটাপানি, ঝিলমিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষ্মণপুর, রামপুর, কোরবা ও রায়গড় এবং উড়িষ্যার তালচেরের খনি উল্লেখযোগ্য। ইহার পশ্চিমে উমারিয়া (মধ্যপ্রদেশ) অবস্থিত।

(৩) মধ্যপ্রদেশের মধ্যভাগের ছিন্দওয়ারা ও মোহপানির খনি রহিয়াছে।

(৪) গোদাবরীর উপত্যকায় বোম্বাই রাজ্যের (বিদর্ভ) চান্দার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খনি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনির কয়লার খনি প্রধান। প্রথমটি হইতে ভারতের ৪.৫% এবং দ্বিতীয়টি হইতে ১% কয়লা উত্তোলিত হয়।

হিমালয়-অঞ্চলের ও টার্সিয়ারি যুগের কয়লা—যে স্থানে হিমালয় পর্বতমালার পাদ-পর্বত (Foot Hills) অবস্থিত, গোণ্ডওয়ানা যুগে দাক্ষিণাত্যের

মালভূমি ঐ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ যুগে ঐ অঞ্চলে যে কয়লার সৃষ্টি হয়, তাহা, হিমালয় পর্বতের উৎপত্তির সময়, শিলাস্তরে প্রবল চাপের ফলে শিলাস্তরের কুঞ্চন, ভাঁজ ও চ্যুতির সৃষ্টি হেতু কয়লা-স্তরগুলি ফাটিয়া, ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। তাই, দার্জিলিং জেলার খনি হইতে প্রধানতঃ গুড়া কয়লা পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির শিলাস্তরে ঐভাবে ভাঁজ বা চ্যুতির সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া কয়লাস্তরগুলি সাধারণতঃ অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।

আসামে সাধারণতঃ মধ্যযুগ (Mesozoic) হইতে টার্সিয়ারি যুগ পর্যন্ত সৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। আসামের মার্ঘেরিটা হইতে লেডো পর্যন্ত অঞ্চল, নাগাপাহাড়, গারো ও খাসি পাহাড়ের খনিগুলি উল্লেখযোগ্য। রাজস্থানের বিকানীর জেলার পালানা (Palana), কাশ্মীরের রিয়াসিতে টার্সিয়ারি যুগের কয়লা পাওয়া যায়।

লিগ্‌নাইট (Lignite)—মাদ্রাজ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ এবং কাশ্মীরে লিগ্‌নাইট শ্রেণীর কয়লা রহিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের ভূ-গর্ভে সম্ভবতঃ ২০০ কোটি টন লিগ্‌নাইট সঞ্চিত আছে। মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ-আরকট জেলার নেয়ভেলির পার্শ্ববর্তী প্রায় ১০০ বর্গমাইল স্থানের ভূ-গর্ভে ২০০ কোটি টন লিগ্‌নাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহা অতি নিকৃষ্ট কয়লা হইলেও দক্ষিণ-ভারতে কয়লা পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। তাই, লিগ্‌নাইট উত্তোলন করিয়া উহার দ্বারা তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদন, রাসায়নিক সার প্রস্তুতি প্রভৃতি কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বহু কোটি টাকা ব্যয় করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এখানে ৩৫ লক্ষ টন লিগ্‌নাইট উত্তোলিত হইবে।

খনিজ তৈল (Petroleum)—পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ভারতের ৪ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে ভারত-সরকার এবং দুই-একটি বিদেশী তৈল কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ কাংরা-উপত্যকা, কাম্বে-উপসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কচ্ছ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে তৈল-অনুসন্ধান কার্য করিতেছেন।

আসামের ডিগবয় খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ টন খনিজ-তৈল উত্তোলিত হয়। এই রাজ্যের নহরকাটিয়া, মোরান ও হুগরিজান নামক স্থানগুলিতে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল খনি হইতে বৎসরে ৪০-৫০ লক্ষ টন খনিজ তৈল উত্তোলিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অঞ্চল হইতে তৈলবাহী নলের দ্বারা গৌহাটি ও বিহারের বারুণীতে তৈল আনিয়া পরিশ্রুত করা হইবে। তখন ভারতের চাহিদার ৪০% পূরণ হইবে।

কয়লা, খনিজ তৈল ও জলশক্তি, এই তিনটি শক্তির উৎস বলিয়া এই তিনটিকে কোন দেশের শক্তি-উৎপাদনের সম্পদ (Power Resources) বলা হয়। পূর্বেই আমরা জলশক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

আকরিক লৌহ (Iron Ore)—পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ আকরিক লৌহ ভারতে রহিয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত। ইহার পরিমাণ প্রায় ২,১০০ কোটি টন। হিমাটাইট (Haematite) আকরিক (এক জাতীয় আকরিক লৌহ) বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও বোম্বাই রাজ্যে এবং ম্যাগনেটাইট-আকরিক মাদ্রাজ, মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা ও হিমাচলপ্রদেশে প্রচুর রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে আর এক প্রকার আকরিক লৌহ (Linonite and spathic ores) যথেষ্ট আছে।

ভারতের আকরিক লৌহ প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর। ইহাতে ৬০-৬৫% অংশ লৌহ বর্তমান। উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ এত অধিক পরিমাণে থাকিলেও এদেশে অধিক পরিমাণে আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয় না—১৯৫৬ খৃঃ প্রায় ৫০ লক্ষ টন উত্তোলিত হইয়াছে এবং ১৯৬১ খৃঃ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন উত্তোলনের পরিকল্পনা হইয়াছে।

বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের লৌহখনিই প্রধান। বিহারের সিংভূম জেলার গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি; উড়িষ্যার গুরুমহিষিণী, বাদামপাহাড়; মধ্যপ্রদেশের দাল্লী ও রাজহারা এবং মহীশূরের কাড়ুর জেলার খনি হইতে অধিকাংশ আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়। বোম্বাই রাজ্যের চান্দা জেলা ও মাদ্রাজের সালেম জেলার খনিও উল্লেখযোগ্য।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)—ভারতের ভূ-গর্ভের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের মোট পরিমাণ ১১.২ কোটি টন। তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে ১০ কোটি টন রহিয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ ১৬ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইয়াছিল।

বোম্বাই রাজ্যের নাগপুর ও ভাণ্ডরা জেলা, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও ছিন্দ-ওয়ারা জেলায় ভারতের ৬১% ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। বোম্বাই রাজ্যের পঞ্চমহল, ছোট উদয়পুর ও রত্নগিরি; অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপতনম ও সন্দুর; মহীশূরের বেল্লারী, কাদুর, উত্তর-কানাড়া, শিমোগা, তুমকুর ও চিতলদুর্গ; বিহারের সিংভূম; উড়িষ্যার কোরাপুট, কিয়ঞ্জর, বোনাই, সুন্দরগড় প্রভৃতি স্থানেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। রাজস্থানের বনস্‌ওয়ারাতে সামান্য পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়।

পূর্বে কেবলমাত্র ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হইত। বর্তমানে এদেশে ফেরো ম্যাঙ্গানিজ (Ferro-manganese) তৈয়ারী হইতেছে। তন্মধ্যে টাটা কোম্পানির উড়িষ্যার জোডা (Joda) কারখানা বৃহত্তম।

ক্রোমাইট (Chromite)—এই ধাতু ভারতের ভূ-গর্ভে ১৩.২ লক্ষ টন সঞ্চিত আছে। ১৯৫৭ খৃঃ প্রায় ৭৮ হাজার টন উত্তোলিত হইয়াছে। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে ক্রোমাইট প্রয়োজন হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূরে ইহা পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার কিয়ঞ্জর, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা এবং মহীশূরের হাসান ও শিমোগা জেলায় ক্রোমাইট উত্তোলিত হয়।

স্বর্ণ—মহীশূরের কোলার-অঞ্চলের ভূ-গর্ভে সম্ভবতঃ ১২.৬ লক্ষ টন স্বর্ণের আকরিক রহিয়াছে। ভারতের কোন কোন নদীর বালুকায় বা স্থানবিশেষে সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ থাকিলেও মহীশূরের কোলার-খনি হইতে ভারতের অধিকাংশ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ঐ রাজ্যের হুট্টির খনি পুনরায় খোলা হইয়াছে। এদেশের উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ সামান্য,—১৯৫৭ খৃঃ প্রায় ১ লক্ষ ৭৯ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয়।

তাম্র—বিহার রাজ্যের সিংভূম-জেলার মৌসাবনি, বাদিয়া ও ধোবানী তাম্রখনি প্রধান। এই অঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ তাম্র উত্তোলিত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ প্রায় ৪ লক্ষ টন আকরিক তাম্র পাওয়া গিয়াছে।

বক্সাইট (Bauxite)—বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশে ইহা পাওয়া যাইলেও বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও জম্মুতে দেশের অধিকাংশ বক্সাইট রহিয়াছে। রাঁচী-মালভূমিতে লোহারডাগার নিকট বক্সাইট উত্তোলিত হয়। বোম্বাই শহরের নিকট টাঙ্গা-পাহাড়, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর, বালাঘাট, মান্দালা, সিওনি প্রভৃতি এবং উড়িষ্যার সম্বলপুরের নিকট প্রচুর আকরিক বক্সাইট আছে। বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাষণ করিতে প্রচুর অথচ সুলভ তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন। তাই, জলবিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্রের নিকট বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ ৯½ কোটি টন বক্সাইট উত্তোলিত হইয়াছিল।

অভ্র (Mica)—অভ্র উত্তোলনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথম স্থানীয়। মূল্য হিসাবে, ভারতের খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে অভ্র চতুর্থ স্থানীয়। বিহারের মালভূমির ১,৫০০ বর্গমাইল, রাজস্থানের ১,২০০ বর্গমাইল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ৬০০ বর্গমাইল স্থানে অভ্র পাওয়া যায়। তবে উৎকৃষ্ট অভ্র বিহারের খনি হইতে পাওয়া যায়। আর, এই অঞ্চলে ভারতের ৮০% অভ্র উত্তোলিত হয়। বিহারের অভ্র-খনি-অঞ্চল (Mica Belt) বা যে স্থানে অভ্র পাওয়া যায়, তাহা, ৬০ মাইল দীর্ঘ এবং ১২ হইতে ১৪ মাইল প্রশস্ত—ইহা হাজারিবাগ, গয়া ও মুঙ্গের জেলায় বিস্তৃত। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায় অভ্রখনি দ্বিতীয় স্থানীয়। রাজস্থানে সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়। ১৯৫৭ খৃঃ প্রায় ৬ লক্ষ হন্দর অভ্র ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।

ইলমেনাইট (Ilmenite)—দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলের বালুকার মধ্যে ইলমেনাইট পাওয়া যায়। কেরল রাজ্যের উপকূলেই অধিক পরিমাণে আছে। ভারতের উপকূলের বালুকার মধ্যে ৩৫ কোটি টন ইলমেনাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৯৫৮ খৃঃ কেরল রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টন ইলমেনাইট পাওয়া যায়।

বেরিল ও মনাজাইট (Beryl and Monazite)—এই দুইটি আণবিক শক্তি-উৎপাদনে প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহারা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। প্রথমটি রাজস্থানে এবং দ্বিতীয়টি কেরলে পাওয়া যায়।

লবণ (Salt)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে লবণ-উৎপাদনের উৎস তিনটি,—(ক) সমুদ্র-জল, (খ) রাজস্থান ও বোম্বাই রাজ্যের শুষ্ক অঞ্চলের লবণাক্ত জলের হ্রদ বা জলাশয়, (গ) হিমাচল প্রদেশের খনিজ লবণ। পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলে সমুদ্র-জল হইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। কচ্ছের রণ, কাঠিয়াবারের ও কাম্বে-উপসাগরের উপকূলেই অধিকাংশ লবণ পাওয়া যায়। বৎসরে রাজস্থানের সম্বর হ্রদ হইতে ২½ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এত লবণ প্রস্তুত হইতেছে যে, দেশের চাহিদা মিটাইয়া কিছু কিছু বিদেশে রপ্তানি করা যায়। খনিজ লবণ ছাড়া অন্য লবণ ৩৬ লক্ষ টন পাওয়া যায় (১৯৫৭ খৃঃ)।

অন্যান্য খনিজ দ্রব্য—জিপ্‌সাম (Gypsum)—রাজস্থানের যোধপুর ও বিকানীর, কাঠিয়াবার, মাদ্রাজের তিরুচিরাপল্লী জেলায় জিপসাম (৯ ল. ট,) পাওয়া যায়। **এ্যাপাটাইট** (Apatite)—এই খনিজ পদার্থ হইতে ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। আর, ফস্‌ফেট জমির উৎকৃষ্ট সার। ১৯৫৪ খৃঃ প্রায় ২,৩০০ টন এ্যাপাটাইট উত্তোলিত হইয়াছে। বিহারের সিংভূম, হাজারিবাগ ও গিরিডি, পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায় এই খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। **দস্তা ও সীসা** (Lead and Zinc)—এইদেশে দস্তা ও সীসা (৩৭ লক্ষ টাকা) সামান্য পরিমাণে উত্তোলিত হয়। রাজস্থানের উদয়পুর জেলার জয়ার খনিতে প্রায় ২,৫০০ টন (১৯৫৬ খৃঃ) দস্তা পাওয়া গিয়াছে। **হীরক** (Diamonds)—মধ্যপ্রদেশের পান্না শহরের ১২ মাইল দূরে নূতন হীরকের খনি (Diamond bearing volcanic pipe) অবিষ্কৃত হইয়াছে। শিল্পে ব্যবহারযোগ্য হীরক এই স্থানে পাওয়া যাইবে। ইহাছাড়া, এস্‌বেস্‌টস্‌, কাইনাইট, গ্রাফাইট, সোরা (Saltpetre), ব্যারাইটস প্রভৃতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরিবহন-ব্যবস্থা (Transport)

বাণিজ্যসম্ভার-বহন ও গমনাগমন, রেলপথ, পাকারাস্তা, জলপথ প্রভৃতির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। আর, পরিবহনের সুব্যবস্থার উপর শিল্প-বাণিজ্য তথা

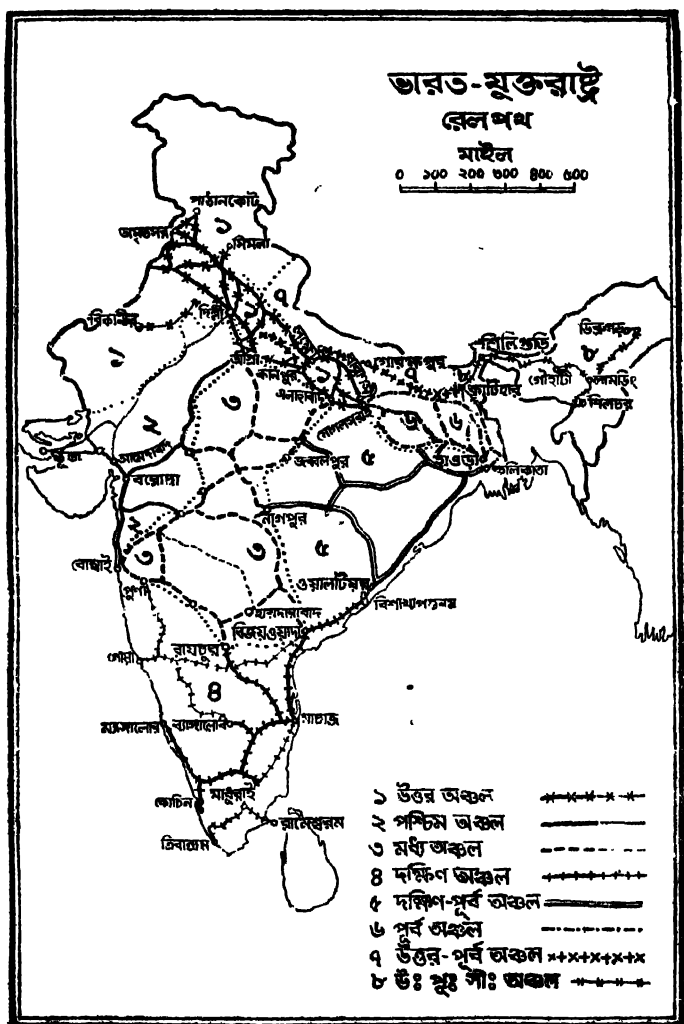
দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল আয়তন ও বিপুল লোকসংখ্যার তুলনায় এদেশে পরিবহন-ব্যবস্থা অপ্রতুল বলা যাইতে পারে। তবে, জাপান ভিন্ন এশিয়ার অন্য কোন রাষ্ট্রে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পরিবহন-ব্যবস্থায় উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

রেলপথ—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৫৭-৫৮) ৩৪,৮৮৯ মাইল রেলপথ আছে। রেলপথের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এদেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানীয় এবং এশিয়াতে প্রথম স্থানীয়। প্রতি দিন ভারতের রেলগাড়ীগুলি ৪০ লক্ষ যাত্রী এবং ৩০৭ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য বহন করে। তথাপি দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় রেলপথের দৈর্ঘ্য এবং ইহার পরিবহন-ক্ষমতা কম বলা যায়। তবুও এদেশের রেলপথগুলি দেশের পণ্যদ্রব্যের ৮০% অংশ বহন করে। কারণ এদেশের পাকারাস্তায় বা জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা ভাল নহে। মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়, যে, এদেশের উর্বর ও ঘন বসতিপূর্ণ সমভূমি, শিল্প- ও খনি-অঞ্চলেই রেলপথ বেশী। পার্বত্য অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করা ব্যয়বহুল এবং উহা বিরল-বসতি অঞ্চল বলিয়া তথায় রেলপথ কম। আবার, রেলপথগুলি বিভিন্ন গেজের,—ব্রডগেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। এইজন্য বিভিন্ন গেজের সংযোগস্থলে পণ্যদ্রব্য এক গেজের গাড়ী হইতে অন্য গেজের গাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। তাই, পণ্যদ্রব্য প্রেরণ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। বর্তমানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আটটি আঞ্চলিক রেলপথ গঠিত হইয়াছে ; যথা—

(১) **উত্তর-রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৬৩৬৪ মাইল এবং কেন্দ্র দিল্লী। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ ও রাজস্থানে ইহা বিস্তৃত। মোগলসরাই ইহার পূর্ব-প্রান্ত। তৈলবীজ, গম, মিলেট, চামড়া, চিনি, তুলা এবং লবণ, এই রেলপথ বহন করে। এই রেলপথ কোন বন্দরের সহিত সংযুক্ত নহে।

(২) **পশ্চিম-রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৬০৫৭ মাইল এবং কেন্দ্র বোম্বাই। মথুরা ও আগ্রা ইহার উত্তর-প্রান্ত। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই রেলপথ বিস্তৃত। বোম্বাই, কাণ্ডালা ও কাঠিয়াবাড়ের বন্দরগুলির সহিত এই রেলপথ

সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। প্রধানতঃ তুলা-উৎপাদন অঞ্চল এবং বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্রগুলির সহিত এই রেলপথ সংযুক্ত।



(৩) **মধ্য-রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৩৩০ মাইল এবং কেন্দ্র বোম্বাই। এখান হইতে এই রেলপথ দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ, নাগপুর, রায়চুর ও বিজয়ওড়াদা পর্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও উত্তর-প্রদেশের অংশ বিশেষে ইহা অবস্থিত। প্রধানতঃ তুলা-উৎপাদন অঞ্চলে ইহা বিস্তৃত।

(৪) **দক্ষিণ-রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৬,১৫৯ মাইল এবং কেন্দ্র মাদ্রাজ। এখান হইতে আরম্ভ করিয়া রায়চুর, ওয়াল্‌টেয়ার ও পুণা পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে এই রেলপথ বিস্তৃত। মাদ্রাজ, বিশাখাপতনম, কোচিন প্রভৃতি মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও মহীশূর রাজ্যের বন্দরগুলির সহিত সংযুক্ত। তৈলবীজ, তুলা, তামাক, মসলা, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এই রেলপথ বহন করে।

(৫) **দক্ষিণ-পুর্ব রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৪১৯ মাইল এবং কেন্দ্র কলিকাতা। ইহা হাওড়া হইতে নাগপুর ও ওয়াল্‌টেয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বোম্বাই-রাজ্যে এই রেলপথ ছড়ান আছে। আকরিক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুণাপাথর প্রভৃতির খনি, এবং টাটানগর, ভিলাই, রৌরকেলা ও বার্ণপুরের লৌহ-ইস্পাতের কারখানা এই রেলপথে অবস্থিত। এইজন্য এই রেলপথের দ্বারা প্রচুর মালপত্র বাহিত হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে বাহিত হইবে। তাই, ইহা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ।

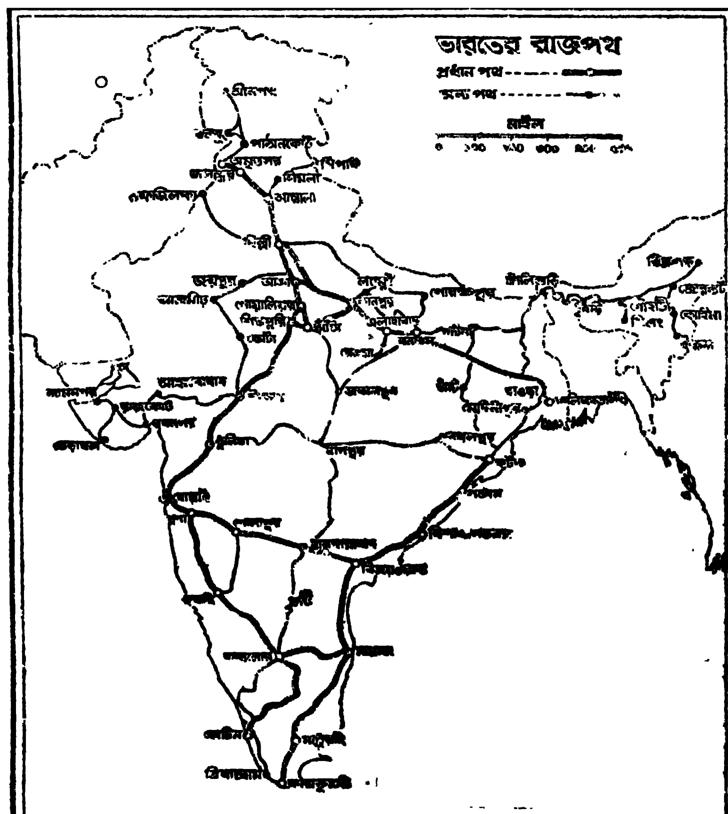
(৬) **পুর্ব-রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ২৩২৫ মাইল এবং কেন্দ্র কলিকাতা। এখান হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে ইহা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ছোটনাগপুরের খনি-অঞ্চলে (কয়লা ও অভ্র) এবং উন্নত শিল্প-অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার আয়তন ছোট হইলেও ইহা প্রচুর মালপত্র বহন করে।

(৭) **উত্তর-পুর্ব রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৩,০৬৪ মাইল এবং কেন্দ্র গোরাক্ষপুর। ইহার সমগ্র অংশই মিটারগেজ। উত্তর-বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই রেলপথ বিস্তৃত। ইহা প্রধানতঃ গঙ্গা নদীর উত্তর-অঞ্চলে রহিয়াছে। আগ্রার নিকট আচনেরা ইহার পশ্চিম-প্রান্ত এবং কাটিহার পূর্বপ্রান্ত। প্রধান

ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চলে বিস্তৃত বলিয়া এই রেলপথ প্রচুর ইক্ষু ও চিনি বহন করে। তাহাছাড়া, তরাই-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য বহন করে।

(৮) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ১,৭৩৮ মাইল এবং কেন্দ্র পাণ্ডু। আসাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও বিহারের কিছু অংশে বিস্তৃত। ইহা প্রধানতঃ চা, কাঠ ও পাট বহন করে।

রাজপথ (Roads)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২,৪০,০০০ মাইল রাস্তা আছে।



তন্মধ্যে ৮০,০০০ মাইল পাকারাস্তা। আর, পাকারাস্তাগুলির মধ্যে ১৩,৭০

মাইল **জাতীয় সড়ক** (National High-ways); যথা—(১) অমৃতসর হইতে কলিকাতা; (২) আগ্রা হইতে বোম্বাই; (৩) বোম্বাই হইতে বাঙ্গালোর হইয়া মাদ্রাজ; (৪) মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা; (৫) কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই; (৬) বারাণসী হইতে নাগপুর, হায়দরাবাদ, কর্নুল ও বাঙ্গালোর হইয়া কুমারিকা অন্তরীপ; (৭) দিল্লী হইতে আমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই; (৮) আমেদাবাদ হইতে কাণ্ডালা-বন্দর; (৯) আম্বালা হইতে সিমলা হইয়া তিব্বত; (১০) দিল্লী হইতে মুরাদাবাদ হইয়া লক্ষ্ণৌ; (১১) লক্ষ্ণৌ হইতে বারুনি; (১২) আসাম প্রবেশ-পথ; এবং (১৩) আসাম ট্রাঙ্ক রোড। ইহা ছাড়া, জম্মু-শ্রীনগর সড়ক পিরপঞ্জল পর্বতের বনিহল গিরিপথ (৭,২৫০′ উচ্চ) সুরঙ্গের মধ্য (জহর-সুরঙ্গ) দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতীয় সড়কের সকল অংশ সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয় নাই। আবার, জাতীয় সড়কগুলির কোন কোন অংশের স্থান বিশেষে নদীর সেতু নির্মিত হয় নাই। এই সড়কগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নির্মাণ করিয়াছেন।

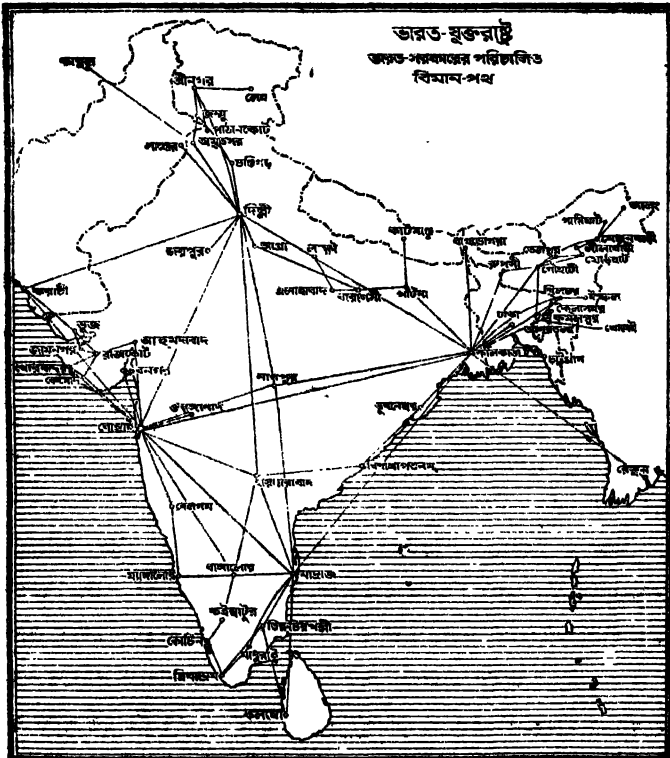
জাতীয় সড়ক ভিন্ন রাজ্য-সড়ক ও জেলা-সড়ক রহিয়াছে। রাজ্য-সড়ক রাজ্য-সরকার কর্তৃক নির্মিত। এইগুলির দ্বারা রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থান পরস্পর সংযুক্ত।

জলপথ (Water Transport)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের তুলনায় জলপথের দৈর্ঘ্য কম। এদেশের নাব্য নদীপথ ও খালপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০,০০ মাইল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর কিছু অংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের বার্কিংহাম-খাল, উড়িষ্যার ব-দ্বীপের খাল, মালাবার উপকূলের খাল ভারতের প্রধান জলপথ। ইহাদের মধ্যে ১৫৫৭ মাইল জলপথে স্টীমার এবং ৩৫৪৭ মাইল জলপথে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের দামোদর-পরিকল্পনায় দুর্গাপুর হইতে হুগলী তীরস্থ ত্রিবেণী পর্যন্ত একটি নাব্যখাল খনন করা হইতেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদীগুলির জলপথের উন্নতি সাধনের জন্য ভারত-সরকার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

বিমান-পথ (Airways)—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা, অথবা রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইলে কিংবা যে-স্থানে রেলপথ বা পাকারাস্তা নাই, সে-সব অঞ্চলে বিমান-

পথ দেশের যোগাযোগ রক্ষা করে। আবার, বিমানযোগে ডাক, লোকজন, মালপত্র দ্রুত একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাচল করিতে পারে। এইজন্য বিমান-পথ দেশের পক্ষে অপরিহার্য বলা যাইতে পারে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে অসামরিক ৮৫টি বিমান-স্টেশন আছে ; তন্মধ্যে কলিকাতার দমদম, দিল্লীর পালাম এবং বোম্বাই-এর স্যাণ্টাক্রুজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর



(International Airports)। এদেশের ৫২২টি অসামরিক বিমানপোতের মধ্যে ২০৭টি সম্পূর্ণ কার্যকরী অবস্থায় রহিয়াছে। ১৯৫৩ খৃঃ ১লা আগস্ট হইতে দুইটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ভারত-সরকার বিমান-পথগুলি স্বহস্তে পরিচালনা করিতেছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন অংশে বিমান পরিচালনা করেন; উহার নাম **"ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস্‌-করপোরেশন"** এবং অপরটি ভারতের সহিত বিদেশের সংযোগ রক্ষা করে, **"এয়ার ইণ্ডিয়া-ইণ্টারন্যাশনাল"**। ১৯৫৮ খৃঃ ভারতীয় বিমানপোতগুলি ২ কোটি ৯০ লক্ষ মাইল যাতায়াত করিয়াছে এবং ৮লক্ষ যাত্রী ও ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ পাউণ্ড মাল ও ডাক বহন করিয়াছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী, ডাচ, পাকিস্তান, রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশের বিমানগুলি ভারতের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ রক্ষা করে।

সমুদ্র-পথ—১৯৫৮ খৃঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৬,৩৯,৭০৮ টনের (GRT) মোট ১৪১ খানি সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল; তন্মধ্যে ৮৫ খানি উপকূলের এবং ৫৬ খানি বিদেশের বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর উহা ৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। উপকূলের বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, ইহাই ভারতের আইন।

বর্তমান ভারতীয় দুইটি জাহাজ প্রতিষ্ঠানের (Eastern Shipping Corporation এবং Western Shipping Corporation) মূলধনের অধিকাংশ ভারত-সরকারের প্রদত্ত এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইহা ছাড়া, বেসরকারী জাহাজ-প্রতিষ্ঠানও আছে। দুইটি তৈলবাহী জাহাজও (Tanker) রহিয়াছে। ভারতীয় জাহাজগুলি বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, সিংহল, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া পণ্যদ্রব্য বহন করে। তবুও ভারতের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য বিদেশীয় জাহাজগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বন্দর ও পোতাশ্রয়—ঝড়-ঝাপটার সময় পোতাশ্রয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ নিরাপদে থাকিতে পারে। কতকগুলি পোতাশ্রয় স্বাভাবিক এবং কতকগুলি কৃত্রিম। সাধারণতঃ স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে। আবার, নদীর মোহনার নিকট নদীতীরস্থ সামুদ্রিক বন্দর থাকিতে পারে। জাহাজ হইতে মালপত্র নামান ও জাহাজে মালপত্র উঠান এবং ঐগুলিকে রাখিবার ব্যবস্থা বন্দরে

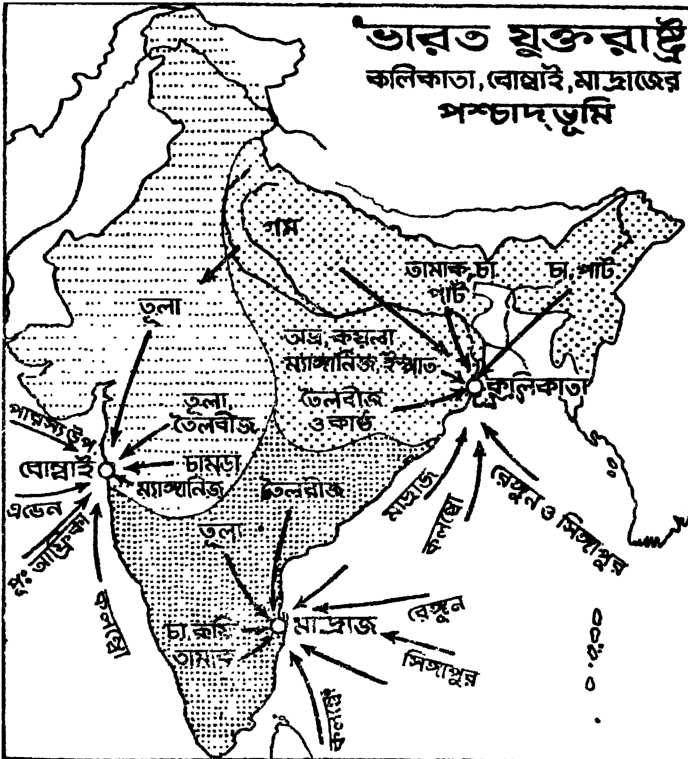
থাকে। মালপত্র চলাচল করিবার জন্য রেলপথ, জলপথ ও রাস্তা বন্দরের সহিত দেশের বিভিন্ন স্থানের সংযোগসাধন করে। যে-অঞ্চলের মালপত্র কোন্ বন্দর মারফত বিদেশে চলাচল করে, সে-অঞ্চলকে ঐ বন্দরের **পশ্চাৎভূমি** (Hinterland) বলে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি কলিকাতার পশ্চাৎভূমি। বন্দরের সহিত ইহার পশ্চাৎ-ভূমির পরিবহন-ব্যবস্থা ও পশ্চাৎ-ভূমির বহির্বাণিজ্যের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। উন্নত পশ্চাৎভূমি এবং সুগঠিত পরিবহন-ব্যবস্থা থাকিলে বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫৩৫ মাইল হইলেও ইহার তটরেখা বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগরের তটরেখা বিশেষ খণ্ডিত নহে; এবং ভারত মহাসাগরের শীর্ষদেশে অবস্থান হেতু ভারতের বহির্বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা থাকিলেও এদেশের উন্নত বন্দরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও কাণ্ডালা, এই ছয়টি ভারতের প্রথম শ্রেণীর বন্দর। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ এই বন্দরগুলি ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান করিয়াছে। তাই, এদেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য ইহাদের মারফতে চলে। ইহাদের প্রত্যেকটির পশ্চাৎ-ভূমি জনবহুল ও বিস্তৃত। এইজন্য সময় সময় এই বন্দরগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য এত অধিক পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয়, কিংবা এত অধিক সংখ্যক জাহাজ উপস্থিত হয় যে, তখন বন্দরের কাজ অচল হইয়া পড়ে। এইজন্য এদেশের ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্য এই ছয়টি বন্দরের দ্বারা সুচারুরূপে হইতে পারে না। এই সকল বাধা বিপত্তি দূরীভূত করিবার জন্য বন্দরগুলির কার্যের পরিধি ও কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং ঐগুলিকে ক্রমশঃ কার্যকরী করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, কতকগুলি ছোট ছোট বন্দরের উন্নতি সাধন এবং প্রথম শ্রেণীর আরও দুই-একটি বন্দর গঠিত হইবে।

ভারতের ছোট ছোট বন্দরের সংখ্যা কম নহে। এদেশের প্রায় ২২৫টি বন্দরের মধ্যে ১৫০টি বন্দর কার্যকরী অবস্থায় আছে। এই সকল বন্দরে সাধারণতঃ পোতাশ্রয় নাই। এই সকল স্থানে জাহাজগুলি সাধারণতঃ উপকূল হইতে কিছু দূরে থামিয়া নৌকায় মালপত্র নামাইয়া দেয় এবং নৌকা হইতে মালপত্র উঠায়।

দঃ পঃ মৌসুমী-বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইলে ঐ বন্দরগুলি অকেজো হইয়া যায়। এই সকল বন্দগুলির মধ্যে পূর্ব-উপকূলস্থ কোকনদ, মছলিপত্তনম্, পণ্ডিচেরি, কাড্ড'লোর, কারিকল, নেগাপট্টনম্ ও ধনুষ্কোটি এবং পশ্চিম-উপকূলের তুতিকোরিণ, আলে'প্পি, কুইলন, কজিকোড, তেল্লীচেরী, ম্যাঙ্গালোর, ভাটকল, কারওয়ার, মালপে, ভবনগর, পোরবন্দর, ওখা, বেদিবন্দর ও মাণ্ডাভি বন্দর উল্লেখযোগ্য।

প্রধান বন্দর (Major ports)—কলিকাতা—ইহা সমুদ্র হইতে নদীপথে



প্রায় ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীতীরস্থ ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর। ইহার পশ্চাৎভূমি সমগ্র আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও

উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ। এই অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষিজ, খনিজ ও শিল্প-দ্রব্যে উন্নত। এখানে চা, পাট, কয়লা, অভ্র, আকরিক লৌহ, লাক্ষা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বহির্বাণিজ্যযোগ্য দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। ঐগুলি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে কলিকাতা সর্বপ্রথম। (১৯৫৭-৫৮ আমদানি ৫৫'১৬ লক্ষ টন ও রপ্তানি ৪৬'৪১ লক্ষ টন।) এদেশের লৌহ-ইস্পাত-শিল্প, পাট-শিল্প ইহার পশ্চাৎভূমিতে অবস্থিত। তাহা ছাড়া, এখানে অসংখ্য ছোট-বড় কলকারখানা রহিয়াছে। আর, পশ্চাৎভূমির সহিত ইহার পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত,—পূর্ব-রেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ এই বন্দর হইতে বিস্তৃত হইয়াছে, জলপথে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত এবং প্রধান সড়কগুলিও এখান হইতে সুরু হইয়াছে। তাই, ইহা এদেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কলিকাতা বন্দরের যেমন অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থাও রহিয়াছে,—হুগলী নদীতে নূতন নূতন চরের সৃষ্টি হইতেছে, বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীতে মিঠা জলের পরিমাণ কম হইতেছে, অর্থাৎ নদী ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে, কারণ অন্য ঋতুতে ভাগীরথীর প্রবাহ ক্ষীণ। তাই, সারা বৎসর ভাগীরথীর প্রবাহপথে পরিমিত জল বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাগীরথীর উৎসের নিকট ফারাক্কা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। কলিকাতা ভারতবর্ষের পূর্বতন রাজধানী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

বোম্বাই—ইহা ভারতের পশ্চিম-উপকূলের নিকট একটি ছোট দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং এদেশের দ্বিতীয় প্রধান নগর ও বন্দর। এখানে সুন্দর, স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। এই পোতাশ্রয় ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রস্থ এবং (২২'—৪০') গভীর। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ মোট আমদানি ৯৩'০২ল. ট. ও রপ্তানি ৫৮'০৮ ল. ট। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম-ভারত এবং দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিমাংশ ইহার পশ্চাৎভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বতের ভোরঘাট ও থলঘাট গিরিপথের অবস্থান হেতু মধ্য রেলপথ বোম্বাই-এর সহিত দাক্ষিণাত্য-মালভূমি এবং উত্তর ও পূর্ব-ভারতকে সংযুক্ত করিয়াছে, কারণ ঐ গিরিপথ দুইটির মধ্য দিয়া রেলপথ নির্মিত হইয়াছে।

তুলা, কার্পাস-বস্ত্র, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বোম্বাই-এর রপ্তানি দ্রব্য। ইহার নিকট কয়লা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং ইহার দ্বারা প্রধানতঃ কল-কারখানাগুলি চালিত হয়। তাই, ইহা ভারতের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পকেন্দ্র পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই ভারতের প্রধান বস্ত্র-শিল্পকেন্দ্র হইলেও বর্তমানে এখানে নানারূপ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহার নিকটস্থ ট্রোমবে-এ খনিজ তৈল পরিশোধনের বিরাট কারখানা ও পরম-আণবিক গবেষণা-কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই শহর বোম্বাই-রাজ্যের রাজধানী।

মাদ্রাজ—ইহা করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত ভারতের তৃতীয় প্রধান বন্দর ও নগর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় নাই,—ইহার নিকট সমুদ্র অগভীর ও উপকূল বালুকাময়। তাই, এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে,—ব্রেক-ওয়াটার অর্থাৎ দুইটি কংক্রিট-প্রাচীর উপকূলের নিকটস্থ প্রায় ২০০ একর সমুদ্র বেষ্টন করিয়াছে এবং ঐ অংশ ৩০′ গভীর। এই স্থানে পোতাশ্রয় অবস্থিত। মাদ্রাজের আমদানি ২০·০৩ ল. ট. এবং রপ্তানি ৬·৭৩ ল. ট.। ইহার পশ্চাৎ-ভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণাংশ। চীনাবাদাম ও তাহার তৈল, কাঁচা ও পাকা চামড়া, তামাক, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ, বস্ত্র, কফি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। দক্ষিণ-রেলপথ ইহার সহিত পশ্চাৎভূমির সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহার বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহার উপকণ্ঠের পেরামপুরের রেলওয়ের যাত্রীগাড়ী নির্মাণের বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজ শহর মাদ্রাজ-রাজ্যের রাজধানী।

কোচিন—ইহা মালাবার উপকূলে একটি লেগুনের উপর অবস্থিত। ইহা ভারতের পঞ্চম প্রধান বন্দর। বর্তমানে দক্ষিণ রেলপথের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই দুই গেজের রেলপথ এই বন্দরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। ইহার আমদানি ১৪·০৪ ল. ট. ও রপ্তানি প্রায় ৩·৯৬ ল. ট.। নারিকেল ও উহার তৈল, ছোবড়া, চা, গোলমরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

বিশাখাপত্তনম—ইহা অন্ধ্র প্রদেশে, কলিকাতা ও মাদ্রাজ, এই দুইটি বন্দরের মধ্যভাগে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। ক্ষুদ্র অথচ গভীর সাগরশাখায়

পোতাশ্রয়টি অবস্থিত। আর, 'ডলফিন-নোজ' নামক শৈলশিরা পোতাশ্রয়ের প্রবেশ মুখকে সুরক্ষিত করিয়াছে। ইহার পশ্চাৎভূমি অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ, এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ। দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ রেলপথ ইহার পশ্চাৎভূমিতে বিস্তৃত। আর, এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় ও বহু অংশে কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এইজন্য ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, কাঠ, হরীতকী প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। ইহার আমদানি ১১'৬৬ ল. ট., ও রপ্তানি ১৩'৪৭ ল. ট.।

কাণ্ডলা—বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত কচ্ছে, কচ্ছ-উপসাগরের পূর্ব-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র সমুদ্রশাখায় (Kandala creek) অবস্থিত। বর্তমানে বিবিধ উন্নতিসাধন করিয়া ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হইয়াছে। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারত করাচির পশ্চাৎভূমি ছিল। আর, বোম্বাই বন্দর, এই অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত। এই সকল অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য কাণ্ডালায় প্রথম শ্রেণীর বন্দর নির্মিত হইয়াছে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং বোম্বাই রাজ্যের সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট ইহার পশ্চাৎভূমি। গুজরাটের দীসা হইতে ১৭০ মাইল দীর্ঘ মিটারগেজ রেলপথ কাণ্ডালা পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার আমদানি ৬'০৯ ল. ট. ও রপ্তানি ২'৩৫ ল. ট.।

অন্যান্য বন্দর (Minor Ports)—নিম্নলিখিত ছোট, ছোট বন্দরগুলির দ্বারা সাধারণতঃ উপকূলের বাণিজ্য (Coasting trade) চলে। **কাকিনদ** অন্ধ্র-প্রদেশের গোদাবরীর ব-দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। চীনাবাদাম, রেড়ি ও তামাক ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। **মছলিপত্তনম** ঐ রাজ্যের কৃষ্ণার ব-দ্বীপের কিছু উত্তরে অবস্থিত। ইহা মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। চীনাবাদাম, খইল ও রেড়ি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। **পণ্ডিচেরি** মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পিঁয়াজ, হাড়ের গুঁড়া ও আম। ইহা পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী এবং ফরাসী কৃষ্টির কেন্দ্র। **কাড্ডালোরের** মারফতে মালয়ের বাণিজ্য চলে। চাউল, ডাল ইহার প্রধান

উপকূল-বাণিজ্য (Coasting trade)। **নেগাপট্টিনম** কাবেরীর ব-দ্বীপের প্রধান বন্দর এবং মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। চীনাবাদাম, চাউল, তামাক প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। **ধনুষ্কোডি** পক প্রণালীতে পামবান দ্বীপের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং দক্ষিণ রেলপথের প্রান্ত-স্টেশন। ইহা সিংহলের নিকটতম বন্দর। তাই, সিংহলগামী অধিকাংশ যাত্রী এই বন্দরটি ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া, এখানে বাণিজ্যও যথেষ্ট চলে। মাছ ও বস্ত্র সিংহলে রপ্তানি এবং নারিকেল ও উহার তৈল ঐ দেশ হইতে আমদানি হয়।

তুতিকোরিণ দক্ষিণ-ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। মধুরাই-অঞ্চলের ইহা প্রধান বন্দর। সিংহলের সহিত ইহার বিশেষভাবে বাণিজ্য চলে। ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, দারুচিনি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। দক্ষিণ-রেলপথের মিটারগেজের প্রধান শাখা ইহার সহিত সংযুক্ত। **আলেপ্পি** কেরলের অন্যতম বন্দর এবং কোচিনের ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নারিকেল ও উহার শুষ্ক শাঁস (Copra), ছোবড়া, দারুচিনি, আদা ও গোলমরিচ ইহার রপ্তানি দ্রব্য। **কুইলন** ঐ রাজ্যের আর একটি প্রধান বন্দর ও মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। এই স্থান হইতে নবনির্মিত মিটারগেজ রেলপথ কোচিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আলেপ্পির মত ইহার রপ্তানি দ্রব্য। **কজিকোড** (কালিকট) কেরল-রাজ্যে কোচিনের ১০০ মাইল উত্তর অবস্থিত। নারিকেল, নারিকেল-তৈল, ছোবড়া, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, কফি, চা, আদা, গোলমরিচ, চীনাবাদাম ইহার রপ্তানি দ্রব্য। ব্রডগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। **তেল্লীচেরী** কেরলের কজিকোডের ৫৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ব্রডগেজ রেলপথ এই বন্দরকে অতিক্রম করিয়াছে। দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময়েও এই বন্দরটি কার্যকরী থাকে। কজিকোডের অনুরূপ ইহার রপ্তানি দ্রব্য। **ম্যাঙ্গালোর** মহীশূর রাজ্যে ব্রডগেজ রেলপথের প্রান্ত-স্টেশন। মহীশূর রাজ্যের মালভূমি-অংশের হাসান শহরের সহিত ইহা পাকা-রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। গোলমরিচ, চা, কফি, চন্দনকাঠ, মাছের সার (fish manure) ও টালি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। মালাবার উপকূলের অধিকাংশ বন্দরই লেগুন-সংযোগকারী খালের দ্বারা যুক্ত ; আর, উল্লিখিত প্রত্যেক বন্দরই দক্ষিণ-রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত।

বৈটকুল মহীশূর-রাজ্যের জগ্-জলপ্রপাত হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ জলপ্রপাতের জলশক্তি হইতে ১'২ লক্ষ কি. ও. তড়িৎশক্তি পাওয়া যায়। তাই এখানে বিবিধ শিল্প স্থাপিত হইতে পারে। ইহার পশ্চাৎভূমি মহীশূর-রাজ্যের শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এই বন্দর রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত নহে; পশ্চাৎভূমির সহিত রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত হইলে ইহা একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হইতে পারে। **কারওয়ার** ঐ রাজ্যে ভাটকলের কিছু উত্তরে কালী নদীর মোহনায় অবস্থিত। এইজন্য ইহার পোতাশ্রয় ঝড়-ঝাপটা হইতে রক্ষা পায়। ইহা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত নহে। মশলা ও চন্দনকাঠ ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। **মালপে** একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয়ের সম্মুখে ছোট-ছোট দ্বীপ রহিয়াছে এবং ঐগুলি ঝড়-ঝাপটা হইতে পোতাশ্রয়কে রক্ষা করে। ইহা বর্তমানে পশ্চিম-উপকূলের মাছ ধরার প্রধান বন্দর (Fishing Centre)।

ভবনগর কাঠিয়াবারের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের বন্দর। ইহা কাম্বে উপসাগরের উপকূলে আমেদাবাদ হইতে ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র অগভীর বলিয়া বন্দর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে জাহাজ থামিয়া নৌকায় মালপত্র নামান-উঠান হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ-শিল্পের গবেষণা-কেন্দ্র আছে। পশ্চিম রেলপথের মিটারগেজের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। **পোরবন্দর** এই অঞ্চলের আর একটি বন্দর। এখানে সিমেন্টের কারখানা আছে। **ওখা** কাঠিয়াবার উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি আধুনিক বন্দর। বড় বড় জাহাজ এই বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। তৈলবীজ, লবণ, জিপসাম, তুলা প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। **বেদিবন্দর** কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত এবং নবনগরের বন্দর। **ভেরাবল** বিখ্যাত সোমনাথের নিকট অবস্থিত। পিয়াজ ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। **মাণ্ডভি** কচ্ছের বন্দর।

প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রধান নগর

প্রাচীনকালে নদীর তীরে কিংবা তীর্থস্থানে বা সুরক্ষিত স্থানে শহরগুলি গড়িয়া উঠিত; কারণ সে-যুগে জলপথই যাতায়াতের সুবিধা ছিল, আর সুরক্ষিত

স্থানে লোকেরা নিরাপদে বসবাস করিতে পারিত। আবার, দেশের রাজধানী-গুলিও এক একটি প্রসিদ্ধ শহরে পরিণত হইত। বর্তমানে একাধিক রেলপথ

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
প্রধান নগর সমূহ

কিংবা রাস্তা বা জলপথের মিলনস্থলে অথবা বন্দরে বাণিজ্য ও শিল্প গড়িয়া

উঠিবার অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় এই সকল স্থান এক একটি শহরে পরিণত হয়। যে-স্থানে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হয় বা যে স্থান খনি-অঞ্চলের কেন্দ্র তথায় নগণ্য স্থানও প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হয়। নিম্নে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রধান শহরের পরিচয় এবং উহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবার হেতু বর্ণনা করা হইল।

দিল্লী—উত্তর-ভারতের কেন্দ্রস্থলে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলিয়া হিন্দু, পাঠান, মুঘল ও ইংরাজদের রাজত্বকালে ইহা সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল। এইখানে সে-যুগের বহু কীর্তি-চিহ্ন বর্তমান। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পর ইহাকে আর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক কেন্দ্রস্থল বলা যায় না; তবুও ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ও দিল্লী টেরিটরির রাজধানী। দিল্লী ভারতের প্রসিদ্ধ রেলপথ ও রাস্তার কেন্দ্র। তাই, ইহা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর তৈলবীজ, গম প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বস্ত্র, তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য, ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুতের কল-কারখানা রহিয়াছে। হাতীর দাঁতের কাজ, সোনা-রূপার জরির ও পাতের কাজ ইহার উল্লেখযোগ্য কুটির-শিল্প। বর্তমানে বহু উদ্বাস্তু দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাস করিয়া ছোট-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে। ইহার উপকণ্ঠে পালাম নামক স্থানে আন্তর্জাতিক বিমান-স্টেশন রহিয়াছে। আর, দিল্লী উত্তর-রেলপথের প্রধান কেন্দ্র।

পাঞ্জাব—অমৃতসর পাঞ্জাবের বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সীমান্তের নিকট অবস্থিত বলিয়া ইহা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইহা শিখদের তীর্থস্থান ও এখানে তাহাদের স্বর্ণ-মন্দির আছে। ইহা পশমশিল্পের কেন্দ্র, কারণ পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। আর, গম, তৈলবীজ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **চণ্ডীগড়** আম্বালার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা পাঞ্জাবের রাজধানী। ইহা নূতন শহর। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও উদ্যানযুক্ত এই নগরটির গঠন- ও স্থাপন-কৌশল বিশিষ্ট

প্রকৃতির। **জলন্ধর** শস্য-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে খেলার যাবতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। **লুধিয়ানার** রেশম-, পশম- ও কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল—শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী ও প্রধান নগর। কাশ্মীর-উপত্যকায় বিতস্তা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। এই উপত্যকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি, পাইনগাছের শ্যামল বনভূমি, ফল-ফুলের বিচিত্র শোভা, নদী ও হ্রদের সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এত মনোরম যে, ইহাকে ভূ স্বর্গ বলা হয়। এইজন্য বহু বিদেশী এখানে বেড়াইতে আসেন। ইহার শাল, 'নামদা' নামক কম্বল, পট্টু নামক পশমী বস্ত্র এবং রেশমী বস্ত্র, কাঠের উপর সূক্ষ্ম কাজ প্রভৃতি কুটীর-শিল্প প্রসিদ্ধ। ইহাছাড়া, ইহা ফলের বাণিজ্যকেন্দ্র। **সিমলা** হিমাচলপ্রদেশের রাজধানী। ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০০০ ফুট। আর, ইহা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাস। **দার্জিলিং** পশ্চিমবঙ্গে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এবং বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। ইহা এই রাজ্যের রাজ্যপালের গ্রীষ্মনিবাস। এখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং টাইগার হিল হইতে এভারেস্টের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। ইহা দেখিবার জন্য বহু বিদেশী পর্যটক এখানে বেড়াইতে আসেন। দার্জিলিং জেলা চা-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **মুসৌরী** ও **নাইনিতাল** উত্তরপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যনিবাস।

উত্তরপ্রদেশের—আগ্রা যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে একাধিক রেলপথের সংযোগস্থলে (পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব রেলপথ) অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশে বহু গবাদি-পশুপালিত হয় এবং তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে চামড়া ও কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। এইস্থানে মর্মর প্রস্তরের দ্রব্য, বাসন, কার্পেট, খেলনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কুটীর-শিল্প। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল ও দুর্গ ইহার দ্রষ্টব্য বস্তু। **আলিগড়ে** তালা, কাঁচি, ছুরি প্রস্তুত হয়। এখানে ঘি, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় ও ঐগুলি প্রচুর রপ্তানি হয়। ইহার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। **মিরাট** দোয়াবের সেচখাল অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **বেরিলি** কাঠ বা অন্যান্য বনজাত দ্রব্যের ব্যবসার স্থান। এখানে কৃত্রিম-রবার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা

হইয়াছে। **হরিদ্বার** শিবালিক পর্বতের উপত্যকায় ও গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহার কিছু দক্ষিণে গঙ্গার উচ্চ অংশের খাল (Upper Ganges Canal) নির্গত হইয়াছে। **কানপুর** রেলপথ ও রাস্তার কেন্দ্রে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা রাজ্যের সর্বপ্রধান বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা চামড়া, কার্পাস, পশম, চিনি, তৈল প্রভৃতি শিল্পের জন্য বিখ্যাত; কারণ এই দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিবার কাঁচামালগুলি এই রাজ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে সামরিক বিভাগের কারখানা (Ordance Factory) রহিয়াছে। **লক্ষ্ণৌ** এই রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহার রাজধানী ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান। মুসলমান যুগে ইহা অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই যুগের বহু চমৎকার ইমারত এখানে আছে। মাটির খেলনা, হাতীর দাঁতের ও কাঠের সুন্দর সুন্দর কারুশিল্প ইহার কুটির-শিল্প। **এলাহাবাদ** গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আর, ময়দা-, চিনি-, তৈল-শিল্প রহিয়াছে। ইহার উপকণ্ঠস্থ নাইনিতে কয়েকটি কল-কারখানা আছে। এখান হইতে আম ও পিয়ারা রপ্তানি হয়। ইহা একটি বিশিষ্ট রেলপথের কেন্দ্র। ইহার কৃষি ও পশু গবেষণা-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। **বারাণসী** গঙ্গা নদীর তীরস্থ নগর ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান এবং এখানে তৈল ও ময়দার কল আছে। ইহার রেশম- ও বাসন-শিল্প বিখ্যাত। তাহা ছাড়া, বিবিধ প্রকার খেলনা প্রস্তুত হয়। এখানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এখান হইতে প্রচুর আম ও পেয়ারা রপ্তানি হয়। **মির্জাপুর** কলিকাতা-দিল্লী প্রধান রেলপথের উপর ও গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কার্পেট ছবি, মাটির ও পাথরের জিনিস, বাসন প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। **গোরক্ষপুর** উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু-উৎপাদন-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই, ইহার চিনি-শিল্প উল্লেখযোগ্য। **দেরাদুন** হরিদ্বারের উত্তরে দুন-উপত্যকায় অবস্থিত। এখানে ভারত-সরকারের কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে,—জরিপ-বিভাগের প্রধান-কেন্দ্র, বন-বিভাগের গবেষণা-কেন্দ্র ও সামরিক বিদ্যালয়।

বিহার—পাটনা গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা বিহার রাজ্যের রাজধানী ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখান হইতে প্রচুর লঙ্কা রপ্তানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **রাঁচি** ছোটনাগপুর-মালভূমিতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান। তাহার উপকণ্ঠে লাক্ষা-গবেষণাকেন্দ্র ও রেশমকীট-প্রতিপালন কেন্দ্র আছে। আর, ইহার নিকটে বড় বড় যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইবে। **জামসেদপুর** বা **টাটানগরে** লৌহ ও ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী ও নানা রকমের যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা রহিয়াছে। এইগুলি এখানে স্থাপিত হইবার কারণ, ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর আকরিক লৌহ, চূণাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং ঝরিয়ার কয়লার খনি-অঞ্চল প্রায় ১১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। **ডালমিয়ানগর** শোণ নদের তীরে অবস্থিত। শোণ নদের সেচখাল-অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয় বলিয়া চিনির কল; নিকটস্থ কাইমুর পাহাড়ে চূণাপাথর ও ডালটনগঞ্জ-অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া সিমেণ্ট; এবং কাইমুর পাহাড়-অঞ্চলে বাঁশ ও সাবই ঘাস উৎপন্ন হয় বলিয়া কাগজের কল এখানে স্থাপিত হইয়াছে। শোণের খাল হইতে প্রচুর জল-সরবরাহ, ডি. ভি. সি. হইতে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং জলপথ, (শোণের নাব্য খাল) রাস্তা ও রেলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা ইত্যাদি অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় ইহা বিহারের প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ—দার্জিলিং ও কলিকাতার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। **আসানসোল** রাণীগঞ্জ-কয়লাখনি-অঞ্চলের প্রধান নগর। ইহা রেলপথের কেন্দ্র। ইহার নিকটে বহু কল-কারখানা আছে। তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত (বার্ণপুর), এ্যালুমিনিয়াম, বাইসাইকেল, কাচ, বস্ত্র ও মৃৎশিল্প প্রসিদ্ধ। **চিত্তরঞ্জন** রাণীগঞ্জ-কয়লাখনি-অঞ্চলের নিকটে বিহারের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের বিরাট কারখানা রহিয়াছে। বর্ধমান জেলায় সেচখাল থাকায় প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। তাই, **বর্ধমান** শহরে অনেকগুলি চাউলের কল আছে। এখান হইতে প্রচুর ধান ও চাউল রপ্তানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত

হইবে। **দুর্গাপুরে** লৌহ ও ইস্পাত, কোলগ্যাস ও কোক্, তাপবিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানায় ১০ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী হইবে। **বোলপুর** বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এই জেলায় ময়ূরাক্ষীর সেচখাল থাকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ইহা রাস্তার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ধান ও চাউলের বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে। ইহার নিকটে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। **শিলিগুড়ি** হিমালয়ের পাদদেশে রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কাঠ, চা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি এখান হইতে রপ্তানি হয়।

আসাম—শিলং খাসি-পাহাড়ে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা স্বাস্থ্যকর নগর ও আসামের রাজধানী। গৌহাটির সহিত পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। **গৌহাটি** ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ইহা আসামের বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত পাণ্ডুতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের প্রধান অফিস রহিয়াছে। আর, ইহার নিকটে তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। **ডিব্রুগড়** উত্তর-পূর্ব আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত নদী-বন্দর। ইহা এই অঞ্চলের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে চা ও কাঠ রপ্তানি হয়। **শিলচর** সুর্মা-উপত্যকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এইস্থান পর্যন্ত বরাক নদীতে স্টীমার যাতায়াত করে। এখান হইতে চা ও কাঠ রপ্তানি হয়। **মার্ঘেরিটা** উত্তর-পূব আসামে অবস্থিত। এখানে কাঠ ও প্লাইউড্-এর কারখানা, কয়লার খনি, ইট তৈয়ারীর কারখানা ও চা-বাগান আছে।

উড়িষ্যা—কটক মহানদীর ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে ও উহার দুইটি শাখানদীর মধ্যস্থ ভূ-খণ্ডে অবস্থিত। ইহা এই রাজ্যের পূর্বতন রাজধানী এবং বৃহত্তম নগর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বস্ত্র, খেলনা, চুড়ি প্রভৃতি কুটীর-শিল্প ও কাঠের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। **ভুবনেশ্বর** এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা তীর্থস্থান। এখানে বিমান-স্টেশন আছে। যে অংশে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নবনির্মিত ও সুন্দর নগর। **পুরী** সমুদ্র-তীরস্থ, স্বাস্থ্যকর

নগর ও তীর্থস্থান। এখানে জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। খেলনা, বাসন, সোনা-রূপার গয়না প্রভৃতি ইহার কুটীর-শিল্প। **সম্বলপুর** মহানদীর তীরে অবস্থিত। ইহার কিছু দূরে হীরাকুদ-বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের নিকট এ্যালুমিনিয়াম-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে কাঠের বাণিজ্য চলে। **রৌরকেলার** নিকট আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট ও চূণাপাথর পাওয়া যায়। শঙ্ক নদী হইতে প্রচুর জল-সরবরাহের সুবিধা আছে। ঝরিয়া ও বোকারো হইতে কয়লা আনিয়া এখানে ১০ ল. ট. লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী হইবে। তাই, রৌরকেলায় লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

মধ্যপ্রদেশ—ইন্দোর এই রাজ্যের বৃহত্তম নগর ও কার্পাস শিল্পকেন্দ্র, এবং বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **জব্বলপুর** এই রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্যপ্রধান নগর। এখানে কাপড়ের ও ময়দার কল, সামরিক বিভাগের কারখানা (Gun carriage factory) ও টালির কারখানা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **গোয়ালিয়র** বাণিজ্য ও-শিল্পপ্রধান নগর। ইহার বস্ত্র-, চর্ম, মৃৎ-শিল্প উল্লেখযোগ্য। **ভুপাল** এই রাজ্যের রাজধানী ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে বৈদ্যুতিক বড় বড় যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। **ভিলাই** ছত্তিশগড় সমভূমিতে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দাল্লি রাজহারা নামক স্থানে প্রচুর আকরিক লৌহ এবং পূর্বে কোরবায় কয়লাখনি রহিয়াছে; আর, জল-সরবরাহের সুবিধা আছে বলিয়া এখানে ১০ লক্ষ টন লৌহ-ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

রাজস্থান—জয়পুর এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা একটি সুন্দর শহর। ইহা পাথর-শিল্প ও ধাতুনির্মিত দ্রব্যের উপর মীনাকরা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **আজমীঢ়** মুসলমানদের তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকটস্থ **পুষ্কর** হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে রেলওয়ে কারখানা আছে। ইহার নিকটে অভ্রের খনি আছে। **উদয়পুর** এই রাজ্যের একটি সুন্দর শহর। ইহার নিকটে ছোট-ছোট সুন্দর হ্রদ ও উহার পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ রহিয়াছে। এইজন্য বিদেশী বহু পর্যটক বেড়াইতে

আসেন। ইহা কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। **যোধপুর** মরুভূমির পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে বড় দুর্গ ও বিমান-স্টেশন আছে।

বোম্বাই—আহমদাবাদ এই রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্র। গুজরাট-অঞ্চলে উৎকৃষ্ট তূলা উৎপন্ন হয়, তাই ইহা ভারতের দ্বিতীয় প্রধান বয়ন-শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম-রেলপথের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই দুই মাপের রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত থাকায় ইহার বাণিজ্যের সুবিধা আছে। **নাগপুর** ভারতের প্রসিদ্ধ রেলপথ ও বিমান-পথের কেন্দ্র। ইহা বিদর্ভ-অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাছাড়া, কাচ ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। প্রচুর কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানিজ এখান হইতে রপ্তানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। **পুণা** দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উপর ভোরঘাট গিরিপথের প্রবেশমুখে অবস্থিত। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকট সামরিক বিভাগের একটি বড় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। পুণায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে,—আবহাওয়া-বিভাগের প্রধান কার্যালয়, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক গবেষণালয় ও নদী-গবেষণাকেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। **নাসিক** দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উপর অবস্থিত একটি হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। ইহার পিতল-কাঁসার বাসনশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে ভারত-সরকারের স্ট্যাম্প ও নোট্ ছাপান হয়। **বরোদা** গুজ-রাটের প্রসিদ্ধ শহর। ইহার বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

অন্ধ্র প্রদেশ—হায়দরাবাদ মালভূমির উপর রেলপথের কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান নগর ও এই রাজ্যের রাজধানী। ইহার তূলার বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহার উপকণ্ঠে সেকেন্দ্রাবাদ ও বোলারামে বিরাট সৈন্যনিবাস রহিয়াছে।

মহীশূর—বাঙ্গালোর মালভূমির উপর রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এইজন্য ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। শিবসুন্দরম্, সিমোগা ও জগ-জলপ্রপাত হইতে

উৎপন্ন প্রচুর তড়িৎশক্তি এখানে সরবরাহ করা হয় বলিয়া নানা প্রকারের কল-কারখানা এখানে স্থাপিত হইয়াছে ; যথা—রেশমী, পশমী ও কার্পাস-বস্ত্র ; তৈল, সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা। বর্তমানে এখানে বিমান, রেলগাড়ী, যন্ত্রপাতি, টেলিফোনের যন্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাছাড়া, বিবিধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে,—দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, কৃষি ও কারিগরী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ইহা এই রাজ্যের শাসনকেন্দ্র। তাই, ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপ্রধান নগর। **মহীশূর** এই রাজ্যের সুন্দর নগর। ইহার নিকটস্থ 'শ্রীবৃন্দাবন' নামক উদ্যানটি দ্রষ্টব্য বস্তু। **ভদ্রাবতী** পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত শিল্পপ্রধান নগর। জগ-জলপ্রপাত হইতে সুলভে প্রচুর তড়িৎ-শক্তি এখানে সরবরাহ করা হয় বলিয়া এখানে লৌহ-ইস্পাত, কাগজ ও সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নিকটস্থ সিমোগাতে দিয়াশলাই-এর কারখানা আছে।

মাদ্রাজ—মধুরাই হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। দক্ষিণ-ভারতে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয় এবং মেটুর, পিকরা, পাপনাশম্ প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি এখানে সরবরাহের ব্যবস্থা আছে (কারণ মাদ্রাজ রাজ্যের তড়িৎশক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি পরস্পর তড়িৎবাহী তারের দ্বারা সংযুক্ত)। এইজন্য ইহা বস্ত্রবয়ন-শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে **কইম্বাটুর** অবস্থিত। উল্লিখিত অনুকূল অবস্থা এখানে বর্তমান থাকায় ইহা ভারতের তৃতীয় প্রধান বয়নশিল্প-কেন্দ্র ; এখানে সিমেণ্ট তৈয়ারীর কারখানাও আছে। ইহার ইক্ষু-গবেষণাকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া, ইহা তুলার বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **তিরুচিরাপল্লী** প্রসিদ্ধ নগর ও রেলপথের কেন্দ্র। এখানে রেলওয়ের বড় কারখানা আছে। ইহার কার্পাস-বয়ন, চুরুট-শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা চাউলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। তিরুচিরাপল্লী হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র। ইহার মন্দির ও ইহার নিকটস্থ কাবেরী নদীর মধ্যস্থ দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গম-মন্দির দেখিতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। **উটকামণ্ড** নীলগিরি পর্বতের উপর প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বিখ্যাত

শৈলনিবাস ও স্বাস্থ্যকর শহর। ইহা একটি ছোট মাপের রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। ইহার নিকট বহু চা-বাগান আছে।

কেরল—ত্রিবান্দ্রম এই রাজ্যের রাজধানী ও সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত। এইজন্য ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **অলওয়ে** (Alwye) শিল্পপ্রধান স্থান.—পল্লীবসলের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপন্ন তড়িৎশক্তির সাহায্যে এখানে এ্যালুমিনা (বক্সাইট নামক আকরিক হইতে এ্যালুমিনা পাওয়া যায়) হইতে এ্যালুমিনিয়াম-পিণ্ড (Ingot) প্রস্তুত হয়। ইহার নিকট রাসায়নিক সার ও রেয়ন (Rayon) তৈয়ারীর কারখানা আছে এবং বর্তমানে মোনা-জাইট-বালুকা হইতে মোনাজাইট-নিষ্কাশণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)

বহির্বাণিজ্য (External Trade)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৃষিপ্রধান দেশ; তাই, স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে এদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল, আর প্রধান আমদানি দ্রব্য শিল্পজাত দ্রব্য ছিল; কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে,—বর্তমানে এদেশের বহু অংশে বিবিধ পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে বলিয়া প্রচুর লৌহ-ইস্পাত ও অলোহ ধাতু নির্মিত দ্রব্য, বিবিধ ধাতু ও কলকব্জা; রেলওয়ের সাজ-সরঞ্জাম এমন কি প্রচুর পরিমাণে গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আমদানি এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইলেও কিছু কিছু শিল্পজাত বিশেষতঃ বস্ত্র রপ্তানি হইতেছে। ১৯৫৭ খৃঃ এদেশের বহির্বাণিজ্যের আমদানির পরিমাণ ১০২৫.৮২ কো. টা. এবং রপ্তানির পরিমাণ ৬৩৭.৭৪ কো. টা. হইয়াছিল; আর, মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৫৬৫ কো. টা. *। সুতরাং বহি-

* এইরূপ গড়মিল হইবার কারণ, পুনঃ রপ্তানি দ্রব্য (Re-export) এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

বাণিজ্যে ভারতের বিরাট ঘাটতি দেখা যায়। এইজন্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও আমদানির পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে।

রপ্তানি—মূল্য হিসাবে নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য (বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে)—চা (১২৩'৪); কার্পাস-বস্ত্র (৬৩'১৯); অন্যান্য বস্ত্র (৫৯'৯৮); বস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য বয়নশিল্পজাত দ্রব্য (৫৮'২৯); রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু (৩৭'৬৭); অলৌহ ধাতুর আকরিক (৩৫'৩৮); পাকা-চামড়া (২১'৫৮); কার্পাস-তূলা (১৮'৬৬); টাটকা ফল, বাদাম ইত্যাদি এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, এইরূপ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (১৪'৪); পশম (১২'৯৩); চিনি (১২'৮৮); আকরিক লৌহ (১১'৭৬); তামাক (১১'৫৯); উদ্ভিজ্জ তৈল (১১'৪২); খনিজ দ্রব্য (যেগুলিকে পরিশোধন বা রাসায়নিক পরিবর্তন করা হয় নাই—Crude Minerals—১১'৩০); সূতা (৯'৭৮); কার্পেট প্রভৃতি (৮'৮৪); কফি (৭'৭৩); কাঁচা চামড়া (৬'৯৯); পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (৬'৬২) এবং কয়লা ও কোক (৫'৩৪)।

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে রপ্তানি হইয়াছে, (বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে।)—বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র (১৬১'১১); মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র (১৩১'৩৯); জাপান (২৭'২১); অস্ট্রেলিয়া (২৪'৬৮); রাশিয়া (১৭'৪৮); সিংহল (১৬'৭৪); প. জার্মানি (১৬'০৯); কানাডা (১৩'৯২); ব্রহ্মদেশ (১৩'১৯); মিশর (১০'৯৯); ফ্রান্স (১০'১৮); আর্জেন্টিনা (৯'৮২); সুদান (৯'৭৩); সিঙ্গাপুর (৮'৯২); নেদারল্যাণ্ড (৮'৩৭); কেনিয়া (৭'৬৮); ইটালি (৭'৩); নাইজিরিয়া (৬'৯) ও পাকিস্তান (৬'৬৮)।

আমদানি—মূল্য হিসাবে নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি প্রধান আমদানি দ্রব্য (বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে।)—কলকব্জা (১৭১'৮৩); লৌহ-ইস্পাত (১৪৬'৯৮); পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (৭৭'৭৬); যানবাহন ও উহার সরঞ্জাম (৭৫'৮১); বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি (৬১'১৪); কার্পাস-তূলা (৪৮'৬২); গম (৩৪'৭৫); অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (২৯'৭);

রাসায়নিক দ্রব্য (২৯'১৮); ধাতু নির্মিত দ্রব্য (২২'৫৪); বস্ত্র (১৯'১৫); সামরিক দ্রব্য (১৮'৫৬); তাম্র (১৭'৯৪); চাউল (১৬'৯); ঔষধাদি (১৬'৩৯); ফল ইত্যাদি (১৫'৮৪); পশম (১২'৯৮); কাগজ (১২'৫৯); তৈলবীজ (১২'১৪); রঙ (১০'৮৯); এ্যালুমিনিয়াম (৮'০১); দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (৭'৯১); দস্তা (৭'২৩); পাট (৭'০০); অপরিশোধিত খনিজ পদার্থ (৬'৬৯) ও উদ্ভিজ্জ তৈল (৫'২১)।

নিম্নলিখিত দেশগুলি হইতে আমদানি হইয়াছে (বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে)—বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র (২৩৮'৫); মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (১৭০'৩২); পঃ জার্মানি (১২২'৮২); ইরান (৫৫'৪); জাপান (৫৪'৪২); ইটালি (৩০'৩৯); ফ্রান্স (২৮'৬৯) ; রাশিয়া (২২'৬৮) ; বেলজিয়াম (২১'৯৪); সুইজারল্যাণ্ড (১৭'৮১); অস্ট্রেলিয়া (১৬'৪১); মালয় (১৪'১৯) ; সৌদি আরব (১৪'০২); কানাডা (১৩'৫৮); পাকিস্তান (১৩'৪); ব্রহ্মদেশ (১৩'১৯); নেদারল্যাণ্ড (১২'৯৮); সিঙ্গাপুর (১২'৬৭); সুইডেন (১১'৯২); কুওয়েট (১১'৪); মিশর (১০'৬৮) ও কেনিয়া (৯'৩৫)।

তালিকাগুলি হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রধানতঃ বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে চলে,—প্রথমটি হইতে সমগ্র আমদানির ২৩'২% ও দ্বিতীয়টি হইতে ১৬'৬% হার এবং সমগ্র রপ্তানির প্রথমটি ২৫'১% ও দ্বিতীয়টি ২০'৬% গ্রহণ করে।

কয়েকটি প্রধান আমদানি পণ্যদ্রব্য ও ঐগুলি যে যে দেশ হইতে আমদানি হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) **ছোট-বড় যন্ত্রাদি ও লৌহ-ইস্পাত**—এই পণ্যদ্রব্যের মূল্য ৩৭৯'৯৫ কোটি টাকা। প্রধানতঃ বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানি, জাপান, কানাডা, বেলজিয়াম, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে এইগুলি আমদানি হয়।

(২) **পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য**—এই পণ্যদ্রব্যগুলির মূল্য ১০৭'৫১ কোটি টাকা। প্রধানতঃ ইরান, সৌদি আরব, কুওয়েট ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি হয়।

(৩) **খাদ্যশস্য, ডাল, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য**—ইহাদের মূল্য ৯৩ কোটি টাকার কিছু বেশী। প্রধানতঃ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া হইতে খাদ্যদ্রব্যগুলি আমদানি হয়।

(৪) **তাম্র, দস্তা ও এ্যালুমিনিয়াম**—ইহাদের মূল্য প্রায় ৩৯ কোটি টাকা। প্রধানতঃ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান হইতে আমদানি হয়।

(৫) **যানবাহনের সরঞ্জাম**—ইহার মূল্য ৭৫'৮১ কোটি টাকা। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হয়।

(৬) **রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ ও রঙ**—ইহাদের মূল্য প্রায় ৫৬'৪৩ কোটি টাকা। বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হয়।

(৭) **কার্পাস-তুলা**—ইহার মূল্য ৪৮'৬২ কোটি টাকা। প্রধানতঃ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কেনিয়া দেশ হইতে আমদানি হয়।

(৮) **বস্ত্র**—ইহার মূল্য ১৯'১৫ কোটি টাকা। বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইটালি, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদানি হয়।

বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য যে সকল দেশে রপ্তানি হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

(১) **চা**—মূল্য হিসাবে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়। উহার মূল্য ছিল ১২৩'৪ কোটি টাকা। বৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী চা রপ্তানি হয়। ইহাছাড়া, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর ও পঃ জার্মানিতে চা রপ্তানি হয়।

(২) **কার্পাস বস্ত্র**—এই পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিয়া ভারত ৬৫'১৯ কোটি টাকা পাইয়াছে। মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া ও বৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে ইহা রপ্তানি হইয়াছে। চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতার জন্য দঃ পূ এশিয়ায় বস্ত্র-রপ্তানি ক্রমশঃ কমিতেছে। ইহাছাড়া, ৯'৭৪ কো. টা. সূতা রপ্তানি হয়।

(৩) **রেশমী, পশমী ও রেয়নবস্ত্র, এবং পাটের চট ও বস্তা**—এই সকল পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিয়া এই দেশ ১১৮'২৭ টাকা পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যই প্রধান। প্রধানতঃ মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় পাটের জিনিসগুলি রপ্তানি হয়; ইহাছাড়া, আর্জেন্টীনা, মিশর, হংকং, কানাডা এবং কেনিয়ায় অল্প-বিস্তর রপ্তানি হয়।

(৪) **কার্পাস-তুলা**—জাপান, মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানিতে ১৮'৯৬ কোটি টাকার এই পণ্যদ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছে। বর্তমানে এ দেশে লম্বা ও মাঝারি আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশের কলগুলি ভারতীয় তুলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে বলিয়া তুলার আমদানি বা রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

(৫) **আকরিক লৌহ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ**—৬৩'৭৩ কোটি টাকার মূল্যের এই পণ্যদ্রব্যগুলি রপ্তানি হইয়াছে। মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পঃ জার্মানিতে অভ্র ও ম্যাঙ্গানিজ এবং আকরিক লৌহ জাপান, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়াছে; ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরে কয়লা রপ্তানি হইয়াছে।

(৬) **কাঁচা ও পাকা চামড়া**—ইহাদের মূল্য ছিল ২৮'৫৭ কোটি টাকা। প্রধানতঃ মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে এইগুলি রপ্তানি হইয়াছে।

(৭) **ফল, উদ্ভিজ্জ তৈল ও উদ্ভিজ্জজাত দ্রব্য**—ইহাদের মোট মূল্য ৪১'২৭ কোটি টাকা। মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিম-ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশে উদ্ভিজ্জ তৈল ও উদ্ভিজ্জজাত দ্রব্যগুলি এবং ফল ও সব্জি রপ্তানি হইয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। এইরূপ ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য বেসরকারী পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ সরকার মারফত ৪৯২'৯ কোটির টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানি হয়। তন্মধ্যে খাদ্যশস্য ১৫২'৬ কো. টা., সরকারী পরিকল্পনার দ্রব্য ৮৮ কো. টা., লৌহ-ইস্পাত ৫১'৬ কো. টা., রেলওয়ের মালমশলা

৪৯'৭ কো. টা. যোগসূত্রের জিনিসপত্র যথা—রেডিও, জাহাজ ইত্যাদি ২৩'৪, সার ও অন্যান্যদ্রব্য ১২৭'৬ কো. টা.।

আমদানি দ্রব্যগুলি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা যায়,—উন্নতিমূলক কার্যের জন্য এবং ভোগ্যপণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য। উন্নতিমূলক কার্যের জন্য, যেমন—(১) শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও শিল্পের জন্য অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ৩৬৪ কো. টা; (২) শিল্পের যন্ত্রাদি—(ক) সরকারী ১৬১'১ কো. টা. ও (খ) বেসরকারী ২০৪'৯ কো. টা, মোট ৩৬৬ কো. টা.। ভোগ্যপণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ১৫২'৬ কো. টাকা খাদ্য ও ১১৭'৮ কো. টা. অন্যান্য ভোগ্যপণ্যদ্রব্য এবং ১৭৪'৬ কো. টা, অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, মোট ৪৪৫ কো. টা।

স্থলপথে আমদানি ও রপ্তানি—স্থলপথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সহিত ভারতের কিছু কিছু বহির্বাণিজ্য চলে। পাকিস্তান ভিন্ন পার্শ্ববর্তী দেশগুলি হইতে ভারত সুউচ্চ পর্বতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং ঐ দেশগুলির সহিত এদেশ রেলপথ বা ভাল রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত নহে বলিয়া ইহার স্থলপথের বাণিজ্য বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে নাই। **নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত** সহিত স্থলপথেই বাণিজ্য হইয়া থাকে। পাকিস্তানের সহিত অধিকাংশ বাণিজ্য স্থলপথে চলে। নেপাল হইতে চাউল এবং কিছু কিছু পাট, তৈলবীজ, কাঠ; ভুটান ও তিব্বত হইতে সাধারণতঃ পশম, চামড়া, মোম, মৃগনাভি প্রভৃতি আমদানি হয়। বস্ত্র, সূতা, রঙ, লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, যন্ত্রাদি, লবণ, চিনি, তামাক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য দেশগুলিতে রপ্তানি হয়। সিকিম হইতে যথেষ্ট কমলালেবু আমদানি হয়। তিব্বতের সহিত বাণিজ্য কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে চলে, কারণ বাণিজ্যপথগুলি হিমালয়ের উচ্চ গিরিপথে অবস্থিত।

দেশের অন্তর্বাণিজ্য (Internal Trade)—**উপকূলের বাণিজ্য** (Coastal Trade)—সমুদ্র-উপকূলের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি জাহাজ ও দেশীয় নৌকার সাহায্যে চলে। ইহাকে উপকূলের বাণিজ্য বলে। সংখ্যাতত্ত্বের (Statistics) সুবিধার জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলকে নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(ক)

পশ্চিমবঙ্গ, (খ) উড়িষ্যা, (গ) অন্ধ্রপ্রদেশ সহ মাদ্রাজ (ঘ) কেরল, (ঙ) কোচিন-বন্দর (চ) বোম্বাই, (ছ) সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও ওখা-বন্দর। এক একটি অংশের বন্দরগুলির পরস্পর বাণিজ্যকে 'অন্তর্বাণিজ্য' এবং যে কোন দুইটি অংশের পরস্পর বাণিজ্যকে 'বহির্বাণিজ্য' বলা হয়। ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ উপকূলের মোট বাণিজ্য ৩৪৩ কো. টা. হয়; তন্মধ্যে আমদানি ১৮০ কো. টা. ও রপ্তানি ১৬৩ কো. টা.। আবার, ১৮০ কো. টা. মধ্যে ১৬৯ কো. টা. 'বহির্বাণিজ্য' ও ১০ কো. টা. 'অন্তর্বাণিজ্য' এবং ১৬৯ কো. টা মধ্যে ১৫৮ কো. টা. ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ও ১১ কো. টা. বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য।

দেশের অভ্যন্তরের স্থলপথের ও জলপথের বাণিজ্য (Inland Trade)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল আয়তন, বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্বাণিজ্য বহুগুণে অধিক। এদেশের বহু অংশে গোযান ও নৌকা প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বহন করে এবং উহার পরিমাণ বা মূল্য নির্ণয় করা সহজ নহে। এইজন্য ইহার পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ১৯৪০ খৃঃ জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি এই বাণিজ্যের পরিমাণ ৭০০০ কো. টা. বলিয়া অনুমান করেন। ঐ বৎসর বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫০০ কো. টা.। তবে, রেলপথ বা ষ্টীমারযোগে যেসব পণ্যদ্রব্য বাহিত হয়, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৬টি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

শিল্প (Industries)

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) কুটীর-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প। সাধারণতঃ কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি শিল্পীরা নিজের ঘরে বসিয়া পরিবারের লোকের সাহায্যে ছোট-বড় যন্ত্র দিয়া নানা রকমের জিনিস-পত্র তৈয়ারী করে। এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কুটীর-শিল্প বলে। বর্তমানে ইহাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। শিল্পী হয়ত বাহিরের শ্রমিক বা শিল্পীকে নিযুক্ত করে, তড়িৎ-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে, তবে ইহার শ্রমিক-সংখ্যা এই

ভাবে নির্দিষ্ট (২০ জনের কম) থাকে যে, এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কারখানা-আইনের বহির্ভূত। যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত থাকে এবং নানাবিধ ছোট-বড় যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়। আবার, যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়। যথা,—হাল্কা, মধ্যমা ও গুরু (Heavy Industry)। লৌহ-ইস্পাতের কারখানাগুলি গুরু শিল্প। আর, লৌহ-ইস্পাত দিয়া নানারূপ শিল্প গড়িয়া উঠে। এইজন্য গুরু শিল্প অন্য শিল্পের ভিত্তি-স্বরূপ। তাই, ইহাকে ভিত্তি বা মূল শিল্প (Basic Industry) বলা হয়।

কুটীর-শিল্প (Small-Scale and Cottage Industries)—প্রাচীনকাল হইতে ভারত কুটীর-শিল্পে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এদেশে বহু যন্ত্র-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও ভারতকে কুটীরশিল্পপ্রধান দেশ বলা যায়, কারণ প্রায় ২ কোটি লোক কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত আছে; এমন কি একমাত্র তাঁত-শিল্প (Hand Loom) ৫০ লক্ষ লোকের উপজীবিকা। তবে, যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। তবুও উৎকৃষ্টতার জন্য আজও ইহা স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর রহিয়াছে। বর্তমানে, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাৎসরিক পরিকল্পনায় ভারত-সরকার ও রাজ্য-সরকার বহু অর্থ-ব্যয় (৩৩'৪ কো. টা.+২০০ কো. টা.) করিয়া কুটীর-শিল্পের উন্নতির বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন.—শিল্পীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কুটীর-শিল্পে অর্থ সাহায্য দান, কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্যগুলির বিক্রয়-ব্যবস্থা, পৃথক পৃথক কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠান, নূতন নূতন ছোট-বড় যন্ত্রাদি ব্যবহার ও কার্য-প্রণালীর শিক্ষাদান ইত্যাদি। তাই, আশা করা যায় যে, পুনরায় কুটীর-শিল্পের উন্নতি হইবে।

তাঁত-শিল্প—কার্পাস, রেশম, পশম ও রেয়ন, এই চারিটি ভাগে তাঁত-শিল্পকে বিভক্ত করা যায়। তাঁত-শিল্পই সর্বপ্রধান ও ইহাতে সবচেয়ে বেশী লোক নিযুক্ত আছে। আর, কার্পাস-বস্ত্রই সবচেয়ে বেশী তৈয়ারী হয়। ভারতের প্রতি রাজ্যে তাঁত-শিল্প প্রচলিত থাকিলেও আসামে তাঁত-শিল্প এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে,—এখানকার স্ত্রীলোকদের অন্যতম প্রধান গুণ বয়নকার্যে অভিজ্ঞতা। ভারতের কয়েকটি স্থান উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের

শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের **কার্পাস-বস্ত্র** প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ; আসাম ; বিহারের ভাগলপুর ; উড়িষ্যার মাদ্রাজ ; উত্তরপ্রদেশের বারাণসী ; মহীশূর ও কাশ্মীরে **রেশমী কাপড়** তৈয়ারী হয়। ১৯৫৭ খৃঃ ভারতে রেশম উৎপন্ন হয় প্রায় ৩২ লক্ষ পা.। উহার অর্ধাংশ মহীশূর রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ইহাছাড়া, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও কাশ্মীরে রেশম উৎপন্ন হয়। কারণ, উক্ত স্থানসমূহে রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। পাঞ্জাবের অমৃতসর ও লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের রামপুর এবং কাশ্মীর **পশমী কাপড়ের** জন্য বিখ্যাত। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং কাশ্মীরে **কার্পেট** তৈয়ারী হয়।

বাসন-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী ও মুরাদাবাদ পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। **প্রস্তর-শিল্প**—বিহারের গয়া ও রাজস্থানের জয়পুরে পাথরের জিনিস তৈয়ারী হয়। **মৃৎ-শিল্প**—পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর, উত্তরপ্রদেশের চুণার প্রভৃতি স্থানে মাটির জিনিস প্রস্তুত হয়। তাহাছাড়া, এদেশের স্থানে স্থানে সোনা-রূপার গয়না, হাতীর দাঁতের জিনিস, চামড়ার জিনিস এবং নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি কারুশিল্পের প্রচলন আছে।

কারুশিল্প ভিন্ন নিম্নলিখিত শিল্পগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা—**খাদি-শিল্প**—১৯৫৭-৫৮ খৃঃ ৭·৭২ কো. টা. খাদি-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। **নারিকেলের ছোব্‌ড়া-শিল্প**—এদেশে প্রায় ১·২ লক্ষ টন ছোব্‌ড়ার দড়ি তৈয়ারী হয় ; তন্মধ্যে কেরলে উহার ৯০% পাওয়া যায়। আর, ঐ রাজ্যে ২৩ হাজার টন ছোব্‌ড়ার জিনিস তৈয়ারী হয়। বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টন ছোব্‌ড়ার দড়ি ও ২১ হাজার টন ছোব্‌ড়ার জিনিস বিদেশে রপ্তানি হয়। এই শিল্পের প্রধান গবেষণা-কেন্দ্র কেরল-রাজ্যের আলেপ্পির নিকটস্থ কলাভূর এবং শাখা গবেষণা-কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের উলুবেড়িয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। **অম্বর-চরকা**—ইহা একপ্রকার উন্নত চরকা। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ এই চরকার দ্বারা যে সূতা কাটা হয়, তাহা হইতে প্রায় ১১১·৫ লক্ষ বর্গগজ কাপড় বোনা হয়।

যন্ত্র-শিল্প—বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠিতে যে সকল উপাদান বর্তমান থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রকৃতি ভারতকে দান করিয়াছে। এদেশে বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রচুর কাঁচামাল, কলকারখানা চালাইবার জন্য কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা এবং যথেষ্ট শ্রমিক থাকায় বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

যে অঞ্চলে কয়লা বা বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সুবিধা আছে এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে এক এক প্রকারের শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বোম্বাই রাজ্যে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া তথায় বস্ত্র শিল্প, পূর্ব-ভারতে প্রচুর পাট জন্মায় বলিয়া কলিকাতা-শিল্পঅঞ্চলে পাটশিল্প, আর যে স্থানের নিকটে লৌহের আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চূণাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেইস্থানে, যেমন টাটানগরে লৌহ-ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯৫৬ খৃঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৭৬১০টি কারখানা ছিল এবং তন্মধ্যে ৭,৪২৪টির অর্থাৎ মোট কারখানার ৯৪% অংশের মূলধন ১,০০৪ কো. টা.। এই কারখানাগুলিতে নিযুক্ত ছিল ১৯ লক্ষ লোক। আর, এইগুলিতে ২,৩১৪ কো. টা. মূল্যের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল. এদেশের কারখানাগুলির মধ্যে কতকগুলি সরকারী এবং বাকিগুলি বেসরকারী কারখানা। বিভিন্ন শিল্প-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উল্লেখ করা হইবে। নিম্নে প্রধান প্রধান শিল্পের পরিচয় ও আলোচনা করা হইল।

কার্পাস-বয়নশিল্প—এই শিল্পে পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আর, এই শিল্প এদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। এত অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয় যে, দেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশেও প্রচুর বস্ত্র রপ্তানি হয়। এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান নিম্ন বলিয়া (বৎসরে মাথা পিছু ১৮ গজ বস্ত্র) দেশের বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও বস্ত্র রপ্তানি করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ বৎসর বৎসর কমিতেছে ; ইহার কারণ বিদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে জাপান ও চীনের প্রস্তুত

বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এইজন্য ভারতে বস্ত্র-শিল্পে উন্নতিসাধন করা হইতেছে,—নূতন ধরণের কলের তাঁত বসান হইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৫৯ খৃঃ প্রারম্ভে) ৫৫৩ কাপড়ের কল (১৮৮টিতে কেবলমাত্র সূতা তৈয়ারী হয় ও ৩৬৫টি সূতা ও বস্ত্র, উভয়ই তৈয়ারী হয়) আছে। এই শিল্পে ২৮৫ কো. টা. মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে এবং ৭.৮২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ১৯৫৭ খৃঃ ১৬,৮০০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা এবং ৪৯,২৭০ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আসাম ভিন্ন এই দেশের প্রতি রাজ্যে কাপড়ের কল আছে। তন্মধ্যে বোম্বাই-এ ২১১টি, মাদ্রাজে ৯৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি, উত্তরপ্রদেশে ২৯টি, মধ্যপ্রদেশে ১৮টি, বিহারে ৩টি, উড়িষ্যায় ১টি এবং অবশিষ্ট রাজ্যের প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ ১০টি কল রহিয়াছে।

বোম্বাই-রাজ্যে ভারতের প্রায় অর্ধেক কাপড়ের কল আছে; তাই এই রাজ্য বস্ত্র-শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বোম্বাই-শহর ও উহার উপকণ্ঠে ৬৫টি, আমেদাবাদে ৭৪টি ও অন্যান্য স্থানে ৭০টি কাপড়ের কল আছে। এই রাজ্যের শোলাপুর, সুরাট, বরদা, ভবনগর, নাগপুর প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র। বোম্বাই-শহর ও উহার আশেপাশে এত অধিক সংখ্যক কল স্থাপনহেতু,—(ক) বোম্বাই-রাজ্যে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় এবং এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা সুগঠিত; (খ) বোম্বাই শহরের জলবায়ু আর্দ্র, ঐরূপ জলবায়ু সূতাকাটার অনুকূল, শুষ্ক জলবায়ুতে সূতা সহজে ছিঁড়িয়া যায়; (গ) ভারতের বন্দরগুলির মধ্যে ইহা ইউরোপের নিকটতম বন্দর বলিয়া বয়নশিল্পের কলকব্জা ও লম্বা আঁশের সূতা আমদানি করিতে খরচ কম হয়; (ঘ) পশ্চিমঘাট পর্বতঅঞ্চলে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে বলিয়া তড়িৎশক্তির দ্বারা কলকারখানা চালাইবার সুবিধা আছে; আর, (ঙ) এই অঞ্চলে মূলধন-সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। আমেদাবাদে ভারতের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্র-শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ, গুজরাট-অঞ্চলে প্রচুর মাঝারি ও ছোট-আঁশের তুলা জন্মায় এবং কাঠিয়াবাড়ের ছোট ছোট বন্দরগুলি দিয়া লম্বা-আঁশের তুলা ও কলকব্জা আমদানি করা সুবিধা; তাহা ছাড়া, আমেদাবাদ রাস্তার ও রেলপথের

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; আর, গুজরাটীরা কর্মদক্ষ ও উৎসাহী বণিক্, এবং এই অঞ্চলে মূলধন-সংগ্রহের সুযোগ রহিয়াছে।

জলসেচ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে মাঝারি ও লম্বা আঁশের যথেষ্ট কার্পাস-তূলা উৎপাদন করা হয়। এই অঞ্চলের পিকারা, মেটুর, ময়ার, শিবসমুদ্রম্, জগ, পাপনাশম্ প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপন্ন তড়িৎশক্তির দ্বারা কলকারখানাগুলি চালাইবার সুবিধা আছে। এইজন্য এই অঞ্চলে ছোট-বড় অনেকগুলি বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—কইম্বাটুর, মধুরাই, মাদ্রাজ, তুতিকোরিণ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি। কইম্বাটুর ভারতের তৃতীয় বয়নশিল্প-কেন্দ্র, এখানে ৪০টি কাপড়ের কল রহিয়াছে।

উত্তরপ্রদেশের কানপুর প্রধান বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র। এখানে ১৭টি কাপড়ের কল আছে। এই রাজ্যে পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত ও বস্ত্রের চাহিদাও যথেষ্ট—এই দুইটি বস্ত্রশিল্পের অনুকূল পরিবেশ। পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি কাপড়ের কল আছে। কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশ হইতে কলকব্জা, রঙ্, লম্বা আঁশের তূলা আমদানির সুবিধা রহিয়াছে। আর, কয়লা-খনিগুলিও নিকটেই অবস্থিত এবং এই রাজ্যে বস্ত্রের চাহিদাও যথেষ্ট,—এইগুলি বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিবার হেতু বলা যাইতে পারে।

রেশম-বয়নশিল্প—কুটীর-শিল্প প্রসঙ্গে রেশম বয়নশিল্পের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

রেয়ন বা কৃত্রিম রেশমশিল্প—কাষ্ঠ-মণ্ড বা উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হইতে রেয়ন (Rayon) বা কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হয়। বোম্বাই-এর কল্যাণ, কেরলের রেয়ন-পুরম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সিরপুরে রেয়ন প্রস্তুত হয়। এই তিনটি কারখানার উৎপন্ন রেয়ন ভারতের ৩৫% চাহিদা মিটাইতে পারে। ১৯৫৬ খৃঃ প্রায় ১৬ হাজার টন রেয়ন এদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল।

পশম-বয়নশিল্প—এদেশে কুটীর-শিল্প হিসাবে ও যন্ত্রশিল্প হিসাবে, এই দুইভাবে পশমী বস্ত্র তৈয়ারী হয়। কাশ্মীরের শাল প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যে বিবিধ পশমী বস্ত্র কুটীর-শিল্প হিসাবে প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের

কানপুর, বোম্বাই-এর জামনগর, আমেদাবাদ ও বোম্বাই-শহর এবং মহীশূরের ব্যাঙ্গালোরে পশমী বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে শ্রীনগর, কুলু, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থান এবং আগ্রা, মির্জাপুর, বিকানীর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে তাঁতে কুটির-শিল্প হিসাবে পশমী বস্ত্র বয়ন করা হয়। এদেশে ৫৪০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে ৩৩৭ লক্ষ পাঃ রপ্তানি হয়। আবার, প্রায় ৯৬ লক্ষ পা. পশম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। ১৯৫৬ খৃঃ এদেশে প্রায় ৪৮০ লক্ষ গজ পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, উটের লোম, ছাগলোম হইতে রাজস্থানে বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পাট-শিল্প—বয়নশিল্পের মধ্যে কার্পাস শিল্পের পর পাট-শিল্পের স্থান। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৪ খৃঃ ১১২টি পাটের কল ছিল। উহাতে ২৭১,৪১৫ জন লোক নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৭ খৃঃ ১০,৩০,০০০ পাট-নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতের অধিকাংশ (প্রায় ৮৪টি) পাটকল কলিকাতা শিল্প-অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার হেতু,—(১) কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানি ও পাট-নির্মিত দ্রব্যগুলি রপ্তানি করিবার সুবিধা আছে। (২) উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যায় প্রচুর উৎপন্ন পাট জন্মায়। (৩) এই অঞ্চলের উৎপন্ন পাট সুলভে কলিকাতায় আনয়ন করা যায়। (৪) রাণীগঞ্জের কয়লার খনি নিকটেই অবস্থিত বলিয়া কয়লাও সুলভে পাওয়া যায়।

বর্তমানে চট বা বস্তার পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যের প্রস্তুত প্যাকিং জিনিসের দ্বারা মালপত্র পাঠান হয়; আবার কোন কোন দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় বস্তায় শস্য না রাখিয়া শস্য বহন করিবার অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিদেশেও পাটকল স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে পাট-শিল্প ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় পাটশিল্পের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার সময় ভারতের পাট-কলের প্রয়োজনীয় পাট ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইত না; সেজন্য পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রচুর পাট আমদানি করিতে হইত। বর্তমানে এদেশের চাহিদা

ভারতের উৎপন্ন পাট, মোটামুটিভাবে মিটাইতে পারে এবং অতি সামান্য পরিমাণে পাট পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আমদানি করিতে হয়।

চিনি-শিল্প—ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। ১৯৩২ খৃঃ পূর্বে ভারতে মাত্র ৩২টি চিনির কল ছিল; কিন্তু ১৯৩২-৩৩ খৃঃ চিনি-শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থার পর চিনি-শিল্পের দ্রুত উন্নতি লাভ হয়—উহার পর বৎসর এ দেশে দেখা যায় যে, ১১২টি চিনির কল রহিয়াছে। ১৯৫৬ খৃঃ এদেশের ১৪৩টি চিনির কলে ১৮ লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৫৮ খৃঃ ২০ লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে আরও কল স্থাপিত হইতেছে।

ভারতের অধিকাংশ চিনির কল গঙ্গা নদীর উপত্যকার মধ্যাংশে অবস্থিত,—উত্তরপ্রদেশে ৬৮টি এবং বিহারে ২৯টি চিনির কল রহিয়াছে। ইহার হেতু, এই অঞ্চল উর্বর সমভূমি, এখানে জলসেচের সুব্যবস্থা আছে এবং জলবায়ুও ইক্ষু-উৎপাদনের অনুকূল। ইহাছাড়া, বোম্বাই রাজ্যে ১৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০, মাদ্রাজে ৩, মধ্যপ্রদেশে ৪, পশ্চিমবঙ্গে ১টি চিনির কল আছে; আর পাঞ্জাব, মহীশূর ও উড়িষ্যা রাজ্যে অন্যগুলি রহিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির যে অংশে জলসেচ ব্যবস্থা আছে, তথায় এবং কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের বিঘা প্রতি ইক্ষু উৎপাদনের হার অধিক এবং জলবায়ুও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। এইজন্য দক্ষিণ-ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বৎসর উত্তর-ভারতের কলগুলি নিজেদের প্রয়োজনরূপ ইক্ষু সংগ্রহ করিতে পারে না, ফলে চিনি-উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। বর্তমান বৎসরে (১৯৫৯) ভারতে হইতে প্রায় ২ লক্ষ টন রপ্তানি হইয়াছে।

সিমেণ্ট-শিল্প—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৭ খৃঃ ৫৬ লক্ষ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ খৃঃ ১৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। সিমেণ্ট-শিল্পে বিহার রাজ্য অগ্রগণ্য। এই রাজ্যের জাপ্‌লা, খেলারি, চাইবাসা, সিন্ত্রি, ডালমিয়ানগর প্রভৃতি সিমেণ্ট-শিল্পকেন্দ্র। মধ্যপ্রদেশের ঝালওয়ারা ও সাতনা; গুজরাটের পোরবন্দর, দ্বারকা, সিকা ও সেভালিয়া;

মহীশূরের সাহাবাদ, ভদ্রাবতী ও বাগলকোট ; উত্তর প্রদেশের চুর্ক ; রাজস্থানের লাখেরি ও সাওয়ার মাধোপুর ; মাদ্রাজের মাধুকারাই, টিরুচি, টিরুনেলভেলি ও কইম্বাটুর ; অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা প্রভৃতি স্থানে সিমেণ্টের কারখানা আছে।

চুণাপাথর, কাদাপাথর (aluminous clay) এবং কয়লা ও সামান্য পরিমাণে জিপ্সাম,—এই কয়েকটি কাঁচামাল সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। ভারতে এই কাঁচামালগুলির অভাব নাই।

কাগজ-শিল্প—১৮৭০ খৃঃ কলিকাতার নিকটস্থ বালিতে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। এদেশে কাগজ-শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিলেও বর্তমানে এই শিল্প দেশের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৫৭ খৃঃ ভারতে ২১০ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। এখানে রাণীগঞ্জ, ত্রিবেণী, নৈহাটি ও টিটাগড়ে কাগজের কল আছে। বোম্বাই-এ ৮টি, (পুনা, আহমদাবাদ প্রভৃতি), অন্ধ্রপ্রদেশে ২টি (সিরপুর, রাজমুন্দ্রী) ; বিহারে ডালমিয়ানগর ; উড়িষ্যায় গাংপুর ও ব্রাজরাজনগর ; মহীশূরে ভদ্রাবতী ; কেরলে পুনালুর ; পাঞ্জাবে জগধারী ; উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ ও সাহারাণপুরে কাগজের কল আছে। প্রদেশে প্রধানতঃ বাঁশ ও সাবাই ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে খবরের কাগজ (News print) প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রতিদিন প্রায় ৮০ টন কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প—পৃথিবীর মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আকরিক লৌহ-সম্পদে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হইলেও লৌহ-ইস্পাত শিল্পে উন্নত নহে ; কারণ লৌহ গলাইবার উপযুক্ত কয়লা (coking coal) যথেষ্ট নাই এবং কয়লার খনিগুলি প্রধানতঃ দেশের এক অংশে রহিয়াছে। লৌহ-ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজন,—(ক) প্রচুর আকরিক লৌহ, (খ) কয়লা, (গ) চুণাপাথর ও ডলোমাইট, (ঘ) ম্যাঙ্গানিজ, (ঙ) প্রচুর জল-সরবরাহ, (চ) পরিবহন-ব্যবস্থা। ছোট নাগপুরের মালভূমি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই সকল অনুকূল অবস্থা

বর্তমান থাকায় এই অঞ্চলে লৌহ-ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বা হইতেছে।

বিহার রাজ্যের সিংভূম জেলার অন্তর্গত **টাটানগর** ভারতের বৃহত্তম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ-ইস্পাতের শিল্পকেন্দ্র। টাটানগরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার হেতু—(১) ময়ূরভঞ্জের লৌহখনি ৪৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, (২) ঝরিয়ার কয়লার খনি-অঞ্চল ১১৫ মাইল উত্তরে রহিয়াছে; (৩) গাংপুরের চুণাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজের খনিগুলি ১১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং (৪) কলিকাতা বন্দরের দূরত্ব ১৫৪ মাইল। টাটানগরের সহিত এই সকল স্থানগুলি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। ইহা ছাড়া, এখানে জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের **বার্ণপুর**। সিংভূম জেলা হইতে আকরিক লৌহ এবং ঝরিয়া হইতে কয়লা সংগ্রহ করা হয়। আর তৃতীয় কেন্দ্র মহীশূর রাজ্যের **ভদ্রাবতী**। এই অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। তাই, এখানে কাঠ-কয়লার সাহায্যে লৌহ গলান হয়। ইস্পাত ও ঢালাই লোহা (Pig Iron) উৎপাদনের মান নিম্নে বর্ণিত হইল,—টাটানগরে ১০ লক্ষ টন; বর্তমানে কারখানা সম্প্রসারণের ফলে ২০ লক্ষ টন তৈয়ারী হইবে; বার্ণপুরে ৬ লক্ষ টন এবং উহা বর্ধিত হইয়া ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে এবং ভদ্রাবতীতে প্রায় ২ লক্ষ টন।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের **ভিলাই**, উড়িষ্যার **রৌরকেলা** এবং পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে** ভারত-সরকার তিনটি লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা তৈয়ারী করিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে কারখানাগুলি হইতে ৩০ লক্ষ টন কাঁচা ইস্পাত পাওয়া যাইবে। তাই, ১৯৬০-৬১ খৃঃ ভারতের ৬০ লক্ষ টন কাঁচা ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। ভিলাই ও রৌরকেলার কারখানা ঝরিয়া ও বোকারোর কয়লার খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে এবং ইহাদের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আকরিক লৌহ সংগৃহীত হইবে। অবশ্য মধ্যপ্রদেশের কোরবার নিকৃষ্ট কয়লা ঝরিয়ার কয়লার সহিত মিশাইয়া ভিলাই-এর কারখানায় ব্যবহার করা হইবে। এই তিনটি কারখানায় ঢালাই লোহা তৈয়ারী সুরু (১৯৫৯ খৃঃ) হইয়াছে। সিংভূমের

লৌহখনি হইতে আকরিক লৌহ সংগ্রহ করিয়া দুর্গাপুরের কারখানায় উহা গলান হইবে। আর, এদেশে লোহা-গলানোর উপযুক্ত কয়লার অভাব আছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার (noncoking coal) অপদ্রব্যগুলি বাদ দিয়া উহাকে উৎকৃষ্ট কয়লায় (coking coal) পরিণত করিবার কারখানা (Coal washing) ঝরিয়া, বোকারো অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আকরিক লৌহ, চুণাপাথর, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা প্রভৃতি কাঁচামাল আছে এবং লৌহ ও ইস্পাত বহন করিবার জন্য রেলপথগুলি সংগঠিত এবং নূতন নূতন রেলপথ নির্মিত হইতেছে।

তাম্রশিল্প—বিহার রাজ্যের সিংভূম জেলায় মৌভাণ্ডারে (ঘাটশিলার নিকটস্থ) আকরিক তাম্র হইতে তাম্র-নিষ্কাশন করা হয় এবং তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতলের পাত প্রস্তুত হয়। এখানে প্রায় ৭৬২৮ টন তাম্র পাওয়া যায় (১৯৫৬ খৃঃ)। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিশুদ্ধ তাম্র নিষ্কাশন করা যায় বলিয়া বর্তমানে তড়িৎশক্তির সাহায্যে তাম্র-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হইতেছে। ডি. ভি. সি. হইতে তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইবে।

এ্যালুমিনিয়াম-শিল্প—বক্সাইট নামক আকর হইতে এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট রহিয়াছে। বর্তমানে রাঁচী জেলার লোহারডাগা নামক স্থান হইতে বক্সাইট-আকর উত্তোলিত করিয়া **মুরি** (রাঁচী জেলা) নামক স্থানে গলান হয় এবং উহা হইতে এ্যালুমিনা (alumina) নিষ্কাশিত হয়। তৎপর কেরল রাজের **আলওয়ে** নামক স্থানে জল-তড়িৎশক্তির সাহায্যে এ্যালুমিনা হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। পরে কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে এ্যালুমিনিয়াম-এর চাদর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। অন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান আসানসোলের নিকটস্থ **অনুপনগর** নামক স্থানে ঐরূপ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে এ্যালুমিনিয়ামের দ্রব্যাদি নির্মাণ করে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫৬ খৃঃ ৭৫০০ টন এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহারা ১৯৬০-৬১ খৃঃ ২৫,০০০ টন ঐ ধাতু নিষ্কাশন করিবে। ইহা ছাড়া, হীরাকুদে যে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে বৎসরে

২০,০০০ টন এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী হইবে। উত্তরপ্রদেশের রিহান্দ-বাঁধের নিকট এবং মাদ্রাজে মেটুর-বাঁধের নিকট এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করিতে প্রচুর অথচ সুলভ বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন হয়।

দস্তা ও সীসা—রাজস্থানের উদয়পুর জেলার অন্তর্গত জয়ার (Zawar) নামক স্থানে দস্তা ও সীসার আকর পাওয়া যায়। ঐগুলি ঝরিয়ায় আনিয়া তথায় গলান হয়। পরে জাপানে পাঠাইয়া সেই দেশে দস্তা ও সীসা পরিশোধিত করিতে হয়; কারণ এদেশে ঐ ধাতুগুলি পরিশোধনের কারখানা নাই। ১৯৫৬ খৃঃ ২৪৯৭ টন দস্তা ও সীসা পাওয়া গিয়াছে।

কাচশিল্প—ভারতে কাচশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ (ফিরোজাবাদের চুড়িশিল্প), বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূরে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত। কাচশিল্পে বালি, কয়লা ও বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশের নাইনি ও বান্দা হইতে বালি সংগৃহীত হয়। আসানসোলের নিকট কাচের একটি বড় কারখানা আছে। এখানে বৎসরে প্রায় ২ কোটি বর্গফুট কাচের চাদর প্রস্তুত হয়। বর্তমানে হাজারিবাগ জেলায় বারকাকানার নিকটে কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার নিকটস্থ যাদবপুরে কাচ সম্বন্ধে গবেষণা-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

রাসায়নিক শিল্প—(Chemical Industry)—রাসায়নিক শিল্পকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা—(১) কতকগুলি প্রধান রাসায়নিক দ্রব্যের উপর অন্যান্য শিল্প ও বহু রাসায়নিক শিল্প নির্ভর করে। এইগুলিকে রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ (Basic or Heavy chemicals) বলা যাইতে পারে; এবং (২) বিবিধ ছোট-বড় রাসায়নিক শিল্প (Light or Medium Chemical Industry)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে রাসায়নিক শিল্প নামে মাত্র ছিল। ঐ যুদ্ধের সময় এই শিল্প কতকটা অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে উন্নতি দেখা যায়। আর, ভারত স্বাধীনতা পাইবার পর রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি

উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা, বোম্বাই, বরোদা ও মহীশূর, এই চারিটি প্রধান রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র। অবশ্য ভারতের অন্যান্য অংশে দুই-একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে।

প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কলকারখানা (Heavy Chemicals)—বিবিধ এ্যাসিড্, কস্টিক সোডা, সোডা (Soda ash), ব্লিচিং পাউডার ও রাসায়নিক সার, এইগুলি প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য। এদেশে (১৯৫৫-৫৬) স্যালফিউরিক এ্যাসিড্ ১১০ হাজার টন, সোডা-এ্যাশ ৮৯ হা. ট.; কস্টিক সোডা ৩৬ হা. ট. প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ খৃঃ ঐগুলি যথাক্রমে ৪৭০, ২৩০, ১৩৫ হা. ট. প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে।

প্রধানতঃ বোম্বাই-রাজ্যে সোডা-এ্যাশ প্রস্তুত হয়; কারণ এখানে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয় এবং উহা সোডা-এ্যাশের কাঁচামাল।

বিহারের **সিন্ধ্রি** রাসায়নিক সার-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ইহা ঝরিয়ার কয়লার খনির নিকট অবস্থিত। এইজন্য এখানে সুলভে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং কয়লা হইতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া শিল্পের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের সুবিধা আছে। তবে, যোধপুর-অঞ্চল হইতে জিপসাম সংগ্রহ করিতে হয়। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ সিন্দ্রিতে ৩, ৩২, ০৩১ ট. অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইয়াছে। অ্যামোনিয়া সালফেট তৈয়ারী করিতে কয়লা ও জিপসাম প্রয়োজন হয়। বর্তমানে (১৯৫৮ খৃঃ) এখানে প্রতিদিন ৭০ ট. ইউরিয়া এবং ৪০০ ট. অ্যামেনিয়া সালফেট-নাইট্রেট্ বা ডবল সল্ট প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া, কেরল রাজ্যে আলওয়ে (Alwaye) এবং মহীশূর রাজ্যে সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের **নাঙ্গাল** (২ ল. ট. অ্যামেনিয়াম নাইট্রেট্ ও ১৪ ট. হেভি ওয়াটার), উড়িষ্যার **রৌরকেলা** (৭০ হা. ট. নাইট্রোলাইমস্টোন) এবং মাদ্রাজের **নেয়ভেলিতে** (৭০ হা. ট. ইউরিয়া) রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

অন্যান্য রাসায়নিক শিল্প—বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। দিল্লীর ডি. ডি. টি., পুণার নিকটস্থ পিমপিরির পেনিসিলিন,

বিহারের গোমিয়ার (বোকারোর নিকটস্থ) বিস্ফোরক-(Explosive) এর কারখানা উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্লাস্টিক-শিল্প (Plastics) ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতা- ও বোম্বাই-শিল্প-অঞ্চল প্লাস্টিক শিল্পের কেন্দ্র। এদেশে প্রায় ১ কোটি পা. প্লাস্টিকের চাহিদা আছে। বর্তমানে কলিকাতার নিকট কোন্নগরে এবং বোম্বাই-এ পলিথেন-শিল্প (Polythene or Polystyrene) স্থাপিত হইয়াছে।

জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প (Ship-building Industry)—ভারতের পূর্ব-উপকূলে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। এখানে জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে বেসরকারী (সিন্ধিয়া নেভিগেসন) কারখানা ছিল; পরে ১৯৫২ খৃঃ ইহা ভারত-সরকারের অধীনে আসিয়াছে। এখানে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প স্থাপনের হেতু,—(১) বিস্তৃত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে বলিয়া জাহাজ-নির্মাণের সুবিধা রহিয়াছে; (২) জামসেদপুর বা টাটানগর হইতে ইস্পাতের চাদর ও লৌহ-দ্রব্য আনয়ন করা সুবিধা; অদূর ভবিষ্যতে ভিলাই হইতে লৌহ-ইস্পাতের দ্রব্যগুলি পাঠান হইবে; (৩) পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ করা সুবিধা রহিয়াছে। এখনও এদেশে জাহাজের ইঞ্জিন ও বিবিধ কলকব্জা তৈয়ারী হয় না। এইজন্য বিদেশ হইতে এগুলি আমদানি করিতে হয়। এখানে সমুদ্রগামী প্রায় ২০টি জাহাজ ও ৩টি ছোট জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের পশ্চিম-উপকূলস্থ কোন এক বন্দরে সম্ভবতঃ কোচিন বন্দরে দ্বিতীয় পোতনির্মাণের কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

বিমান-নির্মাণ-শিল্প (Aircraft Industry)—বাঙ্গালোরে ভারত-সরকারের তত্ত্বাবধানে (১৯৪০ খৃঃ) বিমান-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সাধারণতঃ সামরিক বিভাগের বিমানগুলি (I. A. F.) মেরামত করা হয়। সামরিক বিভাগের জেট-বিমানের বিভিন্ন অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া ঐ অংশগুলি দিয়া বিমান প্রস্তুত করা হয় (assembly)। তাহা ছাড়া, যে বিমানগুলি (H. T. 2.) বিমান-শিক্ষা-কার্যে ব্যবহৃত হয়

তাহা এখানে তৈয়ারী হয়। বর্তমানে রেল-যাত্রীগাড়ীও (Rail coach) তৈয়ারী হইতেছে। বাঙ্গালোরে বিমানের কারখানা স্থাপনের হেতু,—(১) এই স্থানের স্বাস্থ্যকর ও মৃদুউষ্ণ জলবায়ু, (২) সুলভে প্রচুর তড়িৎশক্তির ব্যবস্থা, (৩) ভদ্রাবতীর লৌহ-ইস্পাত কারখানার প্রস্তুত লৌহ ও ইস্পাতের সরবরাহ। তবে, হিমালয়-পার্বত্য অঞ্চল হইতে ফারকাঠ আনিতে হয়। ফারকাঠ হাল্কা বলিয়া বিমানে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড় হইতে এ্যলুমিনিয়াম আনিতে হয়। তাই, এই দুইটি কাঁচামাল দূর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

মোটরগাড়ী-শিল্প (Automobile Industry)—বিদেশ হইতে প্রধানতঃ মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ, ইঞ্জিন প্রভৃতি আমদানি করিয়া এদেশে ঐগুলি যথাযথভাবে সাজাইয়া মোটরগাড়ী তৈয়ারী হয়। বর্তমানে কোন কোন কারখানায় গাড়ীর কতক অংশ প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতার নিকট হিন্দ মোটর কারখানা, মাদ্রাজ (Ennoe), বোম্বাই (Sewrere) ও জামসেদপুরের মোটরগাড়ীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ খৃঃ ৩০ হাজার গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ খৃঃ ৫৭ হাজার মোটরগাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনা আছে।

রেল-ইঞ্জিন-শিল্প (Locomotive Industry)—১৯৫০ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে ব্রডগেজ-রেলইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে ইঞ্জিনের অংশ বিশেষ আমদানি করিলেও এখানে বহু অংশ প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ খৃঃ পর্যন্ত এখানে ৫০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারী হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ খৃঃ ৪০০টি ইঞ্জিন-প্রস্তুতের পরিকল্পনা আছে। চিত্তরঞ্জনে কারখানা স্থাপনের কারণ—(১) রাণীগঞ্জ কয়লার খনি-অঞ্চল এবং (২) অজয় নদের নিকটে অবস্থিত বলিয়া কয়লা ও জল-সরবরাহের সুবিধা আছে; (৩) বার্ণপুরের লৌহ-ইস্পাতের কারখানা নিকটে রহিয়াছে, আর জামসেদপুর হইতে লৌহ-ইস্পাত আনিবার সুবিধা আছে; (৪) ডি. ভি. সি. হইতে তড়িৎশক্তি পাওয়া যায়। এখানে তড়িৎচালিত রেলইঞ্জিন (Electric Locomotive) প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। টাটা

কোম্পানির তত্ত্বাবধানে জামসেদপুরে মিটারগেজের রেলইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা (Telco) স্থাপিত হইয়াছে। এখানে (১৯৫৮ খৃঃ) বৎসরে ১০০টি রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে। ডিজেল-রেলইঞ্জিন নির্মাণের পরিকল্পনাও আছে।

রেলগাড়ী-নির্মাণশিল্প (Rolling stock)—ভারতের বিভিন্ন স্থানে মালগাড়ী ও যাত্রীগাড়ী তৈয়ারী হয়। মাদ্রাজের উপকণ্ঠের পেরাম্বুরের যাত্রীগাড়ী নির্মাণের কারখানা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বিহারের জামালপুর, পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুর ও লিলুয়া, রাজস্থানের আজমীঢ় প্রভৃতি রেলওয়ের কারখানা এবং বিভিন্ন বেসরকারী কারখানায় মালগাড়ী প্রস্তুত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালোরের বিমান-কারখানায় যাত্রীগাড়ী প্রস্তুত হয়।

বিবিধশিল্প—তড়িৎশিল্প (Electrical Industries)—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে বিবিধ তড়িৎশিল্প রহিয়াছে—বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি, বিদ্যুৎকোষ (cells), রেডিও, বিদ্যুৎ-মোটর প্রভৃতি। বিদ্যুৎবাহী তার (cable) রূপনারায়ণপুর (আসানসোলের নিকটস্থ), জামসেদপুর প্রভৃতি স্থানে তৈয়ারী হয়। **টেলিফোন-যন্ত্র**—বাঙ্গালোরে টেলিফোন-যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। **কলকব্জা** (Machines and their parts)—বিবিধ কারখানার জন্য ছোট-বড় নানারকমের যন্ত্রাদি প্রয়োজন হয়। বড় বড় যন্ত্র বা জটিল প্রকৃতির যন্ত্র প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমদানি হইলেও এদেশে নানাবিধ ছোট-বড় যন্ত্র নির্মিত হইতেছে, যথা—পাম্প, ডিজেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি। বাঙ্গালোরে ভারত-সরকারের তত্ত্বাবধানে ছোট-বড় যন্ত্রাদি (Machine Tool), যেমন লেথ্, ড্রিল প্রভৃতি যন্ত্র এবং কলিকাতার নিকটস্থ যাদবপুরে সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি (Scientific and precision instruments) তৈয়ারী হইতেছে। **বাই-সাইকেলশিল্প**—কলিকাতা, আসানসোল, পাটনা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সনপাটে (পাঞ্জাব) বাইসাইকেল প্রস্তুত হয়। অবশ্য ইহার কোন কোন অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। **লণ্ঠন**—এদেশে বৎসরে প্রায় ৫২ লক্ষ লণ্ঠন প্রস্তুত

হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিদেশ হইতে লণ্ঠন আমদানি করিয়া এদেশের চাহিদা পূরণ করিতে হইত। **সেলাই-এর কল**—বর্তমানে ভারতে সেলাই-এর কল প্রস্তুতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৬ খৃঃ প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার সেলাই-এর কল তৈয়ারী হইয়াছে।

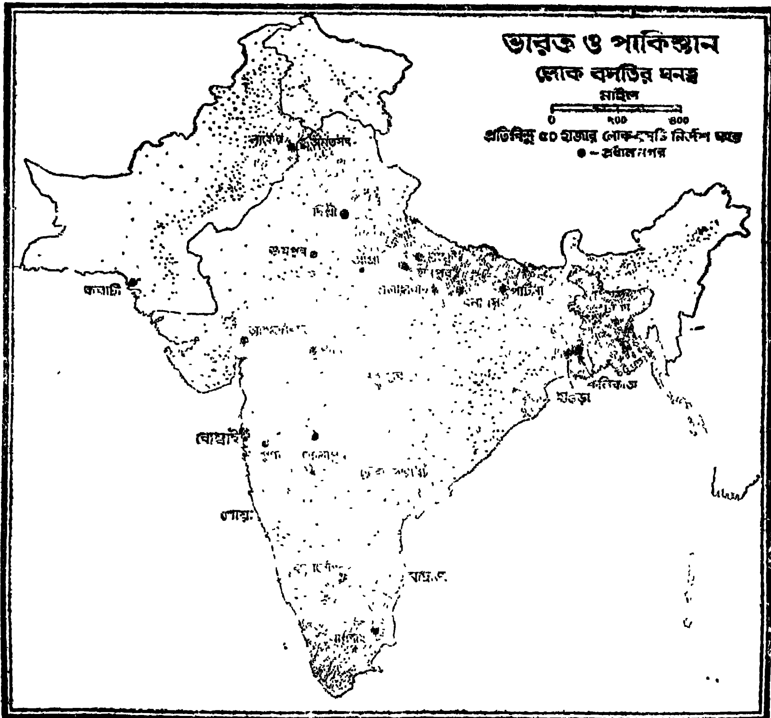
চর্মশিল্প (Leather Industries)—ভারতের গবাদি পশুসম্পদ প্রচুর। পূর্বে এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা চামড়া রপ্তানি হইত। এক্ষণে এদেশে কাঁচা চামড়া পাকা চামড়ায় পরিণত করিবার ব্যবস্থা (Tanning) আছে। কলিকাতা, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ট্যানারী রহিয়াছে। বাবলা গাছের ছাল, হরীতকী প্রভৃতির দ্বারা কাঁচা চামড়া পাকা চামড়ায় পরিণত করা হয়। ভারতে প্রতিবৎসব প্রচুর পরিমাণে (৭৪২০০০ খণ্ড) পাকা চামড়া প্রস্তুত হয়। চর্মনির্মিত দ্রব্যও (৬৬ লক্ষ জোড়া জুতা) যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কানপুর, আগ্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের জুতা তৈয়ারীর কারখানা আছে। বাটানগরের কারখানা ভারতের বৃহত্তম জুতার কারখানা। ইহা ছাড়া, নানাস্থানে চামড়ার অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী হয়। এদেশ হইতে কিছু কিছু পাকা চামড়া ও জুতা বিদেশে রপ্তানি হয়। **দেয়াশলাই-শিল্প**—দেয়াশলাই তৈয়ারীর উপযুক্ত কাঠ ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইতে কাঠ আমদানি করা হয়। এদেশে ১০৮টি দেয়াশলাই-এর কারখানা আছে। তন্মধ্যে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বেরিলী, অম্বরনাথ (বোম্বাই), গোয়ালিয়র, ধুবড়ী, কোটা, (রাজস্থান), টিরুভাট্টিয়ুর (মাদ্রাজ), শিমোগা (মহীশূর) ও বরোদার কারখানা উল্লেখযোগ্য। **রবারশিল্প**—মোটরগাড়ীর টায়ার ও টিউব এবং অন্যান্য দ্রব্য রবার হইতে প্রস্তুত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেলের নিকটস্থ সাহাগঞ্জের রবারের কারখানা ভারতের বৃহত্তম। রবারের কারখানায় বৎসরে ২৮ হাজার টন রবার প্রয়োজন হয়। ভারতের **সাবান-শিল্প**ও উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত শিল্পগুলি ব্যতীত ভারতে কতকগুলি বৃহৎ শিল্পের কারখানা নির্মিত হইতেছে বা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের **ভুপালে** বিদ্যুৎ-উৎপাদনের বড় বড় যন্ত্রাদি (Heavy Electrical Equipment) নির্মাণের একটি বড়

কারখানা স্থাপিত হইতেছে। রাঁচির নিকটস্থ **হাতিয়া** নামক স্থানে ভারি ভারি যন্ত্র (Heavy machine-building plant) প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ইহা ছাড়া, **দুর্গাপুরে** কয়লার খনির কার্যের জন্য যন্ত্রাদি ও কাচ (লেন্স প্রভৃতি) তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইবে।

লোকবসতি ও উপজীবিকা

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ *। এই রাষ্ট্রের প্রতি বর্গমাইলের লোকবসতি ঘনত্ব ২৮৭। রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের লোক-



* ১৯৫১ খৃঃ লোকগণনা অনুযায়ী; ঐ বৎসর কাশ্মীর, আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির লোকগণনা করা হয় নাই। কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং লোকবসতির ঘনত্ব হিসাবে কেরল রাজ্য (৯০৭) প্রথম স্থানীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ (৭৭৬) দ্বিতীয় স্থানীয়। এই দেশে লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্র একরূপ নহে—কোন কোন অংশে অধিক লোক বাস করে, আবার কোন কোন অংশের লোকের বাস কম।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ ; তাই, কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলির লোকবসতি সাধারণতঃ ঘন। আর, পার্বত্য অঞ্চলে বা শুষ্ক অঞ্চলে লোকবসতি কম। (মানচিত্রে লক্ষ্য কর।)

কোন স্থান ঘনবসতিপূর্ণ হইবার হেতু,—

(১) **কৃষিসম্পদ্**—বৃষ্টিবহুল উর্বর সমভূমি, কিংবা যে অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই সকল কৃষিপ্রধান অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ ; যথা—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সমভূমি-অংশ, উপকূলের সমভূমি-অংশ ও নদীর ব-দ্বীপ। কেরল রাজ্যের উপকূলের সমভূমি উর্বর ও বৃষ্টিবহুল বলিয়া ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তবে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ও হিমালয়ের পাদদেশ বৃষ্টিবহুল উর্বর সমভূমি হইলেও এই দুই স্থানের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তথায় লোকবসতি সেরূপ ঘন নহে। (২) **শিল্পপ্রধান অঞ্চল**—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু কলকারখানা রহিয়াছে বলিয়া এই অঞ্চলগুলিই সবচেয়ে ঘনবসতি স্থান। এইভাবে আসনসোলের পার্শ্ববর্তী স্থানে লোকবসতি অধিক।

এজেন্সির লোকসংখ্যা ৫২ লক্ষ অনুমান করা হয়। (Census of India-Paper 1-1952)। India-1959, Published by the Govt. of India-এর প্রদত্ত সংখ্যায় দেখা যায় যে, ১৯৫৮ খৃঃ কাশ্মীর, সিকিম ও পণ্ডিচেরী সহ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩৯ কোটি ৭৫ লক্ষ।

(See India-1959, Page-16. এই অংশে সমস্ত সংখ্যা তথ্যগুলি সেন্সাস রিপোর্ট ও India-59 হইতে গৃহীত হইয়াছে।)

(৩) **খনি-অঞ্চল**—ঝরিয়া, রাণীগঞ্জের কয়লার খনি-অঞ্চল ঘনবসতি স্থানে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে এই সকল স্থানের লোকবসতি কম ছিল।

কোন স্থান বিরলবসতি হইবার হেতু,—

(১) **পার্বত্যভূমি**—এইরূপ অঞ্চলে কৃষিকার্যের উপযোগী জমির পরিমাণ কম এবং রাস্তা বা রেলপথ নির্মাণও ব্যয়বহুল; এইজন্য হিমালয়, আসামের পার্বত্যভূমি এবং ভারতের অন্যান্য পার্বত্যভূমিতে লোকবসতি কম।

(২) **বৃষ্টিবিরল বা মরু-অঞ্চল**—রাজস্থানের পশ্চিমাংশ ও কচ্ছের জলবায়ু শুষ্ক; এইজন্য স্থানগুলি বিরলবসতি অঞ্চল।

(৩) **গভীর অরণ্যময় অঞ্চল**—পার্বত্যভূমি ভিন্ন আসামের উর্বর সমভূমি এবং তরাই-এর সমভূমি গভীর অরণ্যময় বলিয়া এই সকল অঞ্চলের লোকবসতি কম।

১৯৫১ খৃঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫.৬৯ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৬.১৯ কোটি বা ১৭.৩% লোক শহরে এবং ২৯.৫ কোটি বা ৮২.৭% লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর লোকগণনা-সংখ্যা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শহর ও পল্লীগ্রামের লোকবসতির অনুপাতের হারের মধ্যে শহরের লোকবসতির হার বাড়িতেছে এবং পল্লীগ্রামের হার কমিতেছে। (১৯২১-১৯৫১-এর শহরের ১১.৪% হইতে ১৭.৩% এবং পল্লীগ্রামের ৮৮.৬% হইতে ৮২.৭% হইয়াছে।) এদেশে ৩,০১৮টি শহর এবং ৫,৫৮,০৮৮টি পল্লীগ্রাম আছে। তন্মধ্যে একলক্ষ লোকবসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা মাত্র ৭৩টি। আর ৫০০-এর কম লোক বাস করে এইরূপ পল্লীগ্রামের সংখ্যা ৩,৮০,০১৯। আবার, এদেশের কোন কোন অংশে কতকগুলি শহর এত নিকটে নিকটে অবস্থিত (A Group of Towns, for demographic purposes) যে, এক একটি অংশের ঐরূপ শহরগুলিকে একটি শহর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ঐরূপ শহরের সংখ্যা ৩১। এক্ষেত্রে কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, কলিকাতার লোকসংখ্যা ২৫,৪৮,৬৭৭ জন; কিন্তু বৃহত্তর কলিকাতার লোক সংখ্যা ৪৫,৭৮,০৭১ জন।

ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ৮৪'৯৯%, মুসলমান ৯'৯৩%, খৃষ্টান ২'৩%, শিখ ১'৭৪%। ইহা ছাড়া, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি প্রভৃতি ধর্মের লোক কিছু কিছু আছে। হিন্দী, উর্দু, গুরমুখী বা পাঞ্জাবী, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, বাংলা, গুজরাটি, কানাড়া, মালয়ালাম, উড়িয়া, অসমিয়া, কাশ্মীরি,—এই কয়টি ভারতের প্রধান ভাষা।

উপজীবিকা (Livelihood Pattern)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; তাই, এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। এদেশের সমগ্র জনসংখ্যার ৬০'১% জন কোন উপার্জন করে না। ইহারা অবশ্য অধিকাংশ স্ত্রীলোক, শিশু বা বালক-বালিকা। ১০'৬% জন উপার্জন করিলেও আংশিকভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং অবশিষ্ট ২৯'৩ জন উপার্জন করে। এই উপার্জনশীল লোকদের মধ্যে ৬৮'১% কৃষিজীবী এবং ৩১'৯ জন অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত।

প্রাকৃতিক বিভাগ (Natural Regions)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি আমরা আলোচনা করিয়াছি। যে সকল স্থানের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু (প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত), কৃষিজাত দ্রব্য এক প্রকারের, সেই সকল স্থানকে এক একটি বিশিষ্ট অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা যায়। এইরূপ এক একটি অঞ্চলকে একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ বলা যায়। এইভাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তর-ভারতের সমভূমি, (৩) ছোট-বড় পাহাড়-অঞ্চল সহ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, (৪) পশ্চিমঘাট পর্বত ও পশ্চিম-উপকূল, এবং (৫) পূর্বঘাট পর্বত ও পূর্ব-উপকূল অঞ্চল।*

১। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল—এই

অঞ্চলটি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) **লাডাক**—ইহা তিব্বতের মালভূমির অংশবিশেষ। তাই, ইহা সুউচ্চ মালভূমি (১০,০০০')। ইহার উত্তরাংশে কারাকোরাম পর্বতমালা ও দক্ষিণে

---

* এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ Census Report-1951, হইতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

লাডাক পর্বতশ্রেণী। এখানে সিন্ধুনদ ও সিয়াক নদী প্রবাহিত। লাডাকের জলবায়ু শীতল। এখানে সামান্য পরিমাণে যব উৎপন্ন হয়। মেষচারণও অধিবাসীদের উপজীবিকা। লোকেরা প্রধানতঃ বৌদ্ধ। এই সকল কারণে ইহা প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের পার্বত্যভূমির অংশ নহে।

(খ) **হিমালয় পার্বত্যঅঞ্চলের পশ্চিমাংশ**—কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের হিমালয়-অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। পূর্বাংশ অপেক্ষা এই অঞ্চল প্রশস্ততর এবং জলবায়ুও অধিক শীতল। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পূর্বাংশ অপেক্ষা এই অংশের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে চিরপাইন (Chir pine) গাছ জন্মে। এই গাছের কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ভুট্টা, ধান, গম, আলু প্রভৃতি ফসল এবং আপেল, পিয়ার, (নাসপাতি) বাদাম, প্লাম, পিচ প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর- ও কুলু-উপত্যকা ফলের জন্য বিখ্যাত। পশুচারণও অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা।

(গ) **হিমালয়-পার্বত্যঅঞ্চলের পূর্বাংশ**—পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি, আসামের পার্বত্যভূমি, মনিপুর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত বলা যায়। এই অংশগুলির মধ্যে বহু বিষয়ে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়; তাই, এই অঞ্চলটিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত। (১) **পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্যঅঞ্চল**—দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া, ডুয়ার্সের উচ্চ অংশ ইহার অন্তর্গত বলা যায়। এই অঞ্চলটি বৃষ্টিবহুল বলিয়া ইহার জলবায়ু আর্দ্র। আর, উচ্চতাভেদে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। তরাই ও ডুয়ার্সে উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ বনভূমি আছে এবং ইহার পর উচ্চতাভেদে পর পর ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ, সরলবর্গীয় বৃক্ষ, তৃণভূমি, হিমগুল্ম প্রভৃতি দেখা যায়। ডুয়ার্সের ও তরাই-এর বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ভুট্টা, ধান, কমলালেবু উষ্ণ উপত্যকায় এবং আনারস, চা প্রভৃতি এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। (২) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি**—এই অঞ্চলে হিমালয়ের প্রধান শাখা, শাখা-শৈলশিরা

ও বহু নদী-উপত্যকা রহিয়াছে। ইহার পূর্বাংশের এক গভীর উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্র নদ বা সান্‌পো প্রবাহিত। ইহা বৃষ্টিবহুল ও অরণ্যময়। ভুট্টা ও ধান এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। (৩) **আসামের পার্বত্যঅঞ্চল**—আসামের পূর্ব-প্রান্তের পার্বত্য-ভূমি ও মধ্যভাগের মালভূমি (গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড়) ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ শিলং-মালভূমির দক্ষিণ-ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অংশে অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। তাই, এই অঞ্চল, বৃষ্টিবহুল ও গভীর অরণ্যময়। ভুট্টা, কমলালেবু ও আনারস উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে কয়লা ও চুণাপাথর পাওয়া যায়। আর, এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। এই অঞ্চলটিকে উত্তর-পূর্ব পার্বত্যঅঞ্চলও বলা হয়।

২। **উত্তর-ভারতের সমভূমি**—ইহাই ভারতের প্রধান কৃষিঅঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলটি নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(ক) **গঙ্গা নদীর উপত্যকার পূর্বাংশের সমভূমি** (Lower Gangetic Plains)—ইহা, আবার চারিটি উপঅংশে বিভক্ত—(১) **পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি**—ইহা নবীন পাললিক সমভূমি এবং গঙ্গার ব-দ্বীপের কতকাংশ ইহার অন্তর্গত। এখানে গঙ্গা বা পদ্মা ও উহার প্রধান শাখানদী ভাগীরথী প্রবাহিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধান ও পাট ইহার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে বহু কল-কারখানা আছে। পাট-ই প্রধান শিল্প। (২) **উত্তর-বিহারের সমভূমি**—ইহা পাললিক সমভূমি। গঙ্গা ও উহার উপনদী গণ্ডক, ঘর্ঘরা, কুশী প্রভৃতি প্রবাহিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, ইক্ষু ও পাট ইহার কৃষিজাত দ্রব্য। চিনিশিল্প ইহার প্রধান শিল্প। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। (৩) **দক্ষিণ-বিহারের সমভূমি**—গঙ্গানদীর তীর হইতে দক্ষিণে মালভূমির প্রান্তদেশ পর্যন্ত এই সমভূমি বিস্তৃত। এই মালভূমির উত্তর-প্রান্ত

বিশেষ বক্র,—স্থানে স্থানে গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত (যেমন মুঙ্গের ও রাজমহল)। উত্তর-বিহার অপেক্ষা দক্ষিণ-বিহারের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। শোণ নদ ও গঙ্গার ছোট-ছোট বহু উপনদী মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া এখানে প্রবাহিত। শোণ নদের সেচখাল রহিয়াছে। ধান, গম, ডাল, ভুট্টা, ইক্ষু, এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। ডালমিয়ানগর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। (৪) **উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের সমভূমি**—ইহা পাললিক সমভূমি। এখানে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। বিহার অপেক্ষা এই অংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক; তবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য উত্তরাংশের ধান প্রধান ফসল। এই অংশে কূপ হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। গম, যব, ভুট্টা, ডাল, ইক্ষু এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহার চিনিশিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহাও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

(খ) গঙ্গা নদীর উপত্যকার পশ্চিমাংশের সমভূমি (Upper Gangetic Plains)—ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) **উত্তরপ্রদেশের সমভূমির মধ্যাংশ**—এই অংশের ভূমি প্রাচীন পাললিক। এখানে গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। এই অংশে গঙ্গা ও সর্দা নদীর সেচখাল রহিয়াছে। এখানে সেচখাল ও কূপ হইতে জলসেচ করিয়া কৃষিকার্য হয়। গম, যব, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, বাজরা প্রভৃতি ইহার কৃষিজাত দ্রব্য। কানপুর এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। আর, এখানে অনেকগুলি বড় বড় শহর রহিয়াছে। (২) **উত্তরপ্রদেশের সমভূমির পশ্চিমাংশ**—এই অঞ্চলের ভূমি উর্বর। ইহাই এই রাজ্যের প্রধান কৃষিঅঞ্চল। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সেচখাল এবং কূপ ও নলকূপের সাহায্যে কৃষিকার্য চলে। গম, যব ডাল, ইক্ষু, তৈলবীজ, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের চিনিশিল্প উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের জলবায়ু পূর্বাংশ অপেক্ষা শুষ্ক এবং শীত-গ্রীষ্মের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত বেশী।

(গ) যমুনা নদীর পশ্চিমদিকের সমভূমি (Trans-Gangetic Plains)—এই অঞ্চলটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি**—ইহা পাললিক সমভূমি। এখানে সিন্ধুনদের উপনদী বিপাশা, শতদ্রু ও ইরাবতী প্রবাহিত। আর, ইহার জলবায়ু শুষ্ক,—গ্রীষ্ম ও শীতের মাত্রা অধিক। প্রধানতঃ পশ্চিম যমুনা-খাল, শতদ্রু নদীর খাল প্রভৃতি সেচখালের সাহায্যে এখানে চাষ-আবাদ হয়। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিঅঞ্চল। গম, যব, তুলা, ছোলা, ভুট্টা, বাজরা, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি এই স্থানের কৃষিসম্পদ্। অমৃতসর, লুধিয়ানা প্রভৃতি শিল্প-প্রধান নগর। গাঙ্গেয় সমভূমি অপেক্ষা এই অঞ্চলের লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম। (২) **পূর্ব-রাজস্থানের সমভূমি**—এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক। এখানে প্রধানতঃ কূপ হইতে জলসেচ করিয়া গম, যব, তুলা, বাজরা, তৈলবীজের চাষ হয়। এই অঞ্চলের লোকবসতি তত ঘন নহে। (৩) **দিল্লী-টেরিটরি**—এই অঞ্চলের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য পাঞ্জাবের মত। এই অঞ্চলে ছোট-বড় কলকারখানা রহিয়াছে। আর, লোকবসতি ঘন। (৪) **মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশের নদী-উপত্যকার সমভূমি**—এই অঞ্চলের ভূমি উঁচুনীচু; স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে। জলবায়ু শুষ্ক হইলেও পাঞ্জাব অপেক্ষা এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। যমুনার উপনদী চম্বল, বেতুয়া, কেন প্রভৃতি এখানে প্রবাহিত। সেচখাল ও কূপ হইতে জলসেচ করিয়া গম, বাজরা, তুলা, ডাল প্রভৃতি ফসলের চাষআবাদ হয়; এই অঞ্চলের লোকবসতি ঘন নহে।

(৪) **ব্রহ্মপুত্রনদের উপত্যকার সমভূমি**—এই অঞ্চল আসাম রাজ্যে অবস্থিত। এই সমভূমিতে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। তাই, ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধান, তৈলবীজ, ইক্ষু ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। চা, আর একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে। এইজন্য প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। আর, লোকবসতি তত ঘন নহে। গৌহাটী ও ডিব্রুগড় প্রধান শহর।

৩। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং উহার মধ্যস্থ পাহাড়-পর্বত—ইহা ভারতের প্রাচীনতম অংশ। আর, ইহা সাধারণতঃ প্রাচীন শিলায় গঠিত। এই অঞ্চলটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(ক) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য ও পাহাড়িয়া অঞ্চল—এই অঞ্চলটিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়; (১) **রাজস্থানের পাহাড়িয়া অঞ্চল বা আরাবল্লী পাহাড়িয়া অঞ্চল**—প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত ও বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল। উচ্চতাভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা যায়;—আবু পাহাড়ের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৬০″; তবে এই অঞ্চলে সাধারণতঃ ২০″-৩০″ বৃষ্টিপাত হয়। ইহার কোন অংশ অরণ্যময়; প্রধানতঃ শুষ্ক জলবায়ুর উদ্ভিজ্জ এখানে দেখা যায়। উদয়পুর-অঞ্চলে ছোট ছোট স্বাভাবিক হ্রদ রহিয়াছে। এখানে কৃষিকার্য সামান্য হয় এবং ইহা বিরলবসতি অঞ্চল। (২) **রাজস্থানের মালভূমি অঞ্চল**—এই মালভূমির এক অংশ আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে এবং অপর অংশ ঐ পর্বতের পূর্বে অবস্থিত। ইহা ক্ষয়জাত নিম্নমালভূমি। আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমের মালভূমি শুষ্ক ও মরুময়; এখানে **থর মরুভূমি** অবস্থিত। এখানে লুনী একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী। স্থানে স্থানে কূপ হইতে জলসেচ করিয়া সামান্য কৃষিকার্য চলে; তবে বিকানীর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে শতদ্রু নদীর সেচখাল রহিয়াছে বলিয়া ঐ অংশে পাঞ্জাবের মত নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয়। সম্বর হ্রদ হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। আর, যোধপুর অঞ্চলে জিপসাম, বিকানীর-অঞ্চলে কয়লা এবং উদয়পুর-অঞ্চলে (জয়ার খনি) দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়। ইহা বিরল-বসতি অঞ্চল। আরাবল্লী পর্বতের পূর্বের মালভূমির মধ্যে মধ্যে নদী-উপত্যকা রহিয়াছে। এখানে চম্বলের উপনদীগুলি প্রবাহিত। পশ্চিমের মালভূমি অপেক্ষা এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে জলসেচ করিয়া গম, যব, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ, বাজরা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। এই অঞ্চলের জয়পুর, আজমীঢ় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপ্রধান শহর।

(খ) **উত্তরাংশের মধ্যভাগের পাহাড়িয়া ও মালভূমি অঞ্চল**—ইহাকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) **উত্তরপ্রদেশের**

দক্ষিণাংশের মালভূমি ও পাহাড়িয়া অঞ্চল—এই অঞ্চলের ভূমি প্রধানতঃ উঁচুনীচু এবং স্থানে স্থানে পাহাড় রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শোণ নদের উত্তরে কাইমুর পাহাড় উল্লেখযোগ্য। মির্জাপুর জেলার চুর্কের সিমেণ্টের কারখানা রহিয়াছে। আর, ঝান্সি উল্লেখযোগ্য নগর। জলসেচ করিয়া সামান্য পরিমাণে গম, ভুট্টা, ডাল প্রভৃতি ফসলের চাষ-আবাদ হয়। (২) **মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশ**—মালব-বাঘেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ড-এর মালভূমির এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এই অংশের অন্তর্গত। মালবের দক্ষিণাংশে বিন্ধ্য পর্বত, এবং উহার দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত। ঐ পর্বত দুইটি দাক্ষিণাত্য-লাভায় গঠিত। সাতপুরার পূর্বে মহাদেব ও মহাকাল পাহাড়। মহাকাল পর্বত এই অংশে অবস্থিত নহে। মালবের ভূমি উর্বর। এখানে জলসেচ করিয়া গম, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, তূলা, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। অন্য অংশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রায় এইরূপ। পূর্বাংশের বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া এই অঞ্চলে গভীর অরণ্য আছে। তাহাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া স্থানে স্থানে গভীর বনভূমি দেখা যায়। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, জব্বলপুর প্রভৃতি এই স্থানের উল্লেখযোগ্য নগর। কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ ইহার প্রধান খনিজ দ্রব্য।

(গ) **উত্তর-পূর্বের মালভূমি**—এই অঞ্চলকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা,—(১) **ছোটনাগপুরের মালভূমি**—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের পশ্চিমাংশও ইহার অন্তর্গত। ইহা প্রাচীন শিলায় গঠিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। নদী-উপত্যকায় বিশেষতঃ দামোদরের উপত্যকায় গণ্ডোয়ানা-যুগের শিলা রহিয়াছে। ঐ শিলায় কয়লা পাওয়া যায়। ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লার খনি-অঞ্চল। দামোদর নদের উপত্যকার উত্তরের মালভূমিতে অভ্র এবং দক্ষিণের মালভূমিতে বিশেষতঃ সিংভূম জেলায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। তাই, ছোটনাগপুরের মালভূমি ভারতের প্রধান খনি-অঞ্চল। এই অঞ্চলে পরিমিত (৫০") বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে। ধানই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে কয়লা ও বিবিধ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া নানা কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জামসেদপুর বা টাটানগর

ও সিক্কির নাম উল্লেখযোগ্য। (২) **মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ বা ছত্রিশগড়-সমভূমি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল**—এই অঞ্চলও প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত। মহানদীও উহার বহু উপনদী এখানে প্রবাহিত; আর শোণ ও নর্মদার উৎসক্ষেত্রও এখানে অবস্থিত। আকরিক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুণাপাথর এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এইজন্য ভিলাই-এ লৌহ-ইস্পাতের বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে গভীর বনভূমি দেখা যায়; এই অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়। ছত্রিশগড় সমভূমিতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। (৩) **উড়িষ্যার মালভূমি**—এই অঞ্চল প্রধানতঃ প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত। এখানে প্রচুর আকরিক লৌহ এবং অল্পবিস্তর ম্যাঙ্গানিজ, চূণাপাথর, বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়। তলচরে কয়লার খনি আছে। রৌরকেলায় লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাছাড়া, কাগজ, সিমেণ্ট, এ্যলুমিনিয়াম ফেরো-ম্যাঙ্গনিজ প্রভৃতির কলকারখানা এই অঞ্চলে রহিয়াছে। পরিমিত বৃষ্টিপাত (৫০") হয় বলিয়া এই মালভূমির স্থানবিশেষ গভীর অরণ্যময়। ধান্য এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

(ঘ) **দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উত্তরাংশ**—বিদর্ভ ও বোম্বাই-রাজ্যের দাক্ষিণাত্য-মালভূমি ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল লাভাজাত কৃষ্ণমৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া উর্বর। বিদর্ভে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয় এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বাংশ ঐ পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল; এইজন্য এই অংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। তাই, জলসেচ করিয়া কৃষিকার্য চলে। তুলা এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। তাহাছাড়া, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলসেচ করিয়া সামান্য পরিমাণে ধান্য ও ইক্ষু উৎপাদন করা হয়। বিদর্ভে কয়লা ও প্রচুর আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নাগপুর, পুনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর।

(ঙ) **দাক্ষিণাত্য-মালভূমির দক্ষিণাংশ**—অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যের মালভূমি-অংশ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল প্রধানতঃ প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত ভিন্ন নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও বৃষ্টিপাত হইলেও মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিমিত নহে; তাই, ইহার জলবায়ু শুষ্ক।

এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে,—অসংখ্য জলাশয় রহিয়াছে ; ইহাছাড়া, নদী হইতে সেচখালও আছে। তূলা, তৈলবীজ, বাজরা, রাগী, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। সিঙ্গরেণীর কয়লার খনি উল্লেখযোগ্য। হায়দারাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর এই অঞ্চলের প্রধান নগর।

৪। পশ্চিমঘাট পর্বত ও পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল (Western Littoral)—এই অঞ্চলটিকে দুইটি প্রধান উপ-অঞ্চলে (Sub-Region) বিভক্ত করা যায় ; যথা—(ক) **গুজরাট-কাঠিয়াবার**—ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত,—(১) **গুজরাটের সমভূমি-অংশ**—এই অঞ্চলে বৎসরে ৪০"-২০" বৃষ্টিপাত হয় ; দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তরাংশ শুষ্ক। এইজন্য ফসলের অনুরূপ প্রকৃতি দেখা যায় অর্থাৎ দক্ষিণে অল্প পরিমাণ ধান্যও উৎপন্ন হয় এবং উত্তরাংশে সাধারণতঃ বাজরা ও তূলা জন্মে। গুজরাট তূলা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ইহাছাড়া, তৈলবীজ, ছোলা, গম ও ভুট্টা জন্মায়। লোকবসতিও ঘন। এখানে বহু কাপড়ের কল রহিয়াছে ; তন্মধ্যে **আহমদাবাদ** প্রধান বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র। (২) **কাঠিয়াবার**—এখানে স্থানে স্থানে ছোট-বড় পাহাড় রহিয়াছে। আর, দক্ষিণাংশ কৃষ্ণমৃত্তিকায় গঠিত। ইহার জলবায়ু শুষ্ক। তূলা, গম, বাজরা, তৈলবীজ এই স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহার উপকূলে ছোট ছোট অনেকগুলি বন্দর আছে। বস্ত্রশিল্প এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। (৩) **কচ্ছ**—ইহা শুষ্ক অঞ্চল এবং লোকবসতিও কম। বাজরা ও তূলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। **কাণ্ডালা** এই স্থানের প্রধান বন্দর। (খ) **পশ্চিমঘাট পর্বত ও কঙ্কণ-মালবার উপকূলের সমভূমি**—ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। সমভূমি-অংশে কৃষিকার্য চলে এবং পার্বত্যভূমি প্রধানতঃ অরণ্যময়। ইহাকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(১) বোম্বাই শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (Greater Bombay)—ইহা ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প-অঞ্চল। বয়নশিল্পই প্রধান শিল্প। এখানে প্রসিদ্ধ বোম্বাই-শহর ও বন্দর অবস্থিত। (২) **কঙ্কণ-উপকূল**—উপকূলের সমভূমি সঙ্কীর্ণ। ধান্য ও নারিকেল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বোম্বাই-শহরের দক্ষিণে কঙ্কণ-উপকূলের সমভূমিতে কোন রেলপথ

নাই, সমুদ্রপথই প্রধান বাণিজ্যপথ। (৩) **মালবার-উপকূল**—কঙ্কণ-উপকূল অপেক্ষা এই উপকূলের সমভূমি প্রশস্ততর এবং লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। সারাবৎসর এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধান্য, চা, কফি, রবার, গোল-মরিচ, নারিকেল ও সুপারি, ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কোচিন এই অঞ্চলের প্রধান বন্দর।

৫। পূর্বঘাট পর্বত ও পূর্ব-উপকূল অঞ্চল (Eastern Littoral)—এই অঞ্চলটি নিম্নলিখিত উপঅঞ্চলে বিভক্ত, যথা,—

(ক) **উড়িষ্যার ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের সমভূমি**—ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত—(১) **উড়িষ্যার উপকূলের সমভূমি**—ব্রাহ্মণী, মহানদী ও বৈতরণী, এই তিনটি নদী মিলিতভাবে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ব-দ্বীপ অংশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। (২) **অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের সমভূমি**—ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত—ইহার মধ্যাংশে গোদাবরী-কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ এবং উহার উত্তরে ও দক্ষিণে সঙ্কীর্ণ উপকূলের সমভূমি। ব-দ্বীপ উর্বর এবং এখানে বহু সেচখাল থাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। ধান্যই প্রধান ফসল। ইহাছাড়া, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর জন্মায়। এই অংশ ঘনবসতিপূর্ণ, আর ইহার উত্তরে বা দক্ষিণে লোকবসতি তত ঘন নহে। ব-দ্বীপের দক্ষিণে প্রধানতঃ অক্টোবর-নবেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। (খ) **মাদ্রাজের সমভূমি-অঞ্চল**—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ উঃ পঃ মৌসুমী-বায়ু প্রত্যাবর্তন সময়—অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। আর, বার্ষিক বৃষ্টিপাত অধিক নহে। এই অঞ্চলে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অবস্থিত। ইহার ভূমি এত উর্বর যে, এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে দক্ষিণ-ভারতের শস্য-ভাণ্ডার বলে। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে জলসেচ করিয়া চাষআবাদ হয়। ধান্যই প্রধান শস্য; ইহাছাড়া, রাগী, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তিল তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—এই দ্বীপপুঞ্জ দুইটির জলবায়ু অনেকটা নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ইহাদের জলবায়ু

উষ্ণ ও আর্দ্র। আর, দ্বীপগুলি বিশেষতঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গভীর অরণ্যময়। নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আর অরণ্য হইতে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মূল্যবান কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক বিবরণ

গত ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ও টেরিটরিগুলির পুনর্গঠন হইয়াছে ; যথা—

রাজ্য—(১) আসাম, (২) পশ্চিমবঙ্গ, (৩) বিহার, (৪) উড়িষ্যা, (৫) উত্তরপ্রদেশ (৬) রাজস্থান, (৭) পাঞ্জাব, (৮) মধ্যপ্রদেশ, (৯) বোম্বাই, (১০) অন্ধ্রপ্রদেশ, (১১) মাদ্রাজ (১২) মহীশূর, (১৩) কেরল এবং (১৪) জম্মু ও কাশ্মীর। জম্মু ও কাশ্মীর সর্দার-ই-রিয়াসৎ দ্বারা শাসিত রাজ্য এবং অন্যগুলি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য।

ইউনিয়ন-টেরিটরি—টেরিটরিগুলি রাষ্ট্রপতির অধীন। তিনি চীফ্ বা যে-কোন উপাধির শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া এইগুলি শাসন করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ, এই দুইটি টেরি-টরির হিতার্থে রাষ্ট্রপতি আইন রচনাও করিতে পারেন। আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (N. E. F. A.) এবং নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং অঞ্চল সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। আসামের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে এই দুইটি অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। বর্তমানে (১৯৫৭ খৃঃ ডিসেম্বর) আসাম সীমান্তে নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং একটি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ (লেফ্টনান্ট গবর্ণর দ্বারা শাসিত) (৩) মনিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ, এই ছয়টি টেরিটরি। (১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, (২) নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং, এই দুইটি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল।

অঞ্চল—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত, যথা—**উত্তরাঞ্চল**—জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ, **মধ্যাঞ্চল**—উত্তরপ্রদেশ

ও মধ্যপ্রদেশ; **পূর্বাঞ্চল**—আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা; **পশ্চিমাঞ্চল**—বোম্বাই ও মহীশূর; **দক্ষিণাঞ্চল**—অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও কেরল।

পণ্ডিচেরি—১৯৫৬ খৃঃ ২৮ মে, ফরাসী-সরকারের সহিত ভারত-সরকারের যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে ভারতের ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে ও ইয়ানান্ স্থানগুলি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হইয়াছে এবং একজন চীফ্ কমিশনারের শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। এখনও আইনগতভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। পূর্বে চন্দননগর ফরাসীদের অধিকারে ছিল; বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

সিকিম ভারত সরকারের আশ্রিত রাজ্য। **নেপাল** ও **ভূটান** ভৌগোলিক হিসাবে ভারতের অন্তর্গত হইলেও এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

পর্তুগীজ-অধিকৃত **গোয়া**, **দিউ** ও **দমন**, এই তিনটি অঞ্চলও ভৌগোলিক হিসাবে ভারতের অন্তর্গত।

রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক বিবরণ

আসাম

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আসাম রাজ্য। ইহার আয়তন ৪৫,৮৫৭ বর্গমাইল (নেফা ও নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং সহ ৮৫,০৬২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ।

প্রাকৃতিক বিভাগ—আসাম-রাজ্য পার্বত্য অঞ্চল ও নদী-উপত্যকা লইয়া গঠিত। তাই, ইহাকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়,—(১) পার্বত্য অঞ্চল এবং (২) নদী-উপত্যকার সমভূমি-অঞ্চল।

(১) পার্বত্য অঞ্চল—ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত—**(ক) উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল**—ইহা হিমালয়-পার্বত্য-অঞ্চলের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি এই অংশে অবস্থিত। ঐ এজেন্সি আলোচনা-প্রসঙ্গে এই অঞ্চল বর্ণিত হইবে।

(খ) পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল—আসাম-ব্রহ্মদেশ-সীমান্তের পার্শ্বে এই অঞ্চল অবস্থিত। নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং, মণিপুর ও আসামের মিজো (লুসাই-পাহাড) জেলা লইয়া ইহা গঠিত। এই অঞ্চলে রহিয়াছে নবীন ভঙ্গিল-পর্বত।

উহারা বেলেপাথর, কাদাপাথর, চুণাপাথর প্রভৃতি শিলার দ্বারা গঠিত। সমান্তরালভাবে অবস্থিত শৈলাশিরা (Ridge) ও তন্মধ্যস্থ নদী-উপত্যকা দেখিয়া মনে হয়, পাহাড়গুলি জুরা-প্রকৃতির (Jura-type) ভঙ্গিল-পর্বত।

উহাদের মধ্যে **পাটকই, নাগা, বরাইল,** ও **মিজো** (লুসাই) পাহাড় উল্লেখযোগ্য। **জাপাভো** (১০,০০০′) ও **নীল** (৭,০০০′) যথাক্রমে নাগা-পাহাড় ও লুসাইপাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহা বৃষ্টিবহুল বলিয়া গভীর অরণ্যাবৃত! অপেক্ষাকৃত নিম্নঅংশে বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জ (Evergreen Rain forest of Tropical Countries) দেখা যায়। আর, স্থানে স্থানে মৌসুমী অঞ্চলের পর্ণমোচী উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে; উচ্চভূমিতে অবশ্য পাইন-জাতীয় উদ্ভিজ্জ জন্মে। উচ্চতার জন্য পার্বত্যভূমির জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। এই অঞ্চলে কৃষিকার্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই; তবে মণিপুরের উপত্যকায় ধান-আবাদ যথেষ্ট হয়, অন্যত্র 'জুম-প্রণালীতে' ধানের চাষ হয়। নাগাপাহাড়ের নাগিনীমরায় কয়লার খনি আছে। এই অঞ্চলের লোকবসতি কম। নাগা ও মিজোরা উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড (স্তিম-কাপড়) বুনিয়া থাকে।

(গ) **মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল বা শিলং-মালভূমি**—ইহাই আসামের তথা ভারতের এক প্রাচীনতম অংশ। ইহা দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অংশ-বিশেষ এবং উহার মত প্রাচীন শিলায় গঠিত। গ্রানিট্, শ্লেট্, কোয়ারাট্জাইট, শিস্ট প্রভৃতি প্রাচীন শিলার দ্বারা গঠিত মালভূমির অংশবিশেষ আবার প্রাচীন-কালে সৃষ্ট (Eocene) চূণাপাথর ও বেলেপাথরের দ্বারা আবৃত। অতিবর্ষণ হেতু এই মালভূমির স্থানে স্থানে অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ-পার্শ্বদেশ সুউচ্চ বলিয়া সুরমাউপত্যকা হইতে এই উচ্চভূমি খাড়াখাড়িভাবে উঠিয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের **গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া, মিকির** ও **রেজমা** পাহাড় উল্লেখযোগ্য। মিকির ও রেজমা পাহাড় প্রকৃতপক্ষে ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি। নোক্রোক (৬৫৪০′) ও শিলং-শৃঙ্গ (৬,৪৫০′) যথাক্রমে গারো ও খাসি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গ। পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত এই মালভূমিকে বরাইল পাহাড় সংযুক্ত করিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে ছোট ছোট নদনদী উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র বা বরাক নদীতে পতিত হইতেছে। পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চল বৃষ্টিবহুল ও অরণ্যময়। খাসিপাহাড়ের দক্ষিণ-

ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। ইহার নিকটস্থ শৈলশিরা ও গিরিখাতের অবস্থানের বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্যই, হয়ত, এখানে এত অধিক পরিমাণে (৪৫০"—৫০০") বৃষ্টিপাত হয়।

এই অঞ্চলেও 'জুম-প্রণালীতে' কৃষিকার্য চলে। এখানে ধান্য, ভুট্টা, আলু, তুলা কমলালেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নদী-উপত্যকা বা অপেক্ষাকৃত নিম্নঅংশে কমলালেবু, কলা, আনারস জন্মায়। উত্তর-কাছাড় ও মিকিরপাহাড় জেলায় চা উৎপন্ন হয়। গৌহাটি-শিলং রাজপথের নিকটস্থ উমট্রু-এ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গারোপাহাড়ে কয়লা, জয়ন্তিয়া-খাসি পাহাড়ে যথেষ্ট চূণাপাথর রহিয়াছে। এই অঞ্চলে রেলপথ নাই বলিয়া খনির কার্য বিশেষ চলে না। **শিলং** এই অঞ্চলের প্রধান শহর ও আসামের রাজধানী। ইহার জলবায়ু সুখপ্রদ বলিয়া ইহা একটি বিশিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাস। গৌহাটির সহিত পাকারাস্তার দ্বারা শিলং সংযুক্ত।

(২) **নদী-উপত্যকার সমভূমি অঞ্চল**—ইহাকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—

(ক) **ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা বা আসাম-উপত্যকা**—মধ্যভাগের পার্বত্য ভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা, এই দুইটি উচ্চভূমির মধ্যস্থ সমভূমি লইয়া ইহা গঠিত। এই উপত্যকা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪৫০ মাইল বিস্তৃত এবং ইহার গড় প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল। ব্রহ্মপুত্র নদ এখানে প্রবাহিত। আর, ইহার বহু উপনদী প্রবাহিত হইতেছে। নদীবাহিত পলেলরাশির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই উপত্যকার ভূমি উর্বর। ইহা মোটামুটিভাবে সমভূমি হইলেও স্থানবিশেষে ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং ধুবড়ী হইতে তেজপুর পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রাচীন শিলায় গঠিত ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। তাই, গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে এই উপত্যকার বহু বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে।

হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের মানস-সরোবর নামক হ্রদের নিকটবর্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ দেশে প্রায় ৮০০ মাইল **সানপো** নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত। ইহার পর হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ নামচা-বারওয়ার পূর্ব-পার্শ্বে ১৮০০০'

গভীর গিরিখাতের মধ্যে **দিহিং** নাম ধারণ করিয়া বহিতেছে ও আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রবেশ করিতেছে। এই স্থানে **লোহিত** ও **দিবং** নদীর সহিত মিলিত হইয়া **ব্রহ্মপুত্র** নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর আসাম-রাজ্যে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। শিবসাগর জেলার **লোহিতসুতী** ঐরূপ একটি শাখানদী। উহাদের মধ্যে **মাজুলী** নামক বিশাল চর রহিয়াছে। ইহার বহু ছোট-বড় উপনদীর মধ্যে বড়নদী, মানস, ভরালু ও সুবনশিরি দক্ষিণ পার্শ্বের (Right bank) এবং বুড়িদিহিং, লোহিত, ধনশিরি, দিখৌ ও কলং সুতী বাম পার্শ্বের প্রধান নদনদী ও উহার কতকগুলি শাখানদী নাব্য। আর, ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের প্রধান বাণিজ্যপথ। আসামের নদনদীগুলি সময় সময় প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। এই রূপ প্রবল বন্যা সৃষ্টি হইবার হেতু, সম্ভবতঃ গত ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ঢালের পরিবর্তন, নদী বাহিত পললরাশি নদীগর্ভে সঞ্চয়ন এবং পার্বত্যভূমির অরণ্যের ধ্বংস-সাধন।

ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮০-এর-অধিক) হইলেও গৌহাটির নিকটবর্তী অঞ্চল খাসি-পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। এই উপত্যকায় এপ্রিল-মে মাসে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত (২০%) হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা প্রায় ৮০° ফা, থাকে। এইজন্য ইহার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে। ঐ স্থানে বিশপ, বোগাপোমা, শিশু, গর্জন (হোলাং), নাহার প্রভৃতি উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ ও মূল্যবান বৃক্ষ ; শাল, মাকাই, সেগুন, বহরা, গমারী, জারুল, শিমূল প্রভৃতি মৌসুমী অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। আর, বাঁশ ও বেত প্রচুর পাওয়া যায়। আসাম-রাজ্যে প্রায় ২১,০০০ বর্গমাইল বনভূমি আছে, তন্মধ্যে ৬,৭০০০ বর্গমাইল সংরক্ষিত বনভূমি। তাই, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে আসামেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্থানে বনভূমি আছে। এই অরণ্য আসামের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ্‌। বনভূমি হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও কাষ্ঠ হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু নির্মাণ করা এই রাজ্যের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। হোলাং, নাহার ও শাল কাঠ

হইতে রেলপথের স্লিপার তৈয়ারী হয়। মার্ঘেরিটায় ছোলাং-কাঠ হইতে রেলপথের স্লিপার তৈয়ারীর বড় কারখানা আছে। মাকাই-কাঠ হইতে চায়ের বাক্স তৈয়ারী হয়। দিয়াশলাই-শিল্পে শিমূল কাঠ; বাড়ী-ঘর, নৌকা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে গমারী-কাঠ বিশেষ ব্যবহার করা হয়। পলাশ ও কুলগাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। **চাপেরমুখে লাক্ষা** তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইবে। মুনিগাছের পাতা রেশমকীটের খাদ্য। এই গাছের চাষ হয় ও রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। এই রাজ্যে যথেষ্ট বাঁশ পাওয়া যায় বলিয়া **লৌসাখাং**-এ কাগজমণ্ড প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। আর, ধুবড়ীর দিয়াশলাই-এর কারখানা উল্লেখযোগ্য।

শিবসাগর জেলার **কাজিরঙ্গা** নামক স্থান ও গোয়ালপাড়া জেলার ভূটানের সীমান্তে একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্থান দুইটির সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজিরঙ্গায় বহু গণ্ডার স্বাভাবিক পরিবেশে রহিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার ভূমি উর্বর বলিয়া ইহা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। **ধান** ও **পাট** ইহার কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ছাড়া, ইক্ষু, আদা, তামাক, সরিষা প্রভৃতি জন্মায়। ভারতের অর্ধেকের কিছু বেশী **চা** এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। লক্ষীমপুর ও শিবসাগর জেলায় অধিকাংশ চা-বাগান রহিয়াছে—প্রায় ৪ লক্ষ একর জমিতে চা-এর চাষ হয় ও সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। **লিডু** ও **মার্ঘেরিটায়** কয়লা এবং **ডিগবয়ের** নিকটে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এখানে খনিজ তৈল পরিশোধন হয়। বর্তমানে **নহরকাটিয়া, নাও-হোলিয়া, মোরান** ও **হুগরিজান** নামক স্থানে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই খনিগুলি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আর, তৈল উত্তোলন করিয়া গৌহাটি ও বিহারের বারুণিতে নলযোগে পাঠান হইবে। ঐ দুইটি স্থানে তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। আসাম-রাজ্য শিল্পে অগ্রসর হয় নাই,—উমট্রু-এ সিমেন্ট, লৌসাখাং-এ কাগজমণ্ড, দেরগাঁ-এ চিনি, চাপেরমুখে লাক্ষা, শোয়ালকুচিতে

রেশম-এর কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। কুটীর-শিল্পের মধ্যে বস্ত্র-বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য।

গৌহাটি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও আসামের বৃহত্তম শহর। কারণ, ইহা রেলপথ, জলপথ ও রাজপথের কেন্দ্রস্থলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। ইহার নিকট পাণ্ডুতে ব্রহ্মপুত্রের উপর পুল তৈয়ারী হইলে ও তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপিত হইলে ইহার গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট আছে। ইহার নিকটস্থ **পাণ্ডু** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের কেন্দ্র ; এবং **কামাখ্যা-পাহাড়** কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান। **ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, তেজপুর** ও **ডিব্রুগড়** ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান নগর। ডিব্রুগড়ে মেডিকেল কলেজ আছে। **শিবসাগর** শিবসাগর নামক দীঘির জন্য বিখ্যাত। এখানে কলেজ আছে। **তিনসুকিয়া** রেলজংশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকট বহু চা-বাগান আছে।

(খ) বরাক নদী-উপত্যকা—মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে বরাক নদী-উপত্যকা। ইহার তিন দিক পাহাড়-পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত। ইহাকে সুরমা-উপত্যকাও বলা হয়। বরাক নদী ও উহার দুইটি শাখানদী সুরমা ও কুশীয়ারা এই উপত্যকায় প্রবাহিত। এই উপত্যকার পূর্বাংশ মাত্র আসাম-রাজ্যের অন্তর্গত এবং ইহার আয়তনও কম। এখানে স্থানে স্থানে নিম্নভূমি আছে। বর্ষাকালে ঐ নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া বিলের আকার ধারণ করে। এখানে বহু ছোট-বড় নদী প্রবাহিত হইতেছে। বরাক নদী নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া মণিপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং পরে কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বৃষ্টিবহুল (১০০"-এর অধিক) অঞ্চল বলিয়া ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধান, চা, পাট, কমলালেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি ইহার কৃষিজাত দ্রব্য। **শিলচর** এই অঞ্চলের প্রধান নগর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

পরিবহন-ব্যবস্থা—আসাম-রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর কোন সেতু নাই। তাই, এই রাজ্যের ঐ নদের উত্তরপার্শ্বের ও দক্ষিণপার্শ্বের রেলপথ বা রাজপথ

দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত নহে। বর্তমানে পাণ্ডুর নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মিত হইতেছে; ইহার ফলে নদের উভয় পার্শ্বের রাজপথ ও রেলপথগুলির পরস্পর সংযুক্ত হইবে, আর বণিজ্য ও পরিবহনের সুবিধা হইবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ আসামে বিস্তৃত। ইহার প্রধান কেন্দ্র পাণ্ডু। এই রেলপথ মিটারগেজ; তাই, ইহার পরিবহন-ক্ষমতা অল্প। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু-নির্মাণ ও আমিনগাঁও-শিলিগুড়ি রেলপথ সুদৃঢ় করা হইতেছে। এইজন্য, অদূর ভবিষ্যতে রেলপথের এই অংশের পরিবহন-ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। গৌহাটির নিকট তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপনের জন্য রেল-পথের এই অংশে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ খনিজ তৈল বাহিত হইবে। আসামের রেলপথগুলি দুইটি অংশে বিভক্ত,—ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাঞ্চলের এবং দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথ। প্রথম অংশে আমিনগাঁও-ফকিরগ্রাম-আলিপুরদুয়ার প্রধান রেলপথ এবং ধুবড়ী- ও তেজপুর-শাখা। দ্বিতীয় অংশে পাণ্ডু-লামডিং-তিনসুকিয়া প্রধান রেলপথ এবং কতকগুলি শাখা-রেলপথ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ডিব্রুগড়-তিনসুকিয়া-লিডু, লামডিং-বদরপুর-শিলচর শাখা-রেলপথগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাঞ্চলে উত্তর-ট্রাঙ্ক রোড এবং ঐ নদের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ-ট্র্যাঙ্ক রোড বিস্তৃত। ইহাছাড়া, গৌহাটি-শিলং রোড, মণিপুর রোড, কাছাড় ট্রাঙ্ক রোড অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজপথ। এই রাজ্যের বিমানপথ অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। কারণ (১) ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আসাম দূরে অবস্থিত, (২) আসাম-সংযোগ রেলপথ সুদীর্ঘ বলিয়া যাতায়াত সময়সাপেক্ষ, এবং (৩) বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিলে ঐ রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। এই সকল কারণে এই রাজ্যের সহিত ভারতের বিভিন্ন অংশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পরস্পর যোগাযোগ বিমানপোতের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। কলিকাতা হইতে গৌহাটি, তেজপুর, ডিব্রুগড়, ঝোড়হাট ও শিলচরে নিয়মিতভাবে বিমানপোত যাতায়াত করে।

জলপথই আসামের প্রধান বণিজ্যপথ। এই পথে কলিকাতার সহিত এই রাজ্যের অধিকাংশ বাণিজ্য চলে, কিন্তু এই জলপথ বিদেশী রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানের

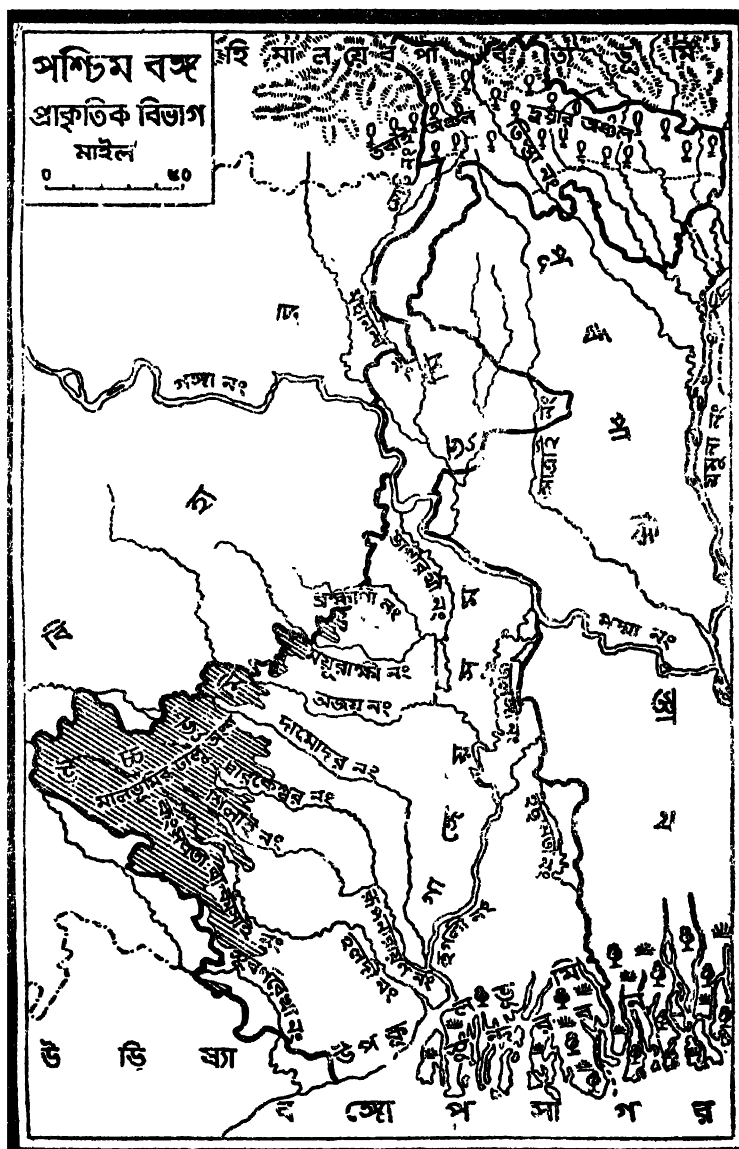
মধ্য দিয়া গিয়াছে। ধুবড়ী হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদে স্টীমারগুলি যাত্রী ও মালপত্র লইয়া যাতায়াত করে। কাছাড় জেলায় বরাক ও সুরমা নদীপথে স্টীমারগুলি মালপত্র ও যাত্রী বহন করে। ইহাছাড়া, ধনশিরি, মানস প্রভৃতি নদীতে ছোট ছোট স্টীমার ও নৌকা যাতায়াত করে। অন্যান্য বহু নদনদীতে নৌকা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

অধিবাসী ও লোকবসতি—আসাম রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার; তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ সমভূমিতে এবং ১২ লক্ষ ৪০ হাজার পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। আর, প্রতি বর্গমাইলে গড় ঘনত্ব ১৮৬; তাহার মধ্যে সমভূমিতে ২৪০ এবং পার্বত্য স্থানে ৩৫ জন। আবার, পল্লীগ্রামে ৮৬ লক্ষ এবং শহরে ৪ লক্ষ লোকের বসতি। ৬৬ লক্ষ লোকের উপজীবিকা কৃষিকার্য। চা-বাগানের শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। এই রাজ্যে বহু আদিবাসী লোকের বাস (৩৭%)।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত। গত ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য-পুনর্গঠন আইন ও সংবিধান (সংশোধন) আইনের দ্বারা এই রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে,—বিহার-রাজ্যের মানভূম জেলার পুরুলিয়া-মহকুমার পাঁচটি থানা ছাড়া বাকী ১৭টি থানা (২,৩৯৮ ব. মা.) এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ-মহকুমার পূর্বাংশ (৭৫৯ ব. মা.) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথমটি পুরুলিয়া জেলা নাম ধারণ করিয়া বর্ধমান বিভাগের এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ-মহকুমার অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে। আর, দ্বিতীয় অংশটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৩৩,৯২৭ বর্গমাইল।

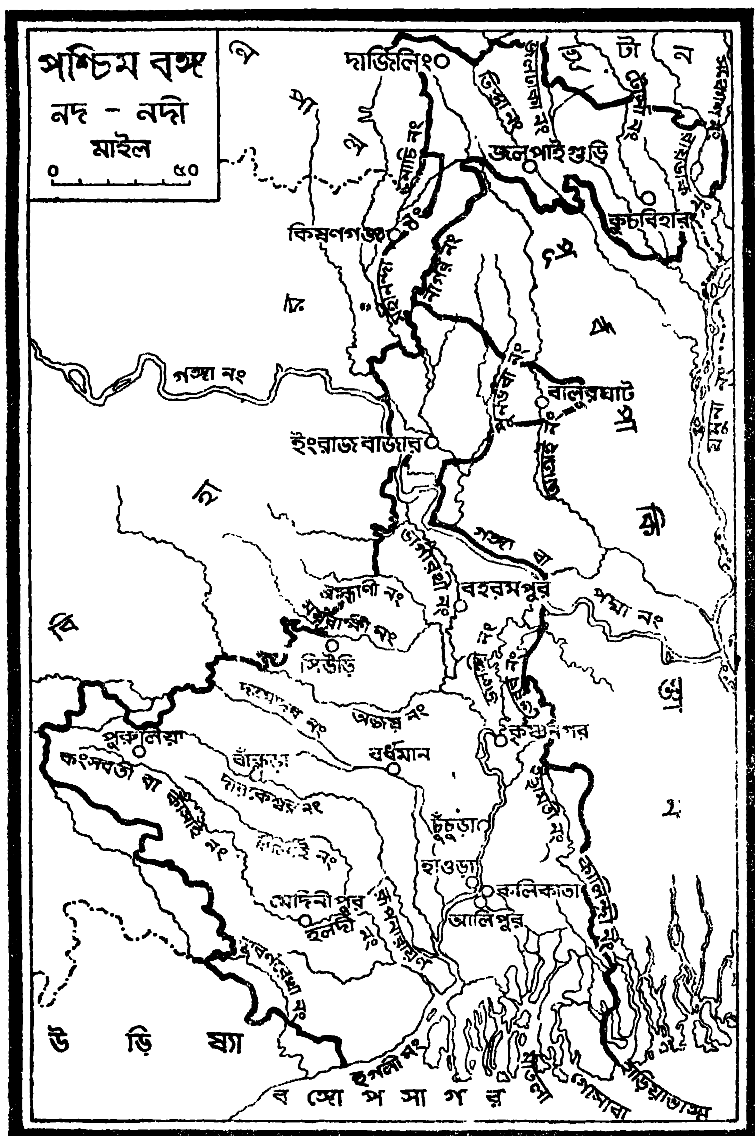
প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উহাদের বিভিন্ন অংশ (The Regions and their sub-divisions)—পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পাললিক সমভূমি হইলেও


পশ্চিম বঙ্গ
প্রাকৃতিক বিভাগ
মাইল
0
৫০
গঙ্গা নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
পদ্মা নং
উ ড়ি ষ্যা

ইহার উত্তরাংশে ও পশ্চিমাংশে উচ্চভূমি আছে ; আবার, সমভূমি-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের বাড়ীঘর, খাদ্য, পোষাক ও জীবিকার মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তাই, এই রাজ্যের সমগ্র সমভূমি-অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। নিম্নে প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উহাদের বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইল।

(১) **হিমালয়-অঞ্চল**—দার্জিলিং জেলার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত। হিমালয় পর্বতমালার শাখা-শৈলশিরাসমূহ ও তন্মধ্যস্থ নদী-উপত্যকা লইয়া ইহা গঠিত। তিস্তা, মেচি, মহানন্দা, বালসন, জলঢাকা প্রভৃতি নদনদী এখানে প্রবাহিত। আর, ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। অবশ্য বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বিভিন্ন অংশের শৈলশিরার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উচ্চতাভেদে জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্রকৃতির,—৪০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত মৌসুমী-অঞ্চলের চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ, ৪০০০-৬০০০ ফুট পর্যন্ত ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং উহা অপেক্ষা অধিক উচ্চে পাইন জাতীয় বৃক্ষ জন্মে ; আর উচ্চতার জন্য তাপমাত্রা কম ; দার্জিলিং শহরের জুলাই ও জানুয়ারির গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬১° ফা. ও ৪০° ফা. (প্রসর ২১° ফা.)। ভুট্টা, যব, আলু ও ধান এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। চা আর একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। দার্জিলিং উৎকৃষ্ট চা-উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে, ইহার পরিমাণ অধিক নহে—দুয়ার- ও তরাই-অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। দার্জিলিং-এর কমলালেবু নামে পরিচিত লেবুগুলি প্রধানতঃ সিকিম হইতে আমদানি হয়। মংপুতে সিঙ্কোনা গাছ জন্মে। উহার ছাল হইতে কুইনিন প্রস্তুত হয়।

দার্জিলিং-এর আদিবাসীরা লেপ্‌চা নামে পরিচিত। বর্তমানে এখানে বহু নেপালী আসিয়া বসবাস করিতেছে। আর, অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, পশুপালক বা চা-বাগানের শ্রমিক। লোকবসতির ঘনত্বও কম। **দার্জিলিং** প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস। এখান হইতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নিকটস্থ টাইগারহিল হইতে সূর্যোদয়ের সময় এভারেস্ট শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য বিদেশী পর্যটকগণ এখানে বেড়াইতে আসেন। **কার্শিয়াং** মহকুমা-শহর ও শৈল-


পশ্চিম বঙ্গ
নদ - নদী
মাইল
০ ৫০
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
কিষণগঞ্জ
বালুরঘাট
গঙ্গা নং
ইংরাজবাজার
ভাগীরথী নং
বহরমপুর
পদ্মা নং
ব্রহ্মাণী নং
ময়ূরাক্ষী নং
সিউড়ি
অজয় নং
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
কৃষ্ণনগর
কংসবতী বা কাঁসাই নং
দ্বারকেশ্বর নং
চুঁচুড়া
হাওড়া
কলিকাতা
আলিপুর
মেদিনীপুর
হলদী নং
সুবর্ণরেখা নং
উ ড়ি ষ্যা
হুগলী নং
ব ঙ্গো প সা গ র

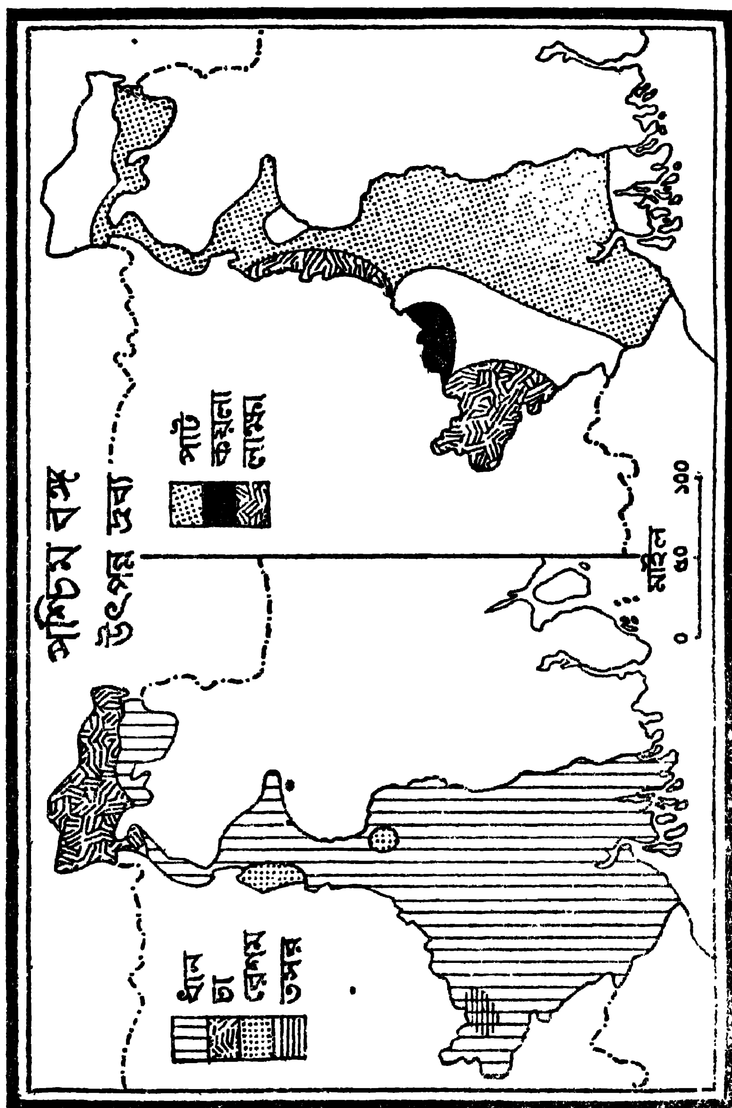
পশ্চিম বঙ্গ
রাজনৈতিক
প্রদেশের সীমানা
জেলার ,,
রেলপথ
০ ৫০ মাইল

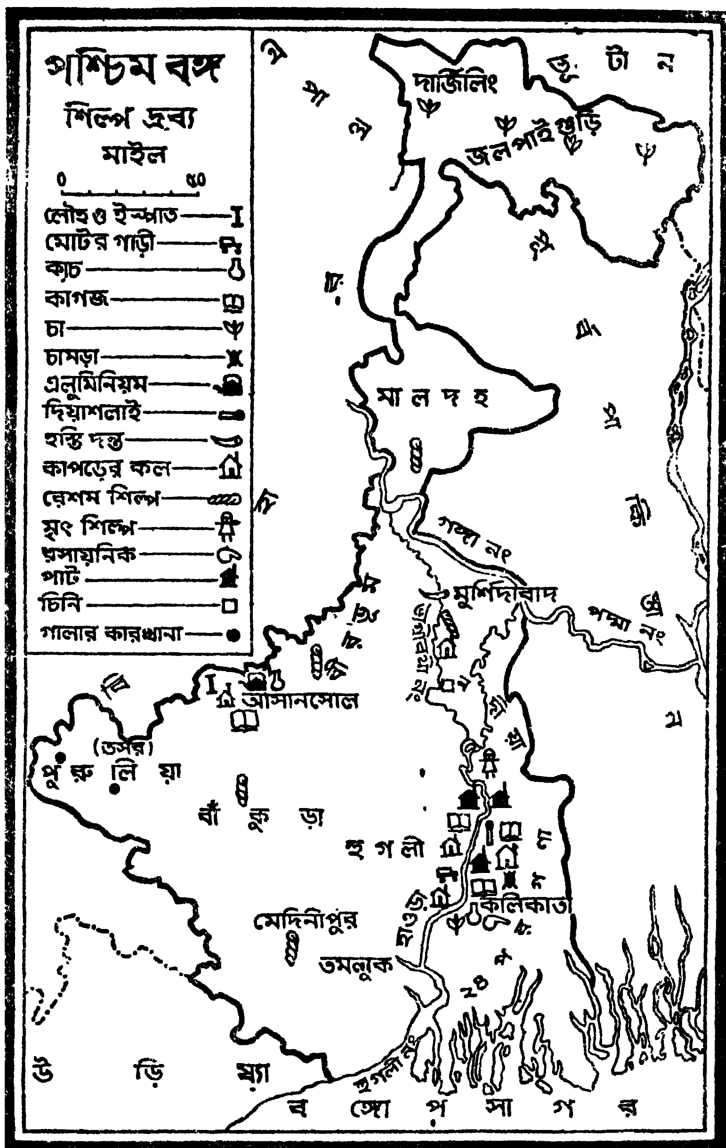
ভুটান
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কুচবিহার
ইসলামপুর
রায়গঞ্জ
দিনাজপুর
বালুরঘাট
ইংরেজবাজার
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
বরাকর নং
রামপুরহাট
সিউড়ী
বহরমপুর
পদ্মা নং
চিত্তরঞ্জন
দামোদর নং
আসানসোল
বোলপুর
কাটোয়া
বর্ধমান
কৃষ্ণনগর
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
চুঁচুড়া
বনগ্রাম
ব্যারাকপুর
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
আলিপুর
২৪-পরগণা
খড়গপুর
ডায়মণ্ডহারবার
হলদী নং
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

নিবাস। এখানে যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল আছে। **কালিম্পং** আর একটি মহকুমা-শহর ও শৈলনিবাস। তিব্বতের সহিত ইহার বাণিজ্য চলে; তবে, চীন তিব্বত অধিকার করিবার পর ঐরূপ বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। শিলিগুড়ি হইতে কার্শিয়ং হইয়া রাস্তা ও ন্যারো-গেজ রেলপথ দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত। আর, শিলিগুড়ি হইতে জাতীয় সড়ক তিস্তা-উপত্যকার মধ্য দিয়া সিকিমে প্রসারিত।

(২) **তরাই ও-ডুয়ার-অঞ্চল**—ইহা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পাদ-সমভূমি (Piedmont Alluvial Plains—১৮৭ পৃঃ দেখ)। ইহা দার্জিলিং জেলায় তরাই ও জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্স বা দুয়ার নামে পরিচিত। হিমালয় পর্বতের পশ্চিমাংশের পাদদেশের শিবালিক পর্বতের ন্যায় কোন পর্বত এখানে দেখা যায় না,—এই অংশে সমভূমি হইতে হিমালয় সুউচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের উত্তরাংশের উচ্চতা ১২-১৫০০ ফুট, তবে স্থানে স্থানে শাখা-শৈলশিরা প্রসারিত হইয়াছে,—বক্সাদুয়ারের নিকটস্থ একটি পর্বত-শৃঙ্গের উচ্চতা ৬,৩১৪ ফুট। মেচি, মহানন্দা, বালসন, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, সঙ্কোস প্রভৃতি নদনদী এখানে প্রবাহিত। উচ্চ পার্বত্যভূমি হইতে নদীগুলি প্রবল বেগে সমভূমিতে অবতরণ করিতেছে। তাই সমভূমিতে ইহাদের স্রোতোবেগ সহসা মন্দীভূত হয়; তখন স্রোতবাহিত ছোট-বড় শিলাখণ্ড, বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি নদীগর্ভে বা পার্শ্বদেশে সঞ্চিত হয়। আর, নদীর প্রবাহপথ মজিয়া যাইলে নদী নূতন ধারাপথ সৃষ্টি করে। এইজন্য, এই অঞ্চলে সময় সময় প্রবল বন্যা দেখা যায় ও নদীর গতিপথ সহসা পরিবর্তিত হয়। এই সকল কারণে এই স্থানের অধিকাংশ মৃত্তিকা নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের দ্বারা গঠিত,—মৃত্তিকা প্রধানতঃ বালুকাময় বা কঙ্করময় (Gravel, sand, silt); তবে মৃত্তিকায় যথেষ্ট হিউমস (Humus) রহিয়াছে।

এই অঞ্চল বৃষ্টিবহুল (১২০″—১৫০″) বলিয়া ইহার জলবায়ু বিশেষ আর্দ্র। ইহার এক-চতুর্থাংশ অরণ্যময়। এখানে প্রধানতঃ শাল বৃক্ষ জন্মিলেও স্থানে স্থানে দীর্ঘাকৃতি এক প্রকার তৃণ বা নল-খাগড়ার অরণ্য দেখা যায়। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বনভূমি। বনভূমি হইতে প্রচুর কাষ্ঠ ও অন্যান্য অরণ্যজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্যে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ, সাপ প্রভৃতি বন্য


পশ্চিম বঙ্গ
উৎপন্ন দ্রব্য
ধান
চা
রেশম
তসর
পাট
কয়লা
লাক্ষা
মাইল
০ ৫০ ১০০


পশ্চিম বঙ্গ
শিল্প দ্রব্য
মাইল
০ ৫০
লৌহ ও ইস্পাত
মোটর গাড়ী
কাচ
কাগজ
চা
চামড়া
এলুমিনিয়ম
দিয়াশলাই
হস্তি দন্ত
কাপড়ের কল
রেশম শিল্প
মৃৎ শিল্প
রসায়নিক
পাট
চিনি
গালার কারখানা
দার্জিলিং
ভু টা ন
জলপাইগুড়ি
মালদহ
গঙ্গা নং
মুর্শিদাবাদ
পদ্মা নং
আসানসোল
(তসর)
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
কলিকাতা
হাওড়া
মেদিনীপুর
তমলুক
২৪
উড়িষ্যা
হুগলী নং
বঙ্গোপসাগর

জীবজন্তুর বাসভূমি। আর, বর্তমানে এই বনভূমির অংশবিশেষ পরিষ্কার করিয়া চা-বাগানে পরিণত করা হইয়াছে। এই রাজ্যের দুই লক্ষ একর চা-বাগানের অধিকাংশ এই স্থানে রহিয়াছে। ধান, পাট, তামাক ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য। আসাম-প্রবেশ সড়ক ও আসাম-সংযোগ রেলপথ এই অঞ্চলকে অতিক্রম করিয়াছে। ঐ জাতীয় সড়ক ও রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ইহাদের দ্বারা আসাম রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত। এই স্থানের লোকবসতি কম। চা-বাগানে বহু অবাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। তরাই-এর **শিলিগুড়ি** প্রসিদ্ধ রেল-জংশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা দার্জিলিং জেলার মহকুমা-শহর। ইহার কিছুদূরে **বাগডোগরায়** বিমান-স্টেশন আছে। **আলিপুর দুয়ার** জলপাইগুড়ি জেলার মহকুমা-শহর ও রেল-জংশন।

(৩) **পশ্চিমের উচ্চভূমি-অঞ্চল**—বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্গত। ইহা ছোটনাগপুর-মালভূমির পূর্বাংশ। ইহা নদী-উপত্যকা, তরঙ্গায়িত সমভূমি ও পেনিপ্লেন লইয়া গঠিত। আর, স্থানে স্থানে ক্ষয়জাত পাহাড় রহিয়াছে। সাধারণতঃ প্রাচীন কেলাসিত-শিলা ও নদী-উপত্যকায় বিশেষতঃ দামোদর ও অজয় নদের উপত্যকায় গোণ্ডওয়ানা শ্রেণীর শিল দেখা যায়। গোণ্ডওয়না-শিলায় কয়লা ও কেলাসিত-শিলায় অল্প-বিস্তর লৌহ-, ম্যাঙ্গানিজ-, অভ্র-আকর ও কেওলিন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের রাণীগঞ্জ-কয়লার খনি-অঞ্চল ভারতবিখ্যাত। এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভের কয়লার স্তর বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সম্প্রসারিত। ভারতের ৩০% অংশ কয়লা এই সকল খনি হইতে উত্তোলিত হয়। দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসবতী, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত। এই স্থান প্রধানতঃ ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত। ইহাতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্ষারক পদার্থ বা হিউমস (Humus) সামান্যই থাকে বলিয়া ইহার উর্বরতা শক্তি কম। আবার, স্থানবিশেষ কঙ্করময় বা শিলাময় তরঙ্গায়িত ভূমি। আর, বহু অংশের ঐ প্রকৃতিভূমি উদ্ভিজ্জের আবরণশূন্য। তাই, বৃষ্টিপাতের জল সহজে ও দ্রুত নিকাশ হয়, ফলে ভূমি শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠের আবরণের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে জলের দ্বারা অপসারিত

বর্ধমান বিভাগ

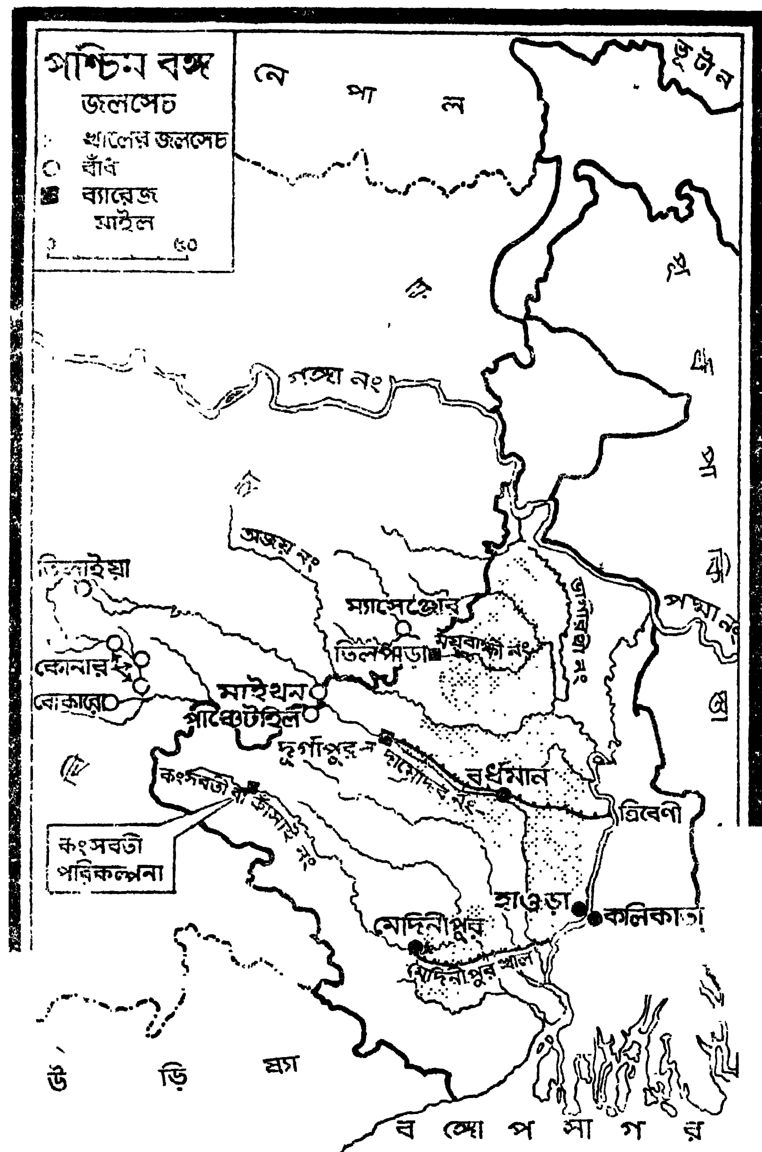
বিভাগের সীমানা ——
জেলার ,, ...
জেলার সদর ---- ●
প্রসিদ্ধ স্থান ---- ○
রেলপথ ----
০ ১৬ ৩২ মাইল

নলহাটি
রামপুরহাট
সিউড়ী
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
শান্তিনিকেতন
বোলপুর
অণ্ডাল
কাটোয়া
ঝালদা
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
কালনা
মেমারি
বিষ্ণুপুর
তারকেশ্বর
চুঁচুড়া
গড়বেতা
শ্রীরামপুর
হাওড়া
মেদিনীপুর
খড়গপুর
কাঁথি
বঙ্গোপসাগর

হয় অর্থাৎ ইহার ভূমির ক্ষয়সাধন সমধিক। এইজন্য নদনদীগুলি শীঘ্র শীঘ্র মজিয়া যায় ও বন্যা সৃষ্টি করে।

এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০"—৫৫"। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তারতম্য এখানে বিশেষ দেখা যায়। এই স্থানের গ্রীষ্মের মাত্রাও কিছু বেশী। তাই, এই রাজ্যের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এই অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। এখানে স্থানে স্থানে শাল, পিয়াল, মহুয়া, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে; তবে, ডুয়ারের বনভূমির মত গভীর নহে। ক্রমনিম্ন ভূমির স্থানে স্থানে বাঁধ (contour line-এর নিম্নে) নির্মাণ করিয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাঁধের পর ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে বলিয়া উহা হইতে সহজে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা যায়। ডাঙ্গা বা উচ্চভূমির বৃষ্টিপাতের জল গড়াইয়া ঐরূপ জলাশয়ে সঞ্চিত হয়। বৃষ্টিপাতের জলে পুষ্ট বলিয়া জলাশয়গুলি প্রধানতঃ সাময়িক। কারণ, কোন বৎসর বৃষ্টিপাত কম হইলে উহাতে জল বিশেষ সঞ্চিত হয় না; ফলে যখন কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন তখন সেচের জন্য জল পাওয়া যায় না; আর, পলি সঞ্চিত হইয়া ঐগুলি অগভীর হইয়া যায়। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। আর, গম, ভুট্টা, ছোলা, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে বনভূমি হইতে তসরগুটি সংগ্রহ করা হয় এবং পলাশ, কুসুম, কুল প্রভৃতি গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থান লাক্ষাশিল্পের কেন্দ্র। অধিবাসীদের কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা হইলেও এই অঞ্চলে খনির কার্যে ও শিল্পে বহুলোক নিযুক্ত আছে। খনি বা শিল্পঅঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র লোকবসতি কম।

এই অনুর্বর অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ্ রহিয়াছে,—কয়লার খনিগুলি এখানে অবস্থিত। তাই, এই রাজ্যের ইহা অন্যতম প্রধান শিল্প-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কারণ, কয়লাকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে। এইজন্য অর্থনীতি-বিদ্যার বিচারে কলিকাতা-শিল্প-অঞ্চল ব্যতীত ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল বলা যায়। আর, কলিকাতা-শিল্প-অঞ্চল



পশ্চিম বঙ্গ
জলসেচ
খালের জলসেচ
বাঁধ
ব্যারেজ
মাইল
নেপাল
ভূটান
গঙ্গা নং
অজয় নং
তিলাইয়া
ম্যাসেঞ্জোর
তিলপাড়া
ময়ূরাক্ষী নং
মাইথন
পাঞ্চেটহিল
দুর্গাপুর
দামোদর নং
বর্ধমান
ত্রিবেণী
ভাগীরথী নং
পদ্মা নং
কংসবতী
কাঁসাই নং
কংসবতী পরিকল্পনা
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
মেদিনীপুর খাল
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

পরোক্ষভাবে প্রধানতঃ এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। কারণ, রাণীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি না থাকিলে কলিকাতা সম্ভবতঃ বিরাট শিল্পঅঞ্চলে পরিণত হইত না।

চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন, সীতারামপুরের কেবল, সূর্যনগরের কার্পাস-বস্ত্র, অনুপপুরের এ্যালুমিনিয়াম, আসানসোলের নিকটস্থ সাইকেল ও কাচের চাদর, বার্ণপুরের লৌহ-ইস্পাত ও রেলগাড়ী-নির্মাণ, কুলটির লৌহ, রাণীগঞ্জের কাগজ প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দুর্গাপুরে লৌহ-ইস্পাতের যে বিরাট কারখানা নির্মিত হইতেছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কাচ (optical glass), খনির যন্ত্রাদি, রাসায়নিক সার, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কোলগ্যাস প্রভৃতি শিল্প স্থাপিত হইতেছে বা হইবে। এখানে ডি. ভি. সি. ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বিরাট তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। রাণীগঞ্জ কয়লার খনি-অঞ্চলে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও কল-কারখানা স্থাপিত হইবে, ইহার হেতু,—(১) এই স্থানে প্রচুর উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায় এবং ঝরিয়ার কয়লার খনি নিকটেই অবস্থিত; (২) ডি. ভি. সি. হইতে তড়িৎশক্তি ও জল পাইবার সুবিধা আছে; (৩) দুর্গাপুরের কারখানা হইতে কোক-কয়লা ও কোলগ্যাস পাওয়া যাইবে; (৪) এই অঞ্চলের পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত,—(ক) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বহু শাখা ও প্রধান-রেলপথ রহিয়াছে, (খ) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে, (গ) দুর্গাপুর-ত্রিবেণী নাব্য খাল হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত বলিয়া জলপথে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে; (৫) কলিকাতা-বন্দর নিকটে অবস্থিত বলিয়া বিদেশের সহিত বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে; (৬) জামসেদপুর বা টাটানগরের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল এবং উড়িষ্যা ও সিংভূমের লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, চুণাপাথরের খনিগুলির দূরত্ব ১৫০ মাইলের অধিক নহে বলিয়া কাঁচা মাল আনিবার সুবিধা রহিয়াছে; (৭) এখানে যথেষ্ট শ্রমিক পাওয়া যায়, এবং (৮) কলিকাতা-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা প্রচুর।

আসানসোল কয়লা-খনি অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা এই স্থানের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রেল-জংশন। **রাণীগঞ্জ** বাণিজ্যপ্রধান নগর। **বরাকর**

আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর। **চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর** ও **দুর্গাপুরের** বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। **পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর** ও **সিউড়ী** জেলার সদর-শহর। **খড়গপুর** রেল-জংশন। এখানে রেলওয়ের বড় কারখানা আছে। ইহার নিকটস্থ হিজলীতে উচ্চ কারিগরী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) **প্রাচীন পাললিক সমভূমি-অঞ্চল**—পশ্চিমের উচ্চভূমির পূর্ব-পার্শ্বে এবং নবীন পাললিক সমভূমির পশ্চিমে এই অঞ্চল অবস্থিত। তাই, বর্ধমান বিভাগের মধ্যাংশ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের ভূমি প্রধানতঃ সমতল হইলেও স্থানবিশেষ তরঙ্গায়িত এবং স্থানে স্থানে ডাঙ্গা বা অনুচ্চভূমি রহিয়াছে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা এঁটেল হইলেও কোন কোন অংশে দো-আঁশ বা বেলেমাটি দেখা যায়। আর, নদী-উপত্যকা উর্বর। এই অঞ্চলের ময়ূরাক্ষী, ও উহার উপনদীগুলি, অজয়, দামোদর, কংসবতী, শিলাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত। এই স্থানের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৫"—৬০"। তাই, ইহার জলবায়ু কতকটা আর্দ্র। এখানে বনভূমি নাই। এখানে ময়ূরাক্ষী (৬ ল. এ), দামোদর (১০ ল. এ) ও মেদিনীপুর-সেচখাল রহিয়াছে। তাই, ইহা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। আমন ধানই এই স্থানের প্রধান ফসল (কৃষিক্ষেত্রের ৯০%) এবং ডাল, আলু, ইক্ষু অন্যান্য ফসল। এখানে পাট অতি সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের চাউলের কল ও তৈলকল (সরিষা) ভিন্ন অন্য কলকারখানা বিশেষ নাই। বীরভূম জেলার আহম্মদপুরে চিনির কল তৈয়ারী হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-মহকুমা, বীরভূম জেলার রামপুরহাট-মহকুমা, বর্ধমান জেলার কাটোয়া-মহকুমা এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-মহকুমায় তাঁতে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলি ধান-চাউলের বাণিজ্যকেন্দ্র, যথা—**বোলপুর, সাঁইথিয়া, গুসকরা, বর্ধমান, কাটোয়া** প্রভৃতি। বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত শান্তিনিকেতনের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৫) **সমুদ্র-উপকূলের নিম্নভূমিঅঞ্চল**—ইহাকে দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—

(ক) **সুন্দরবন-অঞ্চল**—চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ ইহার অন্তর্গত। বর্তমানে ইহার আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গমাইল, তবে ইহার অর্ধাংশ জলভাগ, কারণ, এই অঞ্চল যেন নদনদীর জালবুনানি—এখানে বহু ছোট-বড় নদনদী প্রবাহিত। তন্মধ্যে হুগলী (সুন্দরবনের দক্ষিণভাগের পশ্চিম-প্রান্তে), মাতলা, রায়মঙ্গল, বিদ্যা, গোসবা, ঠাকুরাণী, বড়তলা, বিদ্যাধরী উল্লেখযোগ্য নদনদী। পশ্চিমবঙ্গের পদ্মা বা গঙ্গার শাখানদীগুলি মজিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে; তাই এই নদীগুলি দিয়া মিঠা জল বিশেষ প্রবাহিত হয় না, বর্ষাকালে কেবলমাত্র হুগলী নদী দিয়া প্রচুর মিঠা জল প্রবাহিত হয়। এইজন্য, সুন্দরবনের নদীগুলির জল লবণাক্ত; তবে বর্ষাকালে লবণের পরিমাণ কম। বিদ্যাধরী ও আর দুই-একটি নদীর উচ্চ অংশ মজিয়া যাওয়ায় চব্বিশ-পরগণা জেলার অংশবিশেষের জলনিকাশ সুচারুরূপে হয় না। ফলে স্থানে স্থানে উর্বর ভূমি জলাভূমিতে পরিণত হইতেছে।

এই অঞ্চলে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে বলিয়া ইহার নামকরণ সুন্দরবন হইয়াছে। বর্তমানে সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গ-অংশে সুন্দরী বৃক্ষ বিশেষ দেখা যায় না। এখানে গড়ান, গেঁওয়া, গোলপাতা প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিজ্জের বনভূমি রহিয়াছে। এই বনভূমিতে বাঘ, হরিণ, সাপ ও জলে কুমীর প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু দেখা যায়। আর, বন্য জন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, কারণ ইহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ হরিণের সংখ্যা। বনভূমি হইতে যাহা আয় হয়, তাহা বন-সংরক্ষণে ব্যয় হয়। কাঠ, মধু, মোম, গোলপাতা, হোগলা প্রভৃতি বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয় এবং নদনদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। চূণ তৈয়ারী করিবার জন্য ঝিনুকও সংগ্রহ করা হয়। মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা, মৎস্য-শিকারে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন (মোটর বোট, আধুনিক জাল প্রভৃতি), সংরক্ষণ, পরিবহন প্রভৃতি সু-ব্যবস্থা এখানে সেরূপ বর্তমান নাই বলিয়া মৎস্য-বাণিজ্য সুচারু-রূপে গঠিত হয় নাই। কাক-দ্বীপ নামক স্থানে মৎস্য-বন্দর

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

বিভাগের সীমানা
জেলার ,,
জেলার সদর
প্রসিদ্ধ স্থান
রেলপথ
0 ৫০ মাইল

দার্জিলিং
কালিম্পং
ভুটান
কার্শিয়াং
বাগ্রাকোট
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
আলিপুর দুয়ার
কুচবিহার
দিনহাটা
সিতালদহ
ইসলামপুর
কিষণগঞ্জ
রায়গঞ্জ
দিনাজপুর
গঙ্গা নং
বালুরঘাট
মালদহ
ইংরেজবাজার
গৌড়
জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ
লালবাগ
বহরমপুর
পদ্মা নং
কান্দি
পলাশী
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
শান্তিপুর
রাণাঘাট
বনগ্রাম
ব্যারাকপুর
দমদম
বারাসত
বজবজ
কলিকাতা
আলিপুর
২৪ পরগণা
ডায়মণ্ডহারবার
কুলপী
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। তাই, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবে।

সুন্দরবন-অঞ্চল প্রধানতঃ লবণাক্ত এঁটেল মাটিতে গঠিত। মৃত্তিকার লবণ-ভাগ বৃষ্টিপাতের জলের দ্বারা দূরীভূত হইলে তখন উহাতে প্রচুর আমন ধান জন্মায়। তবে ভূমি অতিনিম্ন বলিয়া জোয়ারের লবণাক্ত জলে প্লাবিত হয়। এইজন্য কৃষি-ক্ষেত্রের চারিদিকে উচ্চ বাঁধ তৈয়ারী করা হয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ঐরূপ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং বাঁধগুলির সংরক্ষণ ব্যয়ও যথেষ্ট। এই অঞ্চলের জলসেচের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনাবৃষ্টি হইলে ধানগাছ শুকাইয়া যায়; আবার প্রবল জোয়ারের জলের চাপে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এই কারণে প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরিমাণে ধান পাওয়া যায় না। তবুও, কোন কোন বৎসর এই অঞ্চলে প্রচুর ধান জন্মায়। পূর্ব-পাকিস্তান ও আসামের স্টীমার-পথ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে কোন উল্লেখযোগ্য নগর নাই। কাক-দ্বীপ, ক্যানিং প্রভৃতি স্থানে সুন্দরবনের বাণিজ্য বিশেষভাবে চলে।

(খ) মেদিনীপুর জেলার উপকূলের নিম্নভূমি—এই নিম্নভূমি উর্বর পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। কাঁথির নিকট উপকূলে বালিয়াড়ি দেখা যায়। হুগলী, রূপনারায়ণ, হলদি, রসুলপুর প্রভৃতি নদনদী এখানে প্রবাহিত। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬০"। তাই, ইহার জলবায়ু আর্দ্র। এখানে হিজলী-সেচ ও নাব্যখাল আছে। এই অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া, ডাল, পাট, নারিকেল, সুপারী, বাদাম প্রভৃতি জন্মায়। তাই, ইহা অন্যতম প্রধান কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ইহা অত্যন্ত ঘনবসতি-পূর্ণ (১০০০/ব. মা.) অঞ্চল। **কাঁথি** ও **তমলুক** মহকুমা-শহর। প্রাচীনকালে তমলুকের নিকট তাম্রলিপ্ত নামক একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। কাঁথির নিকটস্থ দীঘা স্বাস্থ্যনিবাস।

(৬) পাললিক সমভূমি-অঞ্চল—উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ভিন্ন এই রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ইহার অন্তর্গত। ইহা প্রধানতঃ নবীন পাললিক সমভূমি, কেবল-মাত্র মালদহ জেলার কতকাংশ প্রাচীন পাললিক সমভূমি। এই সমভূমি উত্তর

হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(ক) **জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার সমভূমি**—দুয়ারের দক্ষিণে এই অঞ্চল অবস্থিত। এখানে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, সঙ্কোস প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত। ইহার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০"। তাই, ইহার জলবায়ু অত্যন্ত আর্দ্র। আর, স্থানে স্থানে অরণ্য রহিয়াছে। ধান, পাট ও তামাক প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কুচবিহার জেলায় কতকগুলি চা-বাগান আছে। ইহা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সময় সময় নদীর বন্যায় বিশেষ অনিষ্ট হয়। তিস্তা নদী-তীরস্থ **জলপাইগুড়ি** প্রধান শহর। ইহা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **কুচবিহার** আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **দিনহাটা** তামাকের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে তামাকের গবেষণা কেন্দ্র আছে।

(খ) **পশ্চিম-দিনাজপুর ও মালদহ জেলার সমভূমি**—এই অঞ্চল উর্বর সমভূমি। উত্তরাংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক ১০০", আর দক্ষিণে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে,—মালদহ জেলায় ৫৫" মাত্র। মালদহ জেলায় বহু বিল বা জলাভূমি রহিয়াছে। মহানন্দা ও উহার উপনদী নগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা এবং আত্রাই নদী প্রবাহিত। কৃষণগঞ্জ-মহকুমার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথায় ধান ও পাট জন্মায়, কারণ এই অংশের মৃত্তিকা দো-আঁশ বা বেলে। পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার মৃত্তিকা সাধারণতঃ এঁটেল বা দো-আঁশ। এই স্থানে প্রচুর আমন ধান জন্মায়। তাহা ছাড়া, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ ও তামাক অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। মালদহ জেলায় দুইটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক-অঞ্চল রহিয়াছে—(১) বরেন্দ্রভূমি এবং (২) নিম্ন সমতলভূমি। বরেন্দ্রভূমি এঁটেল মৃত্তিকাযুক্ত তরঙ্গায়িত সমভূমি। আর, স্থানে স্থানে বিল বা নিম্নভূমি আছে। আমন ধানই প্রধান ফসল। এই জেলার অন্যান্য অংশ নবীন পাললিক সমভূমি। এই স্থানে আউশ ধান ও পাট প্রধান ফসল এবং এখানে গম, যব, ডাল, ইক্ষু প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। আর, এই অংশে আম বাগানগুলি দেখা যায়। এই স্থানের আম বিখ্যাত। কালিয়াচক ও মাণিকচক থানায় রেশমকীট প্রতিপালিত হয়।

মহানন্দা নদীতীরস্থ **মালদহ** বা ইংরেজবাজার আম- ও রেশম-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। **বালুরঘাট** আত্রাই নদীতীরস্থ শহর ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার সদর। রায়গঞ্জ এই জেলার মহকুমা-শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

(গ) **ভাগীরথী নদীর পুর্বের সমভুমি**—ইহা প্রধানতঃ ভাগীরথীর পুর্বে অবস্থিত; অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ, নদীয়া জেলা ও সুন্দরবন ভিন্ন চব্বিশ-পরগণা জেলা ইহার অন্তর্গত। তবে, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম-তীরের পার্শ্বে এক অপ্রশস্ত ভূ-ভাগ (Flood plain) ইহার অন্তর্গত বলা যায়। এই অঞ্চলে ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, চূর্নি, ইচ্ছামতী প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত। ইহারা পদ্মা বা গঙ্গার শাখানদী। এই স্থানে নদনদীগুলি মজিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী নদী সামান্য পরিমাণে জল বহন করে, কারণ গঙ্গা নদী হইতে নির্গমস্থানে চর সৃষ্টি হওয়ায় গঙ্গা নদী হইতে গ্রীষ্মকালে জল প্রবাহিত হয় না। আর, ইহার প্রবাহপথ অগভীর। এই স্থান গঙ্গার ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশ হইলেও ইহার গঠন-কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। তাই, ইহা বার্ধক্য অবস্থা (Moribund delta) প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে ইহার ভূমির উর্বরতা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। উহা কার্যকরী হইলে ভাগীরথী নদীপথে সারা বৎসর প্রচুর জল প্রবাহিত হইবে ও সকল সময় ঐ নদীটি নাব্য থাকিবে; আর, এই অঞ্চলে সেচখালের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হইবে। তাই, ফরাক্কা-বাঁধের উপর এই অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার তীরবর্তী স্থান অবশ্য উর্বর।

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫৫"—৬৫"। উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ বাড়িয়াছে। এই স্থানের প্রধান ফসল আউশ ধান ও পাট। আর, আমন ধান অল্প-বিস্তর জন্মায়। মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলার 'কালান্তর' নামক অঞ্চলে কাল রঙের এঁটেল মাটি দেখা যায়। এই স্থানে আমন ধান উৎপন্ন হয়। ইহা ধানের ঘাট্‌তি অঞ্চল। এই অঞ্চল রবি শস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। গম, যব, ছোলা, মশুরী, তিসি প্রভৃতি রবিশস্য উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া,

বিবিধ শাক-সব্জি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থান হইতে প্রচুর শাক-সব্জি কলিকাতা শিল্পঅঞ্চলে রপ্তানি হয়। চব্বিশ-পরগণা জেলায় নারিকেল গাছ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশমকীট এবং ঐ জেলার জঙ্গিপুর-মহকুমায় লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়।

বহরমপুর ভাগীরথী নদীতীরস্থ শহর। ইহার খাগড়া বাসনশিল্প উল্লেখযোগ্য; আর রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। জলঙ্গী নদীতীরস্থ **কৃষ্ণনগর** নদীয়া জেলার সদরশহর। ইহার মৃৎ-শিল্প প্রসিদ্ধ। ঐ জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ **নবদ্বীপ** প্রাচীন শহর ও তীর্থস্থান। ইহা সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্র। নদীয়া জেলার **পলাশীতে** চিনির কল এবং **হরিণঘাটায়** সরকারী দুগ্ধ উৎপাদনকেন্দ্র রহিয়াছে। **শান্তিপুর** তাঁতের সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। আর, **কল্যাণী** একটি নূতন শহর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলার **বেলডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর** ও **কান্দি** উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। চব্বিশ-পরগণা জেলার **বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ** ও **ডায়মণ্ডহারবার** মহকুমা-শহর। **বারুইপুর** শাকসব্জি ও ফল-উৎপাদন অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

(ঘ) **ভাগীরথা নদীর পশ্চিমে সমভূমি**—ইহাকে প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়,—(১) মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ অপ্রশস্ত ভূ-ভাগ এবং (২) বর্ধমান জেলার কালনা-মহকুমা ও সদর-মহকুমার কতকাংশ এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা। ভাগীরথীর পূর্বের সমভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মত প্রথম অংশের উৎপন্ন দ্রব্য। তবে, এই অংশ বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হয় বলিয়া ভূমি উর্বর। দ্বিতীয় অংশটির একভাগ ভাগীরথী নদী ও দামোদর নদের মধ্যস্থ ভূ-খণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগ দামোদরের অপর পার্শ্বে রহিয়াছে। ঐ দুইটি নদনদীর মধ্যবর্তী স্থানে সুচারুরূপে জলনিকাশ হয় না বলিয়া কোন কোন অংশ বিশেষতঃ হাওড়া জেলা ও হুগলী জেলার অংশবিশেষ জলে ডুবিয়া যায়। দামোদর নদের বাম তটে উচ্চ বাঁধ আছে বলিয়া ঐ নদের বন্যার দ্বারা এই স্থান প্লাবিত হয় না। তবে, বাঁধ ভাঙ্গিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। আর, বর্তমানে

এখানে দামোদর নদের সেচখাল ও জলনিকাশের জন্য খাল তৈয়ারী হইতেছে। ঐ উভয় শ্রেণীর খাল কার্যকরী হইলে এই স্থানে কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। আমন ধান এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। ইহা ছাড়া, আউশ ধান, পাট, ইক্ষু, আলু উৎপন্ন হয়। হাওড়া জেলায় প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। দামোদর নদের অপর পার্শ্বে কোন বাঁধ নাই বলিয়া বর্ষাকালে বন্যার জলে এই অঞ্চল প্লাবিত হয়। এই জন্য এই স্থানের ভূমি উর্বরা; কিন্তু বন্যার জন্য এখানে সুচারুরূপে কৃষিকার্য করা সম্ভবপর নহে। তবে, দামোদর নদ-পরিকল্পনার দ্বারা বন্যার মাত্রা কম হইতে পারে। এখানে রবিশস্য, ধান, আলু ও শাকসব্জি উৎপন্ন হয়।

তারকেশ্বর হিন্দুদের তীর্থস্থান। **আরামবাগ** রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত নহে। ইহা হুগলী জেলার মহকুমা-শহর। **আমতা** হাওড়া জেলায় দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **কালনা** ভাগীরথী-তীরস্থ মহকুমা-শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **বর্ধমান** জেলার সদরশহর। ধান-চাউলের ব্যাবসার কেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।

(ঙ) **কলিকাতা-শিল্পঅঞ্চল**—চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার ভাগীরথী বা হুগলী নদীতীরস্থ শিল্পঅঞ্চল ও কলিকাতা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। আর, কলিকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্প-অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাগীরথী পূর্ব-তীরে কাঁচড়াপাড়া হইতে বিরলাপুর পর্যন্ত এবং পশ্চিম-তীরে বংশবাটি হইতে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত স্থানে বহু কলকারখানা আছে। ইহাই ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-অঞ্চল।

কলিকাতা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার ভৌগোলিক অনুকূল পরিবেশ বর্তমান থাকিলেও ঐতিহাসিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। মুঘলযুগে ইউরোপীয় বণিকগণ হুগলী নদীর তীরে কুঠি (Factory) স্থাপন করেন;—যথা পর্তুগীজরা হুগলী শহরে, ডচরা চুঁচুড়ায় (১৮২৫ খৃঃ পর্যন্ত), ডেনিস্‌রা শ্রীরামপুরে (১৮৪৫ খৃঃ পর্যন্ত), ফরাসীরা চন্দননগরে (১৯৪৯ খৃঃ পর্যন্ত) এবং ইংরেজরা কলিকাতায়। ১৬৯২-৯৪ খৃঃ ইংরাজ কর্মচারী জব চার্ণক হুগলী নদীতীরস্থ

নগণ্যস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। উল্লিখিতস্থানগুলি অপেক্ষা এই স্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী ও ইহা গভীরতর নদীর তীরে অবস্থিত,—এই দুইটি অনুকূল অবস্থা মাত্র এই স্থানে দেখা যায়। পলাশী যুদ্ধের পর ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িল,—ইহা ক্রমশঃ বৃটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হইল ; আর ১৭৭৩ খৃঃ হইতে ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত ভারত-বর্ষের রাজধানী ছিল। কলিকাতা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইবার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৬৯ খৃঃ সুয়েজ-খাল খোলা হইলে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই ইউরোপের নিকটবর্তী বন্দরে পরিণত হইল। আর, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ফলে বোম্বাই-এর তূলা-বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। ইহা সত্ত্বেও কলিকাতার গুরুত্ব কমিল না ; কারণ, তখন ইহার পশ্চাৎভূমি গাঙ্গেয় উপত্যকায় রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছিল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বোম্বাই বন্দর অপেক্ষা কলিকাতা বন্দরের আর একটি অনুকূল অবস্থা বর্তমান,—ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সুবিস্তৃত জলপথ ইহাকে পশ্চাৎভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, যদিও বন্দর হিসাবে বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতা নিকৃষ্ট,—এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় নাই, দীর্ঘ নদীপথের স্থানে স্থানে চর বা অগভীর অংশ আছে এবং জোয়ার-ভাটার জন্য জাহাজ চলাচল নিরাপদ নহে।

কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী হুগলী নদীর তীরে বিবিধ শিল্প-স্থাপনের নিম্নলিখিতগুলি ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থা বলা যাইতে পারে,—(১) শিল্পের জন্য বিবিধ কাঁচামাল, যথা—পাট, চামড়া, লৌহপিণ্ড, বাঁশ প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায় ; (২) কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, (ডি. ভি. সি. হইতেও তড়িৎশক্তি সরবরাহ হয়) কোলগ্যাস প্রভৃতি শক্তি পাইবার সুবিধা আছে, আর দুর্গাপুর হইতে কোলগ্যাস নলযোগে কলিকাতা অঞ্চলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। (৩) পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কেন্দ্র ও আসাম, পূর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতি জলপথের দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া এই অঞ্চলের পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত ; (৪ সুলভে যথেষ্ট সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় ; (৫) কলিকাতা-বন্দর বলিয়া এই অঞ্চলে বাহির্বাণিজ্যের সুযোগ রহিয়াছে ; এবং (৬) জনবহুল পশ্চাৎভূমিতে পণ্যদ্রব্য

বিক্রয় করিবার সুবিধা আছে। তাহা ছাড়া, বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বহু ধনী ব্যক্তি এখানে রহিয়াছে বলিয়া মূলধন-সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধাও কম নাই। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমিতে (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার প্রভৃতি) প্রচুর পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতের ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টি পাটকল এই অঞ্চলে অবস্থিত। তাই, ইহা ভারতের প্রধান পাটশিল্পের কেন্দ্র। অন্যান্য বয়নশিল্পের মধ্যে কার্পাসশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে ৩২টি কাপড়ের কল আছে। তাহা ছাড়া, হোসিয়ারী শিল্প নগণ্য নহে। ইহা অবশ্য ছোট-শিল্পের (Light Industry) অন্তর্গত। এই রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের প্রধান অন্তরায় তুলা, এই রাজ্যে তুলা উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম-ভারত কিংবা বিদেশ হইতে তুলা আমদানি হয়। আবার, কলিকাতা-বন্দরের তুলা-নির্বীজন যন্ত্র নাই, উহা বোম্বাই-বন্দরে আছে। এইজন্য বিদেশের তুলা বোম্বাই বন্দর মারফত আমদানি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কাগজশিল্প উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান এবং উড়িষ্যা ও আসাম হইতে বাঁশ সংগ্রহ করা হয়। টিটাগড়, নৈহাটী ও ত্রিবেণীতে কাগজের কল আছে। শণ হইতে সিগারেটের জন্য কাগজ ত্রিবেণীতে প্রস্তুত হয়। কাচ-, সাবান-, চীনামাটি- ও রাসায়নিক শিল্পও উল্লেখযোগ্য। আর বিবিধ ভোগ্য-পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য বহু কলকারখানা রহিয়াছে, যথা—ময়দা, তৈল, চাউল, বালি, বিস্কুট, রুটি, পোশাক, চামড়া ও রবারের জিনিস প্রভৃতি। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং- ও ধাতু-শিল্প। এই শিল্পে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এইরূপ কারখানার সংখ্যা প্রায় ৬০০। টাটানগর ও বার্ণপুর হইতে লৌহ-ইস্পাত আনিয়া নানা রকমের জিনিস প্রস্তুত হয়। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, কলকব্জা যন্ত্রপাতি, লৌহ-ইস্পাত ও বিবিধ ধাতুর জিনিস, জাহাজ-মেরামত, নৌকা-নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প রহিয়াছে। এই অঞ্চলের শিল্পে বহু অবাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

বন্দর-প্রসঙ্গে কলিকাতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কলিকাতা ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত বৃটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের বৃহত্তম নগর [পার্শ্ববর্তী

নগর সহ, যাহাকে বৃহত্তর-কলিকাতা বলে, তাহার লোকসংখ্যা ৪৫,৭৮,০৭১ (১৯৫১ খৃঃ)] ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রপ্তানিদ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ অনুযায়ী ইহা ভারতের বৃহত্তম বন্দর। পাটের জিনিস, চা, লাক্ষা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, আকরিক লৌহ, লৌহ-পিণ্ড (Pig-iron), কলিকাতার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। **হাওড়া** (৪,৩৩,৬০০) হুগলী নদীর দক্ষিণতটে কলিকাতার বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান নগর ও শিল্পপ্রধান স্থান। পাট-শিল্প ভিন্ন ইহার ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **লিলুয়ায়** পূর্ব-রেলপথের রেলগাড়ী তৈয়ারীর বড় কারখানা আছে। **বেলুড়ের** এ্যালুমিনিয়াম-শিল্প প্রসিদ্ধ। কেরলের আলওয়ে হইতে এ্যালুমিনিয়াম-পিণ্ড (Ingot) আনিয়া এখানে উহার পাত এবং বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আর, বেলুড়-মঠ প্রসিদ্ধ। উত্তর-পাড়ার নিকটস্থ হিন্দ্ মোটরগাড়ীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। **শ্রীরামপুর** হুগলী জেলার মহকুমা-শহর। এখানে কাপড়ের কল আছে। **সেওড়াফুলি** পাট ও আলুর বাণিজ্যকেন্দ্র। **রিষড়া, কোন্নগর, চাঁপদানি** প্রভৃতি স্থানে পাটকল, রাসায়নিক দ্রব্যের ও ইঞ্জিনিয়ারিং-কারখানা আছে। **সাহাপুরের** রবারের বিরাট কারখানা এবং **ত্রিবেণীর** কাগজের ও পাটের কল উল্লেখযোগ্য। **চন্দননগর** মহকুমা-শহর। ১৯৪৯ খৃঃ পূর্বে ইহা ফরাসীদের অধিকৃত স্থান ছিল। হাওড়া জেলার **বালি, বাউরিয়া, চেঙ্গাইল** প্রভৃতি স্থানে পাটকল আছে।

বজবজে জাহাজ হইতে খনিজ তৈল নামান হয়। এখানে খনিজ তৈলের ডিপো আছে। **বাটানগরে** ভারতের বৃহত্তম জুতার কারখানা রহিয়াছে। **যাদবপুরে** বিশ্ববিদ্যালয় ও যক্ষ্মা-হাসপাতাল আছে। **দমদমে** আন্তর্জাতিক প্রথম শ্রেণীর বিমান-স্টেশন (International standard) অবস্থিত। ইহাই কলিকাতার বিমান-স্টেশন। **কাশীপুরের** বন্দুকের কারখানা, **ইছাপুরের** সামরিক বিভাগের কারখানা উল্লেখযোগ্য। **ব্যারাকপুর** মহকুমা-শহর ও সৈন্য-নিবাস। **ভাটপাড়া** সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। ইহার নিকটে বহু পাটকল রহিয়াছে। **বেলঘরিয়া, আগড়পাড়া, সোদপুর, খড়দহ, টীটাগড়, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী** প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকারের শিল্প আছে। তন্মধ্যে নৈহাটী ও

টিটাগড়ের কাগজের কল উল্লেখযোগ্য। আর, এই সকল স্থানের পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিংশিল্প প্রধান। **কাঁচড়াপাড়ায়** পূর্ব-রেলপথের বড় কারখানা আছে। **দক্ষিণেশ্বরের** কালীমন্দির বিখ্যাত। ইহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনাক্ষেত্র।

পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতি এবং অধিবাসীদের উপজীবিকা—এই রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ২,৬৩,০২,৩৩৬ (১৯৫১ খৃঃ) এবং লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৬ জন। বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ৪৫,৭৮,০৭১ জন, তবে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ২৫,৪৮,৬৭৭ জন। ইহাছাড়া হাওড়ার ৪,৩৩,৬৩০, টালিগঞ্জের ১,৪৯,৮১৭ (বর্তমানে ইহা কলিকাতার অন্তর্গত হইয়াছে), ভাটাপাড়ার ১,৩৪,৯১৬, খড়গপুরের ১,২৯,৬৩৬, গার্ডেনরীচের ১,০৯,১৬০ এবং বেহালার ১,০৪,০৫৫। এই কয়েকটি শহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষের অধিক। লক্ষ্য করা যায় যে, এই শহরগুলির মধ্যে খড়গপুর ভিন্ন অন্য শহরগুলি কলিকাতা-শিল্প-অঞ্চলে অবস্থিত। তাই, এই রাজ্যে বড় বড় শহরের সংখ্যা কম। তবে, মোট অধিবাসীর পল্লীগ্রামে ৭৫% এবং নগরে ২৫% লোক বাস করে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতি মানচিত্রে লক্ষ্য কর যে, মালদহ জেলার গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী স্থান, বীরভূম জেলার উত্তরাংশ, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমা ও বেলডাঙ্গা-অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে ১০০০-এর অধিক। নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চল, ২৪ পরগণা জেলার পশ্চিমাংশ, হাওড়া জেলা, হুগলী জেলার পূর্বাংশ ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। আবার, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি-অঞ্চলে অনেক কল-কারখানা থাকায় সেখানেও বহু লোকের বাস। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার মালভূমি-অঞ্চলে এবং উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বনভূমি বা পাহাড় থাকায় সেই সকল স্থানে লোকবসতি সবচেয়ে কম। পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতির আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়,—ভাগীরথী নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানে এই রাজ্যের অধিবাসীদের ৫৪% অংশ বাস করে, আর এই অংশের আয়তন সমগ্র রাজ্যের ১৩% অংশ মাত্র। আবার, কলিকাতা এবং উহার পার্শ্ববর্তী ৪৭০ বর্গমাইল স্থানে ৫০ লক্ষের অধিক লোকের বাসভূমি।

পশ্চিম বঙ্গ

লোকবসতি

মাইল

0 ৫০

প্রতি বর্গ মাইলে

৪০০ কম
৪০০ ৬০০
৬০০ ১০০০
১০০০ ৩০০০
৩০০০ বেশী

২৫,০০০
১,০০,০০০
৪,০০,০০০
২৫,০০,০০০

নেপাল
ভুটান
পূর্ব পাকিস্তান
বিহার
গঙ্গা নং
পদ্মা নং
উড়িষ্যা
হুগলী নং
বঙ্গোপসাগর

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৫৭ জন কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের জমি চাষ করে, বহুলোক অপরের জমি ভাগে চাষ করে ; আর কতক লোক অন্যের জমিতে মজুর খাটে। আবার পল্লীগ্রামে ও শহরে বহু লোক কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত আছে। যান-বাহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা, খনি ও চা-বাগানে বহু শ্রমিক কাজ করে। এই সব শ্রমিকদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আসিয়াছে।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ—শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দুইটি বিভাগে বিভক্ত,—বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ। আবার, প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলা লইয়া গঠিত, আর অধিকাংশ জেলায় কয়েকটি মহকুমা আছে। নিম্নে জেলার নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে মহকুমার নাম প্রদত্ত হইল।

বর্ধমান বিভাগের জেলা ও মহকুমা—বীরভূম (সদর ও রামপুরহাট) বর্ধমান (সদর, কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল), বাঁকুড়া (সদর ও বিষ্ণুপুর), পুরুলিয়া (সদর), মেদিনীপুর (উত্তর-সদর, দক্ষিণ-সদর, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম), হুগলী (সদর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ), হাওড়া (সদর ও উলুবেড়িয়া)।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের জেলা ও মহকুমা—কলিকাতা, ২৪-পরগণা (সদর, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, বনগ্রাম ও ডায়মণ্ডহারবার), নদীয়া (সদর, রাণাঘাট), মুর্শিদাবাদ (সদর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দি), মালদহ (সদর), পশ্চিম-দিনাজপুর (সদর ও বালুরহাট), জলপাইগুড়ি (সদর ও আলিপুরদুয়ার), কুচবিহার (সদর, মেক্‌লিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা) এবং দার্জিলিং (সদর, কার্শিয়ং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি)।

বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলাকে দুইটি জেলায় বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে,—(১) উত্তর-২৪ পরগণা এবং (২) দক্ষিণ- ২৪ পরগণা জেলা। প্রথমটির বারাসত এবং দ্বিতীয়টির আলিপুর সদর হইবে।

বিহার

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে বিহার রাজ্য। ১লা নবেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ ইহার পূর্বভাগের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৬৭,০৭১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,৮৭,৮৩,৭৭৮। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫৭৮।

বিহার রাজ্যের উত্তরাংশ বা খাস-বিহার গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নঅংশের পাললিক সমভূমি এবং দক্ষিণাংশ ছোটনাগপুরের প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমি। এই মালভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ। এখানে অনেক ছোট-বড় পাহাড় আছে। তন্মধ্যে পরেশনাথ পাহাড় উচ্চতম। ইহার কতকাংশ পেনিপ্লেন বা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (Dissected)। এই রাজ্যের উত্তরাংশে গঙ্গা ও তাহার উপনদী গণ্ডক, ঘর্ঘরা, কুশী ও শোণ প্রবাহিত। আর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদীগুলি ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে নির্গত হইয়াছে। কানাডা-, মাইথন-, পাঞ্চেট-বধ, তিলাইয়া- ও কোনার-বাঁধ এই অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বিহারের জলবায়ু শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের।

প্রাকৃতিক বিভাগ—এই রাজ্যকে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) গাঙ্গেয় সমভূমি ও (২) ছোটনাগপুরের মালভূমি।

(১) গাঙ্গেয় সমভূমি—ইহা গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নঅংশের পাললিক সমভূমি। এইজন্য ইহার ভূমি উর্বরা ও শস্যশ্যামলা। ইহার ভূমির প্রকৃতি ও শস্যের প্রকৃতি অনুযায়ী দুইটি অংশে বিভাগ করা যায়, যথা (১) গঙ্গার নদীর উত্তরের সমভূমি বা উত্তর-বিহার এবং (২) গঙ্গা নদীর দক্ষিণের সমভূমি বা দক্ষিণ-বিহার।

(ক) উত্তর-বিহার—এই অংশ গঙ্গা নদীর উত্তর তীর হইতে তরাই পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা উর্বর পাললিক সমভূমি। এখানে গণ্ডক, ঘর্ঘরা, বুড়িগণ্ডক,

বিহার
রাজনৈতিক

মাইল
০ ৫০

প্রদেশের সীমানা
জেলার ,,
রাজধানী
প্রসিদ্ধ সহর
অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান
প্রশস্ত রেলপথ
অপ্রশস্ত ,,

রক্সৌল
বেত্তিয়া
মতিহারী
জয়নগর
পা ল
যোগবাণী
কিষণগঞ্জ
গণ্ডক নং
সিওয়ান
মজঃফরপুর
দারভাঙ্গা
সমস্তিপুর
পূর্ণিয়া
কাটিহার
শোন নং
আরা
বক্সার
পাটনা
মোকামা
মুঙ্গের
জামালপুর
ভাগলপুর
সাকরিগলিঘাট
রাজমহল
সাসারাম
ডেহিরি
রোহটাস
রাজগীর
কিউল
গয়া
বুদ্ধগয়া
মন্দারগিরি
দেওঘর
দুমকা
গিরিডি
মধুপুর
হাজারিবাগ
ডালটনগঞ্জ
পালামৌ
পরেশনাথ
জামতাড়া
ময়ূরাক্ষী নং
গোমো
ধানবাদ
সিন্ধ্রি
অজয় নং
দামোদর নং
লোহারডাগা
রাঁচি
পুরুলিয়া
রাঁ চি
জামশেদপুর
খারসাওয়ান
সরাইকেলা
ঘাটশিলা
চাইবাসা
উ ড়ি ষ্যা

কমলা, কুশী প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত। নদীগুলি বিশেষতঃ কুশী নদীর প্রবল বন্যায় বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। বর্তমানে কুশীর তীর উচ্চ বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে। ঐ নদীতে বাঁধ ও সেচখাল নির্মাণ হইতেছে। ইহা ছাড়া, গণ্ডক নদী-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ ও উত্তরাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র। এই আর্দ্র অঞ্চলে ধান, পাট, ভুট্টা, ডাল, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অংশে পাট বিশেষ জন্মায় না, তবে ধানই প্রধান শস্য। চম্পারণ জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গা আম ও মজঃফরপুর লিচুর জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তর-বিহারে অনেকগুলি চিনির কল আছে। কাটিহারে পাটকল রহিয়াছে। **বারুণীতে** খনিজ তৈলের পরিশোধন-কারখানা এবং তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মিত হইবে। **দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর** ও **ছাপরা** উল্লেখযোগ্য শহর। এই অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন (১০০০ ব. মা.)। এইজন্য এখানে বনভূমি নাই এবং কৃষি-উপযোগী অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম।

(খ) দক্ষিণ-বিহার—এই অঞ্চলের কতকাংশ গাঙ্গেয় নবীন পাললিক সমভূমি এবং কতকাংশ প্রাচীন পাললিক সমভূমি এবং কতকাংশ নদী-উপত্যকা। আবার, স্থানে স্থানে প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমি গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ; যথা, রাজমহল পাহাড় ও মুঙ্গেরের পাহাড়। শোণ নদ সর্বপ্রধান হইলেও বহু ছোট-ছোট নদনদী মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া এই অঞ্চলে প্রবাহিত। উত্তর বিহার অপেক্ষা এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। এই অঞ্চলের শোণ নদের সেচখাল উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কূপ, হইতেও জলসেচ হয়। ধান, ভুট্টা, গম, ডাল, তৈলবীজ ও ইক্ষু এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। শোণ নদতীরস্থ **ডালমিয়ানগর** প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহার কাগজ, চিনি ও সিমেণ্ট-শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, **গয়ায়** কাপড়ের কল ও **জাপলায়** সিমেণ্টের কারখানা আছে। গঙ্গা নদী-তীরস্থ **পাটনা** রাজধানী ও বৃহত্তম নগর। **গয়া** হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। **রাজমহল, ভাগলপুর** ও **মুঙ্গের** গঙ্গা নদী-তীরস্থ শহর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। দক্ষিণ-বিহারের লোকবসতির ঘনত্ব উত্তর-বিহার অপেক্ষা কম।

(২) ছোটনাগপুরের মালভূমি বা বিহারের মালভূমি—ইহা প্রধানতঃ ২০০০'-২৫০০' উচ্চ। এই মালভূমির উত্তর-পূর্বাংশ গঙ্গা নদী পর্যন্ত প্রসারিত। গঙ্গা নদীর প্রবাহপথ যেস্থানে ঘুরিয়া দক্ষিণবাহিণী হইয়াছে, ঐস্থান পর্যন্ত রাজ-মহল পাহাড় বিস্তৃত। ঐ পাহাড় গোণ্ডওয়ানা যুগের ব্যাসল্ট-শিলায় গঠিত। এই অংশ অধিক ক্ষয়গ্রস্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর, এই মালভূমির অধিকাংশ প্রাচীন নাইস-শিলায় (Archaean Gneiss) গঠিত; তবে, দামোদর-উপত্যকায় গোণ্ডওয়ানা যুগের পাললিক-শিলা দেখা যায়। এই অংশে চ্যুতির সৃষ্টি ফলে যে উপত্যকার (Fault-trough) উৎপত্তি হইয়াছে, দামোদর নদ ঐ উপত্যকায় প্রবাহিত। এই শ্রেণীর শিলায় কয়লা পাওয়া যায়। উত্তরাংশের শিস্ট-শিলায় অভ্র-খনিগুলি রহিয়াছে। সিংভূম জেলায় ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলায় আকরিক লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের কোন কোন অংশ বন্ধুর পেনিপ্লেন (রাঁচি মালভূমি) বা তরঙ্গায়িত ভূমি কিংবা নদী-উপত্যকা। এখানে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, বরাকর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদীর উৎপত্তি-স্থল এবং ইহারা এই অঞ্চলে প্রবাহিত। আর, নদনদীর বাঁধগুলি এখানেই অবস্থিত।

এই মালভূমি-অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫০"-এর কিছু বেশী। এইজন্য এখানে স্থানে স্থানে শাল, মহুয়া, পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষের গভীর বনভূমি আছে। খাস বিহার অপেক্ষা এই অঞ্চলের লোকবসতি বেশ কম। সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি বহু আদিবাসীর বাসভূমি মালভূমি-অঞ্চল। ধান্যই ইহার প্রধান ফসল। ইহা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান খনি-অঞ্চল। ঝরিয়া, বোকারো, কারণপুরা, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে **কয়লা**; গয়া, ভাগলপুর, হাজারিবাগ (গিরিডি ও কোডার্মা) ও মুঙ্গের জেলায় **অভ্র**; সিংভূম জেলায় গুয়া, নোয়ামুণ্ডি, বুড়াবুড়ি প্রভৃতি স্থানে **আকরিক লৌহ** এবং ঐ জেলায় ম্যাঙ্গানিজ; মোসাবনিতে **তাম্র**; রাঁচি জেলায় **বক্সাইট** প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

মালভূমি-অঞ্চলে কয়লা ও বিবিধ খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় বলিয়া বহুবিধ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে প্রধান শিল্পগুলি উল্লেখ করা হইল। সিংভূম

জেলায় **টাটানগর** বা **জামসেদপুরে** লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা আছে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া রেল-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, কেবল, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **ঘাটশিলার** নিকটস্থ মৌভাণ্ডারের তাম্র-আকর হইতে তাম্র নিষ্কাশিত হয়; কারণ মোসাবনি ইহার নিকটে অবস্থিত। রাঁচি জেলার বক্সাইট হইতে **মুরি** নামক স্থানে এ্যালুমিনিয়াম-ধাতু নিষ্কাশণ করা হয়। আর, কয়লা-খনি অঞ্চলে **সিন্ধ্রিতে** রাসায়নিক সারের (এ্যামেনিয়ম সালফেট) বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং এইস্থানে সিমেণ্টও প্রস্তুত হয়। **গোমিয়াতে** বিস্ফোরক দ্রব্য তৈয়ারী হয়। **চাইবাসায়** সিমেণ্টের কারখানা আছে। **বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র**। এখানে লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইবে।

রাঁচি, এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান নগর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। ইহার নিকটস্থ **হাতিয়া** নামক স্থানে ভারি ভারি যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। লৌহ-ইস্পাত শিল্পে যে সকল যন্ত্রাদি প্রয়োজন হয়, তাহাই এখানে নির্মিত হইবে। **হাজারিবাগ, মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি** প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর শহর। **ধানবাদ** ও **ঝরিয়া** কয়লার খনি-অঞ্চলের শহর।

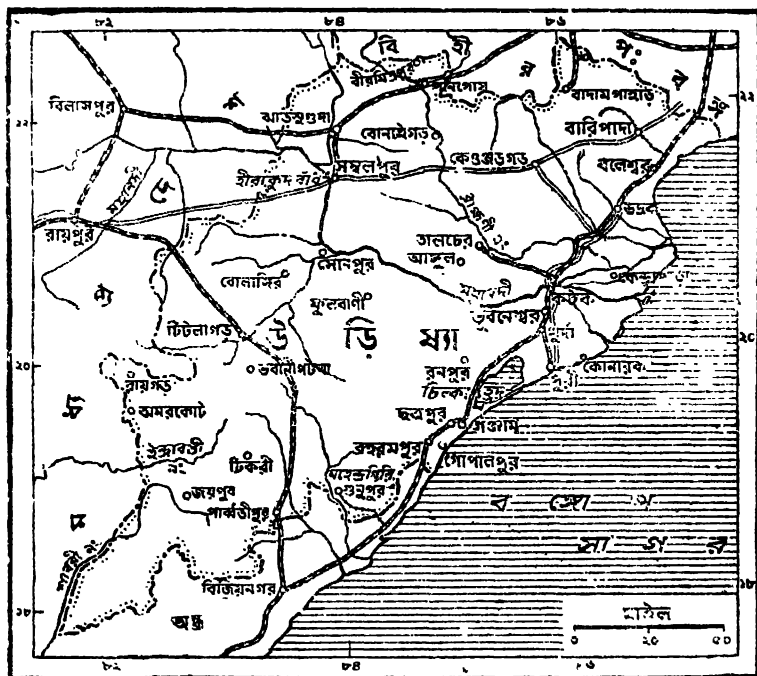
উড়িষ্যা

বিহারের দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্য। ইহার আয়তন ৬০,২৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৪৬,৪৫,৯৪৬। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২৪৩। এই রাজ্যের উত্তরাংশ অরণ্য-সঙ্কুল মালভূমি এবং দক্ষিণাংশ মহানদী-ব্রাহ্মণীর যুক্ত ব-দ্বীপ ও উপকূলের সমভূমি। **মহানদী, ব্রাহ্মণী** ও **বৈতরণী** ইহার প্রধান নদী। আর, ব-দ্বীপ অঞ্চলে সেচখাল আছে। প্রসিদ্ধ চিল্কা হ্রদ এই রাজ্যে অবস্থিত। উড়িষ্যায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের ধানই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রাকৃতিক বিভাগ—উড়িষ্যাকে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) ব-দ্বীপের ও উপকূলের সমভূমি এবং (২) মালভূমি-অঞ্চল।

(১) **ব-দ্বীপ ও উপকূলের সমভূমি**—মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদী তিনটি মিলিতভাবে এই ব-দ্বীপ অংশ গঠিত করিয়াছে। এই অঞ্চল বালেশ্বর হইতে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমভূমিতে তিনটি অংশ দেখা যায়, (ক) সমুদ্র উপকূলের নিম্নভূমি, (খ) মধ্যভাগের উর্বর পাললিক সমভূমি এবং (গ) উহার পার্শ্বে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গঠিত তরঙ্গায়িত সমভূমি। মালভূমির পাদদেশে এই তরঙ্গায়িত সমভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের নদীগুলিতে মধ্যে মধ্যে প্রবল বন্যা হয়। তবে হীরাকুদ-বাঁধের জন্য মহানদীর বন্যার মাত্রা কমিতে পারে। চিল্কা হ্রদের আয়তন ৩৫০-৪৫০ বর্গমাইল; কারণ ঋতুভেদে ইহার আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহা অগভীর হ্রদ (কয়েক ফুট গভীর মাত্র) এবং উহার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ রহিয়াছে। আর, একটি সঙ্কীর্ণ চর সমুদ্র হইতে চিল্কাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বর্ষাকালে ইহা মিঠা জলের হ্রদে পরিণত হয় এবং অন্য ঋতুতে ইহার জল লবণাক্ত। এই হ্রদে প্রচুর মাছ ধরা হয়। আর, ব-দ্বীপে অংশে সেচখাল রহিয়াছে। এই খালগুলি আবার নাব্য। ব-দ্বীপ অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৬০″। তাই, ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এখানে প্রধান ফসল ধান (৯০%)। আর, ইক্ষু, ডাল প্রভৃতি সামান্য উৎপন্ন হয়। গঞ্জাম-জেলার উপকূলের সমভূমি অপ্রশস্ত। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানতঃ ল্যাটেরাইট। ধানই ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ব-দ্বীপ ও উপকূলের সমভূমিতে নারিকেল উৎপন্ন হয়। মহানদীর ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে **কটক** অবস্থিত। ইহা এই রাজ্যের প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকট কাপড়ের কল আছে। **ভুবনেশ্বর** উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান ও মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। **পুরী** সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর শহর। ইহার জগন্নাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান। উপকূলস্থ **কণার্কের** সূর্য-মন্দিরের কারুকার্য অতি চমৎকার। **উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি** পাহাড়ের খোদাই-করা মূর্তিগুলি সুন্দর। গঞ্জামের **বহরমপুর** প্রধান শহর এবং **গোপালপুর** উপকূলস্থ স্বাস্থ্যকর স্থান। সমভূমি অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ (এই রাজ্যের ৫৮% অধিবাসী এখানে বাস করে)।

(২) মালভূমি-অঞ্চল—ইহা প্রধানতঃ গ্র্যানিট্, নাইস, শিস্ট প্রভৃতি প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত। তবে, উত্তর-পশ্চিমাংশে ও ব্রাহ্মণী-উপত্যকায়



পরবর্তী যুগের গোণ্ডওয়ানা-শিলা দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে কয়লার খনিগুলি (তালচের, সুন্দরগড় জেলার কয়লার খনি) আছে। মহানদী উপত্যকার উচ্চঅংশে এবং উত্তর-পূর্বাংশে (ময়ূরভঞ্জ, কেয়ঞ্ঝার, বোনাই) ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলা রহিয়াছে। এই জাতীয় শিলায় আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, মালভূমি-অঞ্চলে চূণাপাথর, ক্রোমাইট, ডোলমাইট, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যগুলি রহিয়াছে। তাই, ইহা খনিজ সম্পদে উন্নত। এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর পেনিপ্লেন বা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি কিংবা নদী-উপত্যকা ও নদী-খাত। তবে,

স্থানে স্থানে বিশেষতঃ করাপুট জেলায় উচ্চ বন্ধুর ভূমি (৩০০০´) আছে। ইহা সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীনতম কেলাসিত-শিলায় (khondalites and charnockites) গঠিত। এই অঞ্চলের কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ প্রায় ৫০০০´ উচ্চ (মহেন্দ্রগিরি—৪৯২৩´)। এই জেলায়ও প্রচুর খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে।

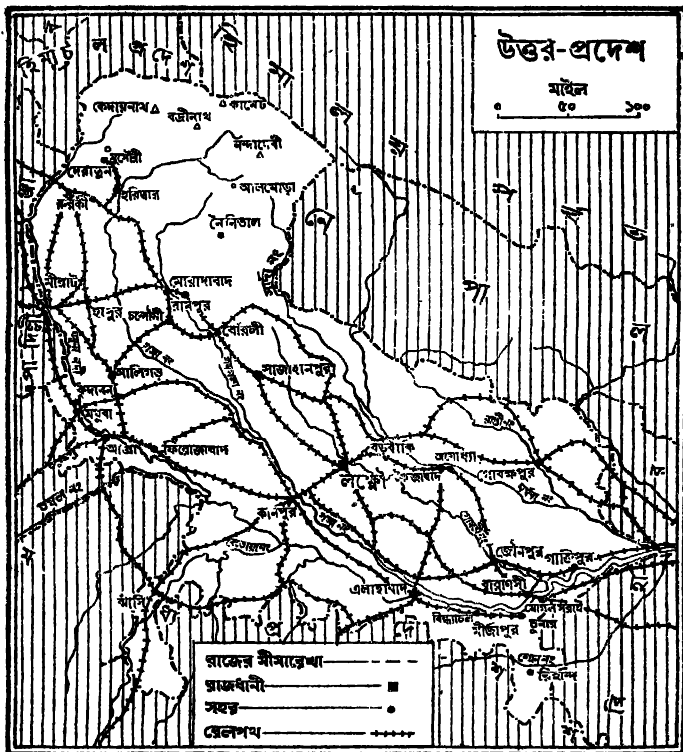
মালভূমি-অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (৫৫″-৬০″) হয় বলিয়া ইহা গভীর অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যে শাল, মহুয়া প্রভৃতি মৌসুমী-পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। আর, ধানই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। সম্বলপুর জেলায় হীরাকুদ নামক স্থানে মহানদীর উপর বিশাল বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এখানে সুবৃহৎ জলাধার সৃষ্টি হওয়ায় এই নদীর বন্যার মাত্রা কমিবে। আর, এখানে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আবার, করাপুট জেলায় অন্ধ্রপ্রদেশের সীমায় মাচকুণ্ড নামক স্থানে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের উৎপন্ন-বিদ্যুতের অধিকাংশ ঐ রাজ্যে সরবরাহ করা হয়।

মালভূমি-অঞ্চল ক্রমশঃ শিল্পপ্রধান স্থানে পরিণত হইতেছে। এই অঞ্চলে বিবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুকূল অবস্থা বর্তমান। তাই, ভবিষ্যতে উড়িষ্যা রাজ্যে নানারকমের কলকারখানা স্থাপিত হইবে, তাহা আশা করা যায়। নিম্নে এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলি বর্ণনা করা হইল। **রৌরকেলায়** কেন্দ্রীয় সরকার লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা নির্মাণ করিতেছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাসায়নিক সার, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্প স্থাপিত হইবে। বেলপাহাড়ে ব্লাস্টচুল্লীর ইট, রাজগাংপুরে সিমেন্ট, ব্রজরাজনগরে কাগজ, হীরাকুদে এ্যালুমিনিয়াম এবং জোডায় ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারীর কারখানা আছে।

উত্তরপ্রদেশ

বিহারের পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য। ইহার আয়তন ১,১৩,৪২২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,৩২,১৫,৭৪২। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫৫৭।

প্রাকৃতিক বিভাগ—উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, যমুনা নদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য-মালভূমি এবং মধ্যভাগে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি।



আবার, কৃষিজাত দ্রব্যের প্রকৃতি (উহা প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে) অনুযায়ী ইহাকে দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, যথা—(৩) গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চঅংশ এবং (৪) ঐ উপত্যকার মধ্যাংশ। তাই এই রাজ্যকে চারিটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা কুমায়ুন ও গারওয়াল—এই অঞ্চলে প্রধান-হিমালয়, মধ্য-হিমালয় ও অব-হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত।

এই স্থানে অব-হিমালয় শিবালিক পর্বত নামে অভিহিত। ইহা অবশ্য হিমালয়ের অংশ নহে,—হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হইবার পরবর্তী সময়ে হিমালয়ের ক্ষয়জাত পদার্থের দ্বারা ইহা গঠিত হইয়াছে। প্রধান হিমালয়ে **নন্দাদেবী, কেদারনাথ, ত্রিশূল, নন্দাকোট, কামেট** প্রভৃতি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত। গঙ্গা, (এই অঞ্চলে ভাগীরথী নামে পরিচিত), ও যমুনার উৎসক্ষেত্র এখানে অবস্থিত। গঙ্গোত্রী হইতে কিছু দূরে গোমুখী নামক স্থানে হিমবাহ হইতে গঙ্গার এবং যমুনোত্রী নামক স্থানে হিমবাহ হইতে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। **গঙ্গার উপনদী** অলকনন্দা, জহ্নুবালা প্রভৃতি ও ঘর্ঘরার উপনদী **কালী** এই অঞ্চলে প্রবাহিত। এই অঞ্চলে উচ্চতাভেদে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। তবে, এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; অবশ্য উচ্চতাভেদে ও শৈলশিলার অবস্থানের জন্য স্থান বিশেষে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় (৩৫"-১০০")। আর, স্থানে স্থানে গভীর বনভূমি রহিয়াছে। ধান, রাগি (মারুয়া), গম, যব, ভুট্টা, তৈলবীজ, আলু, এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। তাহা ছাড়া, আপেল, আম (দেরাডুন-অঞ্চলে) প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। মেষ, গো প্রভৃতি পশুপালন অধিবাসীদের আর একটি উপজীবিকা। ডুন-উপত্যকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়।

দেরাডুন প্রধান শহর। এখানে বনবিভাগের শিক্ষা ও গবেষণ-প্রতিষ্ঠান, সর্ব ভারতীয় জরিপ-কেন্দ্র ও সামরিক শিক্ষালয় আছে। **মুসৌরী, নাইনিতাল, আলমোরা** ও **রাণীখেত** শৈলনিবাস। **বদ্রিনারায়ণ, কেদারনাথ** ও **হরিদ্বার** হিন্দুদের তীর্থস্থান। এই অঞ্চলের লোকবসতি কম। ইহার উচ্চ অংশে **ভোটিয়া** জাতির লোক বাস করে। শীতকালে ইহার নিম্নঅংশে নামিয়া আসে এবং গ্রীষ্মকালে উচ্চঅংশে চলিয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ পশুপালক।

(২) **যমুনার দক্ষিণের মালভূমি-অঞ্চল**—যমুনা নদীর দক্ষিণে এই অঞ্চলটি অবস্থিত। এখানে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ যমুনা নদীর পার্শ্বস্থ ভূ-ভাগ এবং নদী-উপত্যকায় পাললিক সমভূমি; ইহার অবশিষ্ট অংশ তরঙ্গায়িত সমভূমি কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। ঐ মালভূমি-অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষয়জাত পাহাড় রহিয়াছে। ঐ মালভূমি-অংশ, বিশেষতঃ ঝান্সি-অঞ্চল লাল রঙের **প্রাচীন**

কেলাসিত-শিলায় (Archaean Gneisses-নাইস-শিলা) এবং মির্জাপুর-অঞ্চল বিন্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথরে গঠিত। আবার, এই অংশে শোণ নদের উত্তর-কূলে কাইমুর-পাহাড় (Scarps) রহিয়াছে। উহাও বিন্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথর ও আগ্নেয়গিরিজাত শিলায় (Interbedded with porcellanite-volcanic ash) গঠিত। তাই, এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকৃতির। শোণ নদ ভিন্ন অন্য নদনদীগুলি যমুনা নদীতে পতিত হইতেছে। তন্মধ্যে **চম্বল, বেতুয়া, কেন, ও টন** উল্লেখযোগ্য। এখানে চম্বল নদী নিম্নভূমি বা 'খাদারে' প্রবাহিত। খাদারের পার্শ্ববর্তী ভূমি বিশেষভাবে বন্ধুর (চস্-অঞ্চল) ইহাই চম্বলের ব্যাডল্যাণ্ড। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৩০"-৫০" ; আর, পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহার অংশবিশেষ অরণ্যময় বা গুল্মময়। এখানে 'কান' (Kans) নামক একপ্রকার আগাছা জন্মে। এই আগাছা দূরীভূত করা কষ্টকর। বর্তমানে ভারত সরকার এইরূপ আগাছাপূর্ণ কৃষি-উপযোগী ভূমি ট্রাকটরের দ্বারা কর্ষণ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছেন। এই অঞ্চলের বেতুয়া নদীর সেচখাল উল্লেখযোগ্য। এখানে বহু স্বাভাবিক জলাশয় আছে (গ্র্যানিটের ডাইক বা ভেন থাকায় ঐরূপ স্বাভাবিক জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে)। জলাশয় হইতে এবং কূপ হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হয়। ছোলা, গম, অড়হর, তিসি, তিল, বাজরা প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। **ঝান্সি** প্রধান নগর ও রেলপথের কেন্দ্র।

(৩) **গাঙ্গেয় উপত্যকার পাললিক সমভূমি ও তরাই-অঞ্চল—** হিমালয়ের পাদদেশে তরাই-অঞ্চল (ভাবার ভূমি) অবস্থিত। ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ইহা শাল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষের গভীর অরণ্যে আবৃত। এই স্থানের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। বর্তমানে ইহার স্থান বিশেষ পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ধান জন্মায়। বর্তমানে পাটও উৎপন্ন হইতেছে। ইহার দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি। এই সমভূমির প্রায় সকল অংশের ভূ-প্রকৃতি এক প্রকার হইলেও বৃষ্টিপাত এক-প্রকার নহে ; তাই, কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতির। সুতরাং ইহাকে মোটামুটিভাবে

দুইটি পৃথক্ প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চঅংশের সমভূমি এবং ঐ উপত্যকার মধ্যঅংশের সমভূমি। (গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিম্নঅংশ বিহার রাজ্যে অবস্থিত।) ঐ দুইটি বিভাগের সীমারেখা এই রাজ্যকে কোণাকুণি ভাবে ছেদ করিয়াছে,—৪০" সমবৃষ্টিরেখা উভয়ের বিভেদ-রেখা বলিয়া গণ্য করা যায়। সর্দা নদীর সমভূমিতে প্রবেশ-স্থান হইতে একটি সরলরেখা এলহাবাদ পর্যন্ত অঙ্কন করিলে উহার পশ্চিমাংশ উপত্যকার উচ্চঅংশ এবং পূর্বাংশ উপত্যকার মধ্যঅংশ গণ্য করা যায়।

এই অঞ্চলে **গঙ্গা** নদী ও উহার উপনদী **যমুনা, রামগঙ্গা, ঘর্ঘরা** প্রভৃতি প্রবাহিত। এই অঞ্চল পাললিক সমভূমি,—এখানে স্থানবিশেষের পললরাশি হাজার ফুটের অধিক গভীর। আর, গঙ্গা ও যমুনা ঐ সমভূমিকে সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি বা 'খাদার' সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত। ঐ নিম্নভূমি বন্যায় জলে প্লাবিত হয়।

গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চ অংশে (Upper Ganges Plain) বহু সেচখাল রহিয়াছে। গঙ্গার উচ্চঅংশের ও নিম্নঅংশের খাল, পূর্ব যমুনা-খাল, আগ্রা-খাল, সর্দা-খাল প্রধান। ইহা ছাড়া, তড়িৎশক্তির সাহায্যে বহু নলকূপ ও কূপ হইতে জলসেঁচ ব্যবস্থা আছে। এই অংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০"-এর কম হইলেও কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। গম, যব, জোয়ার-বাজরা, ছোলা, অড়হর, তৈলবীজ, ইক্ষু, ভুট্টা ইহার প্রধান ফসল। সামান্য তুলা ও ধান উৎপন্ন হয়। ইহাই উত্তরপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ কৃষি-অঞ্চল।

গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যঅংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী; এখানে সেচখাল-ব্যবস্থা সামান্যই আছে। এইজন্য এই স্থান উচ্চঅংশের মত কৃষি-কার্যে উন্নত নহে। এখানে বিশেষতঃ উত্তরাংশে ও পূর্বাংশে ধানই প্রধান ফসল। গোরক্ষপুর অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, গম, যব, ছোলা, তৈলবীজ, ভুট্টা, তামাক প্রভৃতি জন্মায়। উত্তরপ্রদেশের উৎপন্ন ফসলের ক্রম অনুযায়ী গমের স্থান সর্বপ্রথম (৬০ ল. এ.), দ্বিতীয় স্থান ধানের (৩৫ ল. এ.)। ১৫ ল এ. ক্ষেত্রে ইক্ষু এবং জোয়ার-বাজরা একত্রে ৬০ ল. এ. স্থানে উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে যথেষ্ট গবাদি পশু প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

উত্তরপ্রদেশে খনিজ দ্রব্য অধিক পাওয়া যায় না। গারোওয়াল অঞ্চলে সামান্য তাম্র, মির্জাপুর জেলায় যথেষ্ট চূণাপাথার পাওয়া যায়। মির্জাপুর জেলায় সম্ভবতঃ বিবিধ খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে। এইজন্য এখানে চুর্ক নামক স্থানে সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজ্যে কয়লার খনি নাই এবং তড়িৎশক্তিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয় না। গঙ্গার সেচখালে যে বারটি স্থানে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, সার্দার প্রধান সেচখালে ৫৯ ফুট উচ্চ জলপ্রপাত আছে। তথায় ৪০ হাজার কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। রিহান্দ-পরিকল্পনা হইতে ২,৩৩,০০০ কি. ও. তড়িৎ শক্তি পাওয়া যাইবে। এইস্থানে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশণের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইবে। **কানপুর** এই রাজ্যের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে চিনি-, তৈল-, কার্পাস- ও পশম-, চর্ম-, ময়দা-, রাসায়নিক শিল্প রহিয়াছে। ইহাছাড়া এখানে ছোট-বড় নানা প্রকারের শিল্প আছে। গঙ্গা-তীরস্থ ও রেলপথের কেন্দ্রস্থলে কানপুর অবস্থিত। এইজন্য, এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে শিল্পের কাঁচা মাল ও কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার অনুকূল অবস্থা এখানে বর্তমান। তাই, এই রাজ্যের ইহা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তরপ্রদেশে বহু স্থানে চিনির কল আছে। ভারতের অর্ধেক চিনি এখানে তৈয়ারী হয়। আর, এই রাজ্যে রহিয়াছে বহু তেলের কল ও ময়দার কল। **আগ্রা** আর একটি শিল্প প্রধান শহর। ইহার কার্পাস-, চর্ম-শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র ও তাজমহলের জন্য প্রসিদ্ধ। **লক্ষ্ণৌ** এই রাজ্যের রাজধানী ও একটি সুন্দর শহর। এখানে কাগজের কল আছে। গঙ্গা নদীতীরস্থ **বারাণসী** প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহার বাসন ও রেশমশিল্প বিখ্যাত। **এলাহাবাদ** গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। বার বৎসর অন্তর অন্তর কুম্ভমেলার এবং প্রতি বৎসর মাঘমেলার জন্য এলাহাবাদ প্রসিদ্ধ। ইহার নিকটস্থ **নাইনি** একটি শিল্পকেন্দ্র।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মাখন- ও তালা- শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **মিরাট** ও **হাপুর** কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান নগর। **সাহারাণপুরে**

কাগজের কল এবং **রুড়কিতে** ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **বেরিলি** রোহিলাখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কৃত্রিম-রবার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইবে। **মুরাদাবাদের** বাসন-শিল্প উল্লেখযোগ্য। **গোরক্ষপুর** চিনি-শিল্পের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তর-পূর্ব রেলপথের কেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও রেলওয়ের কারখানা আছে। **ফিরোজাবাদ** কাচের চুড়িশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **চুনারের** মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য। **অযোধ্যা, মথুরা** ও **বৃন্দাবন** হিন্দুদের তীর্থস্থান।

পাঞ্জাব

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব রাজ্য। ইহা পশ্চিম-পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৫৫৩ খৃঃ পেপস্ ও পাঞ্জাব লইয়া এই রাজ্য নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৪৭,০৬২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৬১,৩৭,৮৯০; আর লোকবসতির ঘনত্ব ৩৪৩।

পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং অবশিষ্ট অংশ পাললিক সমভূমি। **শতদ্রুর** কতকাংশ ও সমগ্র **বিপাশা** পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া এবং **ইরাবতী** ঐ রাজ্যের পশ্চিম-পার্শ্ব দিয়া কিছু দূর ও **যমুনা** নদী পূর্ব-পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। পাঞ্জাব রাজ্যকে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) পার্বত্য অঞ্চল ও (২) সমভূমি-অঞ্চল।

(১) পার্বত্য অঞ্চল—এই অঞ্চলে প্রধান-হিমালয়, মধ্য-হিমালয় ও অব-হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। পশ্চিম-হিমালয় পার্বত্যভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও শীতকালে তুষারপাত হয়। উচ্চতার জন্য ইহার জলবায়ু শীতল। এখানে চিরপাইন গাছের বন আছে। গম, যব, ভুট্টা ও আলু ইহার প্রধান ফসল, অবশ্য কৃষি-উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম। এই অঞ্চল ফলের জন্য বিখ্যাত। হিমাচল-প্রদেশের **মুণ্ডি** নামক স্থানের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র (৪০ হাজার কি. ও.) উল্লেখযোগ্য। এই স্থান হইতে পাঞ্জাবে ও পাকিস্থানে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়।


পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ
মাইল
0
১০০
জম্মু ও কাশ্মীর
চন্দ্রভাগা নং
হিমাচল প্রদেশ
কাইলং
চুমার
ডালহৌসি
চম্বা
ধরমশালা
ডনখার গোম্পা
পাঠানকোট
ইরাবতী নং
বিপাশা নং
কুলু
গুরুদাসপুর
হোসিয়ারপুর
মান্ডি
শতদ্রু নং
নামগিয়া
অমৃতসর
রামপুর
কপূরতলা
জলন্ধর
হিমাচল প্রদেশ
সিমলা
ফিরোজপুর
লুধিয়ানা
চণ্ডীগড়
ফরিদকোট
সিরহিন্দ
নাহান
ফাজিলকা
পাতিয়ালা
আম্বালা
ভাতিন্দা
থানেশ্বর
মানসা
কৈথাল
কর্ণাল
সির্সা
নারওয়ানা
জিন্দ
পানিপথ
হিসার
রোটক
ভিওয়ানি
দিল্লী
গুরগাঁও
লোহারু
রেওয়ারি
নারনউল
যমুনা নং

(২) **সমভূমি-অঞ্চল**—ইহাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা—(ক) হিমালয়ের পর্বতের পাদদেশের বৃষ্টিবহুল চোস্ বা ব্যাডল্যাণ্ড, (Bad Land), (খ) মধ্যভাগের উর্বর কৃষিঅঞ্চল এবং (গ) রাজস্থানের সীমান্তের মরুপ্রায় শুষ্ক অঞ্চল।

শিবালিক পর্বতের পাদদেশে ক্ষয়জাত শিলা যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়াছে। আর, এই অঞ্চলের বনভূমি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এই বৃষ্টিবহুল বন্ধুর ভূমির মাটির ক্ষয় অধিক হওয়ায় ইহা ব্যাডল্যাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে বনভূমি সৃষ্টি করিয়া এবং কনটিউর বাঁধ (Contour) নির্মাণ করিয়া সংস্কার হইতেছে। **রূপার ও নাঙ্গাল** এই অংশে অবস্থিত। শতদ্রু নদীতে **ভাকরা** নামক স্থানে বিরাট বাঁধ নির্মিত হইতেছে। ঐ স্থানে নদী-অংশে যে বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নাম 'গোবিন্দসাগর'। আর, নাঙ্গালের নিকট আর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং স্থান হইতে প্রধান সেচখাল সুরু হইয়াছে। ভাকরা ও নাঙ্গাল এবং প্রধান সেচখালে কোটলা ও গাঙ্গুয়ালে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। আর, এই তড়িৎশক্তি পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ও দিল্লীতে সরবরাহ করা হয়। ভাকরা-পরিকল্পনার খালগুলি হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের লক্ষ লক্ষ একর (৩৩ ল. এ.) ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে। ইহার কতকাংশ কার্যকরী হইয়াছে। বিপাশা নদী-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। উহার দ্বারা রাজস্থানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (৩০ ল. এ.) জলসেচ হইবে। নাঙ্গালে রাসায়নিক সার এবং ভারীজলের (Heavy water) কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

পাঞ্জাবের দ্বিতীয় অংশ উর্বর সমভূমি অঞ্চল। এখানে ২০"-৪০" বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, ফলে রবিশস্য চাষের সুবিধা আছে। এখানে বহু সেচখাল, নলকূপ ও কূপ থাকায় কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে। তাই, পাঞ্জাব ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান রাজ্য। গম, যব, ভুট্টা, ইক্ষু, ছোলা, তূলা ও তৈলবীজ এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে যথেষ্ট গবাদি পশু পালিত হয়। এই স্থানের হরিয়ানা-গরু বিখ্যাত। পাঞ্জাবের পশম-, কার্পাস-, চর্ম-, ও চিনি-শিল্প উল্লেখযোগ্য।' আম্বালের নিকটে কাগজের কল আছে।

অমৃতসর এই রাজ্যের বৃহত্তম নগর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। শিখদের স্বর্ণ-মন্দির ও পশম-শিল্পের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে **চণ্ডিগড়** অবস্থিত। ইহা নবনির্মিত সুন্দর শহর ও পাঞ্জাবের রাজধানী। **জলন্ধর** খেলার যাবতীয় দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এবং **লুধিয়ানা** পশম-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **পাঠানকোট** রেলস্টেশন হইতে কাশ্মীর যাইবার রাস্তা সুরু হইয়াছে। **পাতিয়ালা** বাণিজ্যপ্রধান শহর। **আম্বালা** ও **ফিরোজপুর** সৈন্যনিবাস। এই উর্বর সমভূমি-অংশ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

পাঞ্জাবের তৃতীয় অংশের বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ইঞ্চি মাত্র, এইজন্য মরুপ্রায় অঞ্চল। তাই, শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রা অধিক। বর্তমান এই অঞ্চলে ঘাঘর নদী উপত্যকায় সেচখাল তৈয়ারী হওয়ায় কৃষিকার্যের সুবিধা হইয়াছে। তবে, ইহার বহু অংশে জল অভাবে কৃষিকার্য সুচারুরূপে করা সম্ভবপর নহে। জোয়ার-বাজরা, গম, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ প্রধান ফসল। এখানে যথেষ্ট গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। **হিসার** বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে কাপড়ের কল আছে। এই অঞ্চলের লোকবসতি কম।

রাজস্থান

পাঞ্জাবের দক্ষিণে রাজস্থান রাজ্য। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ আজমীঢ় এবং বোম্বাইএর আবু-পাহাড় ও মধ্যভারতের কিছু অংশ (সুনেলতাপ্পা) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১,৩২,১৪৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৫৯,৭০,৭৭৪ ; আর লোকবসতির ঘনত্ব ১২১।

রাজস্থানের অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশবিশেষ। ইহা প্রধানতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বা পেনিপ্লেন। আরাবল্লী ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতমালা। আরাবল্লী পর্বত রাজস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত সামান্য হয় বলিয়া এখানে থর মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অংশে **লুনী** একমাত্র নদী। আর পূর্বাংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। এই অংশে **চম্বল** ও উহার কয়েকটি উপনদী প্রবাহিত। **সম্বর** লবণাক্ত জলের হ্রদ। এখানে অন্তর্বাহিনী

নদী পতিত হইতেছে। এইজন্য ঋতুভেদে এই হ্রদের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। তাই ইহাকে প্লায়া (playa) বলা যায়। আজমীঢ়ের পুষ্কর মিঠা জলের হ্রদ। রাজস্থানের জলবায়ু শুষ্ক, শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রা অধিক।

প্রাকৃতিক বিভাগ—এই রাজ্যে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ লক্ষ্য করা যায়; যথা—(১) থর মরুভূমি ও (২) আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চল এবং (৩) পূর্ব-রাজস্থান।

(১) থর মরুভূমি—বিকানীর, যোধপুর ও জশল্মীর জেলা এই মরুভূমির অন্তর্গত। গোবী বা সাহারা মরুভূমির মত ইহা ভীষণ মরুভূমি নহে বা বৃষ্টি শূন্যও নহে। উত্তর-পশ্চিমাংশ ভিন্ন ইহার অধিকাংশ প্রাচীন শিলায় গঠিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্লেন। তবে, লুনী-উপত্যকায় ও উত্তর-পশ্চিমাংশে আধুনিক যুগের শিলা বা পাললিক মৃত্তিকা রহিয়াছে। আর, এই শিলাময় অঞ্চল বালুকার দ্বারা আবৃত। আবার স্থানে স্থানে উচ্চ বালিয়াড়ি দেখা যায়। তবে, মধ্যে মধ্যে ক্ষয়জাত শৈলশিরা রহিয়াছে। উহাদের শিলার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট—প্রাচীন যুগের গ্র্যানিট ও রিওয়োলাইট, বিন্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথর, পরবর্তী গোণ্ডওয়ানা যুগের তালচের-শিলা, চুণাপাথর ও আধুনিক যুগের শিলা (Tertiary) দেখা যায়। আর, প্রতি বৎসর থর মরুভূমি গড়ে ৫০ বর্গমাইল হিসাবে প্রসারিত হইতেছে।

থর-অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০″। জানুয়ারী ও মে মাসের গড় মাসিক তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬০° ফা. ও ৯৫° ফা.। তবে, প্রতি ঋতুতে দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর অত্যন্ত বেশী—২০°-৩০°। এইজন্য এইরূপ শুষ্ক জলবায়ুতে প্রধানতঃ গুল্মজাতীয় কণ্টক উদ্ভিজ্জ বা বাবলা জাতীয় খর্বাকৃতি কণ্টক বৃক্ষ জন্মে। তবে, দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ লুনী-উপত্যকায় উৎকৃষ্ট তৃণভূমি দেখা যায়। আর, যোধপুরে কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত উর্বরা ভূমি রহিয়াছে; কারণ, চুণাপাথরের গঠিত শৈলশিরা ঐ অঞ্চলকে বায়ুবাহিত বালুকা হইতে রক্ষা করিতেছে। থর-অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি মরুঅঞ্চলের ন্যায়,—বার্ষিক বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়,—কোন বৎসর হয়ত দুই-এক

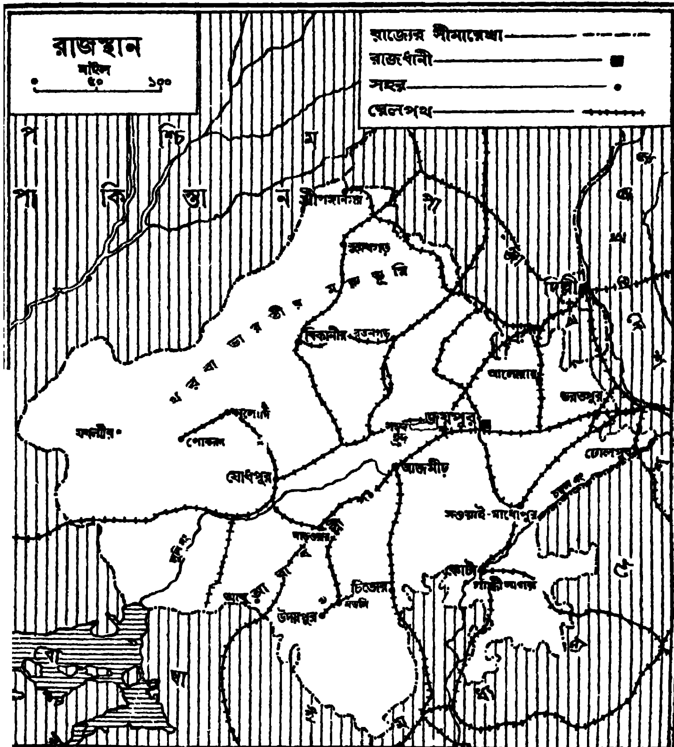
দিনে ১০"-১৫" বৃষ্টিপাত হইতে পারে, আবার দুই-চার বৎসর অতি সামান্য (২"-৩") বৃষ্টিপাতও হইতে পারে। এখানে কোন কোন বৎসরে বন্যাও দেখা যায়।

অনুকূল স্থানে গভীর কূপ (২০০'-৩০০') হইতে জলসেচ করিয়া জোয়ার বাজরা, ছোলা, গম প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়; আর, বালিয়াড়ীর মধ্যস্থ নিম্নস্থানে অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের জলে প্রধানতঃ জোয়ার ও বাজরা জন্মায়। বিকানীরে শতদ্রু নদীর সেচখাল রহিয়াছে। ঐ অঞ্চল লুপ্তপ্রায় ঘাঘর নদীর উপত্যকা মৃত্তিকাময়। তাই, ঐস্থানে সেচখাল হইতে জলসেচ করিয়া গম, ভুট্টা, ছোলা, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। বিপাশা পরিকল্পনার রাজস্থান-খাল-পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বিকানীর ও জশল্মীর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে (২০ লক্ষ একর) প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। এই অঞ্চলে গো, মেষ প্রভৃতি পশু প্রতিপালিত হয়। বিকানীর ও যোধপুর জেলায় **জিপাসাম** ও বিকানীর জেলার পালনায় নিকৃষ্ট **কয়লা** পাওয়া যায়। **বিকানীর** ও **যোধপুর** উল্লেখযোগ্য নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে যথেষ্ট মেষপালন হয় বলিয়া কুটির-শিল্প হিসাবে পশমী কাপড় ও কম্বল প্রস্তুত হয়।

(২) **আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চল**—ইহা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম পর্বতমালা। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৬০ মাইল। এই পর্বতমালা বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রাচীন শিলায় গঠিত। উত্তর-পূর্বাংশ বিভিন্নভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশিরার সমষ্টিমাত্র; উদয়পুর-অঞ্চল উচ্চ শৈলশিরা (৩৫০০'-৪০০০') ও তন্মধ্যস্থ উপত্যকায় পূর্ণ। এই অংশের জয়ার দস্তা ও সীসার খনি উল্লেখযোগ্য। আজমীঢ়ে অভ্র পাওয়া যায়। আর, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত আবুপাহাড়ের উচ্চতম অংশ ৫৬৪৬'। পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ছোট ছোট হ্রদ রহিয়াছে। এই অংশের বৃষ্টিপাতও অপেক্ষাকৃত অধিক (২৫") বলিয়া এই অংশে বনভূমি রহিয়াছে। আবুপাহাড়ে ৫০" বৃষ্টিপাত হয়। চম্বলের উপনদী বানাস এখানে প্রবাহিত। গম, ছোলা, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ উপত্যকা-অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ভীল নামক আদিবাসীরা 'জুম' প্রণালীতে চাষ করে।

আজমীঢ় বাণিজ্যপ্রধান ও রেলপথের কেন্দ্র। এখানে রেলওয়ের কারখানা আছে। ইহা মুসলমানদের ও ইহার নিকটস্থ **পুষ্কর** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **উদয়পুর** সুন্দর শহর। এখানে ছোট ছোট মনোরম হ্রদ আছে। **আবু পাহাড়ের** মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর। **চিতোর** ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। মাকরানার মার্বেলপাথর উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ এই মার্বেলপাথরের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

(৩) **পূর্ব-রাজস্থান**—ইহার অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্লেন, তবে উত্তর-



পূর্বাংশে ও পূর্বাংশে পাললিক ভূমি রহিয়াছে। এখানে **চম্বল** ও উহার উপনদী **বানাস** প্রবাহিত। এখানে বহু ছোট ছোট নদী রহিয়াছে। এই অংশের বৃষ্টিপাতও কিছু বেশী (২০″-৩০″)। তবে, উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা ইহার জলবায়ু শুষ্ক। এখানে প্রধানতঃ কূপ হইতে জলসেচ করিয়া গম, ভূট্টা, বাজরা, জোয়ার, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। আর, এই অংশের লোকবসতির ঘনত্ব কিছু বেশী। সম্বর হ্রদ হইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। চম্বল নদীতে মহাত্মা গান্ধী-বাঁধ ও জলাশয় তৈয়ারী হইতেছে। ইহা কার্যকরী হইলে তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইবে ও কৃষিকার্যের সুবিধা হইবে। সিমেণ্ট- ও কার্পাস-শিল্প এই রাজ্যের প্রধান শিল্প।

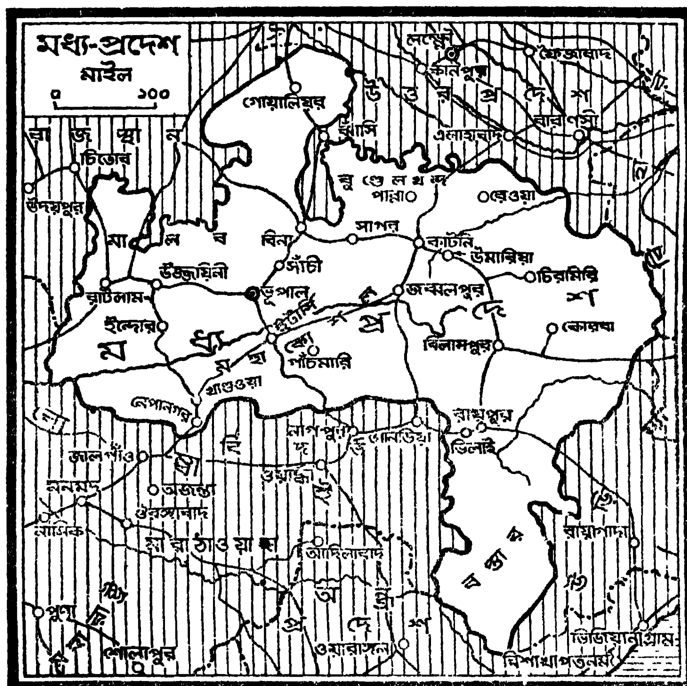
জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী ও সুন্দর শহর। ইহা পাথর-শিল্প ও ধাতু-নির্মিত দ্রব্যের উপর মিনা-করা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের ইহা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল আছে।

মধ্যপ্রদেশ

ভারতের মধ্যভাগে মালভূমির উপর মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত। গত ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল, বিন্ধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও ভূপাল লইয়া এই রাজ্য নূতনভাগে গঠিত হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে এই রাজ্য দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহার আয়তন ১,৭১,২৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৬০,৭১,৬৩৭; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ১৫২। বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল ও পূর্বঘাট পর্বত এই রাজ্যে অবস্থিত। **নর্মদা, তাপ্তী, চম্বল, বেতুয়া, শোণ** ও **মহানদী** মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষে প্রবাহিত।

এই রাজ্যে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত (৩০″-৪৫″) হয়; তবে পূর্বাংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী (৫০″-৫৫″)। গ্রীষ্মকালে নিম্ন-মালভূমি-অঞ্চল খুব উত্তপ্ত হয়। আর, ইহার বহু অংশ অরণ্যাবৃত। এই সকল অরণ্যে শাল, সেগুন, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জন্মে। তসরগুটি ও লাক্ষা এই বন হইতে

পাওয়া যায়। রাজ্যের বহু অংশে সেচখাল, জলাশয় কূপ প্রভৃতি হইতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ (তিসি, চীনাবাদাম প্রভৃতি), ছোলা, মুগুরী, তূলা ইহার প্রধান ফসল। এই রাজ্যে কয়লা (কোরবা, উমারিয়া, ছিন্দওয়ারা, মাহপানি, চিরিমিরি প্রভৃতি), আকরিক লৌহ (দুর্গের



রাজহারা ও বাস্তার), ম্যাঙ্গানিজ (জব্বলপুর, বালাঘাট ও ছিন্দওয়ারা), বক্সাইট, কেওলিন (চীনামাটি), চূণাপাথর, হীরক (পান্না) প্রভৃতি আকরের খনি আছে। ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে মধ্যপ্রদেশ ভারতের সর্বপ্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের কার্পাস-শিল্প প্রধান। ইন্দোর, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল আছে। দুর্গ জেলার **ভিলাই**-এ লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা

স্থাপিত হইতেছে। **নেপানগরের** খবরের কাগজ তৈয়ারীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, এই রাজ্যে সিমেন্ট, চর্ম, চীনামাটি-শিল্প রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক বিভাগ—ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) মালবের মালভূমি এবং সাতপুরা-বিন্ধ্য-পার্বত্য অঞ্চল, (২) বুন্দেলখণ্ডের মালভূমি, (৩) বাঘেলখণ্ড বা রেওয়ার মালভূমি, (৪) নর্মদা নদীর ও শোণ নদের উপত্যকা, (৫) মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণী, (৬) মহানদীর উপত্যকার উচ্চঅংশ বা ছত্রিশগড়ের সমভূমি, এবং (৭) বাস্তারের মালভূমি।

(১) **মালবের মালভূমি এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্য-পর্বতশ্রেণী**—এই মালভূমির উত্তরাংশ বিন্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথরে এবং দক্ষিণাংশ ও পর্বত দুইটি লাভাজাত শিলায় গঠিত। আর, গ্রস্ত-উপত্যকায় **নর্মদা** নদী প্রবাহিত। **চম্বল** ও উহার উপনদীগুলি মালবে প্রবাহিত। মালবে ২৫"-৩৫" এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলে আরও কিছু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য পার্বত্যভূমি অরণ্যাবৃত। গম, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, ডাল ও কার্পাস প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই অঞ্চলের **ইন্দোর** প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বহু কাপড়ের কল আছে। **উজ্জয়িনী** প্রাচীন নগর এবং ইহার কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য। **ভুপাল** মধ্য-প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্যপ্রধান নগর। এখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। **গোয়ালিয়র** শিল্পপ্রধান নগর। বস্ত্র- চর্ম- ও চীনামাটি-শিল্প প্রধান। চম্বল নদীর মহাত্মা গান্ধী-বাঁধ নির্মিত হইলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে ও জলসেচের সুবিধা হইবে।

বুন্দেলখণ্ডের মালভূমি—প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় কিংবা বিন্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথরে গঠিত ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি। এখানে **বেতুয়া** ও **কেন** নদী প্রবাহিত। পান্নায় কন্‌গ্লোমেরেট শিলায় হীরা পাওয়া যায়। ইহার জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য কতকটা মালয়ের মত; তবে এখানে সামান্য ধানও উৎপন্ন হয় এবং তুলা বিশেষ উৎপন্ন হয় না।

(৩) **বাঘেলখণ্ড**—ইহার উত্তরাংশ পাললিক মৃত্তিকায় এবং অবশিষ্ট অংশ প্রধানতঃ বিন্ধ্য-শ্রেণী বেলেপাথরে গঠিত। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কিছু বেশী। এইজন্য গভীর বনভূমি আছে। এই অঞ্চলে চূণাপথর ও কয়লা (উমারিয়া) পাওয়া যায়। সাতনায় সিমেণ্টের কারখানা আছে।

(৪) **নর্মদা নদী ও শোণ নদের উপত্যকা**—নর্মদা নদী গ্রস্ত-উপত্যকায় প্রবাহিত। এই উপত্যকায় গভীরভাবে পললরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। এইজন্য এই অংশের ভূমি উর্বর। এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। **জব্বলপুর** ঐ উপত্যকার শীর্ষদেশে অবস্থিত। এখানে কাপড়ের কল, বিশ্ববিদ্যালয় ও সামরিক বিভাগের কারখানা আছে। ইহার নিকটেই জলপ্রপাত ও মার্বেল-পাথরের পাহাড় বিখ্যাত। শোণ নদ সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় প্রবাহিত। ইহা অরণ্যময় অঞ্চল।

(৫) **মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণী**—মহাদেব প্রাচীন বেলেপাথরের দ্বারা এবং মহাকাল নাইস ও লাভার দ্বারা গঠিত। মহাকাল পর্বত প্রকৃতপক্ষে নদী-উপত্যকাপূর্ণ ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি। অমরকণ্টক (৩৪৯৩) ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার নিকট শোণ নদ ও নর্মদা নদীর উৎসক্ষেত্র। এই সকল পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী বলিয়া ইহারা অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যের পূর্বাংশে প্রধানতঃ শাল এবং পশ্চিমাংশে সেগুন এবং সর্বত্র বাঁশ জন্মে। ছিন্দওয়ার নিকট ও পূর্বাংশে চিরিমিরি ও অম্বিকাপুরের নিকট কয়লা এবং মহাদেব পর্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। আদিবাসী গোন্দরা 'জুম'-প্রণালীতে পার্বত্য ভূমিতে সামান্য কৃষিকার্য করে। উপত্যকায় গম, জোয়ার, কোদন, তুলা প্রভৃতি ফসল জন্মায়। **পাঁচমারী** (৩৫০০′) শৈলনিবাস এবং **ছিন্দওয়ারা** বাণিজ্যকেন্দ্র। নেপালনগরে খবরের কাগজ তৈয়ারীর কল আছে।

(৬) **মহানদী নদী-উপত্যকার উচ্চঅংশ বা ছত্রিশগড়-সমভূমি**—মহাকাল পর্বত ও উড়িষ্যার পাহাড়িয়া অঞ্চলের মধ্যস্থ ভূখণ্ড এই সমভূমি। ইহা ৯০০′-১০০০′ উচ্চ পেনিপ্লেন এবং প্রাচীন শিলায় (কুড্ডাপা-শিলাসমূহ, বেলে-পাথর, শেল, কোয়ার্টজাইট্ প্রভৃতি) গঠিত। উচ্চভূমির দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহা একটি বেসিন। এখানে **মহানদী** ও উহার উপনদীসমূহ প্রবাহিত। ইহার

বৃষ্টিপাত ৫৫" হইলেও কূপ, জলাশয় ও নদী হইতে জলসেচ ব্যবস্থা আছে। এইজন্য এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধানই প্রধান। ইহাছাড়া, ডাল, তিসি এবং গম উৎপন্ন হয়। কোরবার কয়লা, ডুর্গ জেলার ধোলি ও রাজহারা পাহাড়ে প্রচুর আকরিক লৌহ (Haematite—60-67%) পাওয়া যায়। চূণাপাথরেরও খনি রহিয়াছে। আকরিক লৌহ, চূণাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, জল, (১ মণ ইস্পাত তৈয়ারী করিতে ৬ মণ জলের প্রয়োজন) প্রভৃতি লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পাইবার সুবিধা আছে বলিয়া **ভিলাই**-এ লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইতেছে। **রায়পুর** ও **বিলাসপুর** উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ও রেল-জংশন।

(৭) **বাস্তার-মালভূমি**—ইহা প্রাচীন শিলায় (নাইস) গঠিত ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি (১৩,০০০ ব. মা.)। ইহার উচ্চতা ২০০০'—৩০০০' এবং স্থানবিশেষে ৪০০০' উচ্চ। ইহা অরণ্যসঙ্কুল ও বিরল বসতি অঞ্চল। গোদাবরীর উপনদী ইন্দ্রাবতী, শবরী এবং সিলেরু নদী এখানে প্রবাহিত। এই অঞ্চলে বিবিধ খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে, কিন্তু রেলপথ নাই বলিয়া এইগুলি উত্তোলিত হয় না।

বোম্বাই

পশ্চিম-ভারতে বোম্বাই-রাজ্য অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং পূর্বতন হায়দারাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের মারাঠী-ভাষাভাষী অঞ্চল (বিদর্ভ) ও পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের মারাঠী ও গুজরাটী-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া এই রাজ্য নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বোম্বাই-রাজ্য বৃহত্তম। ইহার আয়তন ১,৯০,৬৬৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪,৮২,৬৫, ২২১। আর, লোকবসতির ঘনত্ব ২৫৩।

বোম্বাই রাজ্যের কঙ্কন-উপকূলের পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ সমভূমি এবং গুজরাট-অঞ্চলে সমভূমি রহিয়াছে। আর, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা উপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। অপর আর একটি অংশ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। সৌরাষ্ট্রও একটি মালভূমি। এখানে গীর পাহাড় ও

তাহার পার্শ্বে গীর জঙ্গল অবস্থিত। ভারতে কেবলমাত্র গীর জঙ্গলে সিংহ আছে। এই রাজ্য **নর্মদা** ও **তাপ্তী** পশ্চিমবাহিনী এবং **গোদাবরী** ও **কৃষ্ণা** পূর্ববাহিনী নদী।

কঙ্কন-উপকূল ও পশ্চিমঘাটের পশ্চিম-ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই পর্বতমালা অরণ্যসঙ্কুল। এই অরণ্যে সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। মালভূমি ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কম বলিয়া এই সকল স্থানের জলবায়ু শুষ্ক। এই শুষ্ক অঞ্চলে জলসেচ করিয়া তুলা, গম, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ (চীনাবাদাম), ডাল, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। কঙ্কণ-উপকূলে ধান ও নারিকেল জন্মে। কয়লা (বিদর্ভ), আকরিক লৌহ (বিদর্ভ ও রত্নগিরি জেলা) এবং জিপসাম (কচ্ছ), এই রাজ্যের প্রধান খনিজ দ্রব্য। বোম্বাই শিল্পপ্রধান রাজ্য। ভারতের কার্পাস-শিল্পে এই রাজ্য প্রথম স্থানীয়। ইহাছাড়া, সিমেন্ট, কাচ, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ, কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের নোনাভ্‌লা, অন্ধ্র-উপত্যকা নামক জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানের উৎপন্ন তড়িৎশক্তি বোম্বাই, পুনা, কল্যাণ প্রভৃতি শহরে সরবরাহ করা হয় এবং ইহার ফলে শহরগুলিতে কলকারখানা চালান সুবিধা হইয়াছে। ইহাছাড়া, কয়না- ঘাটপ্রভা- ও কাকরাপুর-বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈয়ারী হইতেছে। বোম্বাই-এর নিকট খনিজ তৈলের পরিশোধনের দুইটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাছাড়া, ইহার নিকটস্থ ট্রোমবে-এ পরম-আণবিক শক্তির গবেষণা-কেন্দ্র আছে।

প্রাকৃতিক বিভাগ—উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা বোম্বাই-রাজ্যকে নিম্নলিখিতভাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা—(১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল; (২) পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল; এবং (৩) দাক্ষিণাত্য-মালভূমি।

(১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল—ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য অনুযায়ী ইহাকে তিনটি প্রধান অংশে বা উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়, (খ) গুজরাট এবং (গ) কঙ্কণ-উপকূল।

(ক) **কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়**—কচ্ছ একটি দ্বীপ। ইহার উত্তরে কচ্ছের রণ ও দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর। কঠিয়াবাড় একটি উপদ্বীপ। প্রাচীনকালে ইহাও একটি দ্বীপ ছিল; পরে, কালক্রমে মহাদেশ ও দ্বীপের মধ্যস্থ সাগরে পলল সঞ্চিত হওয়ায় মহাদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের উত্তরাংশ ভূমিকম্প-বলয়ের অন্তর্গত। তাই, ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের ভূমির ও তটরেখার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বসিয়া কচ্ছের

রণের উৎপত্তি হইয়াছে। কচ্ছের রণ অগভীর উপসাগর। গ্রীষ্মকালে ইহার অধিকাংশ শুকাইয়া লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। কচ্ছের মধ্যাংশ বেলেপাথরে গঠিত, নিম্ন-মালভূমি। তবে মধ্যে মধ্যে বেসল্ট-শিলা রহিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ পাললিক ভূমি। কঠিয়াবাড়ের উত্তর-উপকূলের ভূমি নিম্ন। নর্মদা নদী-উপত্যকায় যে চ্যুতি সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা প্রসারিত হইয়া কঠিয়া-বাড়ের দক্ষিণ-উপকূল গঠিত হইয়াছে। এই উপদ্বীপের অধিকাংশ লাভার দ্বারা গঠিত। এই লাভা-অঞ্চলে অসংখ্য ডাইক্ দেখা যায়। আর, দুইটি পাহাড়িয়া অঞ্চল আছে। উহারা ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে গীর পাহাড় উল্লেখযোগ্য। ইহা বিবিধ আগ্নেয়শিলায় (Gabbors, diorites, syenites) গঠিত। আর, উত্তরাংশে রহিয়াছে বেসল্ট-শিলা। উপকূলে বিশেষতঃ ক্যম্বে উপসাগরের পার্শ্বের ভূমি পাললিক। আর, লাভা-শিলার প্রান্তে অবশ্য ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়।

কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের জলবায়ু শুষ্ক। কচ্ছ মরুপ্রায় অঞ্চল (১০"-১৫")। তাই, ইহার ভূমি শুষ্ক। এখানে কৃষিকার্য সামান্য হয়। বাজরা, জোয়ার ও তুলা, ইহার প্রধান ফসল। এখানে পশুপালন যথেষ্ট হয়। আর, কণ্টক জাতীয় উদ্ভিজ্জ বা গুল্ম দেখা যায়। কঠিয়াবড়ের দক্ষিণাংশের ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী (২০"-২৫")। তবে গীর পাহাড়ে ৪০" বৃষ্টিপাত হয়। কূপ ও জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা স্থানে স্থানে রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উর্বর অঞ্চলে (গোহিলওয়াদ-নিম্নভূমি, ভাদর' নদী-উপত্যক—ঘের) সুচারুরূপে কৃষিকার্য হয়। গম, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, তুলা কঠিয়াবাড়ের প্রধান ফসল। ইহার কার্পাস-শিল্পই প্রধান। তাহাছাড়া, সিমেণ্ট-, চর্ম-, রাসায়নিক, মৃৎ-শিল্পও উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র-উপকূলে লবণ প্রস্তুত হয়। আর, পোরবন্দরে উৎকৃষ্ট পাথর (বাড়ী তৈয়ারীর জন্য) পাওয়া যায়।

কচ্ছের **কাণ্ডলা** প্রথম শ্রেণীর নূতন বন্দর। **ভবনগর, ভেরাবল, পোরবন্দর, ওখা, বেদিবন্দর** কঠিয়াবাড়ের বন্দর। **দ্বারকা** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **জামনগর ও রাজকোট** উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

(খ) **গুজরাট**—কঙ্কণ-উপকূল ও দাক্ষিণাত্য-লাভা অঞ্চলের উত্তরে গুজরাট। ইহার উত্তরাংশের ভূমি শুষ্ক ও বালুকাময় (পালানপুর) এবং উহার দক্ষিণে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত তিনটি অংশ দেখা যায়,—(ক) উপকূলের নিম্ন ও জলাভূমি, (২) পার্বত্যভূমির পাদদেশের পাললিক উচ্চভূমি (২০০′) এবং (৩) উহাদের মধ্যস্থ উর্বর পাললিক সমভূমি (২৫০ মাইল দীর্ঘ ও ৬০ মাইল প্রস্থ)। তৃতীয় অংশই প্রধান কৃষি-অঞ্চল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে,—দক্ষিণতম অংশে ৬০-৭০ ই., সুরাটে ৪১ ই., আমেদাবাদে ২৯ ই.। পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবশ্য কিছু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এখানে প্রধানতঃ জলাশয় ও কূপ হইতে জলসেচ হয়। মাহি ও তাপ্তী নদীর (কাদাপাদা-পরিকল্পনা) সেচখাল আছে। বৃষ্টিপাত বা জলসেচ-ব্যবস্থার উপর ফসলের প্রকৃতি নির্ভর করে; তাই দক্ষিণাংশের ধান্য, মধ্যাংশের গম ও উত্তরাংশের জোয়ার, বাজরা প্রধান শস্য। আর, সর্বত্রই কম-বেশী তুলার চাষ হয়। ইহা ছাড়া, তৈলবীজ (চীনাবাদাম), তামাক, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গবাদি পশুপালনও যথেষ্ট দেখা যায়।

গুজরাট কার্পাস-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **আমেদাবাদ** ভারতের দ্বিতীয় প্রধান কার্পাস শিল্প-কেন্দ্র (৮০টি কল আছে)। ইহা রেলপথের কেন্দ্র এবং ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপ্রধান শহর। **বরোদা** প্রসিদ্ধ শহর। ইহার কার্পাস-, রাসায়নিক ও মৃৎ-শিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **সুরাট** তাপ্তী নদী-তীরস্থ শহর। ইহা মুঘলযুগে বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্তমানে ইহা বাণিজ্য ও কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। নর্মদা-তীরস্থ **বরোচ** প্রাচীন নগর। ইহাও প্রাচীন যুগে বন্দর ছিল।

(গ) **কঙ্কণ**—বোম্বাই-শহরের কিছু উত্তর হইতে গোয়া পর্যন্ত প্রায় ৩৩০ মাইল দীর্ঘ উপকূলই কঙ্কণ নামে অভিহিত। এই উপকূলের ভূমির প্রস্থ ৩০-৫০ মাইল। ইহা নিম্নভূমি হইলেও সমভূমি নহে; কারণ স্থানে স্থানে পাহাড় বা শৈলশিরা কিংবা উচ্চভূমি রহিয়াছে। তাই, ইহা বন্ধুর ভূমি, তবে স্থান বিশেষ পাললিক সমভূমি কিংবা দাক্ষিণাত্য-লাভায় গঠিত নিম্নভূমি আছে। আর, ইহার

তটরেখা এক বিশিষ্ট প্রকৃতির,—পর্যায়ক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর-শাখা বা নদীমোহনা ও ছোট ছোট শৈলশিরার অগ্রভাগযুক্ত অন্তরীপ অবস্থিত। তটরেখার পশ্চাৎভাগে স্থানে স্থানে সংকীর্ণ সমভূমি ও সমান্তরালভাবে অবস্থিত শৈলশিরা বা পাহাড় রহিয়াছে।

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৭৫-১০০ ই.। নিম্নভূমিতে ধান ও নারিকেল এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে রাগি, ডাল ইত্যাদি ফসল জন্মায়। পার্বত্য অঞ্চলে গভীর বনভূমি আছে। অধিবাসীদের কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা হইলেও অন্যান্য কার্যে বহু লোক নিযুক্ত আছে,—বোম্বাই শহরের কাপড়ের কলের শ্রমিক, পুলিশ, গৃহকর্মের চাকর, জাহাজের নাবিক ইত্যাদি। **রত্নগিরি** এই উপকূলের একমাত্র উল্লেখযোগ্য শহর। ইহা ক্ষুদ্র বন্দর ও মাছ ধরার কেন্দ্র। মারাঠা-যুগে **বিজয়দুর্গ** উল্লেখযোগ্য নৌ-ঘাঁটি ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ নৌ-যুদ্ধে ইহা ধ্বংস হইয়া যায়।

বোম্বাই শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল—বন্দর-প্রসঙ্গে বোম্বাই বন্দর ও শহরের বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা বোম্বাই-রাজ্যের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। বস্ত্র, ম্যাঙ্গানিজ ও তৈলবীজ ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। উহার উপকণ্ঠে অবস্থিত **পারেল**, **দাদার** প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র। **ট্রোম্বে দ্বীপে** পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের কারখানা ও পরম-আণুবিক শক্তির গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। **থানা** ও **কল্যাণ** উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র। **মহিম** ও **বান্দ্রা** উপকণ্ঠস্থ শহর। **সান্টা-ক্রুজ** ও **জুহু**-এ বিমান-স্টেশন আছে। **কুরলার** দেয়াশলাই-এর কারখানা ও **আমবেরনাথের** রাসায়নিক-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

(২) **পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল**—দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিমপ্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা মালভূমির সু-উচ্চ পশ্চিম-প্রান্ত। গোয়া হইতে এই পর্বতমালার উত্তরাংশ লাভাজাত শিলায় গঠিত। এই অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে,—গভীর গিরিখাত, সূচ্যগ্রচূড়া প্রভৃতি এখানে দেখা যায়। **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** এই পর্বতমালার

প্রধান গিরিপথ। এই দুইটি গিরিপথের মধ্য দিয়া রেলপথ নির্মিত হইয়াছে ; তাই, মালভূমির সহিত উপকূলের উহারা সংযোগ-পথ। ইহা বৃষ্টিবহুল ও অরণ্যময় অঞ্চল। এই স্থানের **মহাবালেশ্বর** উল্লেখযোগ্য শৈলনিবাস। জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(৩) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বা মহারাষ্ট্র দেশ**—পূর্বতন বোম্বাই-রাজ্যের মারাঠী ভাষাভাষী অঞ্চল, বিদর্ভ ও পূর্বতন হায়দারাবাদ রাজ্যের মারাঠা-ওয়াদা ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্য-লাভার দ্বারা গঠিত ; তবে স্থানে স্থানে পাহাড় বা উচ্চভূমি আছে। তন্মধ্যে **অজন্তার** পাহাড় উল্লেখযোগ্য। **গোদাবরী** ও উহার উপনদী **প্রাণহিতা** (ওয়েনগঙ্গা, পেনগঙ্গা ও ওয়ার্দার মিলিত প্রবাহ), **কৃষ্ণ** ও উহার উপনদী **ভীমা** ও **কনয়া** এখানে প্রবাহিত। পশ্চিমঘাট পর্বতে পূর্বে প্রায় ৫০-৬০ মাইল বিস্তারিত স্থানে ঐ পর্বতের প্রকৃত বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। এখানে ২০-৩০ ই. বৃষ্টিপাত হয়। ঐ অঞ্চলের পূর্বে এবং বিদর্ভের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। তাপ্তী-উপত্যকায় ও বিদর্ভের কৃষ্ণমৃত্তিকা (লাভাজাত) উর্বর ; আবার, অন্যত্র নদী-উপত্যকায় এইরূপে উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি কম ; কারণ, উহা অপরিণত ও অগভীর।

স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্রে কূপ, জলাশয় ও সেচখাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। উর্বর মৃত্তিকাময় অঞ্চলের যেখানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে, তথায় ধান, ইক্ষু, তৈলবীজ, গম, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া, জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতি জন্মায়। তবে, জোয়ার ও বাজরা প্রধান খাদ্য শস্য। উর্বর মৃত্তিকাময় অঞ্চলে লোকবসতি কিছু ঘন, কিন্তু অন্যত্র লোকবসতি কম। কার্পাস-শিল্পই একমাত্র উল্লেখযোগ্য শিল্প। বিদর্ভের চান্দায় লৌহ এবং ওয়ারোরায় কয়লা পাওয়া যায়। আর, কোলাপুরে বক্সাইট রহিয়াছে।

বিদর্ভের **নাগপুর** রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা পূর্বতন মধ্য-প্রদেশের রাজধানী ছিল। নাগপুর বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ও বাণিজ্যপ্রধান নগর। **অমরাবতী, আকোলা** ও **ওয়ার্দা** বিদর্ভের তুলার ব্যবসার কেন্দ্র। **পুনা**

মহারাষ্ট্র-কৃষ্টি ও শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে সৈন্যনিবাস ও ভারতের **প্রধান** আবহাওয়া দপ্তর রহিয়াছে। আর, ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র। পুনার নিকটে সামরিক বিভাগের শিক্ষাকেন্দ্র আছে। **শোলাপুর** বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। আহম্মদনগর জেলায় বেলাপুরে চিনির কল আছে। **আহম্মদনগর ও কোলাপুর** উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

অন্ধ্রপ্রদেশ

উড়িষ্যার দক্ষিণে ও মাদ্রাজ-রাজ্যের উত্তরে অন্ধ্রপ্রদেশ অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৯৫৫ খৃঃ পূর্বতন হায়দারাবাদ রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং এই নবগঠিত রাজ্যের নাম হইয়াছে অন্ধ্রপ্রদেশ। ইহার আয়তন প্রায় ১,০৫,৬৭৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,১২,৬০,১৩৩; আর, লোকবসতি ঘনত্ব ২৯৬।

উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি, ও কৃষ্ণা ও গোদাবরীর নদীর উর্বর ব-দ্বীপ এবং দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অংশবিশেষ লইয়া অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত। **উত্তর-পেন্নার, গোদাবরী** এবং **কৃষ্ণা** ও উহার উপনদী **তুঙ্গভদ্রা** এখানে প্রবাহিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ—অন্ধ্রপ্রদেশকে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—(১) উপকূল-অঞ্চল, (২) পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল এবং (৩) মালভূমি-অঞ্চল।

(১) **উপকূল-অঞ্চল**—এই উপকূল-অঞ্চলকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(ক) **উত্তরাংশ** বা বিশাখাপতনম ও শ্রীকাকুলাম জেলার উপকূলের সমভূমি, (খ) কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপ এবং (গ) নেলোর জেলার উপকূলের সমভূমি। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের উপকূলকে উত্তর-সির্কাস উপকূল এবং নেলোর জেলার উপকূল করমণ্ডল উপকূলের অন্তর্গত।

(ক) **উত্তরাংশ**—এই অংশের উপকূলের সমভূমি সঙ্কীর্ণ এবং স্থানে স্থানে পূর্বঘাটের শাখা-শৈলশিরার দ্বারা বিচ্ছিন্ন—বিশাখাপতনমের নিকট একটি

শৈলশিরা সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা পোতাশ্রয়কে রক্ষা করিতেছে। উহার অগ্রভাগকে ডলফিনের নাসিকা (Dolphin's Nose) বলে। এই অঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশের মৃত্তিকা ল্যাটেরাইট, আর অংশবিশেষে কৃষ্ণ বর্ণের এঁটেল-মাটি ও দো-আঁশ-মাটি (Black loams and clay) দেখা যায়। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত প্রায় ৪০ ই.। ধানই প্রধান ফসল, তবে রাগি, চীনাবাদাম, ডাল ইত্যাদিও উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ, কেওলিন, গ্রাফাইট ও অভ্র পাওয়া যায়। **বিশাখাপতনম্** প্রথম শ্রেণীর বন্দর। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ ও তৈলবীজ। এখানে জাহাজ-নির্মাণের কারখানা ও খনিজ তৈল পরিশোধনের কারখানা রহিয়াছে। ইহার নিকটস্থ **ওয়ালটেয়ার** স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

(খ) **ব-দ্বীপ অঞ্চল**—ইহা উর্বর পাললিক সমভূমি। এখানে কোলার (Colair) হ্রদ অবস্থিত। এই হ্রদে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ৩০-৩৫ ই. বৃষ্টিপাত হয়। আর, গোদাবরী ও কৃষ্ণার সেচখাল দ্বারা যথাক্রমে ৮ লক্ষ, এ, ও ৯ লক্ষ, এ. ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। তাই, এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। ধানই প্রধান শস্য; ইহাছাড়া, ইক্ষু, তামাক (২ ল. এ.), তৈলবীজ জন্মায়। এই স্থানের লোকবসতির ঘনত্ব অধিক (১০০০/ব. মা.)। ইহা সত্ত্বেও এই অঞ্চল হইতে প্রচুর ধান ও চাউল রপ্তানি হয়। কারণ, ধান-উৎপাদনের হার অধিক। (প্রতি একরে ৬০০০ পা. ধান উৎপন্ন হয়)। **কাকিনাদ** ও **মসলিপতনম**, এই দুইটি বন্দর। **গুন্টুর, বিজয়ওড়া** ও **রাজমুন্দ্রী** উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে সিমেন্ট, কাগজ, রেশম-শিল্প আছে।

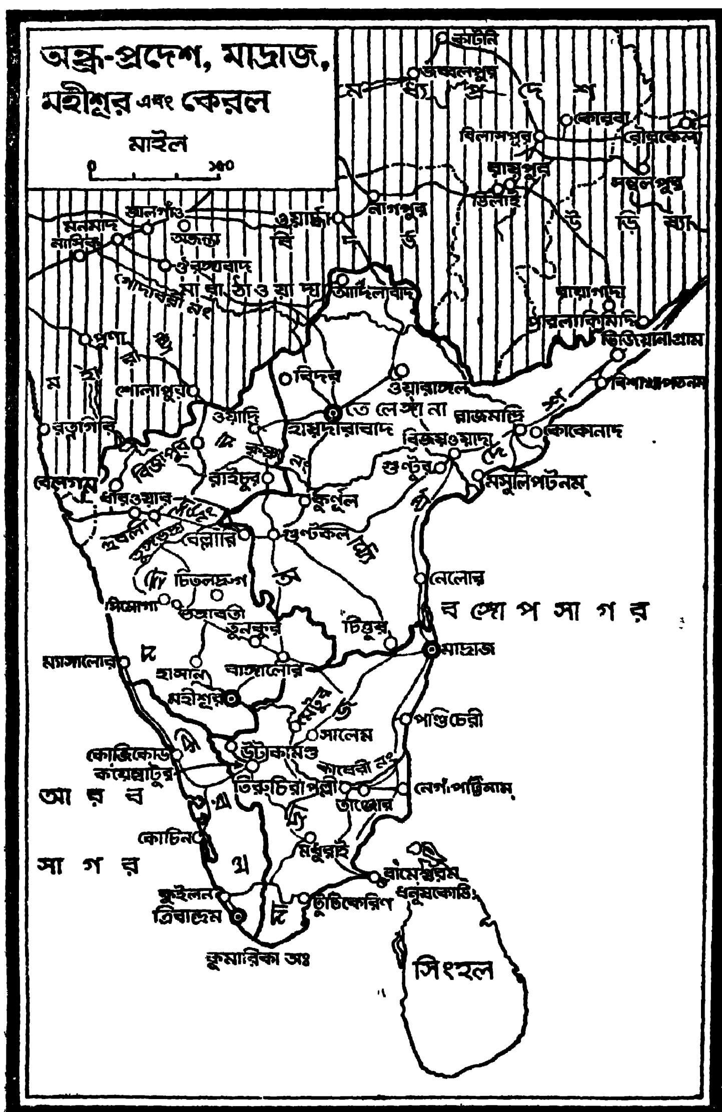
(গ) **দক্ষিণাংশ**—নেলোর জেলার উপকূলের সঙ্কীর্ণ সমভূমি ইহার অন্তর্গত। ল্যাটেরাইট্-মৃত্তিকায় গঠিত এই নিম্নভূমির বিস্তার ২-১২ মাইল মাত্র। ইহার পশ্চিমে প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত নিম্ন-মালভূমি। ঐ অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যায়। এখানে **উত্তর-পেন্নার** নদী প্রবাহিত। এখানে অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসেও বৃষ্টিপাত হয়; তবে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (২৫"-৩০")। এই

অঞ্চল কৃষিকার্যে উন্নত নহে।· ধান, রাগী ও চীনাবাদাম প্রধান ফসল। সমুদ্র-উপকূলে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহার দক্ষিণাংশে পুলকট হ্রদ অবস্থিত। এই হ্রদে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া চুণ প্রস্তুত হয়। **নেলোর** একমাত্র উল্লেখযোগ্য সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অংশে বাকিংহাম-খাল কৃষ্ণা নদী হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা নাব্য খাল।

(২) **পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল**—পূর্বঘাট একটানা পর্বতমালা নহে; বরং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতের সমষ্টি মাত্র। অন্ধ্রপ্রদেশে পূর্ব-ঘাটের দুইটি প্রধান অংশ দেখা যায়,—একটি অংশ গোদাবরী নদীর উত্তরে এবং অপরটি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তরাংশটি পূর্ব-গোদাবরী ও বিশাখা-পত্তনম্ জেলায় অবস্থিত। এই উচ্চভূমি অতি-প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত ও ব্যবচ্ছিন্ন। ইহা অরণ্যসঙ্কুল ও আদিবাসীদের বাসভূমি। ইহার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী (৫০"-৫৫")। উড়িষ্যার সীমান্তে মাচকুণ্ড বিদ্যুৎকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণাংশে কুড্ডাপা-পাহাড়ের শ্রেণী রহিয়াছে। ইহার বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন নামে অভিহিত,—নাল্লামালাই, ভেলিকোণ্ডা প্রভৃতি। বিভিন্ন পাহাড় ও উহাদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকৃতি শিলায় গঠিত। ঐগুলি অবশ্য বিবিধ শ্রেণীর আগ্নেয়শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। আর, এখানে রহিয়াছে নদী-উপত্যকা ও বেসিন। পার্বত্য ভূমি অরণ্যময় এবং নদী-উপত্যকা ও বেসিনের ভূমি খুব উর্বর না হইলেও এখানে যথেষ্ট কৃষিকার্য হয়। জোয়ার ও চীনাবাদাম এই স্থানের প্রধান ফসল। আর, জলসেচ করিয়া সামান্য ধানের চাষ হয়, কারণ স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলাশয় তৈয়ারী করা হইয়াছে। কুণুল-সেচখালও আছে। ইহার উত্তর সীমায় **কৃষ্ণা** নদী ও মধ্যভাগে **উত্তর-পেন্নার** নদী প্রবাহিত। আর, অক্টোবর ডিসেম্বর মাসেও বৃষ্টিপাত হয়। উহার পরিমাণ কম। পার্বত্য অঞ্চলে (ভেলি-কোণ্ডা পাহাড়) ৪০" বৃষ্টিপাত হয়। **চিত্তুর** হিন্দুদের তীর্থস্থান ও প্রসিদ্ধ শহর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **কুণুলে** পূর্বতন অন্ধ্রদেশের রাজধানী ছিল।

(৩) **মালভূমি-অঞ্চল বা তেলাঙ্গানা**—পূর্বতন হায়দারাবাদ রাজ্যের তেলেগু-ভাষাভাষী অঞ্চল এবং কুণুল ও অনন্তপুর জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।


অন্ধ্র-প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কেরল
মাইল
0
১৫০
কাটনি
জব্বলপুর
মধ্য প্রদেশ
কোরবা
বিলাসপুর
রৌরকেলা
রায়পুর
ভিলাই
সম্বলপুর
নাগপুর
ওয়ার্দ্ধা
উ ড়ি ষ্যা
জলগাঁও
মনমাদ
নাসিক
অজন্তা
বি দ র্ভ
ঔরঙ্গাবাদ
আদিলাবাদ
রায়গাদা
পারলাকিমিডি
ভিজিয়ানাগ্রাম
পুণা
বিদর
ওয়ারাঙ্গল
বিশাখাপটনম
শোলাপুর
তে লে ঙ্গা না
রাজমহেন্দ্রি
কোকোনাদ
রত্নাগিরি
ওয়াদি
হায়দারাবাদ
বিজয়ওয়াদা
বিজাপুর
কৃষ্ণা নদী
গুণ্টুর
মসুলিপটনম
বেলগাম
রাইচুর
কুর্নুল
ধারওয়ার
হুবলি
বেল্লারি
গুণ্টকল
নেলোর
চিতলদ্রুগ
সিমোগা
ভদ্রাবতী
ব ঙ্গো প সা গ র
তুমকুর
চিত্তুর
ম্যাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
হাসান
ব্যাঙ্গালোর
মহীশূর
পণ্ডিচেরী
সালেম
কোজিকোড
উটাকামণ্ড
কাবেরী নং
কয়েম্বাটুর
তিরুচিরাপল্লী
নেগাপট্টিনাম
আ র ব
সা গ র
তাঞ্জোর
কোচিন
মাদুরাই
রামেশ্বরম
ধনুষকোডি
কুইলন
ত্রিবান্দ্রম
তুতিকোরিণ
কুমারিকা অং
সিংহল

এই অঞ্চল প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন। গোদাবরী নদীর উপত্যকায় গোণ্ডওয়ানা শিলা দেখা যায়। এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে ছোট-বড় পাহাড় বা শিলাস্তূপ। **গোদাবরী, কৃষ্ণা, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা** প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। ইহার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫-৩৫ ই.। জলাশয়, কূপ ও সেচখাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা অংশবিশেষে রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে নিজামসাগর-জলাশয় ও তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা হইতে জলসেচ হইতেছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। কৃষ্ণা নদীর নাগার্জুন-কোণ্ডা বাঁধ নির্মিত হইতেছে। ইহা কার্যকরী হইলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং জলসেচের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলের জোয়ার প্রধান শস্য। বাজরা, ছোলা, ভুট্টা (করিমগঞ্জ জেলা), তৈলবীজ (চীনাবাদাম, রেড়ি ও তিল), তুলা অন্যান্য ফসল। জলসেচ করিয়া ইক্ষু ও ধান্য উৎপাদন করা হয়। **নিজামাবাদে** এশিয়ার বৃহত্তম চিনির কল রহিয়াছে। **সিঙ্গারেনির** কয়লার খনি উল্লেখযোগ্য। **সিরপুর** কাগজ-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **হায়দারাবাদ** ভারতের পঞ্চম প্রধান নগর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী। ইহা রেলপথের কেন্দ্রস্থলে মালভূমির উপর অবস্থিত। ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত সেকেন্দ্রাবাদ বিখ্যাত সৈন্যনিবাস ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য। **ওয়ারেঙ্গল** আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর।

মহীশূর

বোম্বাই রাজ্যের দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দারাবাদ রাজ্যের কানাড়ী-ভাষাভাষী অঞ্চল এবং কুর্গ রাজ্য ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন ৭৪,৮৬১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৯৪,০১,১৯৩; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ২৫৯। পশ্চিম-উপকূলের সমভূমি, পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি লইয়া মহীশূর রাজ্য গঠিত। এখানে **কাবেরী** এবং **কৃষ্ণা** ও তাহার উপনদী **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** (তুঙ্গ নদ ও ভদ্রা নদী, এই দুইটির মিলিত ধারাই তুঙ্গভদ্রা নদী) প্রবাহিত। এই

রাজ্যের উপকূলে ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং মালভূমি-অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে সেগুন, চন্দন, বাঁশ প্রভৃতি গাছের ঘন বন আছে। শুষ্ক অঞ্চলে সেচখাল, জলাশয় ও কূপ হইতে ক্ষেতে জলসেচ করিয়া চাষ হয়। ধান, রাগি, তুলা, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তামাক এই রাজ্যের প্রধান ফসল। আবার পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষতঃ কুর্গে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। আর, স্থানে স্থানে তুঁতগাছ জন্মে বলিয়া রেশমকীট প্রতিপালিত হয় ও রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতের রেশম-উৎপাদনে মহীশূর প্রথম স্থানীয়। স্বর্ণ, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে মহীশূর রাজ্য প্রসিদ্ধ। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, জগ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ভদ্রা নদী-পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে। এই রাজ্যে সুলভে প্রচুর তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় বলিয়া এখানে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিভাগ—মহীশূর রাজ্যে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ দেখা যায়, যথা—(১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল, (২) পার্বত্য অঞ্চল এবং (৩) মালভূমি-অঞ্চল।

(১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল—উত্তর- ও দক্ষিণ- কানাড়া জেলার উপকূল অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। উত্তরাংশের নিম্নভূমি কেবলমাত্র নদী-উপত্যকার নিম্নঅংশে রহিয়াছে। স্থানে স্থানে শৈলশিরা তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া এই নিম্নভূমিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণাংশে উপকূলের নিম্নভূমি ক্রমশঃ বিস্তারিত (৪০ মা.) হইয়াছে। কালী, শরাবতী, নেত্রবতী প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় শরাবতী নদী **গেরসোপ্পা** বা জগ নামক জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ (৮২৯ ফুট) জলপ্রপাত। এখানে মহাত্মা 'গান্ধী-শক্তিকেন্দ্র অবস্থিত। এখানে অদূর ভবিষ্যতে সুলভে ১৭৫ হাজার কি. ও. তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। এই অঞ্চল বৃষ্টিবহুল (১২৫ ই.)। তাই, ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। উপকূলের বেলেমাটিতে নারিকেল, অভ্যন্তরের উর্বর দো-আঁশ মাটিতে ধান ও ল্যাটেরাইট

মাটিতে রাগি ও ডাল উৎপন্ন হয়। পার্বত্য ভূমি অরণ্যময়। সেগুন, বাঁশ, বেত ও চন্দন গাছ এই বনে জন্মে। তাই, বনভূমি হইতে কাঠ, বাঁশ, বেত, খয়ের, মধু, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। মূল্যবান সেগুন ও চন্দন-কাঠ পাওয়া যায় বলিয়া এই স্থানের বনজ সম্পদ মূল্যবান। পার্বত্য অঞ্চলে আধিবাসীরা জুম্ প্রণালীতে (এখানে কুমরি বলে) চাষ-আবাদ করে বলিয়া বনভূমি বহুলাংশে ধ্বংস হইয়াছে এবং উহা আগাছা ও গুল্মভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কালী নদীর মোহনায় **কারওয়ার** বন্দর অবস্থিত। ইহার নিকট প্রসিদ্ধ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় **বৈটকুল**। এখানে উৎকৃষ্ট বন্দর স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার পশ্চাৎভূমি অল্প পরিসর এবং উন্নত নহে। কারওয়ারের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য সেগুন কাঠ ও মসলা। শরাবতী নদী-মোহনায় **হোনাভার** বন্দর। এই নদীর জলপ্রপাত পর্যন্ত ইহা নাব্য। দক্ষিণ-কানাড়া জেলায় সদর **ম্যাঙ্গালোর** শহর। ইহা উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি টালি তৈয়ারীর কারখানা আছে। কাঠ, কফি ও মসলা ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

(২) **পার্বত্য অঞ্চল**—পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণাংশ মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এই পার্বত্যভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত, বহু চ্যুতিপূর্ণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিলায় গঠিত। তাই, ইহা ব্যবচ্ছিন্ন। পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশ অপেক্ষা এই অংশ অধিক উচ্চ ও প্রশস্ততর। **কাবেরী** (কুর্গ) ও **ভদ্রা** নদী এবং **তুঙ্গ** নদ এই অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহাদের উৎসক্ষেত্র আরব সাগর হইতে ৩০ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত নহে। ইহা বৃষ্টিবহুল ও অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চল। পূর্বতন কুর্গ রাজ্য এই অংশে অবস্থিত। কুর্গের কৃষিক্ষেত্রের ৫৬% ধান ও ৩০% কফি উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া কাদুর ও হাসান জেলায় যথেষ্ট কফি উৎপন্ন হয়।

(৩) **মালভূমি-অঞ্চল**—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্র্যানিট্ শিস্ট, শ্লেট, নাইস প্রভৃতি প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত।*

* দাক্ষিণাত্য-লাভার পার্শ্বস্থ স্থানের কুড্ডাপা-শ্রেণীর শিলা ভিন্ন প্রায় সর্বাংশ প্রাচীনকালে সৃষ্ট নাইস ও গ্র্যানিট্ শিলায় গঠিত এবং উক্ত শিলাময় পৃষ্ঠের আধোভাগে ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলা

এই মালভূমিকে পেনিপ্লেন বলা যায়। ইহা উত্তরে ১৫০০-২০০০ ফুট হইতে দক্ষিণে ৩০০০-৪০০০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। উত্তরাংশে ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চুণাপাথর ও বেলেপাথরের যে পাহাড়গুলি রহিয়াছে, ঐ স্থানে বহু দুর্গ দেখা যায়। উহাদের দক্ষিণে উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকায় গঠিত ধারওয়ারের সমভূমি। এই অঞ্চল তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

পূর্বতন মহীশূর রাজ্যের পশ্চিমাংশের অরণ্যময় উচ্চমালভূমিকে **মালনাদ** এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নমালভূমিকে **ময়দান** বলে। মালনাদ পশ্চিমঘাটের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ঐ অংশ ব্যবচ্ছিন্ন। এই অঞ্চলে তুঙ্গ নদ, ভদ্রা ও কাবেরী নদী প্রবাহিত। মালভূমি ঢাল হইতে নামিবার সময় কাবেরী নদী **শিবসমুদ্রম্** (উহা নদীমধ্যস্থ দ্বীপের নাম) নামক জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। মালনাদ বৃষ্টিবহুল। আর, এই স্থানের অরণ্যে সেগুন, শিশু, বাঁশ, চন্দন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জন্মে। ময়দান বৃষ্টিবিরল (৩০") অঞ্চল বলিয়া ইহা পার্কল্যাণ্ড (Parkland) অর্থাৎ স্থানে স্থানে দুই-চারিটি গাছ দেখা যায়। আবার, মালনাদ অঞ্চলে বিশেষতঃ বাবুভূদান পাহাড়িয়া স্থানে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। ময়দান অঞ্চলে ছোট-বড় অসংখ্য জলাশয় আছে। জলাশয়গুলি হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাছাড়া, কাবেরী নদীর কৃষ্ণরাজাসাগর নামক জলাধার প্রসিদ্ধ। উহা হইতে সেচখালের দ্বারা জলসেচ হয়। ধারওয়ার অঞ্চলের প্রধান শস্য জোয়ার ও তৈলবীজ। ইহাছাড়া, তুলা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ময়দান-অঞ্চলের রাগী, ধান ও জোয়ার প্রধান শস্য। ছোলা ও তৈলবীজ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। মহীশূর গবাদি পশুপালনের জন্য প্রসিদ্ধ।

রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে ক্ষয়জাত শিলা হইতে যে পাললিক শিলা গঠিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃপুনঃ রূপান্তরিত হইয়া ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলায় পরিণত হইয়াছে। এই অংশের শিস্ট ও শ্লেট ধারওয়ার শ্রেণীর শিলা। ডি. এন. ওয়াদিয়া বলেন যে শিলাস্তরগুলিতে অতি জটিলভাবে ভাঁজ সৃষ্টি হওয়ায় পাললিক শিলাগুলি এরূপভাবে রূপান্তরিত হইয়া কেলাসিত শিল্পে পরিণত হইয়াছে যে, তাহাদের পাললিক শিলার বিশেষত্ব কিছু দেখা না, আর গ্র্যানিট্ বা পূর্বতন শিস্ট-শিলা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

উচ্চ মালভূমির উপর (৩০২১') রেলপথ ও রাস্তার কেন্দ্রস্থলে **বাঙ্গালোর** অবস্থিত। ইহার জলবায়ু মৃদু প্রকৃতির ও স্বাস্থ্যকর। এখানে কলকারখানা স্থাপনের অনুকূল অবস্থা বর্তমান,—সুলভ তড়িৎশক্তি ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত, দক্ষ শ্রমিক, কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত প্রচুর ভূমি প্রভৃতি রহিয়াছে। এইজন্য ইহা দক্ষিণ-ভারতের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। কার্পাস, পশম, রেশম, সাবান, কাচ, যন্ত্র প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প। এখানে বিমান, রেলগাড়ী, টেলিফোন, ছোট-বড় যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা আছে। বাঙ্গোলোর মহীশূর রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ও সৈন্যনিবাস। **মহীশূর** সুন্দর শহর ও পূর্বতন রাজধানী। **কোলার** স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। **ভদ্রাবতীতে** লৌহ-ইস্পাত, কাগজ ও সিমেন্টের কল আছে। **হুবলী, ধাওয়ার** ও **বেলগাম** তুলার বাণিজ্য-কেন্দ্র। **বিজাপুর** প্রাচীন শহর এবং এক যুগে ইহা বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার গোলগম্বুজ জগদ্বিখ্যাত।

কেরল

মালাবার উপকূলে কেরল রাজ্য অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুর জেলার ৪টি তালুক ও কুইলন জেলার একটি তালুক ব্যতীত সমগ্র পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ইউনিয়ন এবং মাদ্রাজ রাজ্যের মালবার জেলা ও দক্ষিণ-কানাড়া জেলার কাসরগড় তালুক লইয়া কেরল রাজ্য গঠিত হয়। এই রাজ্যের আয়তন ১৫,০০৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৩৫,৪৯,১১৮; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ৯০৭। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ইহাই সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য।

প্রাকৃতিক বিভাগ—এই রাজ্যে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ দেখা যায়, যথা—(১) উপকূলের পাললিক নিম্নসমভূমি, (২) স্থানে স্থানে শাখাশৈলশিরাযুক্ত ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত নিম্নমালভূমি এবং (৩) উচ্চভূমি।

(১) উপকূলের নিম্নভূমি—মালাবার উপকূলের ভূমি ও তটরেখা এক বিশিষ্ট প্রকৃতির; এই অংশের ভূ-নিম্নে প্রবাল-রিফ্ ও অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া এই সমভূমি

গঠিত হইয়াছে। এই সমভূমি নিম্ন হইলেও প্রশস্ত। আর, উপকূলের নিকটে রহিয়াছে 'মিঠা' বা লবণাক্ত জলের ছোট-বড় লেগুন ও ব্যাকওয়াটার (Back water)। কোচিন-বন্দরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঐরূপ ব্যাকওয়াটার বিস্তারিত হইয়া হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। উহার নাম ভেমবানাদ হ্রদ। ঐগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। লেগুন ও ব্যাকওয়াটারগুলিকে সংযোগ করিয়া ১৫০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল উত্তরে পোন্নানাই নদীর মোহনা হইতে দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খালটি উৎকৃষ্ট জলপথ। এই নিম্নসমভূমিতে বহু জলাশয় বা জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে এই অঞ্চল প্লাবিত হয়। ইহা উর্বর পাললিক সমভূমি।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কেরলই ভূ-বিষুবরেখার অন্যতম নিকটতম রাজ্য। সারা-বৎসর এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; বাৎসরিক গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা যথাক্রমে ৯০° ও ৭০° ফা. এবং দিবারাত্রির তাপমাত্রার প্রসর ৬° ফা.; আর, বাৎসরিক বৃষ্টিপাতও অধিক; অবশ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে (কজিকোট ১১৬" ও ত্রিবান্দ্রমে ৬৪")। আবার, বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তারতম্যও কম এবং বর্ষাকালের স্থায়িত্ব অধিক। এইরূপ উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু ও উর্বর নিম্নভূমি ধান উৎপাদনের অনুকূল। এইজন্য এই অঞ্চলের ধানই প্রধান শস্য। এই স্থানে জলসেচের প্রয়োজন হয় না; বরং জল-নিকাশের প্রয়োজন। এইরূপ নিম্নভূমিকে পাঙ্গা বা কোল বলে। এই অঞ্চলকে ৫০-১০০ একর অংশে বিভক্ত করিয়া উহার চারিদিকে সুন্দরবনের মত বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। আর, পারস্য-চক্র বা পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করা হয়। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে বহু অংশে জল-নিকাশের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবার ধান উৎপাদন করা হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে ভারতের অন্যান্য অংশের মত ধানের চাষ হয়। উপকূলের বেলেমাটি বা অন্যত্র দো-আঁশ মাটিতে, স্থানবিশেষে ল্যাটেরাইট-মাটিতে (বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া) প্রচুর নারিকেলের গাছ জন্মে। এত নারিকেল ভারতের অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। আর, ধানের পরই নারিকেলের স্থান। নারিকেলজাত দ্রব্য বহুলভাবে কেরলে ব্যবহার

করা হয়। ইহা হইতে বিভিন্ন কুটির শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে,—ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দ্রব্য, শুষ্ক শাঁস (copra), নারিকেল তৈল, সাবান, বনস্পতি তৈল প্রভৃতি। আর, কুটীর-শিল্পে স্ত্রীলোকেরা প্রধানতঃ শ্রমিক।

সমভূমি-অংশে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন, কোন কোন পল্লীঅঞ্চলে ২০০০-৪০০০। প্রত্যেক বাড়ীতে কলা, সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ রহিয়াছে। তাই, গ্রামের বাড়ীঘরগুলি পাশাপাশি নহে,—কতকটা দক্ষিণ-বঙ্গের গ্রামের মত। কুইলন হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ত্রিবান্দ্রিম পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইলে সর্বত্রই অল্প দূরে দূরে বাড়ীঘর ও লোকজন দেখা যাইবে, কোথাও একটুও জমি পতিত অবস্থায় নাই, সামান্য বাসগৃহ ভিন্ন সবটুকুই স্থানে কিছু-না-কিছু উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবন বাটুটাও কেরলে এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন।* তাই, কেরল গত ৬০০ বৎসর অবধি ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। মাছধরা অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। মাছধরা-প্রণালী ও সাজসরঞ্জাম সাবেকী ধরণের। বর্তমান নরওয়ে সরকারের সাহায্যে সমুদ্রে মাছধরা প্রণালীর উন্নতি হইয়াছে,—মোটরবোট, আধুনিক জাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। সারডিন মাছ (Sardines) নারিকেল গাছের সারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পেরিয়ার নদীর উপনদী মুদ্রাপূজাতে **পল্লীবসল** নামক স্থানে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র (২১,০০০ কি. ও.) আছে। এই স্থানের উৎপন্ন তড়িৎশক্তির সাহায্যে কোচিন শহর-অঞ্চলে কলকারখানা চালান হয়। বিহার রাজ্যের মুরি নামক স্থানে বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়া নিষ্কাশন করিয়া পেরিয়ার নদীতীরস্থ **আলওয়ে** নামক স্থানে প্রেরিত হয়। ঐ স্থানে তড়িৎশক্তির সাহায্যে এ্যালুমিনিয়া হইতে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। এই রাজ্যে বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। সমুদ্র-উপকূলের বালুকা হইতে মোনাজাইট, ইলমেনাইট ও জিরকন পাওয়া যায়। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহাদের ব্যবহার আছে (ইলমেনাইট হইতে

---

* Travels in Asia and Africa, 1325 1354—Iban Battuta—Trans. by H.A.R. Gibb—p. 231-32.

টিটানিয়া এবং মোনাজাইট হইতে সেরিয়াস নিষ্কাশন করা হয়—ইকেলট্রোরড, বুলেট-ট্রেসার, বেনজিন-শিল্পের অনুঘটক ইত্যাদি ইহাদের প্রয়োগ, তাহাছাড়া থোরিয়াম পাওয়া যায়)।

সমুদ্র-উপকূলস্থ **ত্রিবান্দ্রম** কেরলের রাজধানী ও প্রধান নগর। **কোচিন** ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর। চা, কফি, মশলা ও নারিকেলজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। এডেন বা ডার্বান হইতে বোম্বাই-এর যাহা দূরত্ব তাহা অপেক্ষা স্থানগুলি হইতে ইহার দূরত্ব ৩০০ মাইল কম। এখানে ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। আর, ভারতের নৌবাহিনীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। **আলেপ্পি** ও **কুইলন** বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। মালাবারের **কজিকোড** ও **তেল্লিচেরি** বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই দুইটি বন্দর হইতে কফি, গোলমরিচ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। **ত্রিচুরে** কাপড়ের কল আছে।

(২) **নিম্ন-মালভূমি-অঞ্চল**—উপকূলের সমভূমির পার্শ্বে এই অঞ্চল। ইহা ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত ২০০-৬০০ ফুট উচ্চ নিম্ন-মালভূমি। এখানে স্থানে স্থানে শাখাশৈলশিরা বা পাদপাহাড় রহিয়াছে। এই অঞ্চলও বৃষ্টিবহুল। তবে পালঘাট গিরিপথের পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক; ঐ স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। এই অংশে ধান ব্যতীত চীনাবাদাম ও সামান্য তুলার চাষ হয়। নিম্ন-মালভূমি অঞ্চলেও যথেষ্ট ধানের চাষ হয়। তাহাছাড়া, আদা এবং পাদপাহাড়ে গোলমরিচ জন্মায়। ইহাও কৃষিপ্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

(৩) **উচ্চভূমি-অঞ্চল**—মালাবার-উপকূলের সমান্তরালভাবে **পশ্চিমঘাট** ও **কার্দমম** পর্বত এবং নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথ অবস্থিত। ঐ গিরিপথের দক্ষিণে **আনাইমালাই** পর্বত। দক্ষিণ-ভারতের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ **আনাইমুদি** (৮৮৪১') আনাইমালাই পর্বতে অবস্থিত। নাইস নামক প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় আনাইমালাই ও কার্দমম পর্বত গঠিত। পশ্চিমঘাটের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্দমম পর্বতের দক্ষিণাংশে **শেলকোট্টা** গিরিপথ অবস্থিত। উহার মধ্য দিয়া রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। এই পার্বত্যভূমিতে প্রায় ১০০-২০০ ই. বৃষ্টিপাত হয় এবং উচ্চতাভেদে তাপমাত্রাও কম। ইহা

অরণ্যসঙ্কুল। এই অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চা, কফি ও রবারের বাগানে পরিণত করা হইয়াছে। এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক রবার উৎপন্ন হয়। ৮০-১০০ ই. বৃষ্টিপাত যে অঞ্চলে হয় অথচ যে স্থানে উচ্চতা ১০০০ ফুটের অধিক নহে তথায় রবার (দুই হাজার ফুট উচ্চ স্থানে রবার জন্মায় না), তাহার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চস্থান পর্যন্ত চা উৎপন্ন হয়। তবে, অর্ধেকের অধিক চা-বাগানগুলি ৪০০০ ফুটের অধিক উচ্চস্থানে অবস্থিত। এইরূপ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ ইঞ্চি। পেরিয়ার নদীর বাঁধ ও জলাধার এই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বহু জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত করিবার অনুকূল অবস্থা বর্তমান। **সেনগুলাম** (৪৮ হা. কি. ও.) জল বিদ্যুৎ-কেন্দ্র কার্যকরী হইয়াছে, নেবিয়ামানগালাম (৪৫ হা, কি. ও.)ও প্রোঙ্গালকুথু (৩২ হা.) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে এবং শোলায়ারী (৫৪ হা.), পামবা (১ ল.) ও পান্নিয়ার (৩০ হা.) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

নিম্নভূমির জলনিকাশ এবং উপত্যকা ও নিম্ন-মালভূমি অঞ্চলে জলসেচ করিবার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা হইয়াছে, যথা—কুট্টানাদ, নেয়ার মালামপুশা এবং ওয়ালায়ার-জলাধার।

মাদ্রাজ

অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণে মাদ্রাজ রাজ্য; ইহাই তামিলনাদ বা তামিলদেশ। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ইউনিয়নের ত্রিবাঙ্কুর জেলার ৪টি তালুক ও কুইলন জেলার একটি তালুক মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে; আবার, এই রাজ্য হইতে মালাবার উপকূলের সমগ্র অংশ ও কইম্বাটুর জেলার কেল্লেগাল তালুক এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কুমারিকা অন্তরীপ এই রাজ্যে অবস্থিত। মাদ্রাজ রাজ্যের আয়তন ৫০,১২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৯৯,৭৪,৯৯৬; আর, লোক-বসতির ঘনত্ব ৫৯৭।

প্রাকৃতিক বিভাগ—সমভূমি ও পার্বত্য ভূমি লইয়া মাদ্রাজ রাজ্য গঠিত হইলেও ইহাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা সহজসাধ্য নহে ; কারণ বিভিন্ন অংশে বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে, মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতভাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—

(১) কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের উত্তরে উপকূলের সমভূমি—ইহা করমণ্ডল-উপকূলের সমভূমি। ইহার সমগ্র অংশ নিম্নভূমি বা পাললিক সমভূমি নহে। বিভিন্ন অংশের ভূ-পৃষ্ঠের উন্নতি বা মৃত্তিকার উপাদান বিভিন্ন। পাহাড়ের পাদদেশে নাইস শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন (২৫০-৫০০ ফুট উচ্চ)। আর, এখানে রহিয়াছে অতি-প্রাচীন শিলায় গঠিত ছোট ছোট পাহাড়। এখানে শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের গুল্ম জন্মে। কাড্ডালোর-অঞ্চল বেলেপাথর বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকায় গঠিত। এখানে স্থানে স্থানে নিম্নঅংশে উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। এই অঞ্চলে কুএসটা শ্রেণীর পাহাড় (Cuesta) আছে। বাঁশ, তাল ও নারিকেল গাছ এই অংশে জন্মে। আর, সমুদ্র-উপকূলে অপ্রশস্ত নবীন পাললিক ভূমিও রহিয়াছে। পণ্ডিচেরীর নিকট পললরাশির গভীরতা ৫০০ ফুটের অধিক। সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া উপকূলভাগ গঠিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন আছে। তবে, এই অঞ্চলের কোন কোন অংশের স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন অংশের শিলার প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা দেখা যায়,—নাইস-শিলাময় অঞ্চলে লালমাটি, নিম্নঅংশে কৃষ্ণ-মৃত্তিকা বা দো-আঁশ মৃত্তিকা, তবে অধিকাংশ স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দো-আঁশ মৃত্তিকা আছে।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত (মোট পরিমাণ ৪০-৪৫ ই.) হয়। তাই, অক্টোবর মাসে প্রধানতঃ ধান (সম্বা ধান) রোপণ করা হয়। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, তখন রাগি, তিল, চীনাবাদামের চাষ হয় ; কারণ এইগুলি উৎপাদন করিতে অধিক জলের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য, সে সময় 'কার' ধানের চাষ হয়। ইহা বাংলা দেশের আউশ ধানের মত ; আর, সম্বা ধান আমন ধানের মত। জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থাও আছে। এই অঞ্চলে সমুদ্রে যথেষ্ট মাছ ধরা হয়। উপকূলের সমুদ্র জল

শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা অন্যতম শিল্প। বর্তমানে দক্ষিণ-আরকট জেলায় **নিভেলীতে লিগ্‌নাইট** পাওয়া যাইতেছে। ঐ স্থানে তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র, রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

মাদ্রাজ—এই রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের তৃতীয় প্রধান শহর ও বন্দর। ইহার বস্ত্র- ও চর্ম-শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহার উপকণ্ঠে **পেরামবুরে** রেলওয়ের যাত্রীগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে। **কাঞ্চিভরম, মহাবলীপুরম্** হিন্দুদের তীর্থস্থান ও মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। **ভেল্লোর** শস্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। **কুড্ডালোর** বন্দর ও চীনাবাদামের ব্যবসার স্থান। **চিদাম্বরম্** হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে আনাইমালাই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

(২) **তামিলনাদের পাহাড়**—উল্লিখিত সমভূমির পশ্চিমে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, কয়েকটি উঁচু পাহাড় আছে। তন্মধ্যে জাভাডি, শেভরয়, (৫৪০০'), কালরায়ান ও পাচামালি পাহাড় উল্লেখযোগ্য। পাহাড়গুলি প্রাচীন শিলায় (charnockites) গঠিত। পার্বত্য-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক (শেভরয়—১২৮") ও জলবায়ু মৃদু। এই পাহাড়গুলির গাত্রদেশ অরণ্যময় হইলেও মালভূমি অঞ্চলে যথেষ্ট কৃষিকার্য হয়। রাগী, বাজরা (চোলাম), ছোলা, তৈলবীজ এখানে উৎপন্ন হয়। মালায়ালী নামক আদিবাসীরা শেভরয় পাহাড়ে বাস করে।

(৩) **দক্ষিণ-পেন্নার ও পালার নদী-উপত্যকার উচ্চঅংশ ও সালেম মালভূমি**—মহীশূর-মালভূমি ও তামিলনাদ-পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলই ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের অধিকাংশই প্রাচীন শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন বা মালভূমি (১৩০০-১০০০')। আর, ইহার পশ্চিমাংশ ধাপে ধাপে উচ্চ হইয়া মহীশূরের মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পালার ও দক্ষিণ-পেন্নার নদী মহীশূরের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া এই অঞ্চলে প্রবাহিত। এখানে ইহাদের ছোট-ছোট বহু উপনদী রহিয়াছে। এই অঞ্চল লাল রঙের বেলেমাটির দ্বারা গঠিত। উচ্চভূমির দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও বায়ুর আর্দ্রতা কম; আর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০-৩৩ ই.। বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আছে,—মে হইতে নবেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইলেও আগস্ট-অক্টোবর মাসের

বৃষ্টিপাতই অধিক। এই অঞ্চলে জলাশয় ও কূপ হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাগি ও জোয়ার এই স্থানের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান সামান্যই উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, চীনাবাদাম, তিল ও সামান্য কার্পাস জন্মায়। ইহার পশ্চিমাংশ বিশেষতঃ মহীশূর-মালভূমির ঢালের অংশবিশেষ অরণ্যময় অঞ্চল হইলেও যথেষ্ট তৃণভূমি আছে। এই অঞ্চল গবাদি পশুচারণের জন্য বিখ্যাত। ধর্মপুরী ও কৃষ্ণগিরি নামক বিখ্যাত গরু এখানে প্রতিপালিত হয়। গো-পালকরা মাঠের মধ্যে 'বাথানে' বাস করে; দিবাভাগে মাঠে গোচারণ করে এবং রাত্রিতে বাথানে গরুগুলিকে আবদ্ধ রাখে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলার হিজল-বিল ও নদীয়া জেলার কালন্তর-অঞ্চলে কতকটা এইভাবে গবাদি-পশুচারণ হয়।

মহীশূর-মালভূমির প্রান্তদেশের স্থানে স্থানে সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ, অভ্র, তাম্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে, তবে প্রচুর পরিমাণে লৌহের আকর (Magnetite) সালেমের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও অন্যত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, সালেমের নিকট ৪০ হাজার টন ম্যাগনেসাইট (Magnesite-$MgCO_3$) উত্তোলিত হয়। কাগজ, কাচ, প্লাসটিক, মিশ্রধাতু ও ঔষধে ম্যাগনেসাইট ব্যবহার করা হয়। এই অঞ্চলের **সালেম** প্রধান শহর ও বয়নশিল্পের কেন্দ্র। মেটুর ও পিকারা হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই স্থানের কল-কারখানা চালিত হয়।

(৪) **কাবেরী নদীর উপত্যকা ও ব-দ্বীপ**—কুর্গের পার্বত্য-অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যে কাবেরী নদী (৪৭৫ মা.) প্রবাহিত। মহীশূরে ইহার উপনদী শিমসা প্রবাহিত। এই নদীতেও জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র রহিয়াছে। মহীশূর রাজ্যে মহীশূর শহর হইতে ১২ মাইল দূরে কৃষ্ণরাজাসাগর নামক জলাধার আছে। উহা হইতে জলসেচ হয়। তাহার পর শিবসমুদ্রম্ নামক দ্বীপের নিকট ২০০০ ফুট সমউচ্চরেখা (contour) অতিক্রম করিয়াছে। ঐ দ্বীপের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি জলপ্রপাত ও নদীর খরস্রোত-অংশ (Rapids) আছে এবং নদীর ঐ অংশ- ৩২০ ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। এই স্থানে

জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র অবস্থিত। তৎপর গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া বাহিয়া পরে এই নদী হাগেনাকল জলপ্রপাত (৭০ ফুট) সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পর মেটুর নিকট কাবেরী গিরিখাতের মধ্যে প্রবাহিত। এই অংশে বিখ্যাত মেটুর-বাঁধ রহিয়াছে। ইহার পশ্চাতে জলাধার আছে। এই স্থানেও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই জলাধার হইতে কাবেরীর ব-দ্বীপের সেচখালে জল নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আর, কাবেরী বৃহৎ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে। ইহার উপনদী **ভবানী** ও **অমরাবতী** নিত্যবহা; উহারা যথাক্রমে নীলগিরি ও আনাইমালাই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভবানীর উপনদী **ময়ারের** উৎসক্ষেত্র নীলগিরি। আবার, নীলগিরি হইতে নির্গত হইয়াছে ময়ারের উপনদী **পিকারা**। ময়ার ও পিকারায় জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, দক্ষিণ-মাদ্রাজে পাপনাশম্ (তিনেভেলী জেলা) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে। মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যের সকল জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি পরস্পর তারের দ্বারা সংযুক্ত। ভবানী নদীতে বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হইয়াছে এবং উহা হইতে ২লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। তাই, শুধু কাবেরী হিন্দুদের পবিত্র নদী নহে বা ইহার ব-দ্বীপ অঞ্চল কেবলমাত্র মাদ্রাজের শস্য-ভাণ্ডার নহে, এই নদী ও উহার উপনদীগুলি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের উৎস।

কাবেরী নদীর উপত্যকার নিম্নঅংশ ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি উর্বর এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে বহু সেচখাল আছে। ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ। ঐ স্থানে একাদশ শতাব্দীতে বিরাট বাঁধ নির্মাণ করিয়া ঐ প্রাচীন যুগেই এই অংশে জলসেচ-ব্যবস্থা করা হয়। তাই, হাজার বৎসরের উপর এই ব-দ্বীপে সুচারুরূপে কৃষিকার্য সম্পাদিত হইতেছে। ধানই ইহার প্রধান শস্য; ইহা ছাড়া, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসল অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী-তীরস্থ **তিরুচিরাপল্লী** ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। এখানে এবং ইহার নিকটস্থ **শ্রীরঙ্গম** দ্বীপে বহু মন্দির আছে। শহর দুইটি হিন্দুদের তীর্থস্থান। ইহার নিকটে সিমেণ্ট তৈয়ারী কারখানা আছে। **তাঞ্জোর** ও **কুম্ভকোনম্** প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। এই অঞ্চলের **নেগাপট্টিনম** বন্দর।

(৫) **কইম্বাটুরের মালভূমি**—এই মালভূমির পশ্চিমে পালঘাট-গিরিপথ-অঞ্চল। এই মালভূমি প্রাচীন শিলায় গঠিত; আর, এই মালভূমিতে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই অঞ্চলে ২৭"-৩০" ই. বৃষ্টিপাত হয়; তাই ইহার জলবায়ু শুষ্ক। এখানে ভবানী নদীর বাঁধ হইতে সেচখালের এবং বহু কূপের দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। এখানে সামান্য ধান উৎপন্ন হয়। জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম ও তূলা এই স্থানের প্রধান ফসল। নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে **কইম্বাটুর** শহর অবস্থিত। ইহা ভারতের তৃতীয় প্রধান বয়নশিল্প-কেন্দ্র। এখানে সিমেণ্টের কারখানাও আছে।

(৬) **দক্ষিণ-পূর্ব শুষ্ক অঞ্চল**—মধুরাই, রামনাদ ও তিনেভেলী জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহার অধিকাংশ সমভূমি, তবে উত্তর-পশ্চিমাংশে কতকগুলি পাহাড় আছে এবং ঐ অংশ মালভূমি। মাদ্রাজের অন্যান্য অংশের মত ভূ-নিম্নে নাইস-শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন; উহার উপর স্থানবিশেষে লালমাটি বা ল্যাটেরাইট-মাটি বা কালোমাটি (তিনেভেলী জেলার অংশ বিশেষ) রহিয়াছে; আর নদী-উপত্যকা বা উপকূল নদী বাহিত বা সমুদ্র বাহিত কিংবা বায়ু বাহিত মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। আবার, পাহাড়গুলিও নাইস-পেনিপ্লেনের উপর অবস্থিত। কুমারিকা-অন্তরীপ এই অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর জেলার তালুকগুলি শুষ্ক; এখানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। ভৈগাই, তামপ্রাবার্ণী (তাম্রবার্ণী ?) প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। পশ্চিমপার্শ্বে সুউচ্চ কার্দমম পর্বত রহিয়াছে বলিয়া আরব সাগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় না; আবার অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে যে পথে মৌসুমী বায়ু প্রত্যাবর্তন করে, সেই পথ হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এই অংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (৩০"-৩৫" ই.)। এইজন্য জলসেচের প্রয়োজন। রামনাদ জেলা ও মধুরাই জেলার দক্ষিণাংশে অসংখ্য জলাশয় আছে। ছোট ছোট নদী বা জলধারা যেস্থানে সমউচ্চতা-রেখা (Contour) অতিক্রম করিয়াছে, তথায় বাঁধ তৈয়ারী করিয়া প্রাচীনকালে এই জলাশয়গুলি সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ঐগুলির নিম্নদিকের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ

হয়। তবে, বর্তমানে অসংখ্য জলাশয় মজিয়া গিয়াছে। আর, বৃষ্টিপাত না হইলে জলাশয়ে জল সঞ্চিত হয় না (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বাঁধগুলিও এইরূপ জলাশয়)। ইহা ছাড়া, পেরিয়ার নদীর জলাধার হইতে ভৈগাই নদী-উপত্যকায় এবং তামপ্রাবার্ণী নদী-উপত্যকায় সেচখালের জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। আর, তিনেভেলী জেলায় রহিয়াছে অসংখ্য কূপ (৩৬,০০০)। মৃত্তিকার উপাদান ও জলসেচ-ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন। কাম্বু (বাজরা), রাগি, ধান, তুলা ও চীনাবাদাম এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। মাদ্রাজ রাজ্যের ইহা প্রধান তুলা-উৎপাদন অঞ্চল। তামপ্রাবার্ণী নদীর পাপনাশম্ জলপ্রাপত (৩০০′) হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আর, মান্নার উপসাগরে মুক্তা ও শাঁখ উত্তোলিত হয়।

রামেশ্বরম্ পামবান দ্বীপের উপর অবস্থিত মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান। ইহার নিকটে **ধনুষ্কোডি** বন্দর অবস্থিত। এই স্থান হইতে সিংহলে ফেরি-স্টীমার যাতায়াত করে। **তুতিকোরিণ** মান্নার উপ-সাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান শহর। ইহার লবণ ও কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য। তুলা, বস্ত্র, মসলা, খইল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

(৭) **পার্বত্য-অঞ্চল**—নীলগিরি, আনাইমালাই, পলনি ও কার্দমম পর্বত এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহার দক্ষিণে পালঘাট গিরিপথ এবং ইহার দক্ষিণপার্শ্বে আনামালাই-পলনি-কার্দমম পর্বত। এই পর্বতগুলি পরস্পর সংযুক্ত। দোদাবেত্তা (৮৭৬০′) নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ। এই পর্বত নাইস্ শিলায় গঠিত উচ্চ শিলাস্তূপ। তাই, চারিদিকে খাড়াভাবে উঠিয়াছে। আর, ৬০০০-৭০০০ ফুট উচ্চ-অংশে প্রায় ১০০০ বর্গমাইল স্থান মালভূমিময়। এই অংশের জলবায়ু মৃদু (৫৩-৬০° ফা.) ও বৃষ্টিপাত ৬০-১৬০″ ই.। এখানে প্রচুর চা (৪০,০০০ এ.) ও কফি (২০,০০০ এ.) উৎপন্ন হয়; আর সামান্য ভুট্টা, ধান প্রভৃতি জন্মায়। সিঙ্কোনা (১৫০০ এ.) গাছও জন্মে। এই পার্বত্য-অঞ্চলের অর্ধাংশে আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলের সেগুন, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি আছে। এখানে ইউ-

ক্যালিপ্টাস গাছ রোপণ করা হইয়াছে। **উটকামণ্ড** (৭৩৬৪′) এই স্থানের প্রসিদ্ধ শহর ও শৈলনিবাস। রেলপথের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। নীলগিরি-অঞ্চলের পিকারা, ময়ার প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি উল্লেখযোগ্য। আনাইমালাই-পলনি-কার্দমম পার্বত্যভূমি নাইস শিলায় গঠিত। এখানে বহু শাখা-শৈলশিরা ও নদী-উপত্যকা রহিয়াছে। ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া অরণ্যসঙ্কুল। পলনি-পর্বতের উপর **কোদাইকানাল** (৭,০০০′) শহর অবস্থিত। এখানে ভারত-সরকারের সৌর মানমন্দির আছে।

জম্মু ও কাশ্মীর

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৫, ৮৬১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৪,১০,০০০ ; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ৫৪। এই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং লাডাক-অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধ। তবে, হিন্দুও যথেষ্ট আছে। ইহা সর্দার-ই-রিয়াসাৎ দ্বারা শাসিত রাজ্য।

প্রধানতঃ দুইটি সুউচ্চ পার্বত্য ভূমি লইয়া কাশ্মীর গঠিত ; আর ঐ দুইটি পার্বত্যভূমির মধ্যস্থলে **সিন্ধুনদের উপত্যকা**। উত্তরের পার্বত্যভূমিতে **কারাকোরাম ও লাডাক** পর্বত। পর্বতমালা দুইটির মধ্যবর্তী উপত্যকায় সিন্ধুনদের উপনদী **সিয়াক** প্রবাহিত। কারাকোরাম পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত। উহার বহু উচ্চ গিরিশৃঙ্গ আছে। তন্মধ্যে **গডউইন অস্টেন** বা K_2 পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। দক্ষিণের পার্বত্যভূমিতে হিমালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী ও জাসকর পর্বত রহিয়াছে। সিন্ধুনদের উপত্যকার দক্ষিণপার্শ্বেই **প্রধান হিমালয়-জাসকর** শ্রেণী। প্রধান-হিমালয় ও মধ্য-হিমালয় বা **পিরপঞ্জলের** মধ্যস্থলে বিখ্যাত কাশ্মীর-উপত্যকা। আর, পিরপঞ্জল ঐ উপত্যকার দুইপার্শ্ব ঘিরিয়া রহিয়াছে। আবার, সর্ব-দক্ষিণে অব-হিমালয় শ্রেণী অবস্থিত। কাশ্মীর-উপত্যকায় **উলার** হ্রদ আছে। এই উপত্যকায় ঝেলাম বা **বিতস্তা** নদী ঐ হ্রদের মধ্য

দিয়া প্রবাহিত। তাহা ছাড়া, **চন্দ্রভাগা** (চেনাব) এবং **ইরাবতী** (রাভী) নদী এই রাজ্যে প্রবাহিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ—জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে বিভিন্ন সুউচ্চ পর্বতমালা, গভীর নদীখাত, নদী-উপত্যকা, উচ্চ-মালভূমি ও সমভূমি বর্তমান। এইজন্য বিভিন্ন অংশের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন। তাই, ইহাকে অনেকগুলি প্রাকৃতিক-বিভাগে বিভক্ত করা যায়; কিন্তু ঐরূপ জটিলতা বর্জন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে প্রাকৃতিক-বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা,—

(১) অব-হিমালয় ও উহার নিম্নের সমভূমি-অঞ্চল—পাঞ্জাবের সীমান্তে অপ্রশস্ত (৫-১৫ মা. প্রস্থ) সমভূমি রহিয়াছে এবং উহার পর অব-হিমালয়। উহার উচ্চতা ২,০০০—৪,০০০ ফুট। সমভূমি-অংশে বহু খাত আছে, কারণ ঐ অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আর, অব-হিমালয়ে রহিয়াছে বহু দীর্ঘাকৃতি ও অপ্রশস্ত উপত্যকা বা ডুন। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়; তবে শীতকালেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। পূর্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক (৩৫" ও ২৮")। দক্ষিণাংশে গুল্ম বা ধাক গাছ (মৌসুমী অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ) এবং পার্বত্য-অঞ্চলে চিরপাইন গাছের বনভূমি আছে। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। ধান, গম, ভুট্টা, ছোলা, বাজরা প্রভৃতি এখানে জন্মায়। আর, এখানে বিবিধ খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র উত্তোলিত হয়। রিয়াসি (Riasi) জেলায় কয়লার খনি আছে। বর্তমানে এই জেলা পাকিস্তানের অধিকারে আছে। **জম্মু** এই অঞ্চলের প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। পাঠানকোট হইতে কাশ্মীর-সড়ক জম্মু হইয়া শ্রীনগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

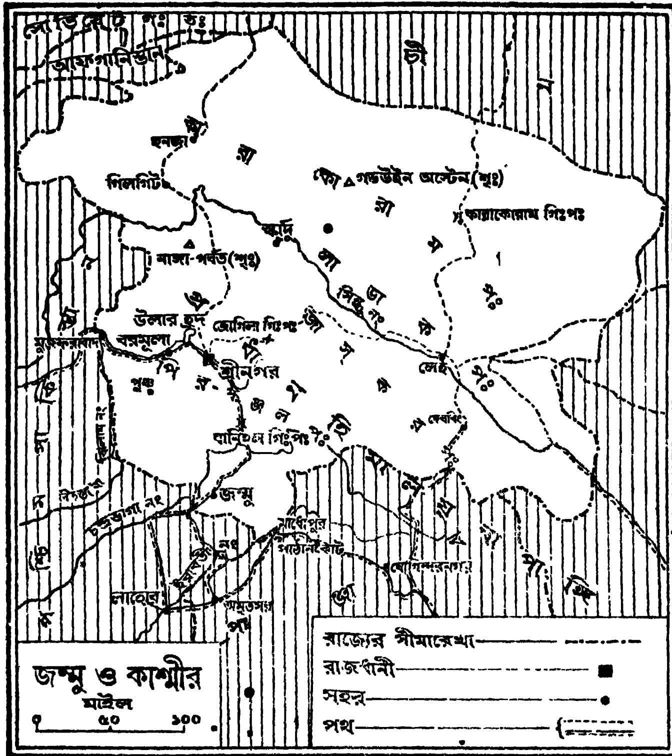
(২) পিরপঞ্জল—ইহা হিমালয়ের শাখা-পর্বত বা মধ্য-হিমালয় (The Lesser Himalayas) বলা যায়। ইহার ভাঁজ ও শিলার প্রকৃতি জটিল। ইহা সুউচ্চ পর্বত,—কোন কোন অংশ ১৫,০০০′ উচ্চ এবং গিরিপথগুলি প্রধানতঃ ১১,০০০—১২,০০০′ ফুট উচ্চ। ইহার উত্তর-ঢাল অপেক্ষা দক্ষিণ-ঢালের বৃষ্টিপাত অধিক; কিন্তু দক্ষিণ-ঢাল খাড়াখাড়িভাবে উঠিয়াছে বলিয়া ঐ অংশে মৃত্তিকা

বিশেষ নাই। তাই, দক্ষিণ-ঢাল অপেক্ষা উত্তর-ঢালে অধিক সংখ্যক সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে; আর, ঐ অংশে বনভূমি দেখা যায়। কাশ্মীর-উপত্যকায় দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তস্থ **বানিহল** গিরিপথ (৯,২৯০′ ফু.) এই পর্বতে অবস্থিত। কাশ্মীর-সড়ক এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। শীতকালে এই অংশের সড়ক বরফের জন্য অকেজো হইয়া যায় বলিয়া বর্তমানে এখানে আরও নিম্নঅংশের নব নিমিত সুরঙ্গের মধ্য দিয়া ঐ সড়ক গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। এই পর্বতমালার ছোট ছোট হিমবাহগুলি উত্তর-ঢালে অবস্থিত; কারণ শীতকালে ঐ অংশে তুষারপাত হয়। আর, দক্ষিণ-ঢালে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়।

(৩) **কাশ্মীর-উপত্যকা** (The Vale of Kashmir)—প্রধান হিমালয় (The Great Himalayas) ও পিরপঞ্জলের মধ্যস্থলে কাশ্মীর-উপত্যকা। ইহার দৈর্ঘ্য ৮৫ মা. ও প্রস্থ ২৫ মা। ইহা বিতস্তা নদীর বন্যাপ্লাবিত পাললিক সমভূমি। ইহার নিম্নঅংশের উচ্চতা ৫,২০০′ ফুট। হরমুখ গিরিশৃঙ্গ (১৫,৯৯৯′) এই উপত্যকার উত্তরাংশের নিকটে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু মহাদেশীয়, —শীতকালে শৈত্য অধিক। শ্রীনগরের জানুয়ারী ও জুলাই-এর গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০·৭° ফা. ও ৭৩° ফা; এবং প্রসর ৪২·৩। ইহার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৬″। শীতকালে এখানে সাধারণতঃ তুষারপাত এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়; আর বৃষ্টিপাত অপেক্ষা তুষারপাতই অধিক। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান ও ভুট্টা। ইহা ছাড়া, গম, তিসি, রাই উৎপন্ন হয়। এখানে অবশ্য জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর, ফলের জন্য কাশ্মীর-উপত্যকা বিখ্যাত। আপেল, বাদাম, নাসপাতি প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুচারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। এখানে তুঁতগাছের চাষ হয় ও রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। তাই, রেশম ও পশম-শিল্পের জন্য কাশ্মীর প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীর-উপত্যকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি, পাইন গাছের শ্যামল বনভূমি, ফুল-ফলের বিচিত্র শোভা, নদী ও হ্রদের সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এত মনোরম যে, ইহাকে ভূ-স্বর্গ বলা হয়। তাই, বহু বিদেশী

এখানে বেড়াইতে আসেন। বিতস্তা নদীতীরস্থ **শ্রীনগর** কাশ্মীরের রাজধানী



ও প্রধান নগর। ইহার নিকট ডাল হ্রদ অবস্থিত। এখানে বিবিধ কুটীর-শিল্প রহিয়াছে। তন্মধ্যে রেশম-, পশম-, দারু-, ধাতু-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

(৪) **প্রধান হিমালয় এবং জাসকর পর্বতমালা**—যেখানে সিন্ধু নদ ঘুরিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে, ঐ স্থান পর্যন্ত প্রধান-হিমালয় বিস্তৃত। জোজিলা (লা-গিরিপথ) পর্যন্ত এই পর্বতমালা প্রশস্ততর। এই অংশ ১৫,০০০′ ফুট অধিক উচ্চ পার্বত্যভূমি,—কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উচ্চঅংশ (Massifs) লইয়া ইহা গঠিত।

নাঙ্গা পর্বত ঐরূপ একটি উচ্চঅংশ। ইহার উচ্চতম অংশের উচ্চতা ২৬,৬২৯ ফুট। ঐ গিরিপথের পূর্বেও এই পর্বতমালা শতদ্রু-স্পিটি-উপত্যকা পর্যন্ত ঐরূপ উচ্চ; এবং এই অংশে ২১,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে। প্রধান-হিমালয়ের এই অংশের দক্ষিণে পিরপঞ্জল পর্বতমালা প্রসারিত ও উহা ১৫,০০০—১৮,০০০ ফুট উচ্চ। আর, প্রধান হিমালয়ের উত্তরে জাসকর পবতমালা। ইহাও সুউচ্চ। ইহার উচ্চতম অংশ ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমির মত ও বহু গিরিশৃঙ্গযুক্ত। জাসকর পর্বতমালার পূর্বাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রূপশু ও সো-মোরারি বেসিন (Tso Morari ১৬,০০০′) এবং পশ্চিমাংশে দেওসাই (Deosai) সমভূমিতে (১৩,০০০′) পরিণত হইয়াছে। এই পার্বত্যভূমিতে লোকবসতি অত্যন্ত কম। অধিকাংশ অধিবাসীই মেষপালক। নিম্নতম অংশে (১৩,৫০০ ফুট) সামান্য যব উৎপন্ন হয়। সো-মোরারি অঞ্চলের কোরজোকে (১৫,০০০ ফুট) সামান্য কৃষিকার্য হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল।

(৫) **সিন্ধু নদের উপত্যকার উচ্চঅংশ—লাডক ও বাল্টিস্তান—** লাডাকের অধিবাসীরা মহাযান বৌদ্ধ এবং ইহা কাশ্মীরের অন্তর্গত। বাল্টিস্তানের অধিবাসীরা মুসলমান এবং ইহা পাকিস্তানের অধিকারে আছে। ইহা তিব্বতের মালভূমির অংশ। এই অঞ্চলে সিন্ধু নদ মন্থরগতিতে (ঢাল ২০′ ফুট/মাইল) প্রবাহিত। ইহার উপনদী সিয়াক, জাসকর, গিলগিট প্রভৃতি এখানে প্রবাহিত। সিন্ধু ও সিয়াকের মধ্যস্থলে ১৯০ মাইল দীর্ঘ ও উচ্চ-লাডাক পর্বত অবস্থিত। তাই, নদী দুইটি বহুদূর ২৫-৩০ মাইল দূরে দূরে কতকটা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। সিন্ধু নদের উপনদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট, আর উহারা সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হইবার সময় পাললিক ভূমি (Fans) সৃষ্টি করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রধান শহর লে (Leh) ঐরূপ পাললিক ভূমির (১০০০′ ফুট গভীর পললরাশি ও ৫ মাইল প্রস্থ) উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু শীতল ও মহাদেশীয়,—জানুয়ারী (১৭·৩ ফা.) ও জুলাই-এর (৬২·৬ ফা.) তাপমাত্রার প্রসর ৪৫·৩ ফা. এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ৩·২ ইঞ্চি। অবশ্য উচ্চ অংশের তুষারপাত বা বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই, এই উপত্যকার পার্শ্বে উচ্চভূমির অবস্থান ও নদী-

মোহনায় পাললিক ভূমি গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলে লোকবসতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল অতি লঘু বলিয়া গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে রৌদ্রে পাথর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, আর ছায়াযুক্ত স্থান অতি শীতল ও রাত্রি অত্যন্ত শীতল। যবই এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। স্থানে স্থানে একই জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে; কারণ দিবাভাগের অত্যন্ত উত্তাপের জন্য শস্য শীঘ্র শীঘ্র পাকে। তাহা ছাড়া, সামান্য গম, ডাল, কন্দ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানে অতি যত্নসহকারে কৃষিকার্য সম্পাদিত হয়—অন্য স্থান হইতে উৎকৃষ্ট মাটি আনিয়া নদীর কূলের বেলেমাটির সহিত মিশিয়া দেওয়া; সার প্রয়োগ ও জলসেচ করা হয়। জো (Dzo-গাভী ও ইয়কের সঙ্কর পশু) নামক পশুর দ্বারা হলকর্ষণ করা হয়। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে যাযাবর জাতির লোক থাকিলেও লাডাকের অধিবাসীরা স্থায়ী গ্রামে বাস করিয়া কৃষিকার্য ও পশুচারণ করে। ইহারা সুসভ্য জাতি। লে প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র, কারণ বাণিজ্য-পথের মিলনস্থলে ইহা অবস্থিত। জোগি-লা পথে ইহা কাশ্মীর-উপত্যকার সহিত এবং অপর দিকে তিব্বতের লাসার সহিত যুক্ত। তাহা ছাড়া, কারাকোরাম ও সাসার-গিরিপথ হইয়া সিং-কিংয়াং-এ যাওয়া যায়।

লাডাকের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের উপত্যকায় বাল্টিস্তান অবস্থিত। লাডাক অপেক্ষা ইহার জলবায়ু কিছু মৃদু হইলেও তীব্র। এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ-উপত্যকায় দুই-একটি পাইন বা দেওদার গাছ এবং নদীর কূলে পপলার ও ইউলো গাছ জন্মে। যব, তরমুজ, পিচ, বাদাম, আঙুর, তামাকও উৎপন্ন হয়; অবশ্য অনুকূল স্থানে ও সামান্য পরিমাণে। স্কার্দো প্রধান শহর।

(৬) কারাকোরাম পর্বত ও উত্তর-পূর্বাংশের মালভূমি—কারাকোরাম পর্বতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই পর্বতের কারাকোরাম-গিরিপথ প্রসিদ্ধ। ঐ পর্বতের উত্তর-পূর্বের মালভূমি শুষ্ক ও অতি শীতল অঞ্চল। এখানে কতকগুলি লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে। ইহা লোকবসতির অযোগ্য স্থান। ভারত ও তিব্বত বা সিংকিং-এ যাইবার বাণিজ্যপথ এই মালভূমিকে অতিক্রম করিয়াছে।

টেরিটরি

দিল্লী

দিল্লী নগরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লইয়া এই টেরিটরি গঠিত। ইহার আয়তন ৫৭৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৭,৪৪,০৭২ ; আর লোকবসতির ঘনত্ব ৩,০৪৪। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এখানে বহু নূতন নূতন দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং পাঞ্জাব বিভক্ত হইবার ফলে পশ্চিম-পাঞ্জাবের বহু উদ্বাস্তু এখানে বাস করিতেছেন বলিয়া ইহার লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

দিল্লী নগর ভিন্ন এই টেরিটরিতে পল্লীগ্রামও আছে। এখানে পশ্চিম-যমুনা-খাল ও আগ্রা-খালের দ্বারা জলসেচ হয়। ইহার উৎপন্ন দ্রব্য পাঞ্জাবের মত। কারণ, ভৌগোলিক হিসাবে ইহা পাঞ্জাবের অন্তর্গত। ইহার জলবায়ু শুষ্ক এবং শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রাও পাঞ্জাবের মত। জানুয়ারী ও জুলাই-এর গড় তাপমাত্রা ৫৬'৯° ও ৮৭'৭° ফা. এবং বৃষ্টিপাত ২৬'২৪ ইঞ্চি।

যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী অতি প্রাচীন শহর। বর্তমানে যেখানে নয়াদিল্লী অবস্থিত, তাহার দক্ষিণে ১০-১২ মাইল স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যুগের দিল্লী নগর অবস্থিত ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আছে। আর, মুসলমান সম্রাট্‌দের বহু কীর্তি বর্তমান। তন্মধ্যে জুম্মা মস্‌জিদ, কুতব-মিনার, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগের পুরাতন দিল্লী শহর সম্রাট্ শাহ্‌জাহান নির্মাণ করেন। দিল্লী উত্তর-ভারতের রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এইজন্য ইহা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কাপড় ও চিনির কল ও ময়দা তৈয়ারীর কল আছে। এই শহরের কুটীর-শিল্প উল্লেখযোগ্য,—উহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্ত প্রভৃতি শিল্প-প্রসিদ্ধ। ইহার নিকটেই **নয়াদিল্লী** শহর। ইহা দিল্লী-টেরিটরি ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী।

হিমাচলপ্রদেশ

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে হিমাচলপ্রদেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন ১০,৯২২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১১,০৯,৪৬৬; আর, লোকবসতির ঘনত্ব

১০২। প্রধান-হিমালয়, মধ্য-হিমালয় (ধৌলাধর পর্বত) ও অব-হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী এখানে রহিয়াছে। আর, শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। শতদ্রু নদী গভীর গিরিখাতে প্রবাহিত। কারণ, শতদ্রু প্রধান-হিমালয়কে ভেদ করিয়াছে। উহার উপত্যকায় সিপ্‌কি গিরিপথ অবস্থিত। ঐ পথে তিব্বতে যাওয়া যায়। ঐ নদীতে ভাকরা-বাঁধ ও গোবিন্দসাগর নামক সুবৃহৎ জলাধারের নির্মাণ কার্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। হিমাচলপ্রদেশের জলবায়ু প্রধানতঃ শীতল। শীতকালে তুষারপাত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬০") হয়। গম, যব, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্য এবং ধান ও ভুট্টা প্রভৃতি খরিফ্ ফসল জন্মায়। ইহা ছাড়া, প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। কাংরা-উপত্যকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়। আপেল, পিচ, নাসপাতি প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের ফলও জন্মায়। হিমাচলপ্রদেশের বনভূমি উল্লেখযোগ্য। দেওদার, চিরপাইন, বাঁশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি বনজাত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হয়। তামা, দস্তা, সীসা, এ্যান্টিমনি প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যগুলি বিভিন্ন স্থানে অল্প-বিস্তর রহিয়াছে। খনিজ দ্রব্যগুলি উত্তোলন করা বা পরিবহন করা ব্যয়বহুল বলিয়া উত্তোলিত হয় না। মুণ্ডি-জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এখানে অবস্থিত। **সিমলা** (৭,২২৪') ইহার রাজধানী ও উল্লেখযোগ্য শৈলনিবাস। ইহা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। **ডালহৌসী** স্বাস্থ্যনিবাস। কৃষিকার্য, মেষচারণ ও কাষ্ঠ-সংগ্রহ এখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা।

মনিপুর

আসামের পূর্বে মনিপুর। উহার আয়তন ৮,৬২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫,৭৭,৬৩৫ ; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ৬৭। মনিপুর-টেরিটরির পাহাড়গুলি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং উহাদের মধ্যে নদী-উপত্যকা বর্তমান। এখানকার বরাক ও মনিপুর নদী এবং লোকতক্ হ্রদ উল্লেখযোগ্য। ঐ হ্রদের চতুর্দিকে পাললিক সমভূমি (১০০-১৫০ ব. মা.) রহিয়াছে। ঐ সমভূমি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এই অংশে ধান, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মায়। আর, ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এই সমভূমি-অঞ্চলই মনিপুরী জাতির লোকের বাসভূমি। এই হ্রদের নিকটে অপেক্ষাকৃত

উচ্চভূমিতে ইহার রাজধানী ও প্রধান শহর **ইম্ফল** অবস্থিত। এখানে বিমান-স্টেশন আছে। পার্বত্য-অঞ্চল অরণ্যসঙ্কুল, নানা আদিবাসীদের বাসভূমি। ভুট্টা, পাহাড়িয়া ধান, তূলা প্রভৃতি ফসল ঐ অংশে জন্মায়। **টাম্মু** ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এই টেরিটরিতে কোন রেলপথ নাই। মনিপুর রোড রেল-স্টেশন (ডিমাপুর) হইতে ইম্ফল হইয়া টাম্মু পর্যন্ত পাকারাস্তা আছে।

ত্রিপুরা

আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা অবস্থিত। ইহার আয়তন ৪০২২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,৩৯,০২৯ ; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ১৫৯। অরণ্যময় কয়েকটি পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে কতকটা সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে নদী-উপত্যকা বর্তমান। গোমতী ও ফেণী প্রধান নদী। ইহার পার্বত্য অঞ্চলে কুকী, মগ, চাক্‌মা প্রভৃতি আদিবাসী লোকেরা বাস করেন। বর্তমানে সমভূমি-অংশে পূর্ববঙ্গের বহু বাস্তুত্যাগী লোক বাস করিতেছেন। ত্রিপুরা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। সমভূমিতে ধান, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসল জন্মায়। পার্বত্যভূমিতে "জুম-প্রণালীতে" কৃষিকার্য হয়। ঐস্থানে কিছু কিছু তূলা উৎপন্ন হয়। এই টেরিটরিতে চা-ও উৎপন্ন হয়। কলা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি ফলও উৎপন্ন হয়। শাল- ও সেগুন-কাঠ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি ইহার অরণ্যজাত দ্রব্য। ইহার রাজধানী **আগরতলা** প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বিমান-স্টেশন আছে। এই টেরিটরিতে রেলপথ নাই।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন ৩,২১৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩০,৯৭১ ; লোকবসতির ঘনত্ব ১০। ব্রহ্মদেশের আরাকান ইয়োমা এই দ্বীপপুঞ্জ দুইটির মধ্যে দিয়া সুমাত্রা দ্বীপে প্রসারিত। প্রাকৃতিক গঠন এবং অধিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থা ও সভ্যতার দিকে বিচার করিলে দ্বীপপুঞ্জ দুইটি বিভিন্ন প্রভৃতির। এইজন্য পৃথক্‌ভাবে ইহাদের আলোচনা করা যুক্তসঙ্গত।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ—১০° উ. হইতে ১৪° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত প্রায় ২২০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ২০০টির অধিক দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। ইহাদের মোট আয়তন প্রায় ২৫০০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে উত্তর-, মধ্য- ও দক্ষিণ-আন্দামান দ্বীপই প্রধান। এই তিনটি প্রধান দ্বীপ পরস্পর সঙ্কীর্ণ প্রণালীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তাই, এই তিনটি দ্বীপকে একত্রে একটি দ্বীপ বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং উহাকে বৃহৎ আন্দামানও বলা হয়। দ্বীপগুলি ভূ-বিদ্যার আধুনিক যুগের (Teritary) সৃষ্ট বেলেপাথার, চূণাপাথর, ক্লে প্রভৃতি শিলায় গঠিত; তবে, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার উচ্চতম অংশের উচ্চতা ২৪০০ ফুট। সারা বৎসর এই দ্বীপপুঞ্জের তাপমাত্রা কম-বেশী ৮৫° ফা. এবং বৃষ্টিপাত ১০০"-এর অধিক। মৌসুমী বায়ু প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইলেও প্রত্যেক মাসেই কিছু-না-কিছু বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তাই, দ্বীপগুলি অরণ্য-সঙ্কুল। উষ্ণ ও আর্দ্র-অঞ্চলের চিরহরিৎ ও মৌসুমী-অঞ্চলের পর্ণমোচী, এই উভয় শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ এখানে জন্মে। বনজাত দ্রব্য ইহার প্রধান সম্পদ। প্রচুর পরিমাণে কাঠ এখান হইতে রপ্তানি হয়। পোর্টব্লেয়ারের পার্শ্ববর্তী স্থানে কিছু কিছু চাষ-আবাদ হয় (৭৫ হাজার একর জমি পরিষ্কার করিয়া ১৫ হাজার একর জমি কৃষিক্ষেত্র ও উক্ত পরিমাণ চারণক্ষেত্র রহিয়াছে)। ধান ও নারিকেল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। দক্ষিণ-আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণাংশে **পোর্টব্লেয়ার** অবস্থিত। ইহা বন্দর ও রাজধানী। এখানকার আদিবাসীরা অসভ্য। ইহারা নিগ্রো-শ্রেণীর (Negritos) অন্তর্গত। পূর্বে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ভারতীয় কয়েদীদিগকে এখানে নির্বাসিত করা হইত। বর্তমানে তাহাদের বংশধরগণ এখানে রহিয়াছে। তাই, ভারতের বিভিন্ন জাতির লোক এখানে দেখা যায়। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বহু বাস্তুত্যাগী এখানে বাস করিতেছেন।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—৬° উ. হইতে ১০° উ. পর্যন্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ইহার উত্তরতম দ্বীপ কার-নিকোবর দক্ষিণ-আন্দামান দ্বীপ হইতে ৭৫ মাইল এবং দক্ষিণতম দ্বীপ বৃহৎ-নিকোবর দ্বীপ সুমাত্রা দ্বীপ হইতে ৯১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ১৯টি দ্বীপের ১২টিতে লোকবসতি আছে।

দ্বীপগুলি প্রধানতঃ বেলেপাথরে গঠিত এবং উহারা উচ্চ নহে। কেবলমাত্র বৃহৎ ও ছোট নিকোবর দ্বীপ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও ব্যবচ্ছিন্ন এবং উহারা অরণ্যময়; অন্য দ্বীপে অরণ্য নাই। এই দ্বীপগুলি আয়তনে ছোট ছোট,—বৃহত্তম বৃহৎ-নিকোবর ১৩৩ বর্গমাইল, কার-নিকোবর ৭৯ বর্গমাইল, চৌরা (Chaura) মাত্র ২·৮ বর্গমাইল ইত্যাদি। আবার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা এইগুলি অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ এবং ইহার অধিবাসীরাও সভ্য। ডাচ, পর্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের (উহারা প্রধানতঃ জলদস্যু) সংস্পর্শে এই দ্বীপপুঞ্জ আসে। তাই, এখানে বহু খৃষ্টান রহিয়াছে। এই দ্বীপগুলির তাপমাত্রা ৬৯-৯৮° ফা. এবং বৃষ্টিপাত ৯০-১৭০" ইঞ্চি। বৃহৎ নিকোবরে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং উহাই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এবং আমিন ও মিনিকয় দ্বীপ

মালাবার-উপকূল হইতে ১৮০-৩০০ মাইল দূরে আরব সাগরে এই দ্বীপগুলি অবস্থিত। এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-দ্বীপ। ইহাদের মোট আয়তন ১১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২১,০৩৫; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ১,৯১২। তাই, ইহারা ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপ। এখানে অসংখ্য দ্বীপ রহিয়াছে; তন্মধ্যে ১০টিতে লোকবসতি আছে। মিনিকয়ই বৃহত্তম দ্বীপ। উহার আয়তন মাত্র ১¾ বর্গমাইল। এই স্থানের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। নারিকেলই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তাহা ছাড়া, সামান্য পরিমাণে মিলেট, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি জন্মায়, কিন্তু ধান উৎপন্ন হয় না। অধিবাসীরা মুসলমান এবং ইহাদের ভাষা মালায়ালাম, তবে মিনিকয়ের ভাষা পৃথক্, উহা সিংহলী ভাষার অনুরূপ। এই স্থানের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য, কাছিম প্রভৃতি। কজিকোড (কেরল) ইহার শাসনকেন্দ্র।

নাগাপাহাড়-টুয়েনসাং অঞ্চল

আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহার আয়তন ৬,২৩৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩,৬৯,০০০। ইহা তিনটি জেলা

লইয়া গঠিত,—(১) নাগাপাহাড়, (২) মোকোকচাং এবং (৩) টুয়েনসাং। ৭১৮ গ্রামে নাগা জাতির লোকেরা বাস করে। পাহাড়-পর্বত ও নদী-উপত্যকা লইয়া ইহা গঠিত। জাপভৌ (১০,০০০′ ফু.) উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। বিভিন্ন উচ্চতায় জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্রকৃতির। আর, ইহার বহু অংশ অরণ্যময়। **কোহিমা** ইহার রাজধানী। ইহা উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মনিপুর-সড়কের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। ইহা কেন্দ্রীয় শাসিত-অঞ্চল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-এজেন্সি বা নেফা

প্রধানতঃ হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলের পূর্বাংশে এই অঞ্চল (এজেন্সি) অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩২,৯৬৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫ লক্ষ ৬০ হাজার (গত ১৯৫১ খৃঃ এই অঞ্চলের লোকগণনা হয় নাই)। এই এজেন্সির পার্বত্যভূমি বহু শৈলশিরা, গিরিখাত ও গভীর নদী-উপত্যকা লইয়া গঠিত। দিহিং, দিবং, লোহিত, নোয়া-দিহং, সুবনশিরি, ভরালু প্রভৃতি নদী গভীর উপত্যকায় প্রবাহিত। উচ্চতা ভেদে এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ দেখা যায়,—নিম্নঅংশে উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জের গভীর অরণ্য, ইহার পর উচ্চতাভেদে পর পর শীতপ্রধান অঞ্চলের পর্ণমোচী, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, তৃণভূমি, আল্পীয় উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং উচ্চঅংশে শীতকালে তুষারপাত হয়। এই অঞ্চলের ধান, আলু, তুলা, কচু প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই এজেন্সিকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) কামেং সীমান্ত বিভাগ (বোমডিলা), (২) সুবনশিরি সীমান্ত বিভাগ (জিরো), (৩) সিয়াং সীমান্ত বিভাগ (আলং), (৪) লোহিত সীমান্ত বিভাগ (তেজু), (৫) টিরাপ সীমান্ত বিভাগ (মার্ঘেরিটা)। বন্ধনীর মধ্যে শাসনকেন্দ্র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই এজেন্সি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল।

এই পার্বত্য-ভূমি বিভিন্ন আদিবাসীর বাসভূমি। কামেং-বিভাগের অধিবাসীরা আকা। ইহাদের সংগঠন-শক্তি অধিক। ইহারা সাহসী, পরিশ্রমী

ও শিকারে দক্ষ। সুবনশিরি-বিভাগের অধিবাসীরা ডাফলা। আকাদের অপেক্ষা ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি। ইহারা খর্বাকৃতি, বলিষ্ঠ ও সাহসী। সুবনশিরি-বিভাগে মিকির জাতির লোকও বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ লম্বা, বলিষ্ঠ এবং দেখিতে সুশ্রী। ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি। সিয়াং-বিভাগে আবর জাতির লোক বাস করে। আর, লোহিত-বিভাগে মিস্‌মি জাতির লোক বাস করে।

বর্তমানে এই এজেন্সির নানাভাবে উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে,—কতকগুলি পাকারাস্তা, কতকগুলি জিপগাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা এবং হাঁটা-রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। সদিয়া-তেজু, উত্তর-লক্ষিমপুর-কিমিন (সুবনশিরি), ওয়াং-বোমডিলা, সদিয়া-রোয়িং (লোহিত) প্রভৃতি রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য। পাসিঘাটে বিমান নামিবার উপযুক্ত স্থান (Air strip) আছে।

অন্যান্য অঞ্চল

পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল

চন্দননগর, ইয়ানান, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও **মাহে** ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চল ছিল। ১৯৪৯ খৃঃ চন্দননগর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৫৪ খৃঃ ১লা নবেম্বর ফরাসী-সরকারের সহিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত-সরকারের অন্যান্য স্থানগুলির শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে ১৯৫৬ খৃঃ ২৮শে মে নয়াদিল্লীতে ফরাসী-সরকারের সহিত ভারত সরকারের যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে ঐ স্থানগুলি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হইয়াছে এবং একজন চীফ কমিশনারের শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। তবে, এখনও আইনগতভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানান, করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরি ও কারিকল এবং মালাবার উপকূলে মাহে অবস্থিত। ইহাদের মোট আয়তন ১৮৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,১৭,১৬৩। **পণ্ডিচেরি** রাজধানী ও বন্দর। ইহার কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে ঋষি অরবিন্দের আশ্রম আছে। **কারিকল** ও **মাহে** বন্দর।

সিকিম (রক্ষণাধীন রাজ্য)

নেপালের পূর্বে এবং দার্জিলিং জেলার উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে সিকিম রাজ্য। ইহার আয়তন প্রায় ২,৭৪৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৩৭,৭২৫। এই রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা লেপ্‌চা; উহারা বৌদ্ধ; তাই এখানে তিব্বতীয় কৃষ্টি যথেষ্ট রহিয়াছে। বর্তমানে বহুসংখ্যক নেপালীও এখানে বসবাস করে।

কাশ্মীর বা নেপালের মত সিকিমে সমভূমি দেখা যায় না। উচ্চ পার্বত্যভূমি, শৈলশিরা, গিরি-খাত, নদী-উপত্যকা লইয়া এই রাজ্য গঠিত। তিস্তা ও উহার উপনদী রঞ্জিৎ এখানে প্রবাহিত। উহাদের সঙ্গমস্থানের উচ্চতা মাত্র ৭৫০'; ইহাই এই রাজ্যের নিম্নতম অংশ। আবার, পূর্ব ও উত্তরাংশে বহু সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত। তন্মধ্যে **কাঞ্চনজঙ্ঘা** সর্বোচ্চ। আর, এখানে রহিয়াছে বহু ছোট-বড় হিমবাহ। ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতাভেদে বিভিন্ন অংশের জলবায়ু বিভিন্ন,—নিম্ন নদী-উপত্যকার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং উচ্চভূমির জলবায়ু শীতল। শৈলশিরার দক্ষিণ-ঢাল বৃষ্টিবহুল এবং উচ্চভূমিতে (৮০০০'-এর অধিক) যথেষ্ট তুষারপাত হয়। উচ্চতাভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ জন্মায়, নিম্ন নদী-উপত্যকায় প্রচুর বাঁশগাছ; আবার, উচ্চভূমিতে রোডোডেনড্রন গাছও দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে ধান ও ভুট্টা এবং উচ্চভূমিতে (৭,৫০০'-এর অধিক উচ্চ নহে) যব ও গম জন্মায়। সিকিমে নদী-উপত্যকায় যথেষ্ট কমলালেবু উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, দারুচিনিও পাওয়া যায়। এখানে গবাদি পশুপালন যথেষ্ট হয়। ইহাই এদেশের অধিবাসীদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়। তাম্র ও উহার সহিত মিশ্রিতভাবে এ্যান্টিমনি ও বিসমাথ এবং গ্যালেনার আকর রহিয়াছে; কিন্তু ঐগুলি উত্তোলিত হয় না।

গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং একমাত্র শহর। জাতীয় সড়ক গ্যাংটক ও জেলেপ-লা ও নাথু-লা (লা-গিরিপথ) হইয়া তিব্বত-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে চুম্বি-উপত্যকার (তোর্সা নদীর উচ্চঅংশ) মধ্য দিয়া লাসায়

যাওয়া যায়। ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার ইহাই প্রধান বাণিজ্যপথ। আবার, ভূটানের রাজধানী পুনাখা যাইবার ইহাই একমাত্র সুগম পথ।

স্বাধীন রাষ্ট্র

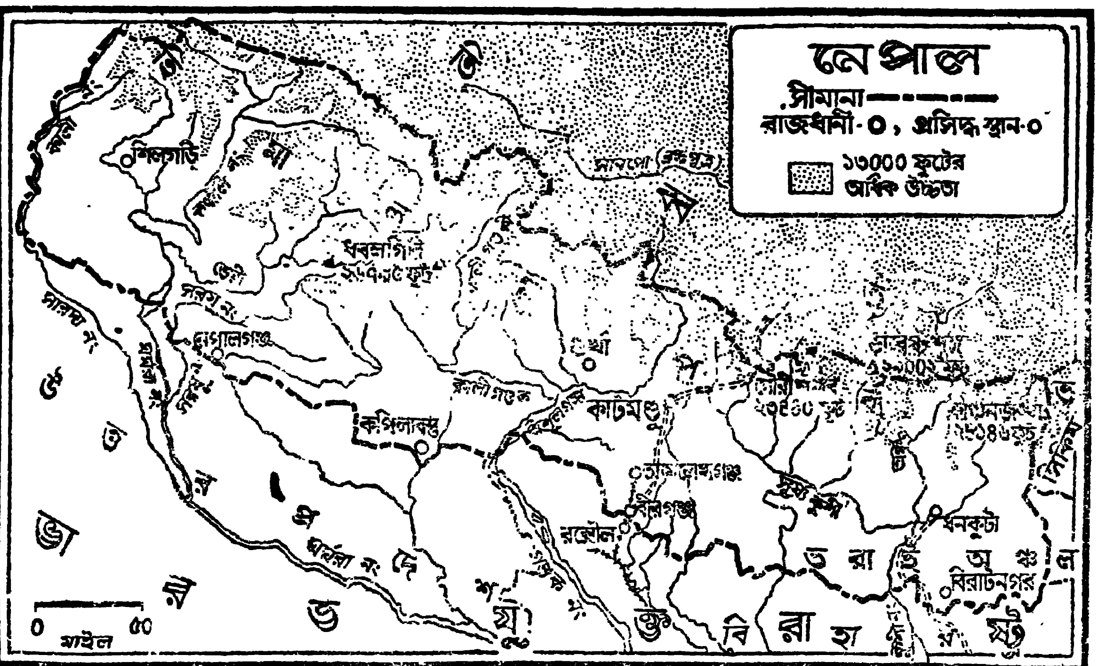
নেপাল

হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে নেপাল অবস্থিত। ভৌগোলিক হিসাবে ভারতের অন্তর্গত হইলেও ইহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহার আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ। এই রাষ্ট্রের দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল (৮০° হইতে ৮৮° পূঃ—কালী নদী হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত) এবং প্রস্থ ১০০-১৫০ মাইল।

নেপালের উত্তরাংশে প্রধান হিমালয়; ইহা উচ্চ পার্বত্যভূমি। এই অংশে **এভারেস্ট, মাকালু, ধবলগিরি** (ধৌলাগিরি), **কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশঙ্কর** প্রভৃতি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি অবস্থিত। মধ্যাংশে **মধ্য-হিমালয়** (মহাভারত লেখ) ও নদী-উপত্যকা। উহার দক্ষিণে **শিবালিক** শ্রেণী (চুরিয়াঘাটি) অবস্থিত। আর, সর্বদক্ষিণে **তরাই-এর** নিম্নভূমি। এই অংশে গভীর বনভূমি আছে। এই স্থানের শালই প্রধান বৃক্ষ। **কুশী** (অরুণ, এ্যম্বক, সূর্যকুশী), **গণ্ডক** (সপ্ত-গণ্ডক —ত্রিশূলী, পূর্ব-রাপ্তী, কালী, বুড়িগণ্ডক), **ঘর্ঘর,** (কালী কারনালী, ভেরী), **পশ্চিম-রাপ্তী, বাঘমতী** প্রভৃতি নদনদী এখানে প্রবাহিত।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; আর, উচ্চ পার্বত্যভূমিতে তুষারপাত হয়। তরাই-এর জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং উচ্চভূমির জলবায়ু শীতল। নিম্নভূমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ, গম প্রভৃতি এবং উচ্চভূমিতে ভুট্টা, গম, যব প্রভৃতি ফসল জন্মায়। এদেশের বনভূমি হইতে যথেষ্ট কাঠ সংগ্রহ করা হয়। সপ্ত-গণ্ডক নদী-উপত্যকায় অভ্র, গ্রাফাইট, বিস্‌মাথ, কোবল্ট, এ্যান্টিমনি, গন্ধক, মূল্যবান প্রস্তর, কয়লা, তাম্র প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় না।

নেপালের মধ্যভাগে একটি উর্বর উপত্যকায় (বাঘমতী) **কাটমাণ্ডু** অবস্থিত। ইহা এই রাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান শহর। **ভাটগাঁও** এবং **পাটান,**


নেপাল
সীমানা
রাজধানী-০, প্রসিদ্ধ স্থান-০
১৩০০০ ফুটের অধিক উচ্চতা
কাটমণ্ডু
কপিলাবস্তু
ধনকুটা
বিরাটনগর
রক্সৌল
শিলগাড়ি
ধবলাগিরি
সাংপো (ব্রহ্মপুত্র)
ঘর্ঘরা নং
কালী গণ্ডক
সরযু নং
০ মাইল ৫০

এই দুইটি উল্লেখযোগ্য শহর এই উপত্যকায় অবস্থিত। এই শহরগুলির কাষ্ঠ-নির্মিত বাড়ী ও মন্দিরের কারুশিল্প মনোরম। বিহারের রাক্সল হইতে একটি পাকারাস্তা (ত্রিভুবন রোড) এই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ অংশে রাক্সল হইতে আমলেখগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ আছে। তরাই-এর বীরগঞ্জে কয়েকটি চাউলের কল এবং বীরনগরে পাট ও চিনির কল রহিয়াছে।

ভুটান

সিকিমের পূর্বে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে ভুটান রাষ্ট্র। ইহার আয়তন প্রায় ১৮,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। অধিবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। ভুটানে হিমালয়ের পার্বত্যভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—এখানে শিবালিক পর্বতশ্রেণী নাই এবং শাখা-শৈলশিরাগুলি প্রধান পর্বতশ্রেণীর সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত নহে;—প্রধান পর্বতশ্রেণী হইতে শাখা-শৈলশিরাগুলি লম্বভাবে নির্গত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে রহিয়াছে নদী-উপত্যকা। চোমোহারি উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। এদেশের মধ্য দিয়া টোর্সা, রায়ডাক, মানস প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। ভূটান বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ইহার জলবায়ু আর্দ্র। নিম্ন-পার্বত্যভূমির জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ইহা অরণ্যসঙ্কুল বলিয়া অধিবাসীরা সাধারণতঃ ৪ হাজার ফুটের অধিক উচ্চস্থানে বসবাস করে। ধান, গম, ভুট্টা, কমলালেবু ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে গালা, মৃগনাভি ও মোম পাওয়া যায়।

পুনাখা রাজধানী। এদেশে বহু বৌদ্ধ-মঠ আছে। ঐ মঠগুলিই এক একটি দুর্গ (Dzong—জং) ও শাসনকেন্দ্র। বর্তমানে **থিম্বু**-এ রাজধানী স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সিকিম হইতে চুম্বি-উপত্যকার রাস্তা চীনের অধিকারে আসিয়াছে; তাই, জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা হইতে সিনচু-লা-এর মধ্য দিয়া থিম্বু পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী হইবে।

ভারতের বৈদেশিক অধিকার

পর্তুগীজ-ভারত

কাঠিয়াবাড়-উপকূলের **দিউ** ও ঐ উপদ্বীপের **তিনটি গ্রাম**, **গুজরাটের দমন** ও **নগর হাভিলি** এবং কঙ্কণ-উপকূলের **গোয়া** ও কারওয়ার নিকটস্থ অঞ্জি দ্বীপ পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত অঞ্চল। ইহাদের মোট আয়তন ১,৫৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,২৪,১৭৭ ('৪০)। উহাদের মধ্যে গোয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ইহার জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য কঙ্কণ-উপকূলের মত। এখানে ম্যাঙ্গানিজ ও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে (ষোড়শ শতাব্দী) **পুরাতন গোয়া** (Velha Goa) উন্নত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে ইহা প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখানে খৃস্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সাধু **সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের** সমাধি আছে। এইজন্য ইহা খৃস্টানদের তীর্থস্থান। **নোভা গোয়া** বা **পানজিম** পর্তুগীজ-ভারতের রাজধানী। **মরমুগোয়া** প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় উৎকৃষ্ট। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য, লবণ, মাছ, বাদাম প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

Questions and Exercise

Lithosphere

1

1. Make classification of Mountains based on their mode of origin giving examples of each case.

2. How are fold mountains formed? Give examples.

3. What are fold and fault of the Earth? Explain with diagrams.

4. What is a volcano? Give a short description of the usual form and structure of one with a diagram.

5. Write a short note on the geographical distribution of volcanoes.

6. How are earthquakes caused? Describe their effects on land.

7. Write short notes on (*a*) Block Mountain, (*b*) Rift Valley, (*c*) Escarpment, (*d*) Epi-centre, (*e*) Dip, (*f*) Strike and (*g*) Chief types of folding.

2

1. Give a broad classification of plateaus and give examples.

2. Explain effects of climate on plateaus.

3. Describe the effects of glacier upon a plateau over which it passes.

4. Write short notes on (*a*) canyon, (*b*) tableland, (*c*) mesa, (*d*) dissected plateau and (*e*) paneplain.

5. Write the characteristic features of a mountain region.

6. Write short notes on (*a*) foothill and spur, (*b*) interlocking spur, (*c*) mountain pass, (*d*) water-parting or divide, (*e*) gorge and (*f*) rapid.

7. Give examples of the various ways in which plains have been formed.

8. Write short notes on (*a*) high plain, (*b*) flood-plain, (*c*) delta-plain, (*e*) karst plain, (*f*) piedmont plain, (*g*) alluvial fan and river terrace or floodplain terrace.

9. Describe plains in dry climate.

10. What is deflation? How are playa and desert parement formed?

11. Write notes on (*a*) sand-dune, (*b*) loess plain and (*c*) aeolian sand plain.

12. Describe glaciated plains with examples.

13. Explain the formation of the following with diagrams :—hanging valley, arête, fiord, boulder clay, esker, erratic, drumlin, moraine, col, horn and cirque.

14. Write notes on :—lagoon, wave-cut terrace, estuary, ria coast, barrier reef, atoll.

3

1. What is the difference between weathering and denudation ?

2. Explain mechanical and chemical weathering.

3. What are the different agents that bring about denudation of the Earth's surface ? Explain their works.

4. Write notes on the following :—stalagmite and stalactite, land slide, fossil, geyser, spring and artesian well.

5. Write a short description of marine depositions and erosion.

6. In what different ways may lakes be formed ? Give an example of each type.

7. Describe the work done by a river as denuding, transporting and depositing agent. (Patna. Mat.)

Hydrosphere

1. Describe and account for the variations in salinity of the oceans and seas.

2. What are the chief causes of ocean currents ? Draw a sketch-map showing the chief currents of the Atlantic Ocean.

3. "Winds are the chief cause of Ocean currents." Explain this by reference to the principal currents of the Indian Ocean.

4. Explain why the Greenland is colder than Norway though in the same latitude. (C. U. '40)

5. Explain by diagrams the formation of tides. Explain Spring Tide, Neap Tide. (C. U. '24)

6. Why is the interval between high tide and the corresponding high tide next day nearly 25 hours. (C. U. '24)

7. Write notes on the following :—equatorial counter current, sargasso sea, cold wall, great bank, river-bore and tidal wave.

India

1

1. Draw an outline map of India and show on it the main physical regions.

2. Describe the mountain system of the Southern India. (C. U. '40

3. Describe the physical features of the Deccan Plateau. (C. U. '20)

4. Divide India into physiographic regions and describe briefly one of them.

5. Draw the map of India showing the principal mountain ranges and rivers.

6. Describe the physical features of the Deccan Plateau. (C. U. '16, '19)

7. Give a short description of the Himalayas.

8. Compare and contrast the rivers issuing from the Himalayas with the peninsular rivers.

9. Draw a sketch map showing the rivers which flow from the Deccan Plateau to the Bay of Bengal.

2

1. In what parts of India would you expect the greatest, and in what parts the least rainfall ? Give your reasons. (C. U. '48)

2. Name the seasons into which the year is divided in India, describing the weather condition of each.

3. Give a general account of the climate and distribution of rainfall in India. (C. U. '16, '18)

4. Draw a sketch map of India indicating by arrows the direction of rain-bearing winds over the country.

5. What is a "rain-shadow region"? Show such regions in India by drawing a sketch map of it. Say how they affect climatic conditions of the regions and thus the life of the people.

6. Divide India into various regions according to climate and describe one important region.

7. Write notes on the following:—The Thar, Nor' Westers, Mango Rains of South India, Tropical cyclones.

8. Account for the following facts :—

(a) Madras has two rainy seasons in the year.

(b) Over most of India the cold weather is almost rainless.

3

1. How does rain control the distribution of forest in India? Mention the main economic uses of forest. (Pat. '51)

2. Write an account of the natural vegetation of India. Mention the important Indian forest products.

3. Give a short account of the soils of India. Classify them and give their characteristics.

4. Explain why irrigation is necessary in India. Describe the various methods of irrigation in India and discuss their relative importance. (Cal. Int. '45)

5. Discuss the importance of irrigation of the Southern India, and describe the systems of irrigation prevailing there. (U. P. Board, '44)

4

1. Give a short description of the Damodar Valley Project. Why is it called a multipurpose project? Name two other river valley schemes of similiar nature. (Gau.-'56)

2. What are the chief sources of Industrial power in India? How far have they been utilised? (U. P. Board, '44)

3. Give an account of the development of the river valley projects in Southern India. Say its influence on the economic life of the area.

4. Analyse the geographical conditions suitable for the development of Hydro-electric power. Do you think it would be wise to develop such projects in the regions possessing coal? (Cal. B. Com., '53)

5. Discuss the factors which should be present for the development of Hydro-electric power. Give a brief description of the Hydro-electric installations of the Northern India.

6. Give an account of the water-power resources of India. How their development is expected to stimulate the industrial activities of the Indian people?

5

1. Give a short account of the soils of India. Classify them and give their characteristics.

2. What do you know about soil erosion? How can afforestation check it?

3. On a sketch map of the India Republic, show the important regions of production of food grains. (Cal. Int. '47)

4. Briefly narrate the conditions favourable for the growth of rice and wheat? What parts of India are best suited for the production of these crops? (Cal. Int. '44)

5. Explain why (*a*) rice flourishes in the lower Ganga valley (*b*) tea on the lower-slopes of the Himalayas and (*c*) cotton in the Deccan. (Pat. '46)

6. What are the principal plantation products in India? Discuss their areas of production.

7. Name the two important fibres produced in India. Give an account of the conditions favourable for their large-scale production.

8. Write a brief account of the main agricultural resources of the Northern India.

9. Divide India into rainfall regions and show the relationship between the rainfall distribution and the main agricultural crops. (C. U. Int., '52)

10. Name, with examples, three types of fisheries.

11. Write a short summary of the Indian fishing industry.

12. Where are river fisheries more important than sea fisheries?

6

1. Draw a map of India showing the regions where the most important minerals are obtained. (Cal. Int. '47, '50.)

2. Draw a map of India and show on it the distribution of coal, iron, maganese, mica and copper and the centres of iron and steel industry. (U. P. Board, '42.)

3. State what places of India produce non-ferrous metals?

4. Draw a map of India and show the important sources of supply of coal, iron ore and mineral oil.

7

1. On a sketch map of India show the principal railway routes with the short description of each railway-zone.

2. Draw a sketch map of India and show the principal air-routes.

3. You propose to go by rail from Amritsar to Jamshedpur via Delhi and Nagpur. State the Railway system over which you will travel and the commercial importance of these places. (Cal. Int., '47).

4. Write a short note on inland waterways in India.

5. Indicate the hinterlands of the ports of Bombay, Visakhapatnam and Calcutta. Also state the principal articles which are exported from these ports. (Cal. Int., Dacca. Int.)

6. Analyse the factors for the development of a port. Illustrate with examples from India. (Pat., '46.)

7. What is meant by "Coastal Shipping"? Name the ports of importance in India's coastal trade.

8. Account for the importance of the following :—Jamshedpur, Patna, Visakhapatnam, Jabalpur, Nagpur, Indore, Bangalore, Asansol, Kanpur, Varanasi, Surat, Gauhati and Kandla.

8

1. Write short notes on (*a*) Bhilai, (*b*) Rourkela, (*c*) Durgapur (*d*) Sindri, (*e*) Bhakra-Nangal.

2. What are the raw materials of the iron and steel industry? Where are they found in India? Locate the principal centres of industry.

3. State reasons why the Bombay state has become the India's chief centre of cotton manufacturing industry.

4. What are the advantages and disadvantages of the cotton manufacturing industry being situated in Bombay.

5. Discuss the geographical factors favouring the growth and development of sugar industry in India and state also centres of this industry.

6. Write briefly the chemical industry of India.

7. What are the raw materials of the paper industry of India?

Where are they found in India? Locate the principal centres of industry.

(Cal. B. com.,—'56)

8. What are the essential raw materials for the manufacture of cement ?

State the place where this industry is at present located in India. (C. U. Int., '49)

9. Write notes on (*a*) Ship-building industry, (*b*) Aircraft industry, (*c*) Leather industry and (*e*) Silk Textile industry.

10. Write briefly what you know about the textile industry of India.

9

1. Write a short essay on the foreign trade of India stating (*a*) imports and their sources, and (*b*) exports and their destinations. (Cal. Int., '50)

2. On a sketch map of India draw the areas of the greatest and of the least density of population. Also state briefly why the distribution of populations is so irregular in India.

10

1. Draw a sketch map of Assam and give a brief account of the geography of the State. (Gau. '54)

2. Compare and contrast the valleys of the Brahmaputra and the Surma under the heading of rainfalls and productions.

3. Write an account of natural vegetation of Assam. What are the important forest products of this state. (Gau. '53)

4. Write a short geographical account of West Bengal with special reference to its relief, climate, agriculture, industries and towns.

5. Divide West Bengal into natural regions, giving reasons for your division. Describe briefly one important region.

6. In what parts of West Bengal is irrigation practised on a large scale ? Why ? What are the different methods of irrigation ?

7. Name the three principal industries of West Bengal. State very briefly the circumstances which favoured their development.

8. What are the principal Cottage Industries of West Bengal ? Give a short account of three such industries.

9. Write briefly the agricultural resources of West Bengal.

10. Write a short account of the River Projects of West Bengal.

11. Describe briefly the Industrial Belt of Greater Calcutta.

12. Write notes on (*a*) The Duars, (*b*) The Sundarbans, (*c*) The Raniganj coal fields.

13. Account for the importance of the following :—Darjeeling, Siliguri, Asansol, Bolpur, Durgapur, Kharagpur, and Naihati.

14. Give a short geographical accounts of the following states :—Bihar, Uttar Pradesh, Madya Pradesh, Orissa, Bombay, Madras, The Punjab and Kerala.

15. Describe the position and account for the importance of the following towns :—Madras, Pondicherry, Cochin, Bangalore, Hyderabad, Ahmadabad, Ajmer, Jaipur, Bhopal, Delhi, Amritsar, Lucknow, Agra and Simla.